সমৃদ্ধ দত্ত
ব্ল্যাক করিডর
১
ব্ল্যাক করিডর • সমৃদ্ধ দত্ত

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, কিছু ভুল থাকবে। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

সমৃদ্ধ দত্ত
ব্ল্যাক করিডর
১
ব্ল্যাক করিডর • সমৃদ্ধ দত্ত

কেন আচমকা এক সেলিব্রিটিকে দিনেদুপুরে হত্যা করা হল? দুবাই থেকে ভারতে হওয়া ক্রিকেটের ম্যাচ ফিক্সিং হয় শোনা যায়। কিন্তু ফিক্সিং প্রসেসটা কেমন? টিভিতে তো বোঝা যায় না! ডিফেন্স ডিলে সত্যিই কি ওই বিখ্যাত ভিআইপি ঘুষ নিয়েছে? কোনো এক কুখ্যাত মার্ডার প্লটের অন্তরালে আসলে কী ঘটেছিল? সভ্যতার শুরু থেকেই অজানাকে জানার উদগ্র বাসনাই মানুষের ইতিহাসের চালিকাশক্তি। গোপন, আড়ালে থাকা সত্যকাহিনির প্রতি কৌতূহল আমাদের সহজাত। আমরা নিজেরা নিরুত্তাপ সাদা জগতে বাস করলেও রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার জগতের গোপন কালো গতিপথে চোখ রাখতে চাই সন্তর্পণে! যতই সেই পথের নাম হোক ব্ল্যাক করিডর!

ISBN : 978-93-88351-28-7

ব্ল্যাক করিডর

সমৃদ্ধ দত্ত

দে'জ পাবলিশিং

কলকাতা ৭০০০৭৩

e-mail: deyspublishing@hotmail.com

www.deyspublishing.com

BLACK CORRIDOR

The Chronicles of Dark Hours (based on real story) in Bengali

by SAMRIDDHA DUTTA

Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing

13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700073

Phone: (033) 22412330/ (033) 22197920, Fax: (033) 2219 2041

e-mail : deyspublishing@hotmail.com www.deyspublishing.com

₹400.00

ISBN : 978-93-88351-28-7

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৯, মাঘ ১৪২৫

নতুন সংস্করণ : জুলাই ২০১৯, আষাঢ় ১৪২৬

প্রচ্ছদ : মৃণাল শীল

৪০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে।

দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদৰক : সুভাষচন্দ্র দে। বিসিডি অফসেট

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭৩

মানসী দত্ত, শ্বেতম দত্ত
এবং
শ্ৰেয়ম দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম

ভূমিকা

আমাদের সকলের মধ্যে একজন করে অপরাধী আছে। মন আর মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালী হয়তো স্থির করে দেয় কোনও এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই অপরাধী বহির্জগতে অবতীর্ণ হবে, নাকি সংযত হয়ে মনোজগতের অন্দরমহলেই রয়ে যাবে। ঠিক এই কারণেই এক চরম অপমান কিংবা ব্যক্তিগত ক্ষতির মুহূর্তে আমাদের মনের ইচ্ছা হয় কাউকে খুন করতে। আমরা ঝগড়া, বিবাদ, মতান্তরের কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে মনে মনে বলেও ফেলি, 'গলা টিপে খুন করে দেব একদিন'। মনে মনে কেন? প্রকাশ্যেও উচ্চারণ করি সেই ক্রোধজনিত হুমকি। আমার চূড়ান্ত ক্ষতি করেছে অথবা আমার পরিজনের সর্বনাশের জন্য কেউ দায়ী, এরকম পরিস্থিতির সামনে আমাদের মনে তাই জন্ম নেয় অন্তহীন রাগ। সেই ক্রোধ তৎক্ষণাৎ একটি বিচার চায়। ব্যক্তিগত বিচারই হল হত্যার সিদ্ধান্ত। কিন্তু কারও ক্ষেত্রে ওই উচ্চারণ নিছক মুহূর্তের এক মানসিক অবস্থান। সে কখনও তার মধ্যে থাকা অপরাধী সত্তাকে বাইরে এসে যথেচ্ছাচার করতে দেয় না। নিজেকে গুটিয়ে নেয় চরম কোনও পদক্ষেপের থেকে। সেই সংযমের কারণ সামাজিক বা আইনি ভয় হতে পারে, মানসিক নিয়ন্ত্রণ হতে পারে কিংবা কার্যকারণ ও পরিণামের বিশ্লেষণ শক্তি তাকে হয়তো সেই রাস্তায় যেতে নিবৃত্ত করে। এক্ষেত্রে প্রথাগত তথা পারিবারিক শিক্ষা একটি বিশেষ ভূমিকা অবশ্যই পালন করে। এবং সব থেকে বেশি ভূমিকা হয়তো পরিবেশ তথা আবহের। কোন পরিবেশে সে বসবাস করছে। সুতরাং মনোজগতে একই স্তরের অপরাধী দুটি মানুষের মধ্যে বাস করলেও, কারও অপরাধ প্রবণতা প্রকট হয়। আবার কেউ সেই মনোভাবকে দমিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। তাই একই কারণে কেউ শত্রুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কেউ মরিয়া ইচ্ছা থাকলেও সেটি বাস্তবায়িত করা থেকে নিজেকে সংযত করে। তাই কোনও ব্যক্তি বাস্তবিকই একটি হত্যা করে জেলে যায়। আবার কোনও ব্যক্তি মনে মনে অসংখ্য হত্যা করে এবং অপারগতার জ্বালা বুকে নিয়েই আপাতসরল দিনযাপন করে। এরকমই এক মনস্তাত্ত্বিক কারণে গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, টিভি সিরিয়ালে অপরাধী তথা ভিলেনের চরম সাজাপ্রাপ্তির সময় পাঠক, শ্রোতা, দর্শকদের মধ্যে এক মানসিক তৃপ্তির জন্ম হয়। হিরো যখন ভিলেনকে ঘুসি

মারছে অথবা গুলি করছে, দর্শকের মনোজগৎ আলোড়িত হয় এই ভেবে যেন তিনিই ওই শাস্তিটি দিচ্ছেন। তাই ওই শেষ দৃশ্যে উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে দর্শক ও পাঠকও। অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অসংখ্য না পারা বে-আইনি পদক্ষেপ ওই পর্দায় কিংবা উপন্যাসের পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত হচ্ছে, এটা দেখে এক আত্মসন্তোষের জন্ম হয়। আমরা তাই বারংবার ওইসব দৃশ্য দেখতে পছন্দ করি। পড়তে তৃপ্তি লাভ করি। ওঁইসব গ্রন্থ, ওইসব সিনেমা এভাবেই জনপ্রিয় হয়।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একজন করে গোয়েন্দা আছে। পারিবারিক, আত্মীয়মহল অথবা পারিপার্শ্বিকে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার পিছনে আসল কারণটি কী সেটি জানা তথা উদ্ঘাটনের এক প্রবল বাসনা আমাদের তাড়িত করে সর্বদাই। আমরা অবিরত বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করি ঠিক কী ঘটেছিল, কার সঙ্গে কার সম্পর্ক কেমন ছিল, ক্রস চেক করে যাচাই করি কে সত্য বলছে, এমনকী পরিচিত কারও গোপন জীবনরহস্য জানতে পারলে সেটিকে অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করি সামাজিক আলাপচারিতায়। কখনও বা সেই ব্যবহার করা প্রবণতার কঠোর নামটি হয় ব্ল্যাকমেল। এই মনোভাবগুলির আড়ালে যে সাইকোলজি কাজ করে সেটি হল গোপন তথ্য জানার সুখ ও আগ্রহ। আত্মীয়বন্ধুদের কোনও এক গোপন জীবন অথবা ঘটনা আমি জেনে ফেললে অন্যদের থেকে নিজেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবেই আমরা প্রতিভাত করি। আমরা তর্কাতর্কির সময় নিজেকে সংযত করতে না পেরে বলেও ফেলি, 'তোমরা কতটুকু জানো ওর সম্পর্কে? ও যা করেছে সেটা বললে চমকে যাবে'! এই যে অন্যদের চমকে দেওয়ার ইচ্ছা বা প্রবণতা এটি সর্বগ্রাসী। তাই আবহমানকাল ধরেই গোপন তথ্য, অজানা জীবন, আড়ালে থাকা রহস্য জেনে ফেলার মতো তৃপ্তি এক তীব্র মনস্তত্ত্ব। আর ঠিক সেই কারণেই যখন আমরা রহস্যকাহিনি পাঠ করি, তখন গোয়েন্দার পাশাপাশি আমরাও মনে মনে প্রতিটি পৃষ্ঠাই বিশ্লেষণ করতে করতে এগোই। শেষ পৃষ্ঠার আগেই আমরা বুঝে ফেলার প্রাণপণ প্রয়াস করি অপরাধী আসলে কে? প্রত্যেক রহস্যকাহিনিতেই গোয়েন্দার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও একজন করে গোয়েন্দাতেই রূপান্তরিত হন। কোনও পাঠকের আগাম আন্দাজ মিলে যায়। কেউ হয়তো মেলাতে পারেন না। কিন্তু আমাদের মধ্যে বাস করা গোয়েন্দা সত্তা অবিরত

আমাদের সঙ্গে চলতে থাকে সামাজিক পরিসরেও। সারাক্ষণ সে খতিয়ে দেখে সামনের লোকটির চোখের গতিপ্রকৃতি কেমন। সে কি মিথ্যা বলছে? আমাদের আলাপচারিতার মধ্যেই ওই তৃতীয় নয়নটি ক্রমাগত অবলোকন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করে অস্বাভাবিক কোনও মুহূর্ত অথবা ঘটনাপরম্পরাকে। তারপর আমরা একাকী হলে সেই সত্তা আমাদের গোপনে শোনায় সে কী কী দেখেছে এবং সন্দেহ করেছে। আমাদের ভিতরে থাকা গোয়েন্দাটির বিশ্লেষণে আমরা চালিত হই পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে।

এই প্রাথমিক গৌরচন্দ্রিকার কারণ একটি জানা অবস্থান আরও একবার উচ্চারণ করা। সেটি হল সহজাতভাবেই আমরা কৌতূহলী, রহস্যভেদ সন্ধানী এবং গোপন মনোসিন্দুকের তালা ভাঙতে আগ্রহী। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে সবথেকে দ্রুত যে তিনটি সেক্টর পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করে হরিহর আত্মা হওয়ার দিকে এগিয়েছে এবং বছরের পর বছর যৌথ ভেঞ্চারে সমান্তরাল অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে, সেগুলি হল রাজনীতি, কর্পোরেট এবং মাফিয়াতন্ত্র। এই তিন পাওয়ার করিডর একজোট হলে যে সর্বশক্তিমান হবেই তা নিয়ে সংশয় নেই। যে অপরাধীকে কিছুতেই বাগে আনা যায় না, আমরা বারংবার লক্ষ করেছি তার পিছনে রাজনৈতিক ক্ষমতার বরাভয় রয়েছে। যে কর্পোরেটের সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে সংস্থা অন্য যোগ্যতরদের ছাপিয়ে একের পর এক সরকারি কন্ট্রাক্ট আদায় করে নেয়, তার ওই সাফল্যের পিছনে থাকে রাজনীতির আশীর্বাদ। আর কর্পোরেট ও রাজনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম হাইফেনের মতো যোগবিন্দু হয়ে রয়ে যায় অপরাধের কালো জগৎ। এই কালো জগতের বাসিন্দা না হলেও এই রহস্যময় দুনিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ কিন্তু দুর্নিবার। দাউদ ইব্রাহিম সংক্রান্ত যে কোনও নতুন কাহিনি সংবাদমাধ্যমে উপস্থাপিত হলে সর্বাগ্রে সেটি পড়ে নিতে ইচ্ছা হয়। হাড় হিম করা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ এবং তার পরবর্তী তদন্তকাহিনি, উপর্যুপরি উঠে আসা চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে অবিরাম চর্চা যে তুমুল জনপ্রিয়, তার প্রমাণ টিভি চ্যানেলগুলির অন্তহীন কভারেজ আর সংবাদমাধ্যমের লাগাতার ফলোআপ স্টোরি। আমাদের মধ্যে অনেকেই এসব কভারেজের জন্য সংবাদমাধ্যমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। অর্থাৎ কেন সংবাদমাধ্যম এভাবে হত্যাকাহিনি, অপরাধপ্রবণতা, ক্রাইম থ্রিলার প্রচার করে? কিন্তু এই

অভিযোগকারীরা এটা মনে রাখেন না যে, সংবাদমাধ্যম যদি দেখে এই প্রতিপাদ্যগুলি প্রচার বা সম্প্রচার করা সত্ত্বেও দর্শক কিংবা পাঠক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, তাহলে কিন্তু সেগুলির প্রচার হবে না। সোজা কথায় এটা কিছুটা ব্যবসায়িক ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের পাটিগণিত বললে কি মিথ্যাচার হবে? মনে হয় না। ঠিক এইভাবেই গোয়েন্দাকাহিনি বরাবরই অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সাহিত্য বিভাগ। মননশীল, উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন, সামাজিক উত্তরণ তথা নির্মল ভালোবাসা অথবা জীবনের সাফল্য ব্যর্থতার অনুপম বার্তাবাহী গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে আমরা মানসিক তৃপ্তি খুঁজে পাই ঠিকই। কিন্তু তার পাশাপাশি রহস্য, গোয়েন্দাকাহিনিও সমানভাবে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

ভারতের বিভিন্ন শহর ও রাজ্যে ঘটে যাওয়া বহু চমকে দেওয়া অপরাধ, রহস্যময় ঘটনাপরম্পরা, ফাঁস হয়ে যাওয়া চমকপ্রদ তথ্য অথবা শিহরন তৈরি করা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাড়া ফেলেছে বারংবার। সাধারণ অপরাধ, দুর্নীতির পাহাড়প্রমাণ বিস্ময়কর প্রবণতাগুলির সঙ্গে নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্ত হয়েছে নতুন এক প্রবণতা। সন্ত্রাস! সেই সন্ত্রাসের কারিগরদের আগে মনে করা হয়েছিল দূরাগত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকেই তারা আসে এবং ভারতকে টার্গেট করে মর্মান্তিক গণহত্যা করে চলে। কিন্তু ক্রমেই জানা যায় আমাদের আশেপাশে অতি নিরীহ আমজনতার মধ্যেই মিশে থাকে একইভাবে নিরীহদর্শন সন্ত্রাসবাদী অথবা তাদের সহায়কবৃন্দ। সিকিউরিটি এজেন্সির পরিভাষায় যাদের বলা হয় স্লিপার সেল। কীভাবে ঘটেছে কোনও একটি অপরাধ সেটি তো জানাই যায়।

কিন্তু যে কোনও গা শিউরে ওঠা অপরাধের আড়ালের প্ল্যানিংটি ঠিক কেমন? কারা জড়িত হল? কেমনভাবে এই অন্ধকার রাস্তায় একজন অপরাধী হাঁটতে শুরু করে? আপাতসরল কোনও একটি কাহিনি তথা ঘটনার পিছনে কোন গোপন গল্প লুকিয়ে রয়েছে? এসব আগ্রহ জাগ্রত হয় আমাদের মনে। কিন্তু সর্বদা সেই উত্তরগুলি পাওয়া সম্ভব হয় না। কালের নিয়মে অন্য কোনও সংবাদের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় একদা তোলপাড় হওয়া একটি কাহিনিকে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যায় সেই চাঞ্চল্যকর রহস্যগুলি।'ব্ল্যাক করিডরে'র ভাবনার উৎপত্তি ঠিক এই আগ্রহ থেকেই। জানা ঘটনাপঞ্জির

আড়ালে আসলে কী ঘটেছিল? সেই জানার বাসনাই কৌতূহলের সঞ্চার করে। কর্মসূত্রে দিল্লি থাকা। তাই যখনই ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাওয়া হয়, তখন নিয়ম হল, একদিন দু'দিন কলকাতায় বর্তমান পত্রিকার সদর দপ্তরে যাওয়া। পত্রিকা পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হওয়া। ২০১৭ সালের এরকমই এক শেষ সেপ্টেম্বরে কলকাতার বর্তমান পত্রিকা দপ্তরে গিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে দীর্ঘ করিডরে মুখোমুখি দেখা জয়ন্তর সঙ্গে। সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক, জয়ন্ত দে। 'কী খবর', 'কেমন আছো', 'কতদিন থাকবে কলকাতায়'-এর চেনা বাক্যগুলির আদান-প্রদানের পর জয়ন্ত প্রস্তাব দিল, আচ্ছা আমাদের একটি ক্রাইম সিরিজ জাতীয় ব্যাপার করলে কেমন হয়? বললাম, ভালোই তো! একটা আইডিয়া করে ফেলা যাক! সেই সূত্রপাত 'ব্ল্যাক করিডর' রচনার ভাবনার। ডিরেক্টর অভিজিৎ ভট্টাচার্য বললেন, একদম অন্যরকম একটা ধারাবাহিক হোক না! সম্পাদক শুভা দত্তের বক্তব্য ছিল, অজানা বিষয়গুলি নিয়ে লিখবে, কত কিছু সংবাদ আসে, কিন্তু সবটা শেষ পর্যন্ত জানা হয় না। এই হল মোটামুটি রচনাটির প্ল্যানিং রুমের কাহিনি। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে একটানা ১১ মাস সাপ্তাহিক বর্তমান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল ব্ল্যাক করিডর ধারাবাহিক। শুরু থেকেই বিস্ময়করভাবে পাঠকবৃন্দ সাড়া দিয়েছিলেন। মেসেজ, চিঠি, ফেসবুক, টেলিফোনে প্রতি সপ্তাহে ফিডব্যাক দিতেন অসংখ্য মানুষ। এবং সর্বোপরি বিভিন্ন এজগ্রুপের পাঠকের রেসপন্স পাওয়াই সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমি সাহিত্যিক নই। একজন সাধারণ সাংবাদিক। তবু এই সামান্য প্রয়াস পাঠক সমাজ গ্রহণ করা একান্তভাবেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের নিয়ম হল কলকাতা পুস্তকমেলা সংক্রান্ত প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনটি হবে দিল্লিতে। কারণটি সহজবোধ্য। প্রতি বছর বইমেলার একটি থিমকান্ট্রি থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সেই বিশেষ রাষ্ট্রের যিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাঁকে ও তাঁর দেশের অতিথিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করতে বইমেলা কর্তাদের আসতেই হবে নয়াদিল্লির এমব্যাসিগুলিতে। সেই লক্ষ্যেই অন্যান্য পরিচালকবৃন্দের সঙ্গেই দিল্লি এসেছিলেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের অন্যতম কর্তা সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার। দিল্লি প্রেস ক্লাবে দেখা হল।

প্রতিবার যেমন হয় নানাবিধ গল্পের মধ্যেই হাসতে হাসতে বললেন, ব্ল্যাক করিডর খুব ভালো হচ্ছে। পড়ছি। লিখে যাও। আমরা কিন্তু বই করছি ওটা!

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সুধাংশুদার ওই বাক্যগুলি এই বইটির প্রথম পৃষ্ঠা। কৃতজ্ঞতা তাঁকেও । নানাবিধ তথ্য সংগ্রহের জন্য সিবিআই-এর বর্তমান ও প্রাক্তন আধিকারিক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আধিকারিক, আইবির প্রাক্তন অফিসার, দিল্লি এবং কলকাতা পুলিশের সম্মাননীয় আধিকারিকদের সাহায্য স্মরণ করা না হলে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। তাঁদের অনুরোধক্রমেই নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হল।

আমরা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও অন্ধকার সড়কে প্রবেশ করতে চাই না। আমরা সাধারণত আলোর পূজারি। যে পথ দিশা দেখায়, সেই রাস্তাই প্রকৃত গন্তব্যবাহী। তবু জীবনের চলার পথ সর্বদা একরৈখিক হতে পারে না। জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে অন্ধকার, অচেনা পথে আচমকা ঢুকে পড়তেই হয়। আবার সেই পথ থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বস্তির পাশাপাশি জমা হয় এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাও। তাই চেনা পথ ছেড়ে অন্য পথে হাঁটা সর্বদাই নেতিবাচক, এমন নয়। শুধু বেরনোর পথ জানা চাই। যাতে পথ না হারায়। জীবনের এই দর্শনকে মনে রেখেই অন্য অজানা এক সড়কে উঁকি মারার প্রয়াস মানব জীবনের সহজাত। যাকে বলা যেতে পারে অপার কৌতূহল। যে অজানা রহস্যময় সড়কটির নাম 'ব্ল্যাক করিডর'।

সমৃদ্ধ দত্ত

নয়াদিল্লি অক্টোবর, ২০১৮

১

ফোন বাজছে চিফ ক্যাশিয়ারের টেবিলে। ৪৫ মিনিট আগে ব্যাংক খুলেছে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। পার্লামেন্ট স্ট্রিট ব্রাঞ্চ। বেজেই চলেছে। কেউ ধরার নেই। কারণ চিফ ক্যাশিয়ার বেদপ্রকাশ মালহোত্রা গিয়েছেন দু নম্বর পেমেন্ট কাউন্টারে। একটি রিসিট নিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন। তাই ফোন ধরতে পারছেন না। ফোন থামছে না। বাজছে। পিওন হরিরাম এদিক ওদিক তাকিয়ে ফোনটা ধরলেন। কিছু শোনার আগে বলে উঠলেন, হ্যালো, স্যার তো রুম কে বাহার হ্যায়... আভি আ যায়েঙ্গে...। অপর প্রান্ত থেকে গম্ভীর গলাটি বলল, তুরন্ত বুলাও সাবকো। একটু ভয় পেয়ে ছুটলেন হরিরাম স্যারকে বলতে। বেদপ্রকাশ মালহোত্রা চিন্তিত মুখে ফিরে আগে বসলেন চেয়ারে। তারপর ফোন কানে দিয়ে দু সেকেন্ডের মধ্যে অন্য প্রান্তের কথা শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে! ফোনে তাঁকে গম্ভীরভাবে কেউ বললেন, পি এন হাসার বলছি! প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি টু প্রাইম মিনিস্টার। ধরুন, ম্যাডাম কথা বলবেন। ম্যাডাম? ফোনে? তাঁর সঙ্গে? স্টেট ব্যাংকের চিফ ক্যাশিয়ারের পা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। সামান্য বিরতি। ওপারে মহিলা কণ্ঠ। ম্যাডামের গলা টেলিফোনে কেমন হয় তা জানা নেই। কণ্ঠটি শীতলভাবে শুধু বললেন, মন দিয়ে শুনুন। এক ভদ্রলোক একটু পরই ব্যাংকের বাইরে আসবে। আপনার কোড ওয়ার্ড হবে "বাংলাদেশ কা বাবু"। মনে রাখবেন.. আই রিপিট 'বাংলাদেশ কা বাবু'। আর আপনাকে তার উত্তরে সেই লোকটি বলবে, 'বার অ্যাট ল'! সমঝ গয়ে না? 'বার অ্যাট ল'। যদি সে এই কোড দেয় তাহলেই তারপর তাঁর হাতে জলদি ৬০ লক্ষ টাকা ক্যাশ দিয়ে দেবেন। ছোট ক্যাশ ভ্যান নিয়ে গেটের বাইরে যান। ঠিক আছে? বেদপ্রকাশ মালহোত্রা কোনোমতে বলতে পারলেন একটাই বাক্য 'জি মাতা জি।' ইন্দিরা গান্ধীকে সরকারি অফিসারদের একটি বড় অংশ মাতাজি বলেই ডাকতেন। 'গুড' বলে মাতাজি ফোন রেখে দিলেন।

দিল্লির কেন্দ্রস্থল পার্লামেন্ট স্ট্রিটের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া শাখায় যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হল। ১৯৭১ সালের ২৪ মে। প্রাইম মিনিস্টার স্বয়ং ফোন করে নির্দেশ

দিয়েছেন ৬০ লক্ষ টাকা পেমেন্টের। কেন কী বৃত্তান্ত কিছুই জানাননি। এরকম কোনোদিন হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফোন করে একটি ব্যাংকের সামান্য চিফ ক্যাশিয়ারকে অর্ডার দিচ্ছেন অজানা অচেনা ব্যক্তিকে ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে দিতে? এত কার্যকারণ বিশ্লেষণের সময় নেই। আর সাহসও নেই। অতএব দ্রুত বলা হল ডেপুটি চিফ ক্যাশিয়ার রামপ্রকাশ বাটরাকে ৬০ লক্ষ টাকা প্যাক করতে। অ্যাকাউন্টসের এইচ আর খান্নার কাছে নির্দেশ গেল ক্যাশ থেকে টাকা ডেসপ্যাচের ফরমালিটি তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। বাটরার কাছে টাকার পরিমাণ আর কারণ শুনে চোখ কুঁচকে গেল ক্যাশিয়ার রাওয়াল সিং-এর। তখন চা দিতে এসেছে ক্যান্টিনের ছেলেটি। তার সামনেই রাওয়াল সিং জানতে চাইলেন ব্যাপার কী? এরকম তো শুনিনি? রেজিস্টারে পেমেন্ট ভাউচারে কে সই করবে? বাটরা চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন, মালহোত্রা করবে সিগনেচার! এরপর আর কথা চলে না। দুজন স্টাফ একটি ট্রাংকে টাকা তুলে দিলেন ছোট কালো ক্যাশ ভ্যানে। ড্রাইভার আর স্বয়ং ব্যাংকের চিফ ক্যাশিয়ার। গেটের বাইরে এসে বাঁদিকে বেঁকে একটু এগোতেই একটি লম্বা মানুষ হাত দেখাচ্ছেন । তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল ভ্যান। নামলেন না মালহোত্রা। জানালা দিয়ে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে শুধু তাকালেন। লোকটি সামনে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে মালহোত্রার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, আমিই সে। মালহোত্রা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, “বাংলাদেশ কা বাবু?” লোকটি এবার হাসল। ঘাড় নেড়ে বলল, ‘বার অ্যাট ল’। হাসি ফুটল মালহোত্রার মুখে। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে ক্যাশ ভ্যানের ডিকি খোলা হল। আর ট্রাংক বের করে নামানো হল মাটিতে। লোকটি বলল এবার আমাদের একসঙ্গে যেতে হবে। আপনার ড্রাইভারকে চলে যেতে বলুন ভ্যান নিয়ে। এবার বোঝা গেল ঠিক সামনেই একটি ট্যাক্সি আগে থেকে দাঁড় করানো আছে। সেখানে ট্রাংক তুলে দুজনে বসলেন পিছনে। আর সামান্য একটুক্ষণ পরই এসে গেল সর্দার প্যাটেল রোড আর পঞ্চশীল মার্গের ক্রসিং। ব্যস! এখানে দাঁড়াও। ট্যাক্সিচালক ব্রেক মারল। ৬ ফুটের বেশি লম্বা লোকটি মালহোত্রাকে বললেন, এখানে নেমে আপনি সোজা প্রাইম . মিনিস্টারের বাড়ি থেকে ভাউচার সাইন করিয়ে নিয়ে ব্যাংকে চলে যান। মালহোত্রাকে মাঝপথে নামিয়ে ট্যাক্সি চলে গেল। মালহোত্রা এগোলেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে। এবং প্রাইম

মিনিস্টারের বাড়ির রিসেপশনে পরিচয় দিয়ে শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী তখন বাড়িতে নেই। পার্লামেন্টে।

পার্লামেন্টে তখন এত কড়াকড়ি ছিল না। তার উপর পরিচয় যেখানে স্টেট ব্যাংকের চিফ ক্যাশিয়ার। বিশেষ করে মালহোত্রা নিজে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল কমিটির সদস্য। তাই রিসেপশনে যখন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যোগাযোগ করতে চাইলেন তাঁকে ফোনে কথা বলিয়ে দেওয়া হল সেখানে। এবং মালহোত্রা পি এন হাকসারকে চাইলেন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব। ঠিক এক মিনিট পর মালহোত্রার চোখের সামনের দুনিয়া কেঁপে উঠল। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিলেন। এবার বসে পড়লেন। তাঁর চোখমুখ দেখে পার্লামেন্টের সিকিউরিটি বিভাগের দুজন অফিসার ছুটে এসে তাঁকে ধরে না ফেললে তিনি পড়ে যেতেন মাটিতে। কারণ পি এন হাকসার ফোন তুলে মালহোত্রার কথা শুনে বলেছেন, এরকম কোনো অর্ডার প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে যায়নি। আর তিনি নিজে আজ অনেক সকালে পার্লামেন্টে। কারণ লোকসভায় স্পেশাল মেনশন আছে প্রাইম মিনিস্টারের। তাই ব্যস্ত। সুতরাং তিনি ফোন করে ম্যাডামকে ধরিয়ে দিয়েছেন এরকম প্রশ্নই ওঠে না। কিছু একটা ভুল হচ্ছে। আপনি ভিতরে আসুন। সিকিউরিটির অফিসাররা ধরে ধরে মালহোত্রাকে সংসদ ভবনের ভিতরে নিয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশ পেয়ে। সেখানে গোটা ঘটনা-পুরম্পরা শুনে পি এন হাকসার চিন্তিতমুখে বললেন, ইমিডিয়েট পুলিশে কমপ্লেন করুন। ওয়েল প্ল্যানড ব্যাংক রবারি। সুচারুভাবে আপনাদের ধোঁকা দিয়ে ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে। আপনারা কি পাগল? নাকি বোকা? এরকমভাবে কোনো প্রধানমন্ত্রী ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে ফোন করে বলবেন যে কাউকে ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে দিন! আর সেই টাকা দেওয়ার আগে আপনি একবার ফোন করবেন না প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে? কিংবা নিজের সুপিরিয়রকে? উলটে হাকসার অগ্নিমূর্তি। পি এম এটা জানতে পারলে আপনাদের সকলের চাকরি যাবে। মালহোত্রা আর কিছু ভাবতে পারছেন না। এত বড় একটা গেমপ্ল্যান? মালহোত্রা কিন্তু পুলিশে যাননি। তিনি ফিরে এলেন ব্যাংকে। এবং কোনো কথা না বলে চুপচাপ নিজের চেয়ারে। একটু পরই আচমকা এল পুলিশ। কী ব্যাপার? জানা গেল মালহোত্রার দেরি হচ্ছে দেখে টেনশন

রাখতে পারেননি জুনিয়র ক্যাশ কফিসার রাওয়াল সিং। তিনিই সোজা পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় গিয়ে এফ আই আর করে ফেলেছেন। মালহোত্রা বিস্মিত হয়ে কোনো কথাই বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, আপনাকে কে বলেছিল এফ আই আর করতে? আমার জন্য ওয়েট করলেন না কেন? রাওয়াল সিং বুঝলেন স্যার প্রচণ্ড রেগে গিয়েছেন। কিন্তু কেন?

অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ ডি কে কাশ্যপ, ইনস্পেক্টর হরি দেব, ইনস্পেক্টর এ কে ঘোষকে (বাঙালি অফিসার দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের) দেওয়া হল তদন্তের দায়িত্ব। এই তিন অফিসারই ক্রাইম ডিটেকশনে তুখড়। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে গিয়েছে। ততক্ষণে সংবাদমাধ্যম জেনে গিয়েছে। তদন্তের নাম দেওয়া হল 'অপারেশন তুফান।' প্রথমেই দু ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল ট্যাক্সিচালককে। সে জানিয়ে দিল ওই প্যাসেঞ্জার নেমেছিল ডিফেন্স কলোনিতে। তবে তার আগে ট্যাক্সি নিয়ে গিয়েছিল রাজিন্দার নগরে। সেখানে একটি বাড়ির সামনে ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে ঢুকে যায় ওই প্যাসেঞ্জার। আর ফিরে আসে একটি সুটকেস নিয়ে। সেখান থেকে পুরোনো দিল্লি। জায়গার নাম নিকলসন রোড। আগে থেকে একটি কালো পাঞ্জাবি পরা মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। আর তাকে সুটকেস দিয়েই বলা হয়েছিল, জোরে চালাও গাড়ি, এক্সট্রা টাকা দেব। ঝড়ের গতিতে ট্যাক্সি এসেছিল ডিফেন্স কলোনিতে। ওই রহস্যময় প্যাসেঞ্জার ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলেছিল, ভাই ট্রাংকটা একটু ভিতরে নিয়ে এসো। তাই করেছিল সে। আর পরিবর্তে? ৫০০ টাকা ভাড়া। যা ১৯৭১ সালে একটি ট্যাক্সিচালকের কাছে স্বপ্ন। শুধু শর্ত ছিল একদম মুখ খুলবি না। তোর উপর কিন্তু নজর রাখা হচ্ছে। সাবধান।

সেই ডিফেন্স কলোনির বাড়িতে ছুটল পুলিশের জিপ। সঙ্গে ড্রাইভার। কিন্তু লাভ হল না। ড্রাইভার শুধুমাত্র সিঁড়ির কাছেই এসেছিল। তারপরই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। একতলা, দোতলা, তিনতলা সব ফ্যামিলি থাকে। কেউ এরকম কোনো ব্যক্তিকে চেনেই না। তাহলে? এবার কী? তাহলে কি ধরা পড়বে না সেই ব্যক্তি? ছবি আঁকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। পোস্টার দেওয়া হবে। পরদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় একটি ফোন এসেছিল দিল্লি পুলিশের হেড কোয়ার্টারে। একটি মিহি গলার পুরুষ। বলা হল ইনভেস্টিগেটিভ

অফিসারকে দিন। কন্ট্রোল রুমে ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার আবার কোথায়? গলাটি বলল, ব্যাংক ডাকাতির কেসে ইনফরমেশন আছে। কাকে বলব? তৎক্ষণাৎ ডিসি ক্রাইম ব্রাঞ্চকে লাইন ট্র্যান্সফার করা হলে রহস্যময় কণ্ঠটি জানিয়ে দিল ওই ডাকাতের নাম নাগরওয়ালা। যে নিজেই এক প্রাক্তন এম আই অফিসার। এম আই মানে? মিলিটারি ইনটেলিজেন্স! আপনি এসব কীভাবে জানলেন? হু আর ইউ? আপনি ঠিক বলছেন তার প্রমাণ কী? পরপর প্রশ্ন করলেন ডিসি ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর এল, বিশ্বাস করার দরকার নেই। আই ওয়াজ ট্রাইং টু হেল্প ইউ! বাট আপনারা চান না। ফোন ছেড়ে দিচ্ছি! এবার সতর্ক ডিসি। তিনি বললেন, আচ্ছা আচ্ছা! ঠিক আছে বলুন। একটা হাসির আওয়াজে খসখসে মিহি গলাটি বলল, পুরোনো দিল্লির পার্সি ধর্মশালায় চলে যান আজ রাতে। পেয়ে যাবেন। সেই রাতেই পার্সি ধর্মশালা থেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেল নাগরওয়ালা। ২৮ বছরের যুবক আইপিএস অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট ডি কে কাশ্যপ সারারাত ধরে জেরা করলেন। পরদিন সকালেই নাগরওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে এক বিরাট ফোর্স গেল টাকা উদ্ধারে। এবং সত্যিই পুরো টাকা উদ্ধার হল সেই সুটকেস-সহ। পুরোনো দিল্লির এক কবরখানা থেকে। এই রহস্যময় কেসের কোনো মাথামুন্ডু বুঝতে পারছেন না ডি কে কাশ্যপ। কে রিক্রুট করল নাগরওয়ালাকে? আর ব্যাংকের চিফ ক্যাশিয়ার কেন পুলিশে কমপ্লেন করতে চায়নি? তাঁরও গাফিলতির সাজা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু কেনই বা সেই নাগরওয়ালা সেদিন দিল্লিতেই রয়ে গেল? পালিয়ে গেল না কেন? কেনই বা ৬০ লক্ষ টাকা কবরখানায় খোলা আকাশের নীচে একটি গর্তে রেখে দেওয়া হয়েছিল ৪৮ ঘণ্টা ধরে? কোনো উত্তর নেই। কিন্তু এসব ছিল নিছক প্রথম এপিসোড। আসল চমক শুরু হল এরপর।

নাগরওয়ালা মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই আদালতে স্বীকার করল সে এই প্ল্যান করেছে। এবং দ্রুত তার ৪ বছরের জেল হয়ে গেল। কিন্তু জেলে যাওয়ার ঠিক তিন মাস পর আচমকা নাগরওয়ালা ফের আদালতে আপিল করে জানাল সে নির্দোষ। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। সেশন কোর্ট আবার শুনানির নির্দেশ দিল বটে। কিন্তু সেই শুনানি শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর নাগরওয়ালার পুনরায় বিচারের আবেদন

খারিজ হয়ে গেল। তবে এই পুনরায় আবেদনের প্রেক্ষিতে সেই আই পি এস যুবক ডি কে কাশ্যপ দেখা করলেন নাগরওয়ালার সঙ্গে। জানতে চাইলেন আসল ঘটনাটি কী? আমার মনে হয় এর পিছনে কোনো গভীর চক্রান্ত আছে। নাগরওয়ালা বলেছিল, আপনাকে বলব। তার আগে আপনি এমন কোনো ব্যবস্থা করুন যাতে আমার কেসটা রিওপেন হয়। আর কেস সেই কোর্টে যেন ফেলা না হয়, যে ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সাজা দিয়েছেন। গভীর চক্রান্ত আছে। কাশ্যপ বললেন, আমি ট্রাই করছি। আপনি আপিল করুন আবার। ১৬ নভেম্বর নাগরওয়ালা আপিল করল আদালতে। অন্যদিকে কাশ্যপ কিছু তদন্তের সূত্র খুঁজতে শুরু করল। কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে তাঁর। কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। স্ত্রী অনুযোগ করছেন। কাশ্যপ বলেছিল একটা কেসে ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। দাঁড়াও অনেক কিছু হাতে আসবে। এটা ক্র্যাক করতেই হবে। তারপর বেড়াতে যাব। কিন্তু স্ত্রী নাছোড়। অতএব ২০ নভেম্বর স্ত্রীকে নিয়ে হানিমুনে যাচ্ছেন কাশ্যপ। দুজনেই দারুণ খুশি। পাহাড়ে। ফাঁকা রাস্তা। গাড়িতে। চণ্ডীগড়ে ঢোকার আগেই আচমকা দুদিক থেকে দুটি ট্রাক সামনে এসে ধাক্কা মারল। গাড়িতে। ড্রাইভার জাম্প করে বাইরে যেতে পারল। পারলেন না ডি কে কাশ্যপ। রহস্যময় দুর্ঘটনায় ২৮ বছরের আইপিএস যুবকের মৃত্যু হল। স্ত্রী বেঁচে গেলেন। কেন দুর্ঘটনা? দুর্ঘটনা নাকি হত্যা? আজও জানা যায়নি। তারপর কী হল? 'কারেন্ট' নামের একটি ইংরাজি পত্রিকা ছিল। পত্রিকার সম্পাদককে নাগরওয়ালা জেল থেকে চিঠিতে জানাল আমি একটা ইন্টারভিউ দিতে চাই। ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা ফেব্রুয়ারিতে। ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি জানা গেল নাগরওয়ালা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তিহার জেল হাসপাতালে ভর্তি। ব্যথা কমানো যাচ্ছে না। বমিও হচ্ছে। দ্রুত পাঠানো হল জি বি পন্থ হাসপাতালে। সাতদিন পর জানা গেল, লাঞ্চের পর লাগাতার কালো রঙের বমি হচ্ছে। এবং সেদিন দুপুর আড়াইটের সময় ১৫ দিন আগেও সম্পূর্ণ সুস্থ নাগরওয়ালার মৃত্যু হল! তারপরই জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন শুরু হল। বিরোধীরা চাইলেন বিচারবিভাগীয় তদন্ত। দিনের পর দিন সংসদ হয়েছিল উত্তাল। সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তো বটেই, খোদ প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বরের নাম জড়িয়েছে। কেন এই একের পর এক রহস্যময় মৃত্যু? কিন্তু

তখন সবেমাত্র বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার যুদ্ধ লড়ছে। ভারত প্ল্যান শুরু করেছে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লড়াইয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা হবে। দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে সীমান্ত পেরিয়ে। ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি আকাশছোঁয়া। আর জাতীয় রাজনীতিতে তখন আছড়ে পড়ছে একের পর এক অ্যাজেন্ডা। অতএব সময়ের সঙ্গে একসময় মুছে গেল এই রহস্যময় এপিসোড।

২

রাত আড়াইটের সময় একের পর এক দরজায় ধাক্কা। অবিরাম। 'জেন্টলম্যান প্লিজ ওপেন দ্য ডোর..জেন্টলম্যান ইটস আর্জেন্ট...জেন্টলম্যান ইওর প্রাইম মিনিস্টার ইজ ডাইং...!' যাঁদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে তাঁরা কেউ ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের সচিব, কেউ প্রধানমন্ত্রীর অ্যাডভাইসর, কেউ ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার অথবা দূতাবাসের অ্যাটাশে। ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ মধ্যরাত। অসহ্য ঠান্ডা। রাতে ঘুমাতেও দেরি হয়েছে সকলের। কারণ গতকাল এই তাসখন্দে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের মধ্যে। ১৯৬৫ সালের সেই যুদ্ধে পাকিস্তান যথেষ্ট ল্যাজেগোবরে হয়েছে। তারা ভেবেছিল ভারত এখনও ১৯৬২ সালের সেই চীন যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে পারেনি আর সেরকমই যুদ্ধে অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। কিন্তু আদতে তা হয়নি। জম্মু-কাশ্মীর তো বটেই, ভারতীয় সেনারা প্রায় লাহোরের দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছিল পালটা পাঞ্জাব বর্ডার ক্রস করে আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপে মান বেঁচেছে পাকিস্তানের। কিন্তু তার ৬ মাস পর সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে এই তাসখন্দ সম্মেলন পাকিস্তানকে আরও ব্যাকফুটে ফেলেছে। যাই হোক, পরদিনই ফেরা দিল্লি। দূতাবাসে রাশিয়ার অফিসারদের নিয়েই ছোটখাটো পার্টি হয়েছে। তাই প্রত্যেকের দেরি হয়েছে ঘুমাতে। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্য সোভিয়েত প্রশাসন যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে, তার থেকে কিছুটা দূরে আর একটি বাংলোয় ভারতীয় অফিসারদের আস্তানা। সেখানেই এই মধ্যরাতের দরজায় করাঘাত। প্রবল বেগে। এবং আতঙ্ক জড়ানো কণ্ঠ এক মহিলার। তড়িঘড়ি করে সকলেই লাফ দিয়ে উঠলেন একটিমাত্র বাক্য শুনে..ঘুমের মধ্যে সঠিক শুনেছেন তো সবাই বাক্যটি? নাকি ভুল শোনা হয়েছে? বাক্যটি হল, ইয়োর প্রাইম মিনিস্টার ইজ ডাইং...! প্রধানমন্ত্রী মারা যাচ্ছেন? মানে কী? কীভাবে? এটা সম্ভব নাকি? নাইট গাউন ছাড়াই অনেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখলেন রাশিয়া প্রশাসনের তথ্য দপ্তরের এক মহিলা অফিসার প্রায় কাঁপছেন। বললেন, আপনারা আসুন... আপনারা চলুন... হি ইজ সাফারিং আ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক..। কোনোমতে গরম জামাকাপড়। গায়ে দিয়ে একটা

গাড়িতেই সকলে বসে ছুটলেন শাস্ত্রীর বাংলোর দিকে। কাছে গিয়ে দেখা গেল বারান্দায় একটা ছোট্ট ভিড়। আর অস্বাভাবিক নীরবতা। দূর থেকে যাঁকে চেনা গেল তিনি হলেন আলেক্সি কোসিগিন। সোভিয়েত প্রিমিয়ার। ভারতীয় অফিসার, কূটনীতিক আর সাংবাদিকদের দেখেই তিনি একধাপ নেমে এলেন সিঁড়িতে। সেই দলে ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার যিনি সেই সময় অন্যতম অ্যাডভাইসর প্রধানমন্ত্রীর। তার আগের দিনই প্রিমিয়ার কোসিগিনের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তিনি। তাঁকে দেখেই কোসিগিন মাথা নাড়লেন, আর হাতটা নাড়িয়ে বোঝালেন ইটস ওভার..। তার মানে? নেই? শাস্ত্রীজি নেই? সম্পূর্ণ সুস্থ, চূড়ান্ত সাধারণ জীবনযাপন করা একজন মানুষ ৬২ বছর বয়সে আচমকা চলে যেতে পারেন নাকি? সকলেই হতচকিত। দৌড়ে ভিতরে গিয়ে কী দেখা গেল? প্রয়োজনের থেকে বিপুল বড়। একটা ঘর। একজন মানুষের পক্ষে শয়নের তুলনায় বিরাটকায় এক বেড। ঝকঝকে সাদা বেডশিট। সাদা পিলোকভার। সাদা পর্দা। কিন্তু বাবুজি (লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে ওই নামেও সম্বোধন করা হত) যে বালিশে মাথা রেখে ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছেন, তার পিছনে লাল দাগ কেন? রক্ত নাকি? আচমকা বাইরে প্রবল একঝাঁক গাড়ির শব্দ। জিপ। সেখান থেকে কঠোর মুখের সুট পরা চারজন রাশিয়ান ভদ্রলোক তড়িৎ বেগে নামলেন। মুখে কোনো এক্সপ্রেশন নেই। শরীর অত্যন্ত বলবান। তাঁরা জিপ থেকে নেমেই সোজা জানতে চাইলেন বাটলার হাউস কোথায়? অর্থাৎ যাঁরা ভিভিআইপির রান্নাবান্না করে সেই কুক, বাটলাররা কোথায় থাকে? ঠিক উলটোদিকের বিল্ডিংটি দেখানো হল তাঁদের। দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন তাঁরা সেই ভবনে। আর আতঙ্কে কম্পমান চার রাশিয়ান বাটলারকে বাইরে বের করে জিপে বসিয়ে এক নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন। কারা এঁরা? জানা গেল এঁরা দুর্ধর্ষ রাশিয়ান স্পাই এজেন্সি কেজিবির চার এজেন্ট। বাটলারদের নিয়ে যাওয়া হল কেন? তাহলে কি শাস্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি? কেজিবি এখানে কেন? তাঁরা ওই চারজনকে নিয়ে গেলই বা কোথায়? মধ্যরাতে, তাসখন্দে যে এরকম একটি চরম সাসপেন্স ভরা নাটকীয়তাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হচ্ছে, এটা দুনিয়ার কেউ জানতে পারছে না তখন। হাতেগোনা ভারতের কিছু

সরকারি অফিসার। রাশিয়ান প্রশাসনিক কর্তারা। আর একটু পরই জেনে যাবে পাকিস্তানের তাবত নেগোশিয়েটর এবং প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান।

তারপর কী হল? ধীরে ধীরে জানা গেল একঝাঁক অসঙ্গতি। অনেক না মেলা প্রশ্ন নিয়ে শাস্ত্রীর নিথর দেহ ফিরল দিল্লিতে। আর সেই মৃতদেহ দেখে সর্বপ্রথম শাস্ত্রীর মা চিৎকার করে বলে উঠলেন, হায় হায়..মেরে বিটওয়া কো জহর (বিষ) সে মার দিয়া...। তারপর? জানব একটু পরে। তার আগে জেনে নেওয়া যাক কী সেই ঘটনাপরম্পরা যা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নিয়তি তাঁকে নিয়ে এসেছিল ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন শাসিত এক প্রদেশের রাজধানী তাসখন্দে (যা আজকের উজবেকিস্তান)? যেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর এবং তাখসন্দ ঘোষণাপত্রের মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল বিদেশের মাটিতে! কী হয়েছিল?

কাশ্মীরের নেতা শেখ আবদুল্লা মস্কা গেলেন। ১৯৬৫। মার্চ। দু মাস আগে নিজের দল ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। গোটা কৌশলটিই অবশ্য স্ট্র্যাটেজিক। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁকে একটি পরোক্ষ বার্তা দিলেন। নিজে কিছু বলেননি। রাজ্যসভার এমপি সুধীর ঘোষকে দিয়ে দিলেন বার্তাটি। সেটি হল শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর নিয়ে খুব বেশি হলে যে দাবিটি আদায় করতে পারেন, সেটি হল ভারতের অন্তর্গত জম্মুকাশ্মীরের স্বশাসনের অধিকার। যেরকম অনেক পার্বত্য এলাকাকে দেওয়া হয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। ভারত থেকে মস্কা যাওয়ার অদ্ভুত রুট নিলেন শেখ আবদুল্লা। ভায়া লন্ডন। তাঁর এক প্রিয়পুত্র সেখানেই থাকে। ফারুখ আবদুল্লা। দিল্লি এবং বিশেষ করে কংগ্রেস তথা ভারত সরকার অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করছে যে, লন্ডনে সাংবাদিকদের সামনে শেখ আবদুল্লা বেফাঁস কিছু মন্তব্য করে বসেন কিনা। একটু লাগামছাড়া বক্তব্যই পাকিস্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে কাশ্মীর নিয়ে। এবং লন্ডনে দাঁড়িয়ে কিছু বলা মানে আন্তর্জাতিক স্তরের ইস্যু হয়ে যাবে। যদিও সেরকম কিছু ঘটল না। শেখসাহেব অত্যন্ত ম্যাচিওরড আচরণ করলেন। কোনো বিতর্কিত কথা, কাশ্মীর ইস্যুতে ত্রিপাক্ষিক কোনো হস্তক্ষেপ

এসব কিছুই বললেন না। হাঁফ ছাড়ল ভারতীয় প্রশাসন। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? বেশিক্ষণের জন্য নয়। কারণ মক্কাযাত্রার পর ফেরার পথে আবার এক অদ্ভুত রুট নিয়েছিলেন শেখ আবদুল্লা। আচমকা তিনি গেলেন আলজিরিয়া। সেখানে একটি বৈঠক করলেন এমন একজনের সঙ্গে যে, এরকম যে কোনো পরিণতমনস্ক রাজনীতিক করতে পারেন, তা কল্পনাতেও ছিল না কারও। যাঁর সঙ্গে শেখ আবদুল্লা বৈঠক করলেন তাঁর নাম চৌ এন লাই। চীনের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সঙ্গে চীনের তখন চরম ঠান্ডা সম্পর্ক। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পর চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে। এহেন চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ আবদুল্লা বৈঠকে কাশ্মীর নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো গোপন ফরমুলার আলোচনা করেছেন! এ নিয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ রইল না। সকলেই নিশ্চিত আদতে কাশ্মীরের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যেই শেখ কোনো নিশ্চয়তা চেয়েছেন চীনের কাছে। আর চীন তো এক পায়ে রাজি হবেই। ভারতে ফেরার পর প্লেন থেকে দিল্লির পালাম এয়ারপোর্টে নামার সঙ্গে সঙ্গেই শেখ আবদুল্লাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল। নিয়ে যাওয়া হল রাজধানী দিল্লির এক সরকারি বাংলোয়। গৃহবন্দি। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন নয়। দ্রুত তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল দক্ষিণ ভারতে। কোদাইকানালের এক মনোরম পরিবেশে একটি সুদৃশ্য আধুনিক কটেজে স্থান হল। কাশ্মীরের একটি বড় অংশের মানুষ ক্ষুব্ধ হলেন। এভাবে কেন শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করেছে ভারত সরকার? অপরাধটা কী? একজন আন্তর্জাতিক মানের নেতা আর একজন আন্তর্জাতিক নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন, বৈঠক করেছেন, কথা বলেছেন। এর মধ্যে অন্যায় কী? এসব নিয়ে তুমুল সরগরম কাশ্মীরও। ঠিক সেই সময়ই গুজরাতের কচ্ছের রানে আচমকা ভারত ও পাকিস্তানের সেনাদের মধ্যে গুলিবিনিময় শুরু হল। আর ঠিক এই সময় জেনারেল আয়ুব খানের মনে হল একদিকে শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করায় কাশ্মীরের মানুষ ক্রুদ্ধ, আবার কচ্ছের রানে সেনাবাহিনীকে ব্যস্ত রেখে দেওয়া হয়েছে, এটাই আদর্শ সময় ভারতকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার। কাশ্মীর দখলের। আয়ুব খান ধরেই নিলেন কাশ্মীরের মানুষ এবার সর্বান্তঃকরণে পাকিস্তানকে স্বাগত জানিয়ে জয়ের পথ সুগম করে দিতে সাহায্য করবে। সুতরাং জেনারেল আয়ুব খান শুরু করলেন তাঁর বিশেষ প্ল্যান। অপারেশন জিব্রাল্টর। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে জেনারেল

আয়ুব খানের এর আগে মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে। মিশরের কায়রো থেকে দিল্লি ফেরার পথে শাস্ত্রী স্থির করেছিলেন করাচিতে নামবেন। সেইমতো জেনারেল আয়ুব খানের সঙ্গে তাঁর দেখা ও বৈঠকও হল। আয়ুব খানের পরনে ছিল সুট। আর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছোটখাটো শরীরে সেই চিরাচরিত ধুতি আর পাঞ্জাবি। শাস্ত্রী চলে যাওয়ার পর আয়ুব খান নিজের মন্ত্রীদের কয়েকজনকে বেশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, নেহরুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এই লোকটা! আয়ুব খান লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে জাজ করতে ভুল করেছিলেন। এমনিতে শাস্ত্রী অত্যন্ত সাদামাঠা মনের মানুষ হলেও তাঁর ভিতরে কোনো দ্বিধা ছিল না যে তাঁর পছন্দ এবং অপছন্দ কোনটা। এলাহাবাদ থেকে রাজনীতি করা ভদ্রলোক আজীবন দেশ ও রাজনীতির কথাই ভেবেছেন। অন্য কোনোদিকে মন দেননি। জওহরলাল নেহরুর মতো শাস্ত্রীর স্টেটসম্যান কিংবা আন্তর্জাতিক নেতা হওয়ারও কোনো বাসনা ছিল না। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের ভূমিখণ্ড রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর, এই মনোভাবেই স্থির ছিলেন। কচ্ছের রানে যখন প্রবল গুলিবর্ষণ এবং প্রায় যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে, তখনও শাস্ত্রী চাইছিলেন একটা কোনো শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। তিনি চাননি কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে। কিন্তু সেটি তাঁর দুর্বলতা নয়। তাঁর আদর্শ ও নীতি। এবং যেই পাকিস্তান অপারেশন জিব্রাল্টর শুরু করে দিল কাশ্মীরে, তখন শাস্ত্রী সামান্য দ্বিধা না করেই তাঁর কমান্ডারদের বললেন, আপনারা যা ভালো বুঝবেন সেটাই করবেন। সরকার কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ১৯৬৫ সালের ৫ আগস্ট পাকিস্তান থেকে একঝাঁক অনুপ্রবেশকারী কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই একের পর এক সেতু উড়িয়ে দিল। সরকারি ভবনগুলি বোমা মেরে বিস্ফোরণে চুরমার করে দিতে শুরু করল তারা। কোনো বাধা না পেয়ে পাকিস্তান উল্লসিত। রেডিও পাকিস্তান ঘোষণা করে দিল “ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে” বিদ্রোহ শুরু হয়েছে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। কাশ্মীরের মানুষ আজাদির লড়াই শুরু করেছে। পাকিস্তানবাসী উল্লাসে বাজি ফাটাতে শুরু করেছিল। কিন্তু আসল ঘটনা অন্য। ভারতীয় সেনা সম্পূর্ণ অন্যরকম প্ল্যান নিয়ে যে এলাকা থেকে পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারীরা প্রবেশ করেছিল, সেই পাকিস্তানের দখলে থাকা হাজি পীর পাস দখল করে নিল। ২৭ আগস্ট। অনুপ্রবেশকারীরা ততক্ষণে কাশ্মীরের

ভিতরে ঢুকে আছে। সামনে থেকে ভারতীয় সেনারা আক্রমণ করছে। আবার পিছনে হাজি পির পাস ভারতীয় সেনার দখলে। মাঝখানে আটকে গেল তারা। সোজা কথায় আয়ুব খানের অপারেশন জিব্রাল্টর বিপর্যয়ের মুখে। সবথেকে হতাশার ব্যাপার হল, আয়ুব খান ভেবেছিলেন এবং নিজের দেশে রেডিও মারফত প্রচার করছিলেন, কাশ্মীরবাসীরা বিদ্রোহ করছে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত হল। বরং উলটে কাশ্মীরবাসীরা সুযোগ পেলেই পাকিস্তানীদের ধরে ফেলে ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দিয়েছে। যা অপ্রত্যাশিত পাকিস্তানের কাছে। এবার কী করা হবে? কিন্তু কাশ্মীর দখলে মরিয়া জেনারেল আয়ুব খানের কাছে যে 'প্ল্যান বি' আছে তা জানা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। এবারের নাম অপারেশন গ্র্যান্ডস্ল্যাম। এই অপারেশনের লক্ষ্য আখনুর ব্রিজ দখল করা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং সদ্য আমেরিকার থেকে উপহার পাওয়া প্যাটন ট্যাংকের মাধ্যমে ৩০ বর্গমাইল ভারতীয় এলাকা দখল করে নিল পাকিস্তান। আখনুর ব্রিজ দখল করে নেওয়ার লক্ষ্য স্থাপনের কারণ পাঞ্জাবের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। সোজা কথায় ভারতের মূলস্রোতের সঙ্গেই কাশ্মীর ছিন্ন হয়ে যাবে। ভারত তৎক্ষণাৎ এয়ারফোর্সকে অপারেশন শুরু করতে নির্দেশ দিল। মুহূর্তের মধ্যে ৩০টি ভারতীয় বায়ুসেনার ভ্যাম্পায়ার যুদ্ধবিমান অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ শুরু করল শত্রুবাহিনীর উপর। জবাব দিতে এগিয়ে এল পাকিস্তান এয়ারফোর্সের সাবার জেট। ক্রমেই যখন পাকিস্তান আখনুর দখলের দিকে এগোচ্ছে এবং জয়ের গন্ধ পেয়ে আয়ুব খান রীতিমতো উল্লসিত, ঠিক তখনই লালবাহাদুর শাস্ত্রী দিয়েছিলেন মাস্টারস্ট্রোক। তিন সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করে স্থির হল কাশ্মীরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে পাকিস্তানকে হতচকিত করে দিতে হবে অন্য নতুন ফ্রন্ট খুলে। তাই হল। ৬ সেপ্টেম্বর সকালে একঝাঁক ভারতীয় সেনার ইনফ্যান্টি ডিভিশন আর ট্যাংক রেজিমেন্ট সোজা অমৃতসর সীমান্ত ক্রস করে লাহোরের দিকে এগোতে শুরু করল। পাকিস্তানের মাথায় হাত। এরকম কোনো সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখেনি তারা। সমস্যাটা হল জেনারেল আয়ুব খানের পরামর্শদাতা এবং আর্মি অফিসাররা সকলেই ছিলেন ইয়েস ম্যান। পাকিস্তান প্রশাসনের প্রথম থেকেই যেটি সবথেকে বড় দুর্বলতা। নিয়ম হল, যে কোনো দেশের যুদ্ধকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে থাকতেই

হবে একটি কাউন্টার সিন্ডিকেট। সেই কাউন্টার সিন্ডিকেটের কাজ হল প্রশাসক, আর্মি, পরামর্শদাতাদের সিংহভাগ যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে চলেছে, আগেভাগেই সেই সিদ্ধান্তটি ফ্লপ করলে বা ব্যর্থ হলে কী করতে হবে, তার রূপরেখা ঠিক রাখা। অথবা বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখা। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সেটি চলে না। জেনারেল আয়ুব খান যা স্থির করছেন তার বিরোধিতা করা মানেই জেনারেলের রোষে পড়া সুতরাং আর্মির মধ্যেও কোনো বিপরীত অভিমত কেউ প্রদান করেনি। আয়ুব খান ভেবেছিলেন ১৯৬২ সালের ভারত আর ১৯৬৫ সালের ভারত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। চীনের কাছে নাস্তানাবুদ হওয়া ভারত আর ১৯৬৫ সালের ভারত যে এক নয়, সেটি তাঁর বুঝতে দেরি হয়েছিল। কারণ তাঁকে পাকিস্তানের ইনটেলিজেন্স সঠিক খবর দেয়নি যে, ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন কয়েকবছর ধরে লাগাতার ইওরোপ আর রাশিয়া সফর করে অসংখ্য আধুনিক ট্যাংক, আগ্নেয়াস্ত্র, সাবমেরিন, ফাইটার জেট কিনে ফেলেছেন। সোভিয়েত ব্লক সম্পূর্ণভাবে ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে বিপুল অস্ত্রসম্ভার দিয়েছে ভারতকে। সুতরাং সেটি ছিল অন্য ভারত। এবং সেই ভারতের দেশভক্তি কিংবা মনের জোরও ছিল মারাত্মক। পাকিস্তান লড়াই করছিল সাম্প্রদায়িক লাইনে। "হিন্দু ভারত কাশ্মীরের মুসলমান ভাইদের অত্যাচার চালাচ্ছে।" এই ছিল প্রাকপ্রচার। কিন্তু ভারতের রাজস্থানের এক সেনা ট্যাংক যুদ্ধে একাই পাকিস্তানের একের পর এক ট্যাংক ধ্বংস করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আয়ুব খান পরে জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে যান যে, ভারতের ওই সেনাটির নাম ছিল আয়ুব খান। ওই যুদ্ধের পর কেরলের এক মুসলিম সেনা সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন পরমবীর চক্র। আর একটি কাহিনি আরও প্রেরণাদায়ক। সেনাপ্রধান জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পার পুত্র ছিলেন এই যুদ্ধে এয়ারফোর্সের এক ফাইটার পাইলট। তাঁর যুদ্ধবিমানকে গুলি করে নামিয়ে এনেছিল পাকিস্তানীরা। জেনারেল আয়ুব খান জেনারেল কারিয়াপ্পাকে একটি ব্যক্তিগত বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, আপনার পুত্রের কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা তাঁকে মুক্তি দেব। শোনা যায়, তার জবাবী বার্তায় জেনারেল কারিয়াপ্পা বলেছিলেন, এই যুদ্ধে আমার হাজার হাজার পুত্র লড়াই করছে। প্রত্যেকটি ভারতীয় যুদ্ধবন্দি আমার পুত্র। আমার নিজের পুত্র বলে কারও প্রতি কোনো বিশেষ ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই।

এদিকে পাকিস্তানে কিন্তু পাকিস্তান সরকার ও প্রচার মাধ্যম তখনও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে আর মাত্র কয়েক.দিন। তারপরই কাশ্মীর দখল হয়ে যাবেই। এমনকী পাঞ্জাবের অনেকটা জমি দখল করে নিতে পারছে পাকিস্তানী সেনা। পাকিস্তান জুড়ে গান চলছিল মাইকে, "হাসকে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান"..। অন্যদিকে দিল্লিতে তখন যুদ্ধজয় নিয়ে এতটাই তুঙ্গে উত্তেজনা যে, সকলেই উদগ্রীব কখন খবর আসবে লাহোর দখল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সময় চলছিল চরম ট্যাংক যুদ্ধ। গোটা যুদ্ধে পাকিস্তানের ক্ষতি হয়েছে ২৫০টি ট্যাংক, ৫০টি এয়ারক্র্যাফট। প্রায় ৫ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে। আবার ভারতেরও ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩০০ ট্যাংক, ৫০টি এয়ারক্র্যাফট এবং হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। পাকিস্তানের থেকে বহুগুণ বেশি জনসংখ্যা, সেনাবাহিনী, এয়ারফোর্সের আয়তনের তুলনায় ভারতের ক্ষয়ক্ষতি আনুপাতিকভাবে অনেকটা কম। এবং সবথেকে বড় কথা হল পাকিস্তানের চরম বেইজ্জতি। কাশ্মীরের মানুষ পাকিস্তানকে চরম হতাশ করেছে। আবার ততদিনে ভারত প্রায় ৭০০ বর্গমাইল পাকিস্তানী জমি দখল করে ফেলেছে। আর ভারতীয় জমি পাকিস্তানের হস্তগত হয়েছে ৪০০ বর্গমাইল। ঠিক এরকম একটি মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল ইউ থন্ট দিল্লি ও করাচিতে এসে দু'পক্ষকেই বললেন, আর নয়! এবার যুদ্ধ বন্ধ করুন। অনেক টালবাহানার পর ২২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হল। যুদ্ধসমাপ্তির আগেও পাকিস্তান জ্বালা ভুলতে না পেরে সাম্প্রদায়িক লাইনেই প্রচার চালিয়ে যায়। বলা হয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী একজন হিন্দু নেতা। তাই তিনি পাকিস্তানকে দখল করতে চান। ঠিক যুদ্ধসমাপ্তির পর দিল্লির রামলীলা ময়দানে এক সমাবেশ ডাকা হয় যুদ্ধজয়ের আনন্দে। সেই মিটিংএ শাস্ত্রী বলেন, আজকের এই জনসভার সভাপতি কে? ওই যে বসে আছেন মীর মুস্তাক সাহেব। তিনি একজন মুসলিম। আজকের জনসভার প্রথম উদ্বোধনী বক্তা কে? ওই যে মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি। একজন খ্রিস্টান। মঞ্চে পার্সি, শিখ সকলেই বসে আছে। পাকিস্তানের কাছে এসব হল স্বপ্ন। তাদের রাষ্ট্রনেতাদের একটাই কাজ। ধর্মীয় জিগিরে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা। তা না হলে তারা ক্ষমতায় থাকতেই পারবে না। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনাই চলে না। যুদ্ধসমাপ্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দিল, তারা ভারত ও

পাকিস্তানের মধ্যে এই যুদ্ধ সমাপ্তির একটি চুক্তি সম্পাদন ও আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র প্রকাশের ক্ষেত্র ও মধ্যস্থতাকারী হতে প্রস্তুত। সেইমতো ১৯৬৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শেষ হলেও ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে তাসখন্দে সেই চুক্তি সম্পাদন ও দর কষাকষির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানেই গিয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে দড়ি টানাটানি। কারণ কে কতটা অধিকৃত ভূমি ছাড়বে, যুদ্ধবন্দিদের সংখ্যা কত, ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে এসব ছিল প্রধান ইস্যু। অবশেষে স্থির হল ১৯৬৫ সালের ৫ আগস্ট যাঁদের দখলে যে ভূমি ছিল, সেটি এবং যেখানে যাঁদের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল সেই পুরোনো অবস্থানে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং ভারতের লোকসান হল হাজি পীর পাস ফেরত দিয়ে দিতে হয়েছিল। যা পাকিস্তানের কাছে সর্বোত্তম উপহার ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ এসবে সন্তুষ্ট নয়। তারা তুমুল ক্ষিপ্ত আয়ুব খানের উপর। কারণ সবটাই ধোঁকা ছিল। কাশ্মীরবাসী সঙ্গে নেই। চীন অনেক লম্বাচওড়া লেকচার দিয়েছে, দিল্লির নিন্দা করেছে, কিন্তু সরাসরি সাহায্য করেনি। আর এই যুদ্ধে পাকিস্তানের কোনো লাভই হয়নি। অর্থনীতি ধসে গিয়েছিল। সুতরাং আয়ুব খান ছিলেন হতাশ ও নিরাশ।

চুক্তি সম্পাদনের আলোচনা শুরু হওয়ার আগে জেনারেল আয়ুব খান বুঝে গিয়েছিলেন শাস্ত্রী লোকটি মোটেই সহজ নয়। নরম নয়। দেখতে ওরকম। তিনি শুরুতেই বলেছিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীজি কাশ্মীর কে মামলে মে কুছ অ্যায়সা কর দিজিয়ে কী ম্যায়ভি আপনে মুলক মে মুহ দিখানে কাবিল রহু..'। মুচকি হেসে লালবাহাদুর শাস্ত্রী সুন্দর উর্দুতে উত্তরে বলেছিলেন, ‘সাহাব, ম্যায় বহোত মুয়াফি চাহতা হুঁ কী ইস মামলে মে ম্যায় কোই খিদমত নেহি কর সাকতা..। ঠিক কতটা তিক্ত ছিল ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক? পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত কেবল সিং পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীর মেয়ের বিবাহে একটি বেনারসি শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। সেই শাড়ি সেই অর্থমন্ত্রী নিলামে চড়িয়েছিলেন এবং সংগৃহীত অর্থ পাকিস্তান ডিফেন্স ফান্ডে দিয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি বিকেলে সেই ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সাড়ে ৯ টা নাগাদ নিজের ঘরে ফিরে এলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ব্যক্তিগত পরিচারক

রামনাথ এসে বললেন, বাবুজি খাবার রেডি করি? এখানে যে কদিন শাস্ত্রী আছেন তাঁর খাবার আসছে তাসখন্দের ভারতীয় দূতাবাসের দূত টি এন কলের বাসভবন থেকে। তাঁর নিজস্ব বাবুর্চি জান মহম্মদ সেই খাবার তৈরি করে। তাসখন্দে আসার আগেই শাস্ত্রী খাবার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি বিদেশে গেলে এটাই ছিল প্রধান সমস্যা। একেবারে সাধারণ রুটি, ডাল, সবজি ছাড়া বিশেষ কিছুই খেতেন না। রাতে দুধ। টি এন কল আশ্বস্ত করেছিলেন যে চিন্তা নেই। আমার বাড়ি থেকে খাবার যাবে আপনার কাছে। যাক নিশ্চিন্ত! শাস্ত্রীজি রাত পৌনে ১০টা নাগাদ রামনাথকে বললেন, খাবার এসেছে?

হ্যাঁ বাবুজি কিছুক্ষণ আগেই জান মহম্মদ দিয়ে গিয়েছেন। স্পিনাক, একটু আলু ভাজা আর সবজির ঝোল। ব্যস! খাবার পর একটু হাঁটা অভ্যাস শাস্ত্রীর। তাই করলেন। তবে কেন যেন বেশিক্ষণ না। বললেন, আমি ঘুমাব এবার। রামনাথ শুনেই কিচেন থেকে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এলেন। রাত ১১ টা ১৫ নাগাদ দুধ খেলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। পরদিন কাবুল যাওয়া। খুব সকালে। তাই শাস্ত্রী রামনাথকে বললেন, যাও, শুতে চলে যাও। কাল কিন্তু ভোরে ওঠা। যাওয়ার আগে আবার রামনাথকে ডাকলেন। ভ্রু কুঁচকে যাচ্ছে রামনাথের। এরকম অস্বস্তি তো কখনও দেখা যায়নি। কী ব্যাপার! শাস্ত্রী বললেন, একটু জল দাও তো! রামনাথ সঙ্গে সঙ্গে ড্রেসিং টেবিলে কাকা থার্মো ফ্লাস্ক থেকে ঈষদুষ্ণ জল ঢেলে দিলেন। পুরো গ্লাস খেলেন না শাস্ত্রী। বললেন, আচ্ছা। এবার যাও। চলে গেলেন রামনাথ ঘুমাতে। বললেন, বাবুজি আজ আমি মেঝেতে আপনার কাছেই শুয়ে পড়ি? এইটুকু তো রাত। কেটে যাবে! শাস্ত্রী মাথা নাড়লেন। বললেন, না না, তুমি দোতলায় যাও। আজ ভালো ঘুমানোর দরকার। কাবুলের কোনো সময়ের ঠিক নেই মিটিং এর। যাও...। যাওয়ার

রহস্য

রাত দেড়টা। ঠিক পাশের ঘরে শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব জগন সহায় আর দুজন স্টেনোগ্রাফার রয়েছেন। মাঝখানের দরজায় নক করছে কেউ। এই ঘরে অবশ্য কেউ ঘুমোয়নি। কারণ প্যাকিং চলছে। কাল ভোরে বেরনো। তাই এখনই প্যাক না করা হলে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে আগেভাগে লাগেজ দেওয়া যাবে না। সিকিউরিটির লোকজন

অনেক আগে এসে প্রাইম মিনিস্টারের সফরসঙ্গীদের লাগেজ নিয়ে যায়। বোঝা গেল আর কেউ নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দরজায় নক করছেন। ধড়ফড় করে উঠলেন সহায়। দরজা খুলেই দেখলেন শাস্ত্রী প্রায় কথা বলতে পারছেন না। কোনোমতে বলছেন জল..। জল? জল তো বাবুজির ঘরেই টেবিলে থাকে? আজ কি রামনাথ রাখেনি? জগন দ্রুত ঘরে এসে দেখলেন থার্মোফ্লাস্ক আছে। তার মানে বাবুজি বুঝতে পারেননি। জল খেয়ে শাস্ত্রী বললেন, ডক্টরসাব কোথায়? জগন সহায় শাস্ত্রীকে জল দিয়ে বললেন, বাবুজি এবার আপনি একদম ঠিক হয়ে যাবেন। ততক্ষণে শাস্ত্রী খুব কাশছেন। অবিরত। এবার জগন সহায় বুঝলেন অবস্থা একটু সিরিয়াস। তিনি ধরে ধরে শাস্ত্রীকে শুইয়ে দিয়ে বললেন, আমি এখনই ডেকে আনছি ডাক্তারসাবকে। শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ আর এন চুঘ। ঠিক পাশের বিল্ডিং-এ আছেন। দৌড়ে গেলেন সহায়। ডাঃ চুঘ এসে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী বুকে হাত চেপে ধরেছেন। কাশছেন। এবং মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ। এবং তখন সত্যিই অনেক দেরি হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স রেডি হচ্ছে। শাস্ত্রীর বুকে পাম্প করতে করতে ডাঃ চুঘ কাঁদতে শুরু করলেন। মুখে বললেন, বাবুজি আমাকে একটুও সময় দিলেন না..বাবুজি আমাকে একটু সময় দিলেন না...। জয় শ্রীরাম...জয় সীতামাইয়া...শেষ উচ্চারণ...। লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা গেলেন।

খবর ছড়িয়ে পড়ল। সেই যে শুরুতে বলেছিলাম একটি জিপ ঝড়ের গতিতে এসে দাঁড়াল, সেটি ছিল রাশিয়ান স্পাই এজেন্সি কেজিবির নাইনথ ডিরেক্টরেটের অফিসারদের বাহিনী। তাঁরা যাঁদের প্রথমেই জিপে তুলে নিয়ে গেল তাঁরা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী ও সফরসঙ্গীদের জন্য রান্না করার দায়িত্বে। সেই বাবুর্চিদের নেতার নাম আমেদ স্যাটারোভ। সঙ্গে জুনিয়র আরও তিন বাটলারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৩০ কিলোমিটার দূরের এক নির্জন বাড়িতে। সেটি ছিল কেজিবির ইন্টারোগেশন সেন্টার। কেন এই জিজ্ঞাসাবাদ? কারণ কেজিবি শুরুতেই সন্দেহ করে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু বিষক্রিয়ায় হয়েছে। কে বিষ দেবে তাঁকে? সর্বাগ্রে সন্দেহ হয় এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই খাবার তৈরি আর সার্ভ করার দায়িত্বে থাকা বাবুর্চিদের। কিন্তু ওই রাশিয়ান বাবুর্চিরা জানায়, একমাত্র দুধ ছাড়া আর কোনো খাবার লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্য কিচেন থেকে যায়নি। খাবার এসেছে টি এন কলের ব্যক্তিগত

কিচেন থেকে। কে রান্না করেছে? জান মহম্মদ। তৎক্ষণাৎ সেকেন্ড অফিসার উস্তিনভ জিপ নিয়ে গেলেন আবার সেই ঘটনাস্থলে। জান মহম্মদকে হ্যান্ডকাফ পরানো হল। তাঁকে নিয়ে আসা হল ঝড়ের গতিতে সেই ইন্টারোগেশন সেন্টারে। এবং তারপর নিরন্তর এক জেরা। আর ঠিক অন্যদিকে শাস্ত্রীর ঘরে গিয়ে ভারতীয় অফিসাররা গিয়ে কী দেখেছিলেন? দেখা গেল শাস্ত্রীর চপ্পল যথারীতি সাজানো রয়েছে খাটের সামনে। এবং এরপরই একঝাঁক পরস্পরবিরোধী তথ্য। চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে কেউ বলেছেন, পেটের নীচে কাটা দাগ দেখা গিয়েছে। এবং ধবধবে সাদা বালিশে চাপ চাপ রক্তের ছোপ। কাটা দাগ ঘাড়ের কাছেও। যাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে বলা হচ্ছে তাঁর ঘাড়ে কাটা দাগ কেন? কেনই বা সেই কাটা দাগের ঠিক নীচেই চাপ চাপ রক্ত? যা নিয়ে সবথেকে বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তা হল শাস্ত্রীর গোটা শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল। এরকম কি স্বাভাবিক? ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ আর এন চুঘকে হঠাৎ করে কোথায় যেন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি প্রচণ্ড আপসেট। ভোর সাড়ে ৪ টের সময় এলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আয়ুব খান। আয়ুব খানকে সত্যিই মনে হল যথেষ্ট দুঃখিত। তিনি শুধু বললেন, এই যে লোকটি এখানে শুয়ে আছেন তিনি কিন্তু ভারত আর পাকিস্তানের সমস্যা মেটানোর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র হতে পারতেন। আমার বিশ্বাস শাস্ত্রীজি বেঁচে থাকলে আমরা দুই দেশ সব সমস্যার সমাধানের রাস্তা ঠিক বের করে নিতাম। শাস্ত্রীর দেহ নিয়ে আসা হল দিল্লি। এবং শাস্ত্রীর পত্নী ললিতা শাস্ত্রীর প্রথম থেকে সন্দেহ তাঁর স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শাস্ত্রীর পরিবার তদন্ত চাইলেন। সরকার থেকে সবরকম আশ্বাস দেওয়াও হল যে তদন্ত হবে। হলও। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না, সেটি হল পোস্ট মর্টেম হয়নি কেন? তাসখন্দে রাশিয়া প্রশাসনের কাছে বারংবার চিঠি লিখলেন শাস্ত্রীর পরিবার। কোনো জবাব নেই। ১৯৭০ সালে সরকারের পক্ষ থেকে মোরারজি দেশাই জানালেন সবরকম রিপোর্ট পাওয়ার পর তাঁরা নিশ্চিত যে, কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ নেই। শাস্ত্রীজির মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে। সেই বাবুর্চি জান মহম্মদকে ততদিনে পাঠানো হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনে। গোটা ঘটনার সাক্ষী ছিলেন একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ আর এন চুঘ।

১৯৭৭ সাল জরুরি অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ইন্দিরা গান্ধী অবশেষে নির্বাচনের ডাক দিলেন। এবং গোটা ভারত অত্যাশ্চর্য হয়ে রায় দিল তাঁর বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কংগেস হেরে গেল লোকসভা ভোটে। কেন্দ্রে এই প্রথম অকংগ্রেসী সরকার। সেই নতুন সরকারের প্রথম ঘোষণা ছিল, "ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে যতরকম অন্যায়, যত অনাচার, অনিয়ম হয়েছে এবার ধীরে ধীরে হবে সব বিচার।" খোদ তাঁরই বিচার করবে জনতা সরকার। ততদিনে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পত্নী ললিতা শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বিষক্রিয়ায়। জনতা সরকার ক্ষমতায় আসায় শাস্ত্রীর পরিবার আবার আশান্বিত। এবার অন্তত মোরারজি দেশাইকে কোনো চাপের মুখে দ্বিধা করতে হবে না। এবার সত্য উদ্ঘাটন হবে। আবার তদন্তের দাবি করা হল। জনতা সরকার রাজি। সাক্ষী চাই। একে একে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। সবথেকে জোরালো প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রয়োজনীয় মানুষটি শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ আর এন চুঘ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। বয়স হয়েছে। তবু তিনি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। অবশ্যই সেদিন যা যা দেখেছেন এবং বুঝেছেন তা বলবেন। বাবুজি তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন। সত্য উদঘাটনের দিন খুব কাছে আসছে। ঠিক তখনই একটি ট্রাক দুর্ঘটনার খবর এল। ডাঃ আর এন চুঘ, তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্রকে পিষে দিয়ে একটি রহস্যময় ট্রাক তাঁদের গাড়িকে দুমড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। একমাত্র কন্যা বেঁচে গেলেন। কিন্তু পঙ্গু। কীভাবে হল সেই দুর্ঘটনা? ট্রাক কেন রাস্তার একেবারে পাশ থেকে যাওয়া ঢিমে গতির একটি ফ্যামিলি কারকে ধাক্কা মারল? লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুকে সবথেকে কাছের থেকে দেখা ডাক্তার চুঘের থেকে জানা হল না ঠিক কী ঘটেছিল ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারির মধ্যরাতে। তিনি একজন চিকিৎসক হিসাবে কী দেখেছিলেন? কী বুঝেছিলেন? লালবাহাদুর শাস্ত্রীর শরীরে সত্যিই কি কাটা দাগ ছিল? কেন? আজও সঠিক উত্তর পাওয়া গেল না!

৩

কত টাকার নোট ছিল? একটা সুটকেসে কি ৬৭ লক্ষ টাকা ধরতে পারে? যদি ধরাতেই হয় তাহলে নোটের বিন্যাস কেমন হওয়া উচিত? অর্থাৎ ১০০ টাকার নোট? নাকি ৫০০ টাকার নোট? ৭ নম্বর রেস কোর্স রোড অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ দুটি জিনিস কখনওই অ্যালাউ করে না। ১) কোনো বন্ধ সুটকেস নিয়ে কেউ ভিতরে যেতে পারবে না। আর ২) দর্শনার্থীদের নিজের গাড়িতে সোজা প্রাইম মিনিস্টারের অফিসের লবিতে যাওয়ার অনুমতি নেই। হর্ষদ মেহতা এর কোনোটাই মানেননি। এটা হতে পারে? ১৯৯২ সালে শেয়ার কেলেঙ্কারিতে হর্ষদ মেহতা নামের রাজকোটের এক ব্যক্তি সরকারি ব্যাংকিং ব্যবস্থার বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো আর চরম দুর্নীতির স্বরূপটি প্রকাশ করে ফেলার পর যতটা না সেই দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে সাধারণ মানুষ কিংবা সংবাদ মাধ্যমের আগ্রহ ছিল, তার থেকে ঢের বেশি কৌতূহল হয়ে দাঁড়াল প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও কি এক কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন হর্ষদের থেকে? নাকি নেননি? হর্ষদ সত্যি বলছে? নাকি প্রধানমন্ত্রী সত্যি বলছেন? কী হয়েছিল সেদিন? ৪ নভেম্বর ১৯৯১? সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল টাইমিং। অর্থাৎ সকাল ১০ টা বেজে ৪৫ মিনিট। সিবিআই এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে হর্ষদ মেহতা যা বলেছিলেন তা হল, বম্বে থেকে আনা হয়েছিল দুটি সুটকেস। দিল্লির হোটেলে এসেই একটি সুটকেসের ৬৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যটির ৩৩ লক্ষ টাকা বের করে সিঙ্গল একটি সুটকেসে ভরা হল। তিনি এবং তাঁর ভাই নিজেদের গাড়িতে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। সঙ্গে সৎপাল আর সুনীল মিত্তল। প্রথমেই তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর কে খান্ডেলকরের চেম্বারে। এই সেই ব্যক্তি যিনি প্রাইম মিনিস্টারের ব্যক্তিগত সচিব। আর এই খান্ডেলকরের সঙ্গেই ফোনে কথা হয়েছে হর্ষদের। তাঁকেই দেওয়া হল সুটকেস। এক কোটির। চারজন যাওয়া হল প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে। না। নেই প্রধানমন্ত্রী। তবু আসবেন। একটু পরে। চারজনই অপেক্ষা করছিলেন কখন আসবেন প্রধানমন্ত্রী। সেদিন ছিল সোমবার। অর্থাৎ রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দেখা করার দিন। সুতরাং সকালেই বেরিয়ে গিয়েছেন নরসিংহ রাও। কিছুক্ষণের প্রতীক্ষা। হ্যাঁ।

অবশেষে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী। লাঞ্চের জন্য। এবং চেম্বারে ঢোকার আগে তাঁদের আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন ভেতরে আসতে। খান্ডেলকর বললেন, আপনারা এগোন। আমি এখনই আসছি। ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে ঢুকছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি একঝাঁক সরকারি ব্যাংকের টাকা বন্ড কেনার নাম করে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়েছেন। আর মাঝপথে সেই টাকায় বেনামী শেয়ার কিনে সেইসব শেয়ারের দাম চড়িয়ে দিয়েছেন কৃত্রিমভাবে। সম্পূর্ণ মাছের তেলে মাছ ভাজা। নাম তার হর্ষদ। আদরের নাম বিগ বুল। প্রাথমিক আলাপচারিতার মধ্যে ঘরে ঢুকলেন আবার খান্ডেলকর। সঙ্গে একটি সুটকেস। সেই সুটকেস দেওয়া হল প্রধানমন্ত্রীকে। রাও ব্যস্ত। তাঁকে আবার অফিস যেতে হবে। সুতরাং তাঁর পক্ষে আর বেশিক্ষণ সময় দেওয়া সম্ভব নয়। মিটিং শেষ। কিন্তু ওই কয়েকটি মুহূর্তই কি ভারতের রাজনীতির প্রতি এক চির বিশ্বাসহীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করে চলে গেল? কারণ খোদ হর্ষদ যখন জানালেন আর কাউকেই নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে তিনি এক কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছেন শেয়ার কেলেঙ্কারির লাইসেন্স হিসাবে। গোটা দেশে আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল সেই সংবাদ। মিডিয়ায় তোলপাড়। বিরোধীরা আখ্যা দিলেন চোর প্রধানমন্ত্রী। আর এখানেই চমক। কারণ হর্ষদের এই দাবির সঙ্গে অসংখ্য ঘটনাপঞ্জি আর প্রটোকল মিলছে না। তদন্ত যতই এগোল আর আদালতে শুনানির সময় দেখা গেল হর্ষদের বক্তব্যে প্রচুর ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে ফাঁক রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হয়ে সরকারপক্ষের সওয়ালেও। কী জানাল সরকারপক্ষ?

প্রধানমন্ত্রীর সিডিউল। সোমবার ৪ নভেম্বর ১৯৯১। দিল্লি পুলিশের ভিভিআইপি মুভমেন্টের লগবুকে দেখাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বাসভবন থেকে বেরিয়েছেন সকাল ৯টা ১২ মিনিট। কারণ সেদিন সোমবার। প্রধানমন্ত্রীর ব্রেকফাস্ট মিটিং ছিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে। ঠিক ৯টা ১৬-তে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি ভবন। ৯টা ৫৫। ব্রেকফাস্ট মিটিং শেষ। প্রধানমন্ত্রী বেরিয়ে গেলেন সাউথ ব্লক অর্থাৎ তাঁর অফিসের উদ্দেশে। রাষ্ট্রপতি ভবনের লাগোয়া সেই অফিস। টাইম লাগল এক মিনিট। ৯টা ৫৬। দুপুর ১টা ১২ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে চলে গেলেন। ১টা ১৬, পৌঁছলেন বাসভবন। লাঞ্চ আর বিশ্রাম। বিকেল ৪টে ৫০, আবার প্রধানমন্ত্রী অফিস গেলেন। এবং সাউথ ব্লক পৌঁছলেন ৪টে ৫৫।

এরপর আর কোথাও যাননি। সাউথ ব্লক থেকে রাত ৮টা ২৭ মিনিটে নরসিংহ রাও বাসভবনে ফিরে যান। এটি হল তাঁর মুভমেন্টের খুঁটিনাটি। এবার দেখা যাক যতক্ষণ তিনি সাউথ ব্লকে ছিলেন সেখানে কী কী করলেন। সকাল ১০টা, ক্যাবিনেট কমিটি অফ পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের মিটিং। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ফিরে। একে বলা হয় সিসিপিএ মিটিং। সেটি শেষ হয়েছিল সাড়ে ১০টায়। পাকিস্তানের একটি ডেলিগেশন দলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ১১টা ১৫। যে দলের নেতৃত্বে ছিলেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আগা শাহি। সিসিপিএ মিটিং শেষ হয়েছিল সাড়ে ১০টায়। আর পাকিস্তানের নিধিরা ১১টা পাঁচের মধ্যেই ঢুকে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে। তাহলে হর্ষদের সঙ্গে কখন দেখা করতে গেলেন তিনি? এই বক্তব্যটি সঠিক ধরতে হলে মেনে নিতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ওই এক কোটি টাকার জন্য এতই আকুল ছিলেন যে, দুটি মিটিং এর মাঝখানের আধঘণ্টার মধ্যে তিনি আবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন অফিস থেকে? এবং বাসভবনে গিয়ে হর্ষদের সঙ্গে দেখা করে টাকা ভর্তি দুটি সুটকেস নিয়ে কোনো একটি গোপন স্থানে রেখে আবার ফিরে এসেছিলেন অফিসে? আর তারপরই স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক? এটা কি হয়েছিল? এটা কি সম্ভব? সরকার অস্বীকার করে। হর্ষদের আইনজীবী রাম জেঠমালানির পুত্র মহেশ জেঠমালানি বলেছিলেন, রেস কোর্স রোডের লগবুক দেখানো হোক। অর্থাৎ সকাল ১০টা ৪৫-এ সেদিন কারা এসেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই থাকবে। কারা তাঁরা? এখানেই ধোঁয়াশা। কারণ স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ জানাচ্ছে, ভিজিটরদের লগবুক দু'মাসের জন্য আপডেট করা থাকে। রেখেও দেওয়া হয়। তারপর আর সেটি রক্ষিত করার ব্যবস্থা নেই। কী বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও? বলেছিলেন, “আমি রামায়ণের সীতা মায়ের মতো অগ্নিপরীক্ষা দিতে রাজি আছি। অগ্নিপরীক্ষাতেও পাশ করে যাবো।” এটা ঠিকই যে হর্ষদের ওই দাবি কোনোভাবেই প্রধানমন্ত্রীর শিডিউলের সঙ্গে মানানসই নয়। আবার এটাও ঠিক হর্ষদ ঠিক তার আগের কয়েকদিন ধরে পাগলের মতো টাকা তুলেছেন একের পর এক ব্যাংক থেকে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা ৪ নভেম্বর। সিবিআই এর রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, ২ নভেম্বর হর্ষদ এ এন জেড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক থেকে তুলেছেন ১০ লক্ষ টাকা। সেটি ছিল ফোর্ট ব্রাঞ্চ।

এরপর সেদিনই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বম্বে মেইন ব্রাঞ্চ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা। ওই টাকার পাশাপাশি হর্ষদের নিজের সোর্স থেকে যোগাড় হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা। এটাও তো প্রশ্ন তিনি এত টাকা কেন তুললেন? আর কাকেই বা দিলেন?

৪ নভেম্বর ১৯৯১। আইসি ১৮৩। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। দুই প্যাসেঞ্জারের নাম হর্ষদ মেহতা এবং অশ্বিন মেহতা। হর্ষদের ভাই। সিট নম্বর জে ১১ এবং ১২। জে ক্লাস। মানে বিজনেস ক্লাস। কত ছিল তাঁদের লাগেজের ওজন? সিবিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে ৬৭ কেজি। দুটি সুটকেস। ৫৫ লক্ষ টাকা। সেই যে হিন্দিতে বলা হয় না "কাহানি মে টুইস্ট?" এবার সেটা হবে। কারণ সেদিন বিকেলের ফ্লাইটে আবার দুই ভাই ওই একই ফ্লাইটের রিটার্ন জার্নিতে বম্বে ফিরে এসেছিলেন। অর্থাৎ আইসি ১৮৪। এবং কী আশ্চর্য। দিল্লি যাওয়ার সময় সঙ্গে থাকা দুটি সুটকেস বম্বেতে ফেরার সময় ছিল না!! এয়ারপোর্টে বোর্ডিং পাস রেকর্ড চেক করে দেখা গেল এটা সত্যিই। কোথায় গেল সেই দুটি সুটকেস? ঠিক কী হয়েছিল সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে দিল্লি তথা ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানায়? ৭ নং রেস কোর্স রোডে? আজও অজানা।

ঠিক কী ছিল ১৯৯২ সালের কেলেঙ্কারি? গুজরাতি জৈন পরিবারে জন্মগ্রহণ করা হর্ষদ মেহতার বাবা মুম্বইয়ের কান্দিভিলিতে ব্যবসায় বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে চলে এসেছিলেন (তখনও ছত্তিশগড় হয়নি)। হোলি ক্রস বায়রন বাজার হাই স্কুলের ছাত্র হর্ষদ মোটেই পড়াশোনায় ভালো ছিল না। পরিবারটি ফিরে আসে বম্বে। নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স সংস্থার সামান্য বিমা বিক্রেতা হিসাবে কেরিয়ার শুরু করা হর্ষদের প্রবেশ ঘটল শেয়ার মার্কেটে ১৯৮০ সালে। বি অম্বালাল অ্যান্ড সনস্ নামের একটি ব্রোকারেজ সংস্থায় ডেইলি ডিল ডেস্কে। এবং মাত্র ১০ বছরের মধ্যে তাঁকে বলা হল শেয়ার মার্কেটের অমিতাভ বচ্চন। কারণ ১৯৯০ সালের মধ্যে তাঁর নিজের ফার্ম গ্রো মোর রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নামীদামি মানুষ ও সংস্থা শেয়ার কেনাবেচায় যুক্ত হয়েছিলেন। তখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সরাসরি কোনো শেয়ার কিনতে পারত না মার্কেট থেকে। তাদের নিয়ম ছিল বন্ড ক্রয় করা অথবা অন্য ব্যাংকের সিকিউরিটিজ আর বন্ড

কেনাবেচা অনুমোদিত ছিল। হর্ষদ এটাই ধরলেন। ব্যাংকগুলিকে তিনি বললেন বেশি সুদ পাইয়ে দেবেন। তাঁর সংস্থার মাধ্যমে যদি কেনা হয়। আর রিটার্নও দারুণ। সেই টোপে পা দিয়েছিল একাধিক ব্যাংক। হর্ষদ সহজ একটি পন্থা নিলেন। ব্যাংকের টাকায় বন্ড কেনার আগে সেই টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে চালান করে দিলেন। আর বিভিন্ন বাছাই করা শেয়ার বিপুলভাবে কিনতে শুরু করে দিলেন। যার ফলে ওইসব সংস্থার শেয়ারের দাম চড়তে শুরু করল। যার প্রধান উদাহরণ অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি। অর্থাৎ এসিসি সিমেন্ট। ১৯৯১ সালে যে সংস্থার

শেয়ারের দাম ছিল ২০০ টাকা, সেটি মাত্র তিন মাসের মধ্যে পৌঁছে গেল ৯ হাজার টাকায়। এবার বিক্রির পালা। একই সঙ্গে আর একটি পন্থা ছিল 'বি আর'। অর্থাৎ ব্যাংক রিসিপ্ট। জাল 'ব্যাংক রিসিপ্ট' ইস্যু করে বাজার থেকে টাকা তোলা। জীবনে কেউ নাম শোনেনি এরকম দুটি ব্যাংককে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ব্যাংক অফ কারাদ। এবং মুম্বই মার্কেন্টাইল কো অপারেটিভ ব্যাংক। এই দুই ব্যাংকের রিসিপ্ট হাতে পেয়েই লগ্নিকারীরা বিশ্বাস করল তাঁদের টাকা জমা হয়েছে বাজারে। যার মধ্যে ব্যাংকও আছে। আসলে হয়নি। ঠিক যখন তিনি তুমুলভাবে বিক্রি শুরু করে দিলেন তাবৎ শেয়ার, সেদিনই দেউলিয়া হয়ে গেল বহু ব্রোকার আর লগ্নিকারী। শেয়ার মার্কেট ব্যাপকভাবে ক্র্যাশ করল। ৬৮৬৮ কোটি টাকার দুর্নীতি। স্টেট ব্যাংকের লোকসান ৬৭০ কোটি টাকা...ইউকো ব্যাংক ৩৯ কোটি টাকা...ব্যাংক অফ সৌরাষ্ট্র ১৭৯ কোটি টাকা....একের পর এক ব্যাংক আবিষ্কার করল তাদের সম্পূর্ণ বোকা বানানো হয়েছে সিকিউরিটিজ কেনার নামে। আর ততদিনে হর্ষদ মেহতার স্ট্যাটাস কী? মুম্বইয়ের ওরলিতে সি ফেসিং একটি পেন্টহাউসে থাকেন। ১৫ হাজার স্কোয়ার ফুট। যার মধ্যে আছে মিনি গলফ কোর্স আর দুটি সুইমিং পুল। গ্যারাজে টয়োটা লেক্সাস, টয়োটা সেরা আর করোলা স্টারলেট এবং মার্সিডিজ সিরিজের দুটি মডেল। যা সেই বিশ্বায়নের আগের ভারতে কজনের কাছে ছিল? অন্তত জানা যাচ্ছে হর্ষদ মেহতার বাড়ি ওরলি থেকে অনতিদূরে। বান্দ্রার এক বাসিন্দার কাছেও নাকি ছিল না এতগুলো বিদেশি গাড়ি। পরে অবশ্য সেই বান্দ্রার ভদ্রলোক ধনী শিল্পপতি হওয়ার ব্যাকরণটাই পালটে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম মুকেশ আম্বানি! আসল প্রশ্ন

অন্য। এই বিপুল অঙ্কের টাকার লেনদেন কখনও সরকার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার কর্তাদের অলক্ষে সম্ভবই না। কারণ ঠিক আগের বছরই মার্চ মাসে দেখা গিয়েছে ভারতের এক আয়কর দাতা আগাম ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন ২৬ কোটি টাকা! সরকারের একবারও মনে হল না কেন যে নামটির সঙ্গে এই বিপুল আয়কর দেওয়ার কোনো আগের রেকর্ড নেই, সেখানে আচমকা ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে ২৬ কোটি টাকা অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার মধ্যে একটা রহস্য আছে? জানা যাচ্ছে, আয়কর দপ্তরের মধ্যে থেকেই হর্ষদকে আগাম পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এরকম করার। অর্থাৎ গোটা ঘটনায় আয়কর দপ্তর জড়িত ছিল। ২৭ লক্ষ শেয়ারের লেনদেন হয়েছে স্রেফ ব্যাংক নোট লেনদেনে। যেসব ব্যাংক নোট (বিআর) আদৌ বৈধ ছিল না। এই বিপুল পরিমাণ শেয়ারের মূল্য ছিল ২৫০ কোটি টাকা। আর মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে হর্ষদ মুনাফা করেছিলেন আড়াই হাজার কোটি টাকা।

প্রশ্নটি হল একজন সাধারণ শেয়ার বাজারের ব্রোকার ফার্মের মালিক কীভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারেন? তার আগে তো হোমওয়ার্ক ছিল। অবশ্যই ছিল। রামেশ্বর ঠাকুর ছিলেন অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে হর্ষদের মিটিং হয়েছিল। এই যোগাযোগ কীভাবে? যাঁর নাম সিবিআই এর তদন্তে উঠে এসেছিল তিনি হলেন লুধিয়ানার এক পানের দোকানের মালিকের নাতি। বাবা ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। তিনবারের রাজ্যসভার নেতা। সত্যপাল মিত্তল। তাঁর পুত্রের নাম? সুনীল মিত্তল। হর্ষদের ট্যাক্স কনসালট্যান্ট সিবিআইকে বলেছিলেন ইনকাম ট্যাক্স রেইড আটকানোর জন্য অর্থমন্ত্রকের দ্বারস্থ হতেই হয়েছিল। সেই সংযোগ নাকি ঘটিয়েছিলেন সুনীল মিত্তল। সুনীল মিত্তল সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কারও যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। সিবিআই তাঁকে বলেছিল আপনার আর হর্ষদের মধ্যে টেলিফোনে কথা হয়েছিল। হর্ষদ নিজেই সেই ফোনালাপ রেকর্ড করে রেখেছে। এটা কি সত্যি যে হর্ষদ আপনাকে বলছে প্রাইম মিনিস্টারের পি-এর সঙ্গে একবার কথা বলে ডেট ফিক্সড করতে? সমস্যা হল অডিও রেকর্ড আদালতে গ্রাহ্য নয়। যে নোটগুলি নিয়ে এক কোটি টাকা ভরা হয়েছে, একটি সুটকেসে সেটির ওজন হবে ৭০ কেজি।

পার্লামেন্টে যৌথ সংসদীয় কমিটির সামনে আসা হর্ষদকে প্রশ্ন করা হল আপনি ৭০ কেজি ওজনের সুটকেস বয়ে নিয়ে গেলেন কীভাবে? হর্ষদ উত্তর দিলেন, আমি তো বলিনি আমি একা বয়ে নিয়ে গিয়েছি। আমরা চারজন ছিলাম। সিবিআই ডিরেক্টর এস কে দত্ত জানতে চেয়েছিলেন একটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেন হঠাৎ একটি সুটকেসে ভরতে গেলেন? দুটিতে নিলে হালকা হয়ে যেত তো? আর এটা বিশ্বাসযোগ্য আপনার সুটকেস চেক করে দেখা হয়নি প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে? হর্ষদ হাসতে হাসতে বলেছেন, কেন করা হল না চেক? আপনারাই জানতে চান দিল্লি পুলিশ আর প্রধানমন্ত্রীর অফিসে। কেন আমার গাড়ি একেবারে পোর্টিকোতে যেতে দেওয়া হল? জিজ্ঞাসা করুন প্রাইম মিনিস্টারকে। আর কার কার সঙ্গে তার আগে দেখা করেছি বলব? সব দলেরই নেতা আছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল রাজনৈতিক মহলে। তাহলে কি বিরাট বড় ঘুষের জাল ছড়িয়ে ফেলেছিল হর্ষদ? কারা কারা আছে সেই তালিকায়? আসল ধন্দ রয়েই গেল। একটি সুটকেস? নাকি দুটি?

মোট ২৮ টি মামলা যখন ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, ততদিনে কেটে গিয়েছে ৯ বছর। বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য আর কানেশকন হাতে আসছে সিবিআইয়ের। হর্ষদ জেলে। তাঁকে নতুন করে জেরা করা হবে ঠিক হয়েছিল। কারণ রাজনীতির বেশ কিছু রাঘববোয়ালের নাম অজানা এন্ট্রিতে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল হর্ষদের? সিবিআই যখন থানে জেল কর্তৃপক্ষকে বলেছিল যে একবার হর্ষদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সময় চাই। থানে জেল থেকে বলা হয়েছিল, পরের মাসে আসুন। তার কিছুদিনের মধ্যেই আচমকা জানা গেল হর্ষদের বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। জেল হাসপাতালে পাঠানো হল। বলা হল হার্ট প্রবলেম। ২০০১ সালের ৩১ ডিসেম্বর। ৪৭ বছর বয়সে আচমকা রাতে মারা গেলেন হর্ষদ মেহতা। আর তাঁকে জেরা করা হল না। জানা গেল না আরও কারা যুক্ত এই হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে। কাদের নাম ছিল? তাঁরা আজও রাজনীতিতে বিদ্যমান এবং শিল্পসংস্থাতেও। একঝাঁক ব্র্যান্ডনেম সেলেব্রিটি! এসবকে ছাপিয়ে যে রহস্যটি অজানা রয়ে গেল সেটি হল ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংকের চেয়ারপার্সন এম জে ফেরওয়ানির মৃত্যু রহস্য। হর্ষদ মেহতার গডফাদার ছিলেন এই ফেরওয়ানি। তাঁর ব্যাংক ১ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক নোটস

প্রথম ইস্যু করে। কার নির্দেশে? সেই তদন্ত যখন সবেমাত্র শুরু হবে, ঠিক তখনই একদিন মুম্বইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে এম জে ফেরওয়ানির মৃতদেহ উদ্ধার হল। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। আগের দিন অফিস করেছেন। সিবিআই তাঁকে ফোন করে বলেছিল যে, পরদিন তাঁর অফিসে একটি টিম যাবে। সব কাগজপত্র যেন তিনি রেডি রাখেন। সেইমতোই সব বন্দোবস্ত করেছিলেন ফেরওয়ানি। অফিসের সেক্রেটারিকে বলে এসেছিলেন কিছু নোটের টাইপ করে রাখতে। পরদিন আসছে সিবিআই। কিন্তু ঠিক আগের রাতে ফেরওয়ানির রহস্যজনক মৃত্যু হয়ে গেল! স্বাভাবিক মৃত্যু? নাকি হত্যা? সিবিআই তদন্ত জাল যখন বহু বছর পর প্রায় গুটিয়ে এনেছিল এবং পাওয়া গিয়েছিল বেশ কিছু আচমকা নতুন বিস্ফোরক তথ্য। হর্ষদ মেহতাকে আবার জেরা করে কয়েকটি গোপন নাম জানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সিবিআই। তখন কেন্দ্রে এনডিএ সরকার। লালকৃষ্ণ আদবানির হাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সিবিআই থানের কারাগারে যাবে। নতুন বছর আসছে। ২০০২ সাল। তারিখ স্থির হয়েছে ৫ জানুয়ারি। হর্ষদ রাজি নতুন করে সিবিআইকে প্রশ্নের জবাব দিতে। কিন্তু ৩১ অক্টোবর সকালে হর্ষদের বুকে হঠাৎ ব্যথা। কী হল? অসহ্য যন্ত্রণা। প্রথমে সিভিল হাসপাতালে। এরপর জেজে হাসপাতালে যাওয়ার কথা। সেই সুযোগই পাওয়া গেল না। বুকে যন্ত্রণার কিছু ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হল। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে। হর্ষদ মেহতা যখন এভাবে মহারাষ্ট্রের থানের জেলে বন্দি হয়ে অনেক অজানা সংযোগ খোলাখুলি বলার প্রস্তুতি নিতে নিতেই আচমকা রহস্যময় হার্ট অ্যাটাকে মারা যাচ্ছে, সেই সময় মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ মুম্বইয়ের টোপাজ ডান্স বারে আর এক ব্যক্তি মাধুরী দীক্ষিতের মতো দেখতে এক ডান্সারকে লক্ষ্য করে নিউ ইয়ার্সের রাতে ৯৩ লক্ষ টাকা উড়িয়েছিল!! এভাবেই টাকা উড়িয়ে সে গোটা মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লির বহু রাজনৈতিক নেতাদের কিনে ফেলেছিল মাত্র ২ বছরে। এক অভিনব দুর্নীতির আবিষ্কার করে সে ২০ হাজার কোটি টাকার এক বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে! এবার শুনব সেই অত্যাশ্চার্য কাহিনি!

৪

ওরলির কার্নিভাল। আন্ধেরির দীপা। গ্র্যান্ট রোডের টোপাজ। এই তিনটি ডান্স বারের ভিড়। কখনও কমেনি। নিয়ম হল একটি থাকবে কমন ডান্স ফ্লোর। সাধারণ কাস্টমারের জন্য। একটি ডান্স এনক্লোজার থাকবে ফ্লোরের সামনেই। পার্টিরা প্রচুর অর্থ খরচ করবে একটি করে গান আর একটি নাচের ঠিক পরই। আর এসবের আড়ালে রয়েছে একটি প্রাইভেট চেম্বার। ডান্স বারের পিছনের দিকে। সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা সকলের নেই। কারণ অফুরন্ত অর্থ আর প্রবল প্রভাব না থাকলে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডান্সবার গুলোর এই গোপন এলাকাটিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আপাতত দীপা ডান্স বারের একটি প্রান্তের টেবিলে বসে আছেন এক ব্যক্তি। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার প্রদীপ সাওয়ান্তকে দেখে একঝলক মনে হবে মারাঠি সিনেমার হিরো। গ্রে রঙের সাফারি। আর এই আলো আঁধারি ডান্স ফ্লোরের আবহে চোখে একটা সানগ্লাস। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১। দুজন নর্তকী ডান্স ফ্লোরে। তাঁদের নাম কাজল আর রানি। আসল নাম নয়। অবিকল কাজল আর রানি মুখার্জির মতো দেখতে। তাই এই নাম। প্রদীপ সাওয়ান্ত ছাড়া আর মাত্র একজন ব্যক্তি বসে আছেন সেই প্রাইভেট এনক্লোজারে। যে গানের সঙ্গে ডান্স চলছিল সেটি হল কোই মিল গয়া...। ঠিক মাঝপথে আচমকা দরজা ঠেলে ঢুকলেন, সাদা শার্ট আর ক্রিম রঙের ট্রাউজার্স পরা সাধারণ চেহারার সামান্য বেঁটে একজন লোক। পাশে আর একজন। যার হাতে দুটি ভারী ব্যাগ। এমন ব্যাগ, যেটায় বাজারও করা যায় বাড়ি ফেরার পথে। লোকটির মুখে বোকা বোকা হাসি। একটু যেন টেনশনে। এরকম প্রাইভেট চেম্বারে সচরাচর বিগ পার্টি আসে। এর চেহারা, আচরণ আর ভাবভঙ্গি কেমন যেন নার্ভাস। অথচ তাঁর আশেপাশে হাত কচলাচ্ছে ডান্স বারের ম্যানেজার। দুপাশে দুই বাউন্সার রীতিমতো গার্ড করছে। আর তাঁর টেবল ধার্য হল একেবারে ফ্লোরের সামনে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কাজল আর রানি মুখার্জির সঙ্গে যোগ দিলেন মনীষা আর ঐশ্বর্য। অর্থাৎ মনীষা আর ঐশ্বর্যের মতো দেখতে আরও দুজন ডান্সগার্ল। এবার চারজন। ওই লোকটির শাগরেদ সঙ্গে আনা ব্যাগের চেন

খুলে পাশে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেটা ঘটল সেটি প্রদীপ সাওয়ান্তের মতো তুখড় পুলিশ অফিসারকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কেন? কী হল?

জানার আগে একটু জেনে নিতে হবে কে এই প্রদীপ সাওয়ান্ত। প্রদীপ সাওয়ান্তের বাবা মূলচন্দ্র সাওয়ান্ত কাজ করতেন মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চে। কলেজ থেকে মাঝেমধ্যেই প্রদীপ বাবার অফিসে চলে আসতেন একসময়। বাবার সঙ্গে দেখা করা অজুহাত। আসলে দেখতে আসতেন ফতে সিং গায়কোয়াড়কে। মুম্বই পুলিশের এক হিরো পুলিশ অফিসার। ফতে সিং-এর গোঁফ ছিল পুরুষালি। আর চেহারাও তেমন। সেটা দেখে আর তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রদীপ জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন পুলিশ অফিসার হতে হবে। এই ফতে সিং-এর মতো। মুম্বইয়ের মাতুঙ্গার রুইয়া কলেজ থেকে পাশ করার পর প্রদীপ সম্পূর্ণ নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন এমপিএসসি পরীক্ষার জন্য। মহারাষ্ট্র পুলিশ সার্ভিস কমিশন। এবং ১৯৮৬ সালের ব্যাচে প্রদীপ ছিলেন টপার। লম্বা। ফর্সা। হ্যান্ডসাম। বহুদিন মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ডিউটি করার পর ১৯৯৭ সালে প্রদীপ সাওয়ান্তের পোস্টিং হয়েছিল মুম্বই শহরের বাইকুল্লা ডিভিশনে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ। বাইকুল্লা ডিভিশনে তখন সবথেকে বেশি যে ক্রাইম হচ্ছে সেটি হল জুয়েলারির দোকানে ডাকাতি। একের পর এক। দ্বিতীয় অশান্তি অরুণ গাওলি বনাম অশ্বিন নায়েক গ্যাং ওয়ার। ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছেন প্রদীপ। এবং সাওয়ান্ত দুটি অসাধ্য করলেন। দুটি গ্রেপ্তার। অশ্বিন নায়েকের শার্প শুটার সন্দীপ ডিচোলকর আর ছোটা রাজনের গ্যাংস্টার বেঙ্কটেশ বাপ্পা। যে বেঙ্কটেশ ক্রাইমের পরে কালীপুজো করে নিজের রক্ত খায়। এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে দিলেন প্রদীপ সাওয়ান্ত। গোটা মুম্বই পুলিশ তাঁকে সমীহের চোখে দেখা শুরু করল। দ্রুত পদোন্নতি হল সাওয়ান্তের। এবার এসিপি ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সাওয়ান্ত হয়ে উঠলেন অপ্রতিরোধ্য। কারণ তাঁর অস্ত্রাগারে রয়েছে তিনটি সাংঘাতিক মারণাস্ত্র। অপরাধী মোকাবিলায়। প্রদীপ শর্‌মা, প্রফুল্ল ভোঁসলে আর বিজয় সালাসকার। মুম্বইয়ের সর্বকালের সেরা তিন এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। দাউদ ইব্রাহিম, ছোটা রাজন, অরুণ গাউলি, অশ্বিন নায়েক—যে কোনো মাফিয়া ডনের শার্প শুটার আর সুপারি কিলারদের মধ্যে অনেককে এই তিনজন ফিনিশ করেছেন। সাওয়ান্ত টিম এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে আমির খান

নাসিরউদ্দিন খানের ‘সরফরোশ’ সিনেমায় আমির খানের চরিত্রের আদলটি ছিল প্রদীপ সাওয়ান্তের ধাঁচে। এবং তাঁর কোড নেম এরপর থেকে হয়ে যায় ‘রাঠোর’! মহারাষ্ট্র পুলিশের মধ্যে যখন কোনো গোপন ফোনবার্তা অথবা ইনফরমার মারফত বার্তা বিনিময়ের সময় তাঁর নাম রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হবে, তখন সরাসরি নাম নয়, বলতে হবে ‘রাঠোর স্যার'। অর্থাৎ ‘সরফরোশে’ সেই আমির খানের চরিত্রের নামটি। প্রদীপ সাওয়ান্ত ততদিনে মেগা সাফল্য পেয়েছেন বলিউড আর আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক অপ্রত্যাশিত চমকপ্রদ কানেকশন ধরে ফেলে। করাচির ছোটা শাকিলের সঙ্গে সংযোগ ছিল ভরত শাহের। কে ভরত শাহ? বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা প্রযোজক। যশ চোপড়ার ‘ডর’ শুরু করে সঞ্জয় লীলা বনসালির ‘দেবদাসে’র প্রযোজক। আর ঠিক এই ঘটনাপরম্পরার মধ্যেই একটি ছোট ঘটনা ঘটল পুণের কাছে। যা পরে গোটা ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল বিস্ময়ে। ৭ জুন ২০০২। সকাল থেকে প্রবল জ্যাম। মারাত্মক গরম পড়েছে। সেই প্রবল যানজটের মধ্যেই আচমকা পুণের বান্দ গার্ডেন পুলিশ স্টেশনের টহলদারি অফিসার আর কনস্টেবলরা একটি ইন্ডিকা আটকালেন পুণে রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে। চালক ছাড়া ইন্ডিকায় রয়েছে তিনজন যাত্রী। তিনজনই বেরিয়ে এলেন। ইন্ডিকার মধ্যে বড়বড় ব্যাগ। লেদারের।

কী আছে?

চালক বললেন, স্ট্যাম্প পেপার স্যার!

প্রশ্ন : কোথায় যাচ্ছে?

উত্তর : ব্যাঙ্গালোর

প্রশ্ন : পেপার দেখি?

না পেপার দেখে সন্দেহ মিটছে না। কত টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পেপার ধরা পড়ল? বেশি না। ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৯৪ টাকার। কিন্তু এই তিন যাত্রীকে জেরা করে এরপর মাত্র সাত থেকে ১০ দিনের মধ্যে পুণে, ভিওয়ান্ডি, মুম্বই আর বাঙ্গালোরে বাছাই করা কিছু বাড়িতে আর স্টোরে অভিযান চালিয়ে আটক করা হল এরকম অসংখ্য বান্ডিল করা স্ট্যাম্প

পেপার। কত টাকা মূল্যের? মাথা ঘুরে যাবে শুনলে। ২১০০ কোটি টাকার! এবং সব স্ট্যাম্প পেপার জাল! ভারতবর্ষের অন্যতম বড় দুর্নীতি ফাঁসের প্রথম ধাপটি এভাবে শুরু হয়ে গেল পুণের রেলস্টেশন লাগোয়া বাস স্ট্যান্ডে একটি ইন্ডিকা গাড়িকে আটকের মাধ্যমে। তদন্তে যুক্ত হয়ে গেল মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আর সেই তদন্তের সূত্রেই ডিটেকশন বিভাগের জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ প্রদীপ সাওয়ান্ত একটি বিশেষ সোর্সে খবর পেয়ে সেদিন একটি লোককে দেখতে এসেছিলেন। যে কবে কোথায় থাকবে কেউ জানে না। কিন্তু নিউ ইয়ার্স ইভে নিজের প্রিয় ৬ জন ডান্স গার্লের নাচ দেখে তাঁদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে অন্তত যাবেই সেই লোক। এমনকী দিল্লিতে থাকলেও শুধু এই ডান্স দেখতে লোকটি দুপুরের ফ্লাইটে এসে আবার রাতে ফিরে গিয়েছে এমনও হয়েছে। এই তাহলে সেই লোক? এরকম একেবারে সাদামাটা দেখতে? রানি, কাজল, মনীষা, ঐশ্বর্যর একটি করে নাচ শেষ হচ্ছে, আর পাশে দাঁড়ানো শাগরেদের হাতেধরা ব্যাগে না দেখেই হাত ঢোকাচ্ছে লোকটি। হাতের মুঠোয় যা উঠে আসছে সেটাই উড়িয়ে দিচ্ছে ডান্স ফ্লোরে। এসব সময় সাধারণত মুখের ভাষা অশালীন হয়ে যায় অনেক ক্লায়েন্টের। লোকটি সেরকম নয়। মাঝে মধ্যে শুধু বলছে, আজ বহোত চমক রেহি হো ...আজ কেয়া বিজলি গিরা রহি হো...মাশাল্লা ইতনা ভি নয়নো কে তিরসে কতল মাত করো রানি...। ব্যস! গোটা ডান্স ফ্লোরে আর যে দু-এক জন ক্লায়েন্ট এসেছিল, তারা আস্তে আস্তে বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কারণ কোনো ডান্সার তাদের দিকে কেয়ারই করছে না। অথচ তাদের কাছেও টাকা আছে। তারাও নিয়ম করে আসে। কিন্তু এই আনইমপ্রেসিভ লোকটাই যেন সম্রাট। প্রদীপ সাওয়ান্ত সেদিন একটু পরই সকলের অলক্ষে ফ্লোর ছেড়ে চলে যান। এবং ঠিক পরদিন দীপা বারে এসে পরিচয় দিয়ে সেই রানিকে জেরা করে জানতে পারেন, সেদিন তারা চারজনে মিলে ৩৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন ওই লোকটির থেকে। কিন্তু তারা জানে যে তারা ওই মানুষটির প্রকৃত দিলদার নয়। আসল ভালোবাসার নর্তকী থাকেন টোপাজ বারে। সেদিন সেই রাতে ওই লোকটি তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে টোপাজ বারেই চলে যায়। এককভাবে একজনের নাচ দেখতে। সেই বিশেষ নতর্কীর নাম মাধুরী। কেন এই নাম এতক্ষণে তো বোঝাই যাচ্ছে। ওই টোপাজের বারডান্সার মাধুরী

দীক্ষিতের মতো দেখতে। প্রদীপ সাওয়ান্ত সেই মাধুরীর কাছে গিয়ে তাঁর জন্য পাগল হওয়া মানুষটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন সেদিন কত টাকা বখশিস দিয়েছিলেন তোমার সেই প্রিয় লোকটি? মাধুরী লজ্জিত কণ্ঠে বলেছিল, স্যার পুরোটা গোনা হয়নি। তবে ৯৩-৯৪ লক্ষ টাকা হবে বোধহয়। এক কোটি হয়নি এটা জানি! প্রদীপ সাওয়ান্তের সঙ্গে আসা মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অন্য অফিসাররা রীতিমতো বিস্ময়ে অবিশ্বাস্য চোখে মাধুরীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিলেন। কী নাম সেই লোকটির? সেই লোকটি হল আবদুল করিম লাডসাব তেলগি। যার হাত ধরে ভারত বিখ্যাত হয়েছিল তেলগি স্ট্যাম্প পেপার স্ক্যাম। সব দুর্নীতিকে ছাপিয়ে যাওয়া এই অপরাধ। কারণ এই একটি মাত্র মানুষ একা দেখিয়ে দিয়েছিল রাজনীতিবিদ থেকে পুলিশ কর্তা, একসঙ্গে চারটি রাজ্যের সরকারকে শ্রেফ টাকা দিয়ে প্রায় কিনে নেওয়া যায়। এবং এই একটি মাত্র লোকের জন্য একটি রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। খোদ মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনারকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একঝাঁক পুলিশ কর্তা আর পুলিশ কর্মী, প্রশাসনিক অফিসার গ্রেপ্তার হয়ে যায়। তেলগির চক্রের একজন করে অপারেটর হিসাবে। কত টাকার জাল স্ট্যাম্প পেপার চক্রের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এই আবদুল করিম তেলগি? ২০ হাজার কোটি টাকা!!

রেলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী লাডসাব তেলগি কর্ণাটকের বেলগাঁও-এর খানপুর রেলস্টেশনে কাজ করতেন। সামান্য বেতন। কিন্তু পরিবারটির অবস্থা এক ধাক্কায় প্রায় রাস্তায় এসে দাঁড়ানোর মতো হল, যখন ১৯৬১ সালে আবদুল করিম তেলগির জন্মের কিছুদিনের মধ্যে বাবা লাডসাবের মৃত্যু হল। কারণ ডায়াবেটিস। তিন সন্তান নিয়ে শরিফা বিবি বিপদে পড়লেও হাল ছাড়লেন না। খানপুরের কাছেই একটি জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রচুর ফলের গাছ। গরিব মানুষগুলো সেই অরণ্যে গিয়ে নিজেদের জন্য এবং বিক্রি করার জন্য নানাবিধ ফলমূল নিয়ে কোনোমতে সংসার চালাত। শরিফা বিবি তিন সন্তানকে নিয়ে রোজ ভোরে সেই জঙ্গলে অন্যরা আসার আগেই ঢুকে যেতেন। আর সবেদা, আতা, পেয়ারা জোগাড় করে চলে আসতেন স্টেশনে। সর্বসাকুল্যে খানপুরে ১২টি ট্রেন যাতায়াত করত তখন। সেই ট্রেনের যাত্রীদের কাছে এই ফল বিক্রি করে কখনও

একবেলা, কখনও দুবেলার খাবার জোগাড় করতেন শরিফা বিবি। তাই বলে ছেলেদের পড়াশোনা বন্ধ করে নয়। আবদুল করিম, আবদুল রহিম আর আবদুল আজিম সর্বোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। এভাবেই তো কেটে যাওয়ার কথা একটি প্রত্যন্ত মফস্সল এলাকার দরিদ্র পরিবারের। কিন্তু তা হল না। গোগেট কলেজ থেকে কমার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে প্রথমেই সবাইকে চমকে দিয়েছিল আবদুল করিম। আর তারপরই সে জোগাড় করে ফেলল একটি চাকরি। সেলস এক্সিকিউটিভ। কোম্পানির নাম ফিলিক্স ইন্ডিয়া। কিন্তু এসব ছোটখাটো কাজ তার জন্য নয়। ধাক্কা খেতে খেতে কল্যাণ বা ভীরার থেকে রোজ ট্রেনে এসে শহরে সারাদিন ঘুরে সামান্য দেড়শো টাকা কমিশন আর আড়াই হাজার টাকার বেতন দিয়ে চলে নাকি? আবদুল করিম নিজের মহল্লায় দেখতে পাচ্ছিল সৌদি আরবে যাওয়ার যেন ঢল নেমেছে। সবাই সৌদি আরবে লেবার পাঠায়। আর প্রচুর লাভ করে। করিম মুম্বইয়ের চার্চ গেট স্টেশনের বাইরে নিউ মেরিন লাইনস এলাকায় একটি ছোট্ট দোকান ভাড়া করে ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা শুরু করল। অ্যারাবিয়ান মেট্রো ট্র্যাভেলস। এই ব্যবসা দুভাবে করা যায়। সততার সঙ্গে সবরকম কাগজপত্র ঠিক রেখে। তাতে মুনাফা কম। আর একটি পন্থা হল ইমিগ্রেশন কাগজপত্র জাল করে অনেক বেশি করে অবৈধভাবে লেবার সাপ্লাই করে বিপুল লাভ করা। প্রত্যাশিতভাবেই আবদুল করিম এই দ্বিতীয় পন্থাই বেছে নেবে। কারণ সিঁড়ি নয়, উপরে ওঠার জন্য তার পছন্দ লিফট। দ্রুত আকাশ স্পর্শ করার স্বপ্ন। আর তাই যা হওয়ার তাই হল। একদিন এমআরএ পুলিশ স্টেশনের পুলিশ এসে তাকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে গেল। কারণ তার বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন জালের অভিযোগে এফআইআর হয়েছে থানায়। তিন মাসের জেল। এবং আসলে জেল নয়। সেটাই হল আবদুল করিমের সেরা উপহার। আলিবাবার গুহার দরজা খুলে গেল তার জেলের সহবন্দির মাধ্যমে। সেই লোকটির নাম রতন সোনি। তাকে আবদুল করিম জানতে চেয়েছিল, কীসের জন্য জেল হয়েছে তোমার? রতন সোনি হেসে উত্তর দিয়েছিল, টাকা ছাপার অপরাধে। চমকে উঠল আবদুল। টাকা ছাপা যায়? কোথায় পাওয়া যায় এই মেশিন? রতন বলেছিল, আরে ইয়ার, আভি তো বাস শুরু কিয়ে হো

তুম। ইতনি জলদি কেয়া হ্যায়। একটা কথা শোন, যদি ক্রাইম করতেই হয়, খুচরো পয়সার জন্য করবি না, কোটি টাকার জন্য করবি।

রতন সোনি ভালো করে শান্তভাবে জেনে নিয়েছিল আবদুল করিমের অপরাধের কাহিনি। জানা গেল আবদুলের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ ছিল ৩১২টি লেবারকে সে আরবে পাঠিয়েছিল জাল স্ট্যাম্প পেপার দিয়ে। কোথা থেকে পেলি?

করিম বলেছিল, আছে একজন, আমাদের ট্রাভেল এজেন্সিগুলোতে এসে এসে দিয়ে যায়। সোনি অট্টহাসি হেসে বলেছিল, আর তুই বোকার মতো এটা দেখলি না যে কোথা থেকে স্ট্যাম্প পেপার আসছে? শোন আমাদের দেশের যে কোনো রাজ্যের সরকারে দেখবি সবথেকে নেগলেকটেড, সবার আড়ালে থাকা একেবারে ভাঙাচোরা অফিসের মধ্যে থাকে স্ট্যাম্প পেপার ডিপার্টমেন্ট। কেউ খেয়ালই করে না। বাড়ির দলিল থেকে যে কোনো রেজিস্ট্রি বা ডকুমেন্ট অথবা বিজনেস ডিল। স্ট্যাম্প পেপার লাগবেই। আমরা যদি জাল স্ট্যাম্প পেপার ছাপানো শুরু করি তাহলে আর পিছনে তাকাতে হবে না। কিন্তু কীভাবে? জেল থেকে দুজনে ছাড়া পাওয়ার পর স্বাধীন ভারতের অপরাধ ইতিহাসে এক বিস্ময়কর চক্রান্ত শুরু হল। রতন সোনি আর আবদুল করিম সমাজবাদী জনতা পার্টি বিধায়ক অনিল গোতের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ম্যানেজ করে শুধু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইল এক মন্ত্রীর সঙ্গে। যেভাবেই হোক সেই মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। মহারাষ্ট্র সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী। ব্যবস্থা হয়েও গেল। সেই মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আবদুল করিম চায় স্ট্যাম্প পেপার ছাপানোর সরকারি ভেন্ডিং মেশিনের লাইসেন্স পাওয়ার অনুমতি। যেটা কোনো অপরাধ নয়। যে কেউ আবেদন করতেই পারে। ঠিক দু'মাস পর অমূল্য রতন হাতে এসে গেল। লাইসেন্স নম্বর ১২৫০০। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস। লাইসেন্স পেয়ে গেল আবদুল করিম। কে লেন সেই মন্ত্রী? তাঁর নাম ছিল বিলাস রাও দেশমুখ। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী।

তেলগি স্ট্যাম্প পেপার ছাপা শুরু করল নিজের লাইসেন্সে। এবং রতন সোনি শুরু করে দিল জাল স্ট্যাম্প পেপার ছাপানো। আবদুল করিমের লাইসেন্স অনুযায়ী ছাপা হতে

শুরু হল আসল সরকারি স্ট্যাম্প পেপার। আর দক্ষিণ মুম্বইয়ের কয়েকটি বিল্ডিং২-এর বেসমেন্টে রতন সোনি ছাপাচ্ছিল তখন জাল স্ট্যাম্প পেপার। এরপর জাল আর আসল স্ট্যাম্প পেপার মেশানো শুরু হয়ে গেল। পরবর্তীকালে সিবিআই তদন্তে নেমে দেখেছিল প্রথম বছরেই আবদুল করিম তেলগি সরকারিভাবে আড়াই কোটি টাকার স্ট্যাম্প পেপার কিনেছিল। আর তার সঙ্গে জাল স্ট্যাম্প পেপার মেশানোর পর সেই পরিমাণটি বিক্রি হয়েছিল ১০ কোটি টাকায়। এটা একটি ছোট্ট নমুনা। নেহাত মুম্বইতে আবদ্ধ রইল না ওই ব্যবসা। এবং গোপনও রইল না। কারণ স্ট্যাম্প পেপার ডিপার্টমেন্ট থেকে তেলগিকে টার্গেট করল পুলিশ। যে কোনো দিন গ্রেপ্তার হবে অনুমান করে আবদুল করিম আদালতে আগাম জামিনের একটি আবেদন করেই আচমকা উধাও। আসলে উধাও হল না। মুম্বই পুলিশ যখন কাগজে কলমে তাকে পলাতক হিসাবে ঘোষণা করে ফাইল বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তখন বহাল তবিয়তে মুম্বইতে বসেই আবদুল করিম তেলগি সম্পূর্ণ নতুন এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল জাল স্ট্যাম্প পেপার ব্যবসায়। নতুন কোম্পানির নাম মাধব এমডি। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লি। চার রাজ্যে আচমকা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বেড়ে গেল স্ট্যাম্প পেপারের। অসংখ্য অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে চাকরি পেতে শুরু করল একটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংস্থায়। তার নাম মাধব এমডি। এই সংস্থার সেলসম্যানরা চার রাজ্যের তাবত অফিস, কলেজ, সংগঠন, ক্লাব, সম্পত্তির ডিলে স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির দারুণ অফার দিতে শুরু করেছিল। অনেক কম দামে এভাবে স্ট্যাম্প পেপার পেয়ে সকলেই খুশি। ব্যবসা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে তেলগি দুটি প্রিন্টিং প্রেস কিনে স্ট্যাম্প পেপার ছাপানো শুরু করে দেয়। এবার লাইসেন্স পাওয়া গেল ডেসপ্যাচ অর্ডার ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে। সেই আবেদনের ফর্মে লেখা ছিল ‘প্লিজ কনসিডার’। স্বাক্ষর ছিল অশোক চ্যবনের। মহারাষ্ট্রের তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী। (সিবিআই এই মর্মেই রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছিল)। ততদিনে কয়েক হাজার কোটি টাকার সরকারি লোকসান হয়ে গিয়েছে একের পর এক রাজ্যে। জমি বিক্রি হয়েছে জাল স্ট্যাম্প পেপারে। চাকরির নিয়োগ হয়েছে জাল স্ট্যাম্প পেপারে। সরকারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে জাল স্ট্যাম্প পেপারে। বিদেশি লগ্নি হয়েছে জাল স্ট্যাম্প পেপারে। বিবাহ হয়েছে

জাল স্ট্যাম্প পেপারে। ডিভোর্স হয়েছে জাল স্ট্যাম্প পেপারে। মুম্বইতে এরকম জামাই আদর পেয়ে বারংবার হাত পিছলে বেরিয়ে গেলেও কর্ণাটকে আচমকা একদিন এমজি রোডে শপিং করার সময় গ্রেপ্তার হয়ে গেল আবদুল করিম তেলগি। এবং জানতে পেরেই মহারাষ্ট্র পুলিশ নিজেদের হেফাজতে চাইতে শুরু করল। কর্ণাটক পুলিশ তেলগিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল মুম্বই। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইউনিট নম্বর ফাইভের কাছে বন্দি তেলগি। তাকে জেরা করা হচ্ছে। তাকে নিয়ে যখন তখন গোয়া কিংবা পুণে গিয়ে তদন্ত করছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের জঘন্য এক ছোট্ট লকআপে তেলগির স্থান হয়েছে।

আসলে সব মিথ্যা। কোনো লক আপে নেই তেলগি! ৯ জানুয়ারি ২০০৩ মহারাষ্ট্র স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের চিফ সুবোধ জয়সওয়াল আর কর্ণাটকের তদন্ত সেলের প্রধান আর শ্রীকুমার আচমকা হাজির ক্রাইম ব্রাঞ্চে। জানতে চাইছেন কোথায় তেলগি? গোটা ক্রাইম ব্রাঞ্চ নীরব। কারও মুখে কথা নেই। জয়সওয়াল তৎক্ষণাৎ হোম মিনিস্টারকে ফোন করার ভয় দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়লেন কয়েকজন অফিসার। তেলগি লক আপে নেই। নেই মানে? যার বিরুদ্ধে চারটি রাজ্যের পুলিশের মামলা ঝুলছে, যাকে জেরা করে দেখা যাচ্ছে একের পর এক বড় বড় নাম জড়িয়ে যাচ্ছে সে কোথায়? খবরটি পেয়েই ওই দুই অফিসার ছুটলেন কাফ প্যারেড এলাকায়। মুম্বইয়ের সবথেকে অভিজাত অঞ্চল। তিনতলার একটি ফ্ল্যাট। ডোরবেল বাজানো হল। দরজা খুলে গেল। কর্ণাটক আর মহারাষ্ট্রের দুই পুলিশ কর্তা ঘরে ঢুকে দেখলেন সামনে টিভি চলছে। একটি ফোন কানে নিয়ে কারও সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে তেলগি। সামনে দুজন পুলিশ কনস্টেবল ট্রে হাতে। একটি ট্রেতে চিকেন পকৌড়া, আর একটিতে কফি আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তারা অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করছেন কখন তেলগির কথা শেষ হবে। এটা হল তেলগির নিজের ফ্ল্যাট।

অর্থাৎ গোটা পুলিশ বাহিনী এবং চার রাজ্যের প্রশাসন যখন জানে যে তেলগি মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের লক আপে আছে, তখন আসলে সে নিজের ফ্ল্যাটে বহাল তবিয়তে। আর

তাকে দেখভাল সেবা করার জন্য চাকরের মতো ডিউটি করছে চারজন কনস্টেবল। জানা গেল ২০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অপরাধী আবদুল করিম তেলগি প্রথম থেকে কোনোদিন লকআপে ছিল না। তাকে রাখা হয়েছিল হোটেল 'আশ্রয়' কিংবা তার নিজের গেস্ট হাউস 'অলঙ্কার লজে'। আর মাঝেমধ্যেই সে নিজের কাফ প্যারেডের ফ্ল্যাটে চলে আসত। তদন্তের স্বার্থে মাঝেমাঝেই তেলগিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গোয়ায়। আদতে গোয়ায় সে আর তার পরিবার 'হোটেল সিলভানিয়া রিসর্ট' কিংবা 'লীলা প্যালেসে' উঠত। স্রেফ ক্যাসিনো খেলা কিংবা ছুটি কাটানোর জন্য। অর্থাৎ যার থাকার কথা লক আপে সে আদতে একদম নর্মাল জীবন কাটাচ্ছে। কারণ সে পুলিশ থেকে রাজনীতিবিদ সকলকে বিপুল টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। ওই কাফ প্যারেডে অভিযানের ঠিক তিনদিন পর ভিওয়ান্ডিতে হানা দিয়ে যে জাল স্ট্যাম্প পেপার উদ্ধার হয়েছিল তার মূল্য ছিল ৯০০ কোটি টাকা। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ৮৫০ কোটি টাকার স্ট্যাম্প পেপার। দিল্লির মেহরৌলি থেকে ১১২০ কোটি টাকার স্ট্যাম্প পেপার।

আবদুল করিম তেলগি একটি নজিরবিহীন দুর্নীতি করেছিল সেটা তেমন বড় কথা নয়। আসল কথা হল আবদুল করিম তেলগি প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছে যে, ভারতের মতো রাষ্ট্রে টাকা ছড়ালে সবাইকে কেনা যায়। শুধু দামটা জানতে হবে। কেন এরকম কথা বলা হচ্ছে? কারণ আবদুল করিম তেলগির ঘুষের জালে জড়িয়ে পড়া এবং তার জেরে গ্রেপ্তার হওয়াদের তালিকায় অসংখ্য নাম ছিল। মন্ত্রী থেকে সাধারণ নেতা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সরকারি দপ্তরের সেকশন ইনচার্জ। একে একে সবাই গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু ৫৯তম গ্রেপ্তার মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের জয়েন্ট সিপি প্রদীপ সাওয়ান্ত। এবং ৬০তম গ্রেপ্তার রঞ্জিত কুমার শর্মা। তিনিও নাকি তেলগির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কে তিনি? মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার!! হ্যাঁ! খোদ পুলিশ কমিশনার!

জানা গেল গোবিন্দা আর সোনালি বেন্দ্রের 'জিস দেশ মে গঙ্গা রহতি হ্যায়' এবং গোবিন্দার 'আখিয়োঁ সে গোলি মারে' সিনেমা দুটির ডিস্ট্রিবিউশন রাইট নিয়েছিল যে সানা ফিল্মস, সেটি আসলে ছিল তেলগির সংস্থা। ছোট মেয়ে সানার নামে। কিন্তু দুটিতেই

লোকসান হয়েছিল। তাই আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ধারেকাছে ঘেঁষেনি সে। তাই আবদুল করিম তেলগি আসলের থেকে নকলকে বেশি ভালোবেসেছে। কারণ তাকে কখনও ঠকতে হয়নি নকলের কাছে। নকল স্ট্যাম্প পেপার এবং টোপাজ বারের নকল মাধুরী দীক্ষিত! দুজনের কেউই তাকে ছেড়ে যায়নি কখনও!

৫

ইজরায়েলের তেল আভিভ সিটির বাইরে বেন গুরিয়ন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। এসেছে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ডেলিগেশন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পর সবথেকে যে ব্যক্তি শক্তিশালী সেই প্রতিরক্ষা সচিব বিজয় সিং-এর নেতৃত্বে। ২০০৮ সালের নভেম্বর। প্রতিনিধি দলে আছেন ভবিষ্যতে এয়ারফোর্স এয়ার মার্শাল এন এ কে ব্রাউনি। কেন আসা হয়েছে ইজরায়েলে? মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল নিয়ে কথা বলতে। যা ইতিমধ্যেই অর্ডার দেওয়া হয়েছে ভারতীয় এয়ার ফোর্সের জন্য। গোটা টিমকে এয়ারপোর্টে স্বাগত জানানো হল। আর তারপর প্রত্যেকের জন্য পৃথক একটি করে অডি এস ইউ ভি। নিয়ে যাওয়া হল সেভেন স্টার হোটেলে। যে কোনো সরকারি প্রতিনিধি দলের প্রথম কাজ হল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাদিন কী কী মিটিং আর অ্যাসাইনমেন্টস আছে সেটা ডায়েরিতে লিখে রাখা। তার জন্য আগে থেকেই ইন্ডিয়ান হাইকমিশন থেকে একটি ব্রিফিং ফোল্ডার দেওয়া হয়। অফিসাররা হোটেলে রুমে পৌঁছনোর পরই ফ্রেশ হয়ে এক কাপ কফি খাওয়ার পর তেল আভিভের সিটি সেন্টারের দিকে তাকিয়ে ডেস্কে রাখা ফোল্ডার টেনে নিলেন। এবং ফোল্ডার খুলতেই দেখা গেল একটি বড় এনভেলপের মধ্যে ১০০ ডলার করে একঝাঁক বিল। যার মূল্য কয়েক হাজার ডলার। যাঁরা পরিচিত এই ব্যবস্থায়, তাঁরা বিস্মিত হননি। কিন্তু যাঁরা প্রথমবার গিয়েছেন, তাঁদের একজন লিয়াঁজো অফিসারকে ডেকে জানতে চাইলেন এসব কী? লিয়াঁজো অফিসার বললেন, স্যার, এটা আপনার লোকাল এক্সপেন্স। যদি ব্যবহার না করেন আমাদের হেল্প ডেস্ক ডলারে কনভার্ট করে দেবে। ইওর চয়েস স্যার! বোঝা গেল এই প্রতিনিধি দলকে খুশি রাখার এটা একটা সামান্য প্রাথমিক পদক্ষেপ। যদি ডিল অনুমোদিত হয়ে যায় এবং পজিটিভ রিপোর্ট দেওয়া হয় তাহলে আরও বড় উপহার অবশ্যই অপেক্ষা করবে।

এই ছোট্ট গল্পটি দিয়ে এই পরিচ্ছদটি শুরু করার কারণ একটা আন্দাজ প্রদান করা যে ভারতের ডিফেন্স ডিলের পরতে পরতে কতটা দুর্নীতি, লবি আর কমিশন জড়িয়ে আছে।

যে কাহিনির সূত্রপাত সেই ১৯৪৮ সালে। এবার শোনা যাক দুটি শিহরন জাগানো প্রতিরক্ষা দুর্নীতি।

তহেলকার দুই সাংবাদিক স্থির করলেন এলটিটিইর সঙ্গে ভারতের আর্মস ডিলারদের কী সম্পর্ক তা জানতে একটি তদন্তমূলক স্টোরি করা হবে। আর সেই সূত্রেই তাঁরা দিল্লির সাউথ ব্লকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ওয়েটিং রুমে দেখা পেয়ে গেলেন এক মিডলম্যানের। সুশীল। সামান্য কথোপকথনের পরই সুশীল জানিয়ে দিল যদি সত্যিই কোনো সামরিক অস্ত্র নির্মাণ সংস্থার হয়ে তাঁরা কাজ করতে চান, তাহলে একদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (প্রোকিওরমেন্ট) অমিত সিংলার সঙ্গে। তাঁর কাছে যে তথ্য পাওয়া যাবে সেটি ডিফেন্স ডিলের সবথেকে দামি। অর্থাৎ ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই মুহূর্তে ঠিক কী ক্রয় করতে চাইছে, কোনটা দরকার, এটা জানলেই অর্ধেক কাজ হাসিল।. সুশীল এই কাজটি কি বিনামূল্যে করবে? অবশ্যই নয়। তাই তাঁকে ওই দুই সাংবাদিক প্রাথমিকভাবে মাত্র ২ হাজার টাকা দিয়েছিল। বাকি পেমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টের পর। ঠিক চারদিন পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আর তার আগে সুশীলকে দিতে হয়েছিল ৫ হাজার টাকা। এরকম ক্লায়েন্ট পেয়ে সুশীল খুব খুশি। অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে আলোচনায় স্থির হয়েছিল তাঁকে প্রথমে দিতে হবে ২ লক্ষ টাকা। পরিবর্তে কিছু ডকুমেন্ট। বাকিটা পরে। তবে অর্ডার দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। সেটি সামরিক বিভাগের একেবারে উপরমহলে। সবথেকে ভালো হয় যদি সরাসরি রাজনৈতিক মহলের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধরা হয়। তাহলে আর চারদিকে টাকা ছড়ানোর দরকারই নেই। এক দু'জায়গায় দিলেই কাজ হয়ে যাবে। তবে সবার আগে দরকার একটি সংস্থা গঠন করার। তহলকার যে দুই সাংবাদিক তদন্ত করছেন তাঁদের মধ্যে একজন থাকেন দিল্লির জনকপুরী। একদিন একটি রাস্তা ক্রস করার সময় তিনি দেখলেন রাও তুলা রাও মার্গ নামের রাস্তাটির পাশে গলিটার নাম 'ওয়েস্ট এন্ড'। সেদিনই স্থির করা হল অস্ত্র বিক্রির জাল সংস্থার নাম হবে মেসার্স ওয়েস্ট এন্ড ইন্টারন্যাশনাল। ইন্টারনেটে হঠাৎ দেখা গেল হ্যান্ডহেল্ড কুকার নামের কোনো প্রোডাক্ট। ওই হ্যান্ডহেল্ড নামটি নিয়ে একটি অত্যাধুনিক সামরিক উপকরণের নাম দেওয়া হল 'হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ইমেজার'। পাহাড়ি এলাকায় কাজে লাগবে

সেনাবাহিনীর। সবেমাত্র কারগিল যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং হিমালয় রেঞ্জে কাজে আসবে এটা। বেশ উৎকৃষ্ট টোপ। আসলে ওরকম নামের কোনো সামরিক উপকরণই হয় না। সব প্ল্যান যখন নিখুঁতভাবে করা হয়ে গেল তখন প্রথম কাজ হল ওই হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ইমেজারির একটি কাল্পনিক ছবি দিয়ে ব্রোশিওর তৈরি। কারণ যাঁদের কাছে ওই কাল্পনিক উপকরণ বিক্রির প্রস্তাব দিয়ে কমিশন দেওয়া হবে তাঁদের বিশ্বাস করানো দরকার তো! চেনাশোনা এক আইআইটি দিল্লির ছাত্রকে পাকড়াও করে বলা হল এই নামের একটি মডেল ইমেজ বানাতে হবে। এরকম নামের উপকরণ হলে তাকে কেমন দেখতে হওয়া উচিত? আইআইটির সেই ছাত্রটি অতি উৎসাহে কার্যকারণ না জেনেই সুন্দর মডেল বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেইভাবে তৈরি হল ব্রোশিওর। ২০০১ সালের এনডিএ সরকার। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ। বিজেপি ওই প্রথমবার ভারতবর্ষের সরকারে ক্ষমতায় আসীন। প্রথম দেখা করা হল পি শশীর সঙ্গে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সিনিয়র সেকশন অফিসার। তিনি টাকার বিনিময়ে রাজি হলেন ব্রিগেডিয়ার অমিত শেহগলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। তাঁদের সামনেই ফোন করলেন, স্যার, ওয়েস্ট এন্ড ইন্টারন্যাশনাল থেকে লিয়াঁজো অফিসার একটু বসতে চান। ইয়েস স্যার। রিগার্ডিং হাই অলটিচিউড ইকুইপমেন্টস স্যার। শশী ফোন রেখে হাসছেন। স্যার রাজি। অতএব দুজন সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিচয়ের সাধারণ সাংবাদিক অনায়াসে পৌঁছে গেলেন ডিরেক্টর জেনারেল অপারেশন সাপ্লায়ার্সের বাড়িতে। ডিল তো হয়ে যাবে। কিন্তু ক্যাবিনেট কমিটি অফ সিকিউরিটি চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। সেখানে সমস্ত প্রথম সারির মন্ত্রী ও সামরিক অফিসার। কীভাবে রাজি করানো সম্ভব? ঠিক এখান থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সততার ইতিহাসের সবথেকে বড় কালো দাগটির সূত্রপাত। কারণ আর কাউকে নয়। দুজনকে টার্গেট করা হয়েছিল ঘুষ দেওয়ার জন্য। জর্জ ফার্নান্ডেজের দলের দ্বিতীয় শক্তিশালী ব্যক্তি, জয়া জেটলি। সমতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক। আর বঙ্গারু লক্ষ্মণ। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। গোটা অপারেশনটি তোলা হয় গোপন ক্যামেরায়। নাম দেওয়া হয় অপারেশন ওয়েস্ট এন্ড। দেখা গেল অশোক রোডে বিজেপির সদর দপ্তরে নিজের চেম্বারে বসে বিজেপি সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণ ১ লক্ষ টাকা নিচ্ছেন। নিয়ে ড্রয়ারে

ঢোকালেন এবং কথোপকথনে জানা গেল বাকি অংশ ডলারে দেওয়া হবে। পরিবর্তে তিনি ওই সংস্থাকে পাইয়ে দিতে সাহায্য করবেন হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ইমেজারি অর্ডার। একইভাবে টাকা দেওয়া হল জয়া জেটলিকেও। কারণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ। যাঁকে জয়া সম্বোধন করেন সাহেব বলে। গোটা দেশে তুমুল হইচই হয়েছে। কারণ তার ঠিক আগেই কারগিলে শহিদ হওয়া সেনাদের কফিন কেনাতেও বিপুল দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল ছিল রাজনীতি। এই দুই ঝড়ের মধ্যে সরকারও টলোমলো। বঙ্গারু লক্ষ্মণ ইস্তফা দিলেন। আর তৎকালীন রেলমন্ত্রী সর্বাগ্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরকার থেকে বেরিয়ে গেলেন। সমর্থন প্রত্যাহার করলেন। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বহু চেষ্টা করলেন সেই রেলমন্ত্রীকে শান্ত করার। তিনি কিন্তু কোনো কথাই শোনেননি। রেলমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পদত্যাগ করতে হয় জর্জ ফার্নান্ডেজকেও। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে তদন্ত চলার পর বিজেপি সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে। আর তাঁর চার বছর সাজা হয়। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে চার বছর সাজা ঘোষণার পর অক্টোবরে বঙ্গারু লক্ষ্মণ জামিনে মুক্ত হন। কিন্তু ২০১৪ সালে আচমকা হায়দরাবাদে বঙ্গারু লক্ষ্মণের মৃত্যু হয়। এনডিএ সরকারের আমলে হওয়া এই স্টিং অপারেশন একেবারে খোলাখুলি দেখিয়ে দিয়েছিল রাজনীতিবিদ থেকে সরকারি অফিসার সকলেই কমিশন আর কাটমানির পূজারি।

বঙ্গারু লক্ষ্মণ কিংবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অফিসারদের এভাবে একটি জাল সংস্থার জাল উপকরণ বিক্রির জন্য কমিশন নেওয়ার রীতিটি ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে দুর্নীতির অন্তহীন সংযোগের একটি প্রবহমান উদাহরণ। সবথেকে বিস্ময়কর হল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অস্ত্র কেনাবেচার জন্য মিডলম্যান থাকা এবং দেশে বিদেশে লবি করা একটি অফিসিয়াল ব্যবস্থার মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। এটাই সবথেকে হোয়াইট কলার দুর্নীতি ভারতীয় তথা বিশ্ব রাজনীতিতে। আন্তর্জাতিক কমিশন সিন্ডিকেট ভারতের সেনাবাহিনীর ডিলে কীভাবে ঢুকে পড়েছে তা প্রকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম আর একটি মেগা রাজনৈতিক স্ক্যামের মধ্যে দিয়ে। এক ও অকৃত্রিম বোফর্স কেলেঙ্কারি!

বোফর্স কোম্পানি যে কমিশন দিয়েছিল তা নিয়ে সংশয় নেই। প্রশ্ন তো একটাই ঘুরপাক খাচ্ছে এই ৩০ বছর ধরে। সত্যিই কমিশনের সুবিধা কারা পেয়েছে? কোনো সরাসরি প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। সবটাই কার্যকারণ আর অভিযোগের স্তরে রয়ে গিয়েছে। সত্তরের দশকে অত্তাভিও কাত্রোচ্চি নামের এক সুদর্শন যুবক ভারতে আসেন ইতালি থেকে। যে সংস্থায় তিনি কাজ করতেন তার নাম স্যানপ্রোগেত্তি। তখন দিল্লিতে হাইকমিশন ছাড়া আর কটাই বা ইতালীয় পরিবার কর্মসূত্রে বাস করতো? হয়তো হাতে গোনা। অতএব গান্ধী পরিবারের বড় বধূটির সূত্রে কাত্রোচ্চির পরিবারের সঙ্গে গান্ধীদের সম্পর্ক দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। আর এটা নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই কাত্রোচ্চি যতদিন এদেশে ছিলেন ততদিন তাঁর সংস্থা স্যানগ্রোপোতি ভারতে কমপক্ষে তিনশোর বেশি প্রকল্পের অর্ডার পেয়েছিল। গ্যাস পাইপলাইন থেকে সার উৎপাদক সংস্থাদের হয়ে কারখানা গড়ে দেওয়া পর্যন্ত অসংখ্য। আর যেহেতু এভাবে কাত্রোচ্চির সংস্থা একের পর এক সরকারি অর্ডার পেয়ে এসেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজুড়ে ডিলার আর মিডলম্যানরা ধরে নিয়েছে নিশ্চিত ভারতের ফার্স্ট ফ্যামিলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলেই এই লোকটিই চাবিকাঠি কাজ হাসিলের।

১৯৮০ সালে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক লিখিতভাবে জানাল, ১৫৫ এমএম হাউৎজার সিস্টেম দরকার সামরিক বাহিনীকে উন্নত করার জন্য। আর্জেন্ট! ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জমা পড়া আবেদনের মধ্যে শর্টলিস্ট করা হল কিছু সংস্থাকে। ফ্রান্সের সফমা, সুইডেনের এ বি বোফর্স, ব্রিটেনের ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি সার্ভিস, অস্ট্রিয়ার ভোয়েস্ট অ্যালপাইন। প্রতিযোগিতা হবে এই চার সংস্থার মধ্যে। অর্ডার পাওয়ার জন্য লড়াই। ১৯৮৫ সালে আরও যাচাই পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর তালিকায় এসে দাঁড়াল দুটি কোম্পানি। ফ্রান্সের সফমা এবং সুইডেনের বোফর্স। ঠিক এমন সময় যখন সেনাপ্রধান এ এস বৈদ্য অবসরের দোরগোড়ায়। আর দায়িত্ব নেবেন জেনারেল সুন্দরজি। আবার নতুন সেনাপ্রধান দায়িত্ব নিলে নতুন করে প্রক্রিয়া, পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে অনেক দেরি হতে পারে। তাই তড়িঘড়ি ১২ মার্চ ১৯৮৬ লেটার অফ ইনটেন্ট দিয়ে দেওয়া হল বোফর্সকে। ১৪৩৭ কোটি টাকা দিয়ে ৪১০টি ১৫৫ এমএম ফিল্ড হাউৎজার কামান কেনা হবে। যদিও

তখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছিল ফ্রান্সের সংস্থার হাউৎজার কামান সবদিক থেকে বেশি উন্নত ছিল। তা সত্ত্বেও কেন বোফর্স? কারণ জানা যায়নি। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সুইডিশ রেডিও প্রথম ঘোষণা করে বোফর্স কামানের কেনাবেচায় ঘুষ দেওয়া হয়েছে। এবং ভারতের প্রভাবশালী রাজনীতিকরা কমিশন দিয়েছেন। সেটি ঘোষণা করা মাত্র স্টকহোমে থাকা ভারতের হাইকমিশনার আগুপিছু চিন্তা না করেই সুইডিশ সরকারকে জানিয়ে দেন, ভারত চায় বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। তারপরই আমরা ডিলে সবুজ সংকেত দেব। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বোফর্স ঘোষণা করে যে, কোনো কমিশন এই ডিলে কাউকে দেওয়া হয়নি। আর সেই কারণেই ভারত সরকারকে ৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি পে অফ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, অর্থাৎ যেহেতু কোনো কমিশন চার্জ নেই। কিন্তু বোফর্সের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল কাকে কাকে কমিশন দেওয়া হয়েছে।

১) R

২) P

3)?

৪) NERO

৫) হ্যানসন

৬) Q.

কারা এরা? এখান থেকে তদন্ত শুরু। আর ওই R মানে রাজীব এবং Q মানে কাত্রোচ্চি। এটাই ধরে নিয়ে এগোনো হয়। যদিও এই দুর্নীতি নিয়ে চরম শোরগোল শুরু হতেই ১৯৮৭ সালের জুন মাসে রাজীব গান্ধী প্রতিরক্ষামন্ত্রককে নির্দেশ দেন আমরা যদি এই চুক্তি বাতিল করি তাহলে কী কী লোকসান হতে পারে তা খতিয়ে দেখা হোক। ১৩ জুন ১৯৮২ সালে জেনারেল সুন্দরজি (তৎকালীন সেনাপ্রধান) একটি গোপন নোটে জানালেন, আমাদের জানতেই হবে কারা কমিশন নিয়েছে। বোফর্স আমাদের যদি তথ্যটি না জানায় বা জানাতে অস্বীকার করে, তাহলে আমাদের উচিত হবে বোফর্স কেনা বাতিল

করা। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অরুণ সিং তাঁর নোটে লিখলেন অবশ্যই এই চুক্তি বাতিল করা হলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। লোকসান হবে। এমনকী গোটা ক্রয় প্রক্রিয়া আরও পিছিয়ে যাবে। যা জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি। কিন্তু তবু আমাদের উচিত বোফর্সকে বলা যে কমিশনের বিষয়টি প্রকাশ করতেই হবে। এই টানাপোড়েনে বোফর্স কামান ক্রয় কিন্তু আটকে থাকেনি। শেষ পর্যন্ত কেনা হয়েছিল। সিবিআই তদন্ত সেই থেকে চলছে বটে। সিবিআই চার্জশিটে জানাচ্ছে, কাত্রোচ্চি সাড়ে ৮ কোটি টাকা কমিশন নিয়েছিলেন প্রথমেই। কিন্তু বাকি কোড ল্যাংগুয়েজের মানুষরা? তাদের মধ্যে হিন্দুজা ব্রাদার্স আর উইন চাড্ডা যে সত্যিই এজেন্ট ছিলেন এ ই বোফর্সের সেটা সিবিআই দাবি করেছে। এবং তাদের সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকেও নথি পাওয়া গিয়েছে। রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আর কার নাম জড়িয়ে যায়? তাঁর পারিবারিক তথা সেই ছেলেবেলার বন্ধু। অমিতাভ বচ্চন। যদিও ২০১২ সালে অমিতাভ বচ্চনকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়। এবং অমিতাভ একটাই কথা বলেছিলেন। বদনামের সেই যন্ত্রণাময় ২৫ বছর কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে? আজ নির্দোষ বললে কী হবে? এই একটি দুর্নীতি বচ্চন আর গান্ধী পরিবারের মধ্যে দেওয়াল তুলতে শুরু করে। ১৯৯১ সালে রাজীবের মৃত্যুর পর আমেরিকা থেকে ফেরা রাহুলকে লন্ডন থেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিলেন তাঁর অমিত আংকল। পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুর শেষকৃত্যের সব কাজ সামলেছিলেন। কিন্তু সেই শেষ। তারপরই বচ্চন ও গান্ধীদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ। অমিতাভের অভিযোগ, দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ায়নি গান্ধীরা। বোফর্সের আসল অভিযুক্ত কাত্রোচ্চিকে বহুবার হাতে পেয়েও সিবিআই গ্রেপ্তার করতে পারেনি কেন? সেই রহস্য আজও রয়ে গিয়েছে। কখনও মালয়েশিয়া, কখনও আর্জেন্টিনায় কাত্রোচ্চি ধরা পড়েছেন ইন্টারপোল নোটিশের জন্য। অথচ প্রতিবার সিবিআই দুর্বল নথিপত্র আর প্রত্যর্পণের আবেদন করায় প্রতিবার তিনি হাসতে হাসতে ছাড়া পেয়েছেন। ২০১৩ সালের ১৩ জুলাই ইতালির মিলানে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান কাত্রোচ্চি। এবং সেদিনই কার্যত তাঁর সঙ্গেই কবরে গিয়েছিল বোফর্স রহস্য।

৬

বরফ পড়ছে শ্রীনগরে। অবিশ্রান্ত। এই ডিসেম্বরের শুরুতেই এতটা বরফ সব বছরে পড়ে না। বিকেল পৌনে চারটে বাজে। পপলার গাছগুলো সাদা। গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারের আস্তরণে। ডাল লেক খুব ভোরের দিকে জমে যায়। তাই শিকারাগুলো এখন বিশ্রাম নিচ্ছে হাউসবোটের সামনে। একটাই সমস্যা। তুষার পড়ার সময় মিনিবাসগুলো কমে যায় রাস্তায়। পাওয়া যায় না অটোও। যাতায়াত করা এক যন্ত্রণা। লাল ডের মেমোরিয়াল উওম্যানস হাসপাতালের গেট থেকে ২৩ বছরের এক যুবতী বেরিয়ে এলেন। এই হাসপাতালের ইন্টার্ন। ডাক্তারি পড়ার শেষ কয়েকটি ধাপ চলছে। শনিবার বেশি ক্লাস থাকে না। আর ওয়ার্ডেও ডিউটি ছিল মর্নিং থেকে। তাই কাজের চাপ নেই। বাড়ি ফেরাই যায়। মেয়েটি পরিবারের মধ্যে সবথেকে চুপচাপ। তাঁর বাড়িতে রাজনীতির চর্চা। সে আর ছোট ভাই নিক্কি শুধু আলাদা রকম। ইচ্ছে করলেই পারিবারিক গাড়িতে যাতায়াত করতে পারে মেয়েটি হাসপাতালে। কিন্তু সামান্য দূরত্ব সে চায় না আবার গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করে বন্ধুদের থেকে দূরত্ব বাড়াতে। ফিরনির ক্যাপটা আরও বেশি করে টেনে নিলেন যুবতী। তুষারপাতটা যেন বরফ ঝড়ে পরিণত হচ্ছে। উফফ..কী অসম্ভব ঠান্ডা। লালচকের দিক থেকে একটি ট্রানজিট ভ্যান আসছে। JKF ৬৭৭। অল্প লোক ধরে। যদিও এই সময় কে আর বেরোবে? তাই যাত্রী বেশি নেই। মেয়েটি হাত দেখানোয় ট্রানজিট ভ্যান দাঁড়িয়ে গেল। নওগাঁও? হাঁ..আ যাইয়ে ম্যাডাম..। ভ্যান স্টার্ট নিচ্ছে। আচমকা পিছন থেকে আবছা কুয়াশার মতো বরফ পাতের আড়াল থেকে আপাদমস্তক ঢাকা তিনজন লোক ছুটে ভ্যানে উঠে পড়ল। একটু হলেই ভ্যান মিস হয়ে যেত তাদের। হাঁফাতে হাঁফাতে স্বস্তির হাসি ফুটল। একেবারে সামনের দুটি সিট ফাঁকা। সেখানে বসে তারা জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। ভ্যান চলছে। বাইরে চলছে তুষারপাত। বন্ধ জানালার উপর আছড়ে পড়ছে সাদা সাদা তুষারের গুঁড়ো। রাস্তায় বরফ। গাছে বরফ। ছাদে বরফ। মেয়েটি ভাবছে আগামী তিনমাস ধরে এই অবিরাম স্নো ফল চলবে। স্বাভাবিক জীবন বন্ধ। ভোরে হাসপাতালে যাওয়া সবথেকে কঠিন আর কষ্টকর। ডাক্তারির কোর্সটা শেষ হলে দিল্লি গিয়ে এম ডি

করার ইচ্ছা। আর মাত্র হাফ কিলোমিটার। তারপর বাড়ি গাড়ি জোরে চলতে পারছে না এই বরফে। আরও স্লো হয়ে গেল। কারণ সামনের লোক দুটো উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা নামবে এই স্টপেজে। কিন্তু কই নামছে না তো? বরং এগিয়ে আসছে ভ্যানের পিছনের দিকে। যুবতীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ফিরনি থেকে হাত বের করে আনল তারা। দুজনের হাতে পিস্তল। অন্যজন দরজায়। একজন পিস্তল মেয়েটির মাথায় ঠেকিয়ে বলল ওঠো। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। কোথায়? সেসব পরে জানবে..। ঠিক কপালের পাশে পিস্তলের নলটি ঠেকানো হল। থরথর করে কাঁপছে মেয়েটি। ভ্যানের বাকি পাঁচ যাত্রীর একই দশা। চালকের কাছে গেল এক যুবক। কানের কাছে পিস্তলটা ঠেকিয়ে বলা হল দাঁড়াও এখানে। কেউ চালাকি কোরো না..। আর মেয়েটির দিকে ফিরে তারা চিৎকার করে বলল, ওঠো! কেঁদে ফেলছে মেয়েটি। ভ্যান দাঁড়াল মেয়েটির বাড়ি নওগাঁও থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরে। ভ্যান দাঁড়াতেই তিন যুবক লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। বাগালিকালীপুরা এলাকা। বরফ না পড়লে এতক্ষণে এই অঞ্চল বেশ ভিড় থাকারই কথা। এই চাপোর রোড ধরে সোজা পহেলগাঁও যাওয়া যায় অন্য রুটে। নির্জন ফাঁকা রাস্তায় অবিশ্রান্ত তুষারপাতে এরপর কী? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কেঁদে চলেছে মেয়েটি। কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। ম্যাজিকের মতো নিঃশব্দে হাজির হল একটি নীল মারুতি। এক ঝটকায় দরজা খুলে গেল। তরুণীকে ধাক্কা মেরে ভিতরে ঠেলে দিয়ে তিন যুবক ঢুকে পড়ল। ওই অবিরাম তুষারপাতে এবার কিন্তু ঝড়ের গতি নিল নীল মারুতি ভ্যান। ঠিক দেড়ঘণ্টা পর 'কাশ্মীর টাইমস' পত্রিকা দপ্তরে একটি ফোন এল। 'জেকেএলএফ (জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট) থেকে বলছি। আমাদের হাতে মুফতি সাহেবের ডাক্তার মেয়ে। তিনজনকে মুক্তি দিতে হবে। নইলে...।' ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর। শ্রীনগরের রাস্তা থেকে বিকেলে কিডন্যাপ হয়ে গেলেন রুবাইয়া সঈদ। মাত্র পাঁচদিন আগে ৫ ডিসেম্বর যাঁর বাবা মুফতি মহম্মদ সঈদ দেশের নব গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মেয়েকেই তাঁর বাড়ির কাছ থেকে অপহরণ করে নেওয়া হয়েছে। এর থেকে বড় ধাক্কা ভারতের সন্ত্রাস ইতিহাসে আসেনি। রাজীব গান্ধীর কংগ্রেসকে বোফর্স দুর্নীতিতে বিদ্ধ করে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে তৃতীয় ফ্রন্ট সবেমাত্র জয়ী হয়েছে। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর সরকারের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন কাশ্মীরের নেতা মুফতি মহম্মদ সঈদ। মাত্র পাঁচদিন আগে কার্যভার নিয়েছেন। কিছুই জানেন না। তাই ৮ ডিসেম্বর বিকেলে ছিল নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসে ব্রিফিং। সেদিন ছিল কাশ্মীর নিয়ে ব্রিফিং। অফিসারদের মুফতি মহম্মদ সঈদ তিনটে নাগাদ বলছিলেন, আমি যতটুকু জানি বলি আপনাদের। আপনারা ওভার অল হয়তো বেশি জানেন। বাট আমি কাশ্মীরের মানুষ। তাই একটু নিজের জানকারি বলছি। সবথেকে অ্যাক্টিভ গ্রুপ জেকেএলএফ। ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের আমানুল্লা খান আর মকবুল ভাট দুজনে মিলে এই গ্রুপ তৈরি করে কাশ্মীরের আজাদির জন্য। পিছনে পাকিস্তানের জিয়া উল হকের প্ল্যান K-২। কে টু মানে? কে টু মানে হল কাশ্মীর অ্যান্ড খলিস্তান। ভারত থেকে এই দুটিকে আলাদা করতে হবে। মকবুল ভাটের ১৯৮৪ সালে ফাঁসি হয়ে যায়। তারপর সংগঠনের ভার চলে গেল চারজনের হাতে। যার কোড নেম HAJY। তার মানে কী? চারজনের নামের আদ্যাক্ষর। হামিদ শেখ, আসফাক মজিদ ওয়ানি, জাভেদ মির এবং ইয়াসিন মালিক। অফিসাররা ভাবছেন নতুন মন্ত্রী তো কাশ্মীর নিয়ে বেশ অনেকটা জানেন। ভালোই হল। যত দিন যাচ্ছে ততই কাশ্মীরের সংকট নতুন দিকে টার্ন নিচ্ছে। আইবির 'কে' ডেস্ক (কাশ্মীর ডেস্ক) জানাচ্ছে আজাদির নামে এবার ভায়োলেন্স শুরু হতে পারে। দিল্লির নর্থ ব্লকে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই কাশ্মীরের সন্ত্রাস নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করছেন, ঠিক তখন ওই মুহূর্তে তাঁর নিজের মেজ মেয়ে রুবাইয়া সঈদকেই যে সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ করে সোপোরের দিকে অজানা কোনো হাইড আউটে চলে গিয়েছে, তা তিনি জানতেই পারলেন না। অথচ কী আশ্চর্য। কাল রাতেই তিনি বাড়িতে ফোন করে ছোট ছেলে নিক্কিকে বলেছিলেন, বাড়ি থেকে যেন না বেরোয় সে। কারণ রিপোর্ট আছে গন্ডগোল হতে পারে। ১৪ বছরের কিশোর নিক্কি বাড়ি থেকে বেরোয়নি। কিন্তু রুবাইয়া প্রত্যেক একদিন অন্তর হাসপাতালে যায়। তাকে বারণ করা হয়নি কেন? কারণ কাশ্মীরে মেয়েদের সম্মান অনেক উচ্চস্থানে। টেররিস্ট কারা? কাশ্মীরের লোকাল ছেলেরাই তো! তাই তারাও এই অন্যায় করবে না। মেয়েদের গায়ে হাত দেবে না। মেহবুবা আর রুবাইয়াকে নিয়ে ভয় নেই। বিকেল সাড়ে পাঁচটা। 'কাশ্মীর টাইমস' পত্রিকা দপ্তরে ফোন এল। জেলে বন্দি থাকা কয়েকজনকে মুক্তি দিতে হবে। জে কে এল এফ এরিয়া কমান্ডার শেখ আবদুল

হামিদ, মকবুল ভাটের ভাই গুলাম নবি ভাট, আর মুসতাক আহমেদ জারগর। তিনজনই জে কে এল এফের সুপ্রিমো। 'কাশ্মীর টাইমসের' সম্পাদক মহম্মদ সোফি ভাবলেন এবার কী করা উচিত? আগে কি লোকাল পুলিশকে জানানো দরকার? নাকি সোজা মুফতি সাহেবকে? তিনি অনেক ভেবে দুটি কাজই করলেন। দিল্লিতে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানালেন এই দুঃসংবাদ। আর একই সঙ্গে জম্মু কাশ্মীর সরকারকেও। আধঘণ্টার মধ্যে ভারত জেনে গেল এই ভয়াবহ দুঃসাহসিক ঘটনা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কন্যাকে কিডন্যাপিং। আর ভি পি সিং সরকারের কাছে যা প্রবল অস্বস্তি। মাত্র এক সপ্তাহের সরকারের এই হাল? এবার কী করা হবে? জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লা। মুফতি মহম্মদ সঈদের চরম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। আর সবথেকে মারাত্মক কথা হল ফারুখ সাহেব ঠিক এই সময়টাই কাশ্মীরে নেই। তিনি লন্ডনে। যেটা এই আবদুল্লা পরিবারের দ্বিতীয় বাসস্থান বলা যায়। আর ফারুখ সাহেব নেই মানে সরকারই নেই। কারণ ফারুখ আবদুল্লার মন্ত্রিসভায় কোনো দ্বিতীয় নেতা নেই। তিনিই এক থেকে ১০ নম্বর। এমনকী ফারুখ সাহেব কাশ্মীরে না থাকলে একটিও মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় না। একটিও সরকারি সিদ্ধান্ত বিজ্ঞপ্তি সার্কুলার প্রকাশ হয় না।

কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হঠাৎ করে রুবাইয়া সঈদ কেন? কেন তাঁকেই কিডন্যাপ করা হল? সত্যিই আদতে সে আসল টার্গেট ছিলই না। জেকেএলএফ বহুদিন ধরেই চাইছে এমন একটি কাজ করতে, যা আন্তর্জাতিকভাবে কাশ্মীর ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসবে। তাই প্রথম প্ল্যান হল মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লার বড় মেয়ে সাফিয়া আবদুল্লাকে কিডন্যাপ করা। সেইমতো সব পরিকল্পনা করে দেখা গেল সাফিয়া প্রথমত ঘর থেকে প্রায় বেরোয় না। আর দ্বিতীয়ত মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন গুপকর রোডের গোটা সিকিউরিটি এমনই কড়া তুষারপাতের মরশুমে একবার চেজিং করা হলে গাড়ি স্কিড করে দুর্ঘটনা হবে। সবাই ধরা পড়ে যাবে। অতএব মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাকে কিডন্যাপিং-এর প্ল্যান ক্যান্সেল। তাহলে? রজৌরির এক গোপন আস্তানায় বসে ইয়াসিন মালিক প্রস্তাব দিল সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আল্লা বকশের মেয়েকে অপহরণ করা হবে। ঠিক আছে। তাহলে এটাই ফাইনাল। আল্লা বকশ প্রচণ্ড কড়া ধাতের পুলিশ অফিসার। ডান্ডা ছাড়া কিছু বোঝেন না।

ইলেকশনের সময় জেকেএলএফের একের পর এক ক্যাডারকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লার প্রিয়পাত্র। সুতরাং রাইট চয়েস। কিন্তু সব হিসাবে গোলমাল হয়ে গেল ৩ ডিসেম্বর। ঘোষণা করা হল কেন্দ্রে নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন কাশ্মীরের নেতা মুফতি মহম্মদ সঈদ। ব্যস! আবার প্ল্যান বদল। কারণ এটাই সহজতম এবং সবথেকে জোরাল টার্গেট। খোদ দেশের হোম মিনিস্টারের মেয়েকেই কিডন্যাপ। ঠিক তাই হল। খবর ছড়াতেই মুফতির দিল্লির বাসভবনে সন্ধ্যা থেকে ভিআইপির ঢল। বাইরে আছড়ে পড়ছে মিডিয়া। প্রথমেই এলেন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং। তারপর আই কে গুজরাল, আরিফ মহম্মদ খান। সেখানে বসেই ঠিক হল আরিফ মহম্মদ খান আর ইন্দ্রকুমার গুজরাল যাবেন শ্রীনগরে। নেগোসিয়েশনের জন্য। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী অপহরণকারীদের সঙ্গে দর কষাকষি কারা করবে? শ্রীনগরের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ হেড এ এস ধূলত। আর চিফ সেক্রেটারি মুসা রেজাকে বাছাই করা হল ব্যাকআপ হিসাবে। সামনে থাকবে দুই সাংবাদিক। যাঁদের জেকেএলএফ আর মুফতি সাহেব দুজনের সঙ্গেই যোগাযোগ ভালো। কারা তাঁরা? 'কাশ্মীর টাইমসের' জাহির মেহরাজ আর ফ্রি লান্স মহম্মদ সঈদ মালিক। কথাবার্তা, আলোচনা শুরু হওয়া দরকার যত দ্রুত সম্ভব। কারণ রুবাইয়া কী অবস্থায় আছে তা অজানা। জাফর মেহরাজ একটা ক্রু বের করলেন। প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসফাক মজিদ ওয়ানির বাবার সঙ্গে। আসফাক কিডন্যাপিং এর মাস্টারমাইন্ড। তাঁর ইনফরমেশনের পাইপলাইন বাবা। বাবাকে জানানো হোক ইন্ডিয়া কী চায়! আই বি চিফ ধূলত, সাংবাদিক জাহির আর চিফ সেক্রেটারি মুসা রাত সাড়ে ১০টায় শ্রীনগরের বাইরে এক জঙ্গলে ঘেরা সরকারি আবাসনের দ্বিতীয় তলের বি ফোর টু থ্রি ফ্ল্যাটে ডোরবেল বাজালেন। দরজায় এক সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আপনারা কী চান? ধূলত বললেন, আপনার ছেলে কী চায়? আগে সেটা বলুন!

ওরা সাধারণ নিরীহ ছেলে। হামিদ শেখ অসুস্থ। ওদের নেতা। হাসপাতালে শুনছি চিকিৎসা চলছে জেলে। তাকে ছেড়ে দিন আপনারা।

কোথায় ছাড়া হবে? লালচকে?

বৃদ্ধ (একটু ভেবে।) আপনারা একটা কাজ করতে পারেন না? ইরানিদের হাতে তুলে দিন ওকে।

ইরানিদের হাতে? মানে? এখানে আবার ইরানি কোথায়?

আসফাকের বাবা জানাল, ইরানি এমব্যাসিতে!

ইরানি এমব্যাসি একজন টেররিস্টকে নেবে কেন? এসব কী বলছেন পাগলের মতো কথা?

আচ্ছা তাহলে বরং বর্ডারে ছেড়ে দিন। শেখ সোজা পাকিস্তানের কাশ্মীরে ঢুকে যাবে! রাজি?

ধূলত : আচ্ছা সেটা করা যেতে পারে। আমরা আলোচনা করে জানাচ্ছি। তবে ওই একজনকেই। আর কাউকে নয়।

বৃদ্ধ : স্যার..আমি বলছি মেয়েটির ক্ষতি হবে না। সে ওদের বোন। সেইমতোই ওরা তাকে দেখভাল করছে।

সেখান থেকে অনেক দূরের রজৌরির কাছে এক গ্রামে কাঠের বাড়ির দোতলায় ততক্ষণে চারজন জেকেএলএফ টেররিস্টের নার্ভ ফেল করছে। কারণ রুবাইয়া সঈদ কিছুই খাচ্ছে না। জলও না। আসফাক গেল উপরে। হাত বাঁধা রুবাইয়ার। পা বাঁধা। একটা চেয়ারে বসানো। সামনে টেবিল। সেটা উলটে পড়া। একটু আগেই লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে রুবাইয়া।

আসফাক : সিস্টার আপনি এমন কেন করছেন? খাচ্ছেন না কেন?

রুবাইয়া : আমি না খেয়ে মরে গেলে তোমাদের এই চারজন নয়, গোটা অর্গানাইজেশন ধ্বংস হয়ে যাবে। গোটা কাশ্মীর মেনে নেবে না যে একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে অত্যাচার করে তোমরা খুন করেছ। মনে রেখো তোমাদের কী হাল হয়।

আসফাক : অত্যাচার! আমরা তোমাকে টাচ করেছি? আল্লার নামে শপথ করো। রুবাইয়া : নিজেদের গ্রুপ আর মুভমেন্ট বজায় রাখতে চাইলে ছেড়ে দাও। নাহলে

কাশ্মীরের মানুষই তোমাদের জ্যান্ত মেরে ফেলবে।

আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না আসফাক। চিৎকার করে বলল, চুপ রহো বত্তমিজ লড়কি! এক সেকেন্ডমে গোলি চল যায়েগা।

রুবাইয়া ঠান্ডা চোখে আসফাককে বলল, হিম্মৎ হ্যায়! চালাও গোলি ডরপোক! একা এক মেয়েকে যারা কিডন্যাপ করে নিজেদের দলের স্বার্থে, তারা আবার সাহসী নাকি? কাশ্মীরিয়ৎ-এর লজ্জা তোমরা! কাঁপতে কাঁপতে আসফাক নীচে চলে এল। এবং টেনশন বেড়ে যাচ্ছে। সত্যি যদি কিছু না খায় আর কিছু একটা হয়ে যায়? গোটা ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে আজাদি মুভমেন্টের।

ঠিক এসবের আড়ালে রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য এক খেলা। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফারুখ আবদুল্লার সরকারকে ফেলে দিলে কেমন হয়? সরকার নাগরিকদের সিকিউরিটি দিতে ব্যর্থ। তাই অপদার্থ ফারুখ সরকারের আর দরকার নেই। এই গোপন মিশনের কথা অবশ্য ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারল না। তৈরি হল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ মন্ত্রিসভার মধ্যে। অরুণ নেহরু, আরিফ মহম্মদ খান আর ইন্দ্রকুমার গুজরাল। আর কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু দেশের বাইরে, তাই রাজ্যের মুখ্যসচিব মুসাকে বলা হল আপনি প্রতিটি আপডেট ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে ব্রিফ করবেন নিয়ম করে। অর্থাৎ নেগোসিয়েশন কেমন হচ্ছে। এই সবই চলছে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর অজান্তে। জানা গেল একজনই ব্যক্তি আছে যাকে জেকেএলএফ মান্য করে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। ডাঃ আবদুল গুরু। ঘটনাচক্রে তিনিই হামিদ শেখের চিকিসার দায়িত্বে। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের চিফ এ এস ধূলত চান্স নিলেন একটা। সকাল আটটায় তিনি চেম্বার করেন বারজালায় নিজের বাড়ি কাম ক্লিনিকে। প্রবল ঠান্ডা আর তুষারপাতে পৌঁছে গেলেন ধূলত। অসংখ্য ভিড় বাইরে। ধূলত একটা চিরকুট পাঠালেন ভিতরে। বেরিয়ে এলেন ডাঃ গুরু। কী চাই?

ধূলত : আপনি তো সবই জানেন। আপনাকে হামিদ শেখ মান্য করে। জেকেএলএফের ছেলেরাও সম্মান করে। আপনিই আমাদের সাহায্য করুন।

ডাঃ গুরু বললেন, হামিদ শেখ আমার কাছে স্রেফ এক রোগী। আর কোনো রিলেশন নেই। আর রুবাইয়া সঈদের ব্যাপার তো পুলিশের কাজ! আমি কী করব? আচ্ছা খুদা হাফেজ..অনেক পেশেন্ট ওয়েট করছে। ধূলত বুঝলেন আসাটাই বৃথা। ১১ ডিসেম্বর। দুপুরেই নাটকীয়তায় বদল। লন্ডন থেকে চলে এসেছেন ফারুখ আবদুল্লা। মুখ্যমন্ত্রী। এসেই প্রথম যে কাজ করলেন, সেটি হল চিফ সেক্রেটারিকে সরিয়ে দিলেন। মুসা রেজা অবাক। তাঁর কী অপরাধ? ফারুখ বললেন, আপনার এত সাহস! আপনি আমার ক্যাবিনেটকে কিছু না জানিয়ে সোজা দিল্লিকে রিপোর্ট করছেন? মুসা বললেন, স্যার আমি কাকে রিপোর্ট করব এখানে বলে দিন? যাঁকেই বলেছি, তিনিই বলেছেন ফারুখ সাহেবকে আসতে দাও। তিনিই যা করার করবেন। আর দিল্লির ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে আপনি তো স্যার চেনেন। পাঁচ মিনিট পরপর ফোন করে জানতে চান কী হচ্ছে! একটু কম ইনফরমেশন হলে ধমক। হ্যাঁ ফারুখ জানেন। দিল্লির ক্যাবিনেট সেক্রেটারি একটু বাড়াবাড়ি করেন। নিজেকে মন্ত্রী, প্রশাসনেরও উপরে ভাবা অভ্যাস। কাউকে রেয়াত না করা একটা প্রবণতা। ফারুখ বললেন, আজ থেকে ওনাকে এক লাইনও কিছু জানাবেন না। আমি বুঝে নিচ্ছি। ঠিক দু ঘণ্টা পর ফারুখের ঘরে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকলেন মুসা রেজা। স্যার..স্যার.. আবার ক্যাবিনেট সেক্রেটারি। কী করব? ফারুক উত্তেজিত। বললেন আমাকে লাইন ট্রান্সফার করো। তাই করলেন মুসা। এবং ফারুখ কানে ফোন নিয়ে বললেন, এই যে মিস্টার টি এন শেষন! আপনি কি জম্মু কাশ্মীরের কোনো অফিসার? আপনি স্রেফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি। ভারতের সব রাজ্যের কর্তা নয়। তাহলে আমার চিফ সেক্রেটারিকে আপনি রিপোর্ট চাইছেন কোন অধিকারে? কার অর্ডারে? পি এম বলেছেন? ক্যাবিনেট সেক্রেটারি টি এন শেষনের ওই প্রান্তে মুখচোখ ততক্ষণে লাল। এই ভাষায় কথা শোনার অভ্যাস তাঁর নেই। কিন্তু বুঝতে পারছেন একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদাধিকারে কোন পর্যায়ে। আর সত্যিই তিনি রাজ্যের কাছে জবাবদিহি, সাফাই, নিয়ম করে রিপোর্ট চাইতেও পারেন না। এসব তাঁকে করতে হচ্ছে কেন্দ্রের চাপে। তিনি পড়ে গিয়েছেন দুই যুযধান রাজনৈতিক শিবিরের ইগোর লড়াইয়ের মাঝপথে। ঠিক সন্ধ্যার পর ফারুখ নিজের সোর্সে খবর পেলেন দিল্লিতে একসঙ্গে দুটি গেমপ্ল্যান চলছে। প্রথমত কীভাবে টেররিস্টদের কত

দ্রুত মুক্তি দিয়ে রুবাইয়া সঈদকে ছাড়িয়ে আনা যায়। আর দ্বিতীয়ত ফারুখ আবদুল্লার সরকারের পতন ঘটানো। দুটি ভিন্ন টিমকে দুটি ভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি কিডন্যাপিংকে কেন্দ্র করে এরকম এক অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক খেলা ভারতের পাওয়ার করিডরে আগে হয়নি। ১২ ডিসেম্বর। দিল্লির দুই প্রতিনিধি আরিফ মহম্মদ খান আর ইন্দ্রকুমার গুজরাল এলেন আবার। এবার দেখা করবেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মিটিং শুরু হল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বোঝা গেল দিল্লির মন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছেন টেররিস্টদের শর্ত মেনে রুবাইয়াকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাইয়ে দিতে হবে। তাই ফারুখের সঙ্গে আলোচনা স্রেফ এক নাটকে পরিণত হল। ফারুখ যখন বলছেন, আপনারা জানেন এই হামিদ শেখকে কত কষ্ট করে গুলির লড়াই করে ধরা হয়েছিল? আর তাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে? ইন্দ্রকুমার গুজরালের স্ট্র্যাটেজিটা দেখা গেল অন্যরকম। যখনই ফারুখ কোনো বিরুদ্ধাচারণের কথা বলছেন, তখনই ইন্দ্রকুমার গুজরাল কানে হাত দিয়ে হিয়ারিং এইডটা চেপে ধরে বলছেন, হ্যাঁ..কী বললেন? শুনতে পেলাম না! আবার আরিফ মহম্মদ খান যে কোনো অবাঞ্ছিত কথা শুনলেই বলছেন, সেকি! তাই নাকি! আমরা তো জানতামই না এসব! কী আর করা যাবে! ফারুখ সাহেব একটা কথা বলুন, আজ আপনার নিজের মেয়ে হলে কি এত সব নিয়ম নীতির কথা বলতেন আপনি? তিনবার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ফারুখ এই অভিযোগে স্তম্ভিত। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনাদের সামনেই আমি ফোন করছি মুফতি সাহেবকে। সত্যিই করলেন। বললেন, মুফতি সাহেব আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। আমি বিনা শর্তে আপনার মেয়েকে মুক্তি পাইয়ে দেব। আমি মনে করি রুবাইয়া আমারই মেয়ে। আমার মেয়ের জন্য যা করতাম, আজ আমি তাই করব। প্রান্তে মুফতি সাহেব শুধু বললেন, ফারুখ সাহেব দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওরা বাচ্চা বাচ্চা সব মাথা গরম ছেলে। কী যে করে বসবে। আপনি আর না বলবেন না প্লিজ।

গেম ইজ ওভার! ফারুখ বুঝলেন তিনি একা। সত্যিই তো! যদি কিছু হয়েই যায় মেয়েটার। ফারুখের যুক্তি ছিল কিছুতেই মেয়েটির কোনো ক্ষতি করবে না তারা। তাহলে কাশ্মীরের মধ্যেই জেকেএলএফ একঘরে কোণঠাসা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই চারদিকে এই নিয়ে তীব্র নিন্দাও শুরু হয়েছে। জেকেএলএফ বাধা হয়ে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ইন্ডিয়ান

আর্মি যখন আমাদের মেয়েদের, মায়েদের উপর অত্যাচার করে, তখন আপনাদের এই দুঃখ কোথায় থাকে? কিন্তু ফারুখের গায়ে তকমা লাগানোর চেষ্টা হয়েছে নিজের মেয়ে নয় বলে তিনি এত দেরি করে নার্ভের লড়াই দেখাচ্ছেন। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এম এল কল হাজির হলেন। বললেন, স্যার আর উপায় নেই। পাঁচজনকে আমাদের ছেড়ে দিতেই হবে! পাঁচজন? মানে? এরা প্রথমে বলল একজন। তারপর তিনজন। এখন পাঁচজন? এটা কি ছেলেখেলা? তখনও শ্রীনগরে বসে আছেন দুই মন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খান আর ইন্দ্রকুমার গুজরাল। স্টেট গেস্ট হাউসে ফোন করে তাঁদের ফারুখ বললেন, আজ যে সিদ্ধান্ত আপনারা নিলেন, আমার আপত্তি রইল। তবু গো অ্যাহেড! শুধু একটা কথা। এটা এক নতুন ট্রেন্ড শুরু হল। কাশ্মীরে নতুন রকমের টেররিজম শুরু হবে আজ বলে দিলাম। কিডন্যাপ করলেই সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি দেওয়ানো যায়। এটা সবাই জেনে যাবে।

সাড়ে তিনটে। ১৩ ডিসেম্বর। রজৌরির কাদাল এলাকায় দুটো অ্যামবাসাড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। ঠিক চকে এসে কিছুক্ষণ থমকে রইল। দুদিকের সামনে পিছনের দরজা আচমকা খুলে গেল। পাঁচজন নেমে এল দুটি অ্যাম্বাসাডার থেকে। একজন হাঁটতে পারছে না। পায়ে ব্যান্ডেজ। অন্য দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে সে এগিয়ে গেল একটু দূরে থাকা দুটি অটো রিকশর দিকে। অ্যাম্বাসাডার দুটি চলে গেল। ঠিক এক ঘণ্টা পর ‘কাশ্মীর টাইমসের’ সাংবাদিক জাহিব মেহরাজ নিজের টেবিলে একটা ফোন পেলেন। জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের মুখপাত্র জাভেদ আহমেদ মীর ওপ্রান্তে। ‘আমাদের লোক আমরা পেয়ে গিয়েছি। থ্যাংক ইউ ভাই। ইনশাল্লা ১ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটাকে তোমরা পেয়ে যাবে।' ঠিক তাই। আসফাক হাসতে হাসতে দোতলায় গেল। ঘুমিয়ে পড়েছে রুবাইয়া। সিস্টার.. গম্ভীর কণ্ঠে ধড়ফড় করে উঠে বসেছে রুবাইয়া। এবার কি সত্যিই মেরে ফেলবে? আসফাকের মুখে হাসি কেন? আসফাক বলছে, তোমাদের সরকার সারেন্ডার করেছে। আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে। তোমাকে তাই ছেড়ে দিচ্ছি। খুশ হো না? রুবাইয়ার হাত পা ভেঙে আসছে অবসাদে। একটু পর চাপোর রোডে একটা অটো থেকে নামলেন রুবাইয়া সঈদ। সেরকমই বলা ছিল। আগে থেকেই গোটা কাশ্মীর পুলিশ প্রশাসন অপেক্ষা করছিল। স্বস্তির

নিঃশ্বাস। শুধু তখন রজৌরিতে অকাল দেওয়ালি চলছে। ঘনঘন বাজির শব্দ। আতসবাজি ছোড়া হচ্ছে। কারণ একটা পরীক্ষা সফল হয়েছে। দাবি আদায়ের নতুন অস্ত্র কিডন্যাপিং। সেটাই ছিল শুরু। ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর। যে কোনো সন্ত্রাসবাদীকে ছাড়ানোর দরকার? কাউকে না কাউকে বন্দি করে নাও। এভাবেই ১৯৯৫ সালে ৬ জন বিদেশিকে হিমালয়ের ট্রেকিং করার সময় কিডন্যাপ করে নেওয়া হয়। করেছিল আল ফারহান গ্রুপ। তাদের টার্গেট ছিল মাসুদ আজহারকে মুক্ত করা। সেবার কিন্তু মাসুদকে ছাড়া হয়নি। ইচ্ছে করে টালবাহানা করেছিল সরকার। ফলে সবার আগে নরওয়ের বাসিন্দা হানস ক্রিস্টান অস্ট্রোর মুন্ডু কাটা হয়েছিল। বুকে বুলেট দিয়ে লেখা হয়েছিল আল ফারহান। আর খুঁজে পাওয়া যায়নি বিদেশিদের। স্রেফ ভ্যানিশ করে দেওয়া হয়েছিল।

কাশ্মীরের পণবন্দি করার প্রবণতার সেরা সাফল্য তখনও আসতে চার বছর বাকি। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর কাঠমান্ডু থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আই সি ৮১৪ বিকেল পাঁচটার সময় টেক অফ করল। ১০ মিনিট। তখনও সিট বেল্টের সবুজ সংকেত বহাল। কিন্তু আচমকা মাস্ক পরা দুই যাত্রী উঠে দাঁড়ায়। “না না..উঠবেন না...এখনও সিট বেল্ট সাইন ইজ অন স্যার...।” বলেছিলেন, এয়ার হোস্টেস কল্পনা মজুমদার। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দুটি জার্মান কোল্ট রিভলবার হাতে দুই যাত্রী বলেছিল ককপিটে চলুন। ক্যাপ্টেন দেবী সারণ ছিলেন পাইলটের সিটে। তাঁকে বলা হল ক্যাপ্টেন, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে জানিয়ে দিন প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে। আমরা ওয়েস্টে যাব। ঘাড় ঘুরিয়ে ঠান্ডা মাথার ক্যাপ্টেন দেবী সারণ বলেছিলেন, কোথায় যাব? হাইজ্যাকাররা বলেছিল, সেটা আমরা বলে দেব। আপনাকে যা বলা হচ্ছে করুন!

ক্যাপ্টেন সারণ পালটা বলেন, তোমরা বললে তো হবে না। ফুয়েল নেই। রিফুয়েল করতে হবে..। না হলে কিন্তু প্লেন ক্র্যাশ করবে...এবার কিছুটা ভয় পেল হাইজ্যাকাররা। কিন্তু সেই ভয় সাময়িক। কারণ তাদের টাগেট হয়েছিল সফল। কাঠমাণ্ডু...অমৃতসর..... লাহোর...কান্দাহার..। সেবার ছিল সেরা সাফল্য। কারণ মাসুদ আজহারকে সঙ্গে করে এনডিএ সরকারের বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিং কান্দাহারে স্পেশাল এয়ারক্রাফটে নিয়ে গিয়ে

পৌঁছে দিয়েছিলেন তালিবানদের হাতে। সে কাহিনি তো সকলের জানা...। মাসুদকে ছেড়ে দেওয়ার জের আজও ভুগতে হচ্ছে ভারতকে। পাঞ্জাবে পাঠানকোটের মতো দুর্ভেদ্য এয়ারফোর্স বেস স্টেশনে চারজন সুইসাইডাল স্কোয়াডের জঙ্গিকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল মাসুদ। কীভাবে ঢুকে পড়ল। কোড ছাড়া তো গেট ক্রস করা যাবে না! তাহলে কি এয়ারফোর্সের মধ্যে আইএসআই চর ঢুকে গিয়েছে ভারতে? এসব প্রশ্নের জবাব কোথায়?

লেখকের "গুপ্তচর : ভারত-পাকিস্তান" গ্রন্থে ওই হাইজ্যাকিং কাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

৭

ওয়ান্টেড, ওয়ার্দার্ত, সাহস। পরপর তিনটি সিনেমার হিরোর চরিত্রটি হল গান মাস্টার জি নাইন। এক স্পাই এজেন্ট। আজকাল যাকে বলা হয় সিক্যুয়েল। প্রথম দুটি সিনেমার পর অবশেষে এসেছে এই সিরিজের সর্বশেষ সিনেমাটি। সাহস। আশির দশকের প্রথম ভাগ। মুম্বইয়ের তিলক নগরের শংকর সিনেমায় স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিনেই হাউসফুল। না হয়ে উপায় নেই। এই সিনেমাগুলির হিরোর ভূমিকায় যে যুবক অভিনয় করেন, তাঁর সঙ্গে তরুণ ও যুবকরা অনেকটাই নিজেদের মিল খুঁজে নেয়। তাই প্রবল ভিড় হয় এই নতুন নায়কের ছবি রিলিজ করলেই। ছেলেটি দুর্দান্ত ডান্স করতে পারে। দারুণ শারীরিক কাঠামো। ফর্সা নয়। কিন্তু বেশ লম্বা। সোজা কথায় সেই আদি অকৃত্রিম সুদর্শন পুরুষের সংজ্ঞা টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম। মুখে একটা চাপা সারল্য আছে। আশির দশকে ওই নায়কের নতুন নাম হয়েছে পুওর ম্যানস অমিতাভ। অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চনের ক্যারিশমা আর স্টারডম যে উচ্চতায় গিয়েছে, তার ধারেকাছে না গেলেও একটি নতুন উঠে আসা প্রজন্ম, নিম্নবিত্ত কিশোর, শহর ও ছোট জনপদের উঠতি যুবকবৃন্দ এই হিরোকে নিজেদের সঙ্গে রিলেট করে। বহুদিন পর হিন্দি সিনেমা জগতে কোনো বাঙালি নায়কের উত্থান হচ্ছে। এই হিরোর নাম মিঠুন চক্রবর্তী। সকাল সকালই টিকিট শেষ কেন? কারণ কাউন্টার খোলার আগেই একগুচ্ছ টিকিট দিয়ে দিতে হয় নানাকে। রাজেন্দ্র নিকলজে নামের এক ২৫ বছরের যুবক। নানা তার ডাক নাম। বাইকুল্লা, চেম্বুর, লালবাগ এসব এলাকায় ঘুরে ঘুরে দাদাগিরি করে। আর প্রধান আয় হল ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি। চার পাঁচজনের একটি টিম আছে তার। শুক্রবার, শনিবার আর রবিবার আসল মুনাফার দিন। বাকি দিনগুলিতে সিনেমা দেখতে সচরাচর ফ্যামিলি আসে না। তাই একসঙ্গে অনেক টিকিট ব্ল্যাকে কেনার লোক কমে যায়। এমনিতে শুক্রবার সিনেমা রিলিজের দিনই টিকিট কাটা নিয়ে বিরাট ঝামেলা হয়েছে। মারামারি, সংঘর্ষ। তাই শনি আর রবিবার যে মারাত্মক ভিড় বাড়বে তা জানা কথা। সেই কারণে পুলিশ পোস্টিং করা হয়েছে। একঝাঁক মিঠুন ফ্যান এসে হাজির সিনেমা দেখতে। তারা ইভনিং শো দেখবে। আর কাউন্টারে টিকিট না পেয়ে যথারীতি

ব্ল্যাকেই কাটার ইচ্ছে। কিন্তু এত বেশি দাম বাড়িয়ে রাখা হয়েছে যে তারা দরাদরি শুরু করেছে। নানা এক পয়সাও কমাতে রাজি নয়। কারণ কী? কারণ অন্য মিঠুন ফ্যানের থেকে সে নিজে কয়েকশো গুণ বড় মিঠুন ফ্যান। তার জীবনের প্রধান টার্গেট হল একদিন মিঠুন দাদার পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তোলা। নানার চুলের স্টাইল, জামাকাপড়। পড়ার ধরন, সবই মিঠুন চক্রবর্তীর মতো। সে কথা বলার চেষ্টাও করে ওরকম মিঠুন কণ্ঠে। তাই মিঠুনের সিনেমার টিকিটের দাম ব্ল্যাকে কমানোর মানে হল মিঠুনদার বাজার ভালো নয়। এটা নানা মানবে কেন? কিন্তু সেই যুবকের দলও ছাড়বে না। তারা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। তাদের এই প্রতিবাদ দেখে সাধারণ পাবলিক, যারা এতক্ষণ কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি এই ব্ল্যাকারদের বিরুদ্ধে, তাঁরাও এগিয়ে এসে হট্টগোল শুরু করেছে। পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল উপস্থিত। তাঁরা গোলমাল থামাতে হাজির। কিছুক্ষণ পরই পাবলিকের মুড বুঝে পুলিশ বেধড়ক লাঠি চার্জ শুরু করল। বিশেষ করে ব্ল্যাকারদের ধরে ধরে পেটানো শুরু। সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকার ছেলেগুলো এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগল। পুলিশের সামনে আর কী করা যাবে? কিন্তু একজন পালাচ্ছে না। নানা। রাজেন্দ্র নিকলজের মাথা গরম হয়ে গেল। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে একজন কনস্টেবলের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে সেই কনস্টেবলকেই পেটাতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে গোটা চিত্রটি বদলে গেল। মানুষ পালাতে লাগল আতঙ্কে। কারণ একজন পাড়ার গুন্ডা, টিকিট ব্ল্যাকার পুলিশকে মাটিতে ফেলে পেটাচ্ছে এই দৃশ্য মারাত্মক। হতবাক বাকি কনস্টেবলরা প্রচণ্ড রেগে লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসার আগেই মিঠুন চক্রবর্তীর স্টাইলে নানা জাম্প খেয়ে একটু পিছনে গেল। আর পরক্ষণেই আবার একটা ভল্ট দিয়ে একেবারে সামনে এসেই আরও এক পুলিশের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁকে পিছন থেকে মারল পায়ে। এবং একা নানা পাঁচ পুলিশকে পিটিয়ে পালাচ্ছে।

পালাবে আর কোথায়? পরদিনই ধরা পড়ল। পুলিশ নানা আর তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। প্রোডিউস করা হল কোর্টে। কয়েকমাসের জেল। নানা জেলে গেল বটে। কিন্তু তার নাম ছড়িয়ে পড়ল বম্বে আন্ডারওয়ার্ল্ডে। আশির দশকের শুরুর সেই দিনগুলিতে তখন এই এলাকাগুলির ডন ছিল রাজন নায়ার নামে এক দক্ষিণ ভারতীয়। তার শাগরেদ

রমা নায়েক। এক দুর্ধর্ষ শাপশুটার। সবাই আলোচনা করছে কে এই নানা ছেলেটি? এর তো মারাত্মক সাহস! পুলিশকে পেটাল? এরকম সাহস আগে কেউ দেখায়নি। এমনকী হাজি সাহেবের ছেলেরাও না (হাজি মস্তান)। ছোট বড় সব মাস্তান দলই চাইছে জেল থেকে বেরোলেই নানাকে দলে টানতে হবে। কিন্তু জেলেই নানার কাছে খবর পাঠানো হল মেয়াদ খাটার পরই একবার আন্নার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আন্না হল রাজন নায়ারের কোড নেম। রাজেন্দ্র নিকলজে বুঝে গেল তার দিন আসছে। জেল থেকে বেরিয়ে সে গেল আন্নার সঙ্গে দেখা করতে। আন্না প্রথমেই বলেছিল, ও দিন আচ্ছা কাম কিয়া থা..হামারে সাথ কাম করোগে? রাজি রাজেন্দ্র। হেক্সট নামের ওষুধ কোম্পানির এক সামান্য কর্মীর ছেলে ক্লাস ফাইভ পাশ করার পর আর পড়াশোনা না করা রাজেন্দ্র নিকলজের সামনে একটি সিঁড়ি খুলে গেল পুলিশ পিটিয়ে।

নানা হয়ে উঠল রাজন নায়ারের বিশ্বস্ত এক সৈন্য। বুধবার। সেদিন কোনো কাজ নেই। ডায়মন্ড ক্রিকেট ক্লাবের সামনের মাঠে আন্ডার আর্ম ম্যাচ হচ্ছে। নানার টিম বনাম গুঙ্গার টিম। গুঙ্গা হল জগদীশ শর্মা। এই দুজন আপাতত ব্যবসা চালাচ্ছে রাজন নায়ারের। আচমকা একটি বাচ্চা ছেলে ছুটে এল মাঠে। ছেলেটি চা বানিয়ে এই লোকাল ক্লাবগুলিতে বিক্রি করে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আন্না কো গোলি মার দিয়া কিসিনে..। ব্যাট ফেলে দৌড়চ্ছে রাজেন্দ্র নিকলজে। দৌড়চ্ছে জগদীশ। জানা গেল এসপ্ল্যানেড কোর্টে যাওয়ার সময় আন্নাকে এক রিকশচালক এসে মেরেছে। কার সুপারি ছিল? আবদুল কুঞ্জুর। যে রাজন নায়ারের দীর্ঘকালের শত্রু। কারণ ঘাটকোপার থেকে পন্থনগর, চেম্বুর থেকে তিলকনগরের দোকান আর বেআইনি বিজনেসের কোনো কমিশন সে পায় না। দখলে রেখেছে আন্না। অতএব পথের কাঁটাকে সরাও। রাজন নায়ারকে তার অনুগামীরা আন্না বলে ডাকলেও বম্বে মাফিয়া জগৎ তার সম্পর্কে সম্বোধন করে বড়া রাজন। এই মাফিয়া জগতে সবথেকে সিনিয়র ছিল সে। রাজন নায়ারের গ্যাং-এর হেড কে হবে? শূন্যস্থান পূরণ করবে কেন? সমস্ত গ্যাং মেম্বারদের দাবি রাজেন্দ্র নিকলজে হোক। গুঙ্গাও বলল, তুমিই গ্যাং চালাও। আমি টিম মেম্বার বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমাদের একেবারে নতুন এক টিম হবে। রাজেন্দ্র নিকলজে গ্যাং এর দায়িত্ব নিল। এবং নানার পাশাপাশি তার

একটি নতুন পরিচয় হল। বড়া রাজনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তাকে দেওয়া হল নতুন পরিচয়। ছোটা রাজন!

দায়িত্ব নিলেই তো হল না। গুরু হত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারলে মাফিয়া জগতে সম্মান থাকে নাকি! অতএব ছোটা রাজনের প্রধান টার্গেট হয়ে দাঁড়াল যেভাবেই হোক আবদুল কুঞ্জুকে খুন করতে হবে। শুরু হল এক অবিস্মরণীয় চেজিং! আবদুল কুঞ্জু যেখানেই যাচ্ছে, রাজন, ঠিক খবর পাচ্ছে। কুঞ্জুকে কিন্তু আক্রমণ করছে না রাজন। সে শুধু দেখে যাচ্ছে কুঞ্জুর লুকানোর জায়গা কোথায় কোথায় আছে। এক মাস, দু মাস, ছয় মাস...কুঞ্জু পালাচ্ছে.. রাজন, ঠিক খুঁজে বের করছে। এ যেন একপ্রকার সাইকোলজিক্যাল চাপ। কুঞ্জু ভেঙে পড়ছে। আর পালানোর জায়গা নেই। বম্বের বাইরের জগৎ সে বেশি চেনে না। এরপর আর কোথায় পালাবে? ১৯৮৩ ;:ালের অক্টোবর মাসে কুঞ্জু নিজের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে সোজা একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হল ক্র্যাফোর্ড মার্কেটের সামনে। বম্বে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসে সোজা ঢুকে সে বলল, স্যার আমি আবদুল কুঞ্জু.রাজন নায়ারকে মার্ডার করেছে আমার লোক। সারেন্ডার করছি! চমকে গেল পুলিশ বাহিনী? মোটেই না। তাদের ইনফর্মার আগেই খবর দিয়েছে যে ছোটা রাজন পাগলের মতো ফলো করছে কুঞ্জুকে। আজ নয় কাল অ্যাটাক করবে। আর তা না হলে কুঞ্জু সারেন্ডার করবে। তাই হয়েছে। কুঞ্জু নিশ্চিন্ত। জেলে সে নিরাপদ। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। কিন্তু ভুল। আসলে নিরাপদ নয়। একজন সাধারণ পাড়ার গুন্ডা হিসাবে ছোটা রাজন আগেই দেখিয়ে দিয়েছে সে কতটা ডেয়ারিং আচরণের। ভয় আর আশঙ্কা বস্তুটা তার মধ্যে নেই। ১৯৮৪ সালের ২২ জানুয়ারি পুলিশ কুঞ্জুকে ভিকরোলি কোর্টে নিয়ে যাবে। চতুর কুঞ্জু জানে এই সুযোগটি নিতে পারে রাজন। তাই সে আগেভাগেই পুলিশ কনস্টেবলদের টাকা দিয়ে বলল পুলিশ ভ্যানে না। আমি আমার গাড়িতে যাব কোর্টে। তোমরা পুলিশের গাড়িতে পিছনে বা সামনে আসবে। কথা দিলাম আমি পালাব না। তোমরাও জানো পালালে রাজন আমাকে মারবেই। সেই মতোই নিজের অ্যামবাসাডার গাড়িতে চেপে কোর্টে গিয়ে আবার সেই গাড়িতে ফিরছে কুঞ্জু। চেম্বুর সিগন্যাল। সামনে পুলিশ ভ্যান। পিছনে কালো কাচে ঢাকা কুঞ্জুর গাড়ি। সিগন্যালে গাড়ি আটকে।

আচমকা চারজন যুবক অ্যাম্বাসাডারের জানালার সামনে। ভয়ার্ত কুঞ্জু কাঁপতে কাঁপতে দেখল উইন্ডস্ক্রিনের সামনেই দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, ছোটা রাজন। মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ। সামনে দাঁড়ানো পুলিশ ভ্যান থেকে দ্রুত নেমে পুলিশকর্মীরা দেখলেন বেঁচে আছে কুঞ্জু। কাঁধে লেগেছে গুলি। ছোটা রাজন ততক্ষণে গ্যাং নিয়ে উধাও। এরপর কিছুদিন হঠাৎ সব চুপচাপ। জেলে কুঞ্জু। সে খবর পাচ্ছে আর কোনো খোঁজখবরই করছে না রাজন। তার মানে কি হাল ছেড়ে দিল? হয়তো তাই। ঠিক চারমাস পর। কাঁধে এখনও গুলির জখম আছে কুঞ্জুর। একবার করে ড্রেসিং আর চেক আপ করাতে হয়। জে জে হাসপাতালের আউটডোর ক্লিনিকে যেতে হবে। চারজন পুলিশ কুঞ্জুকে নিয়ে জে জে হাসপাতালে পৌঁছল। পুলিশ কেস। তাই বেশি দেরি হবে না। আরও দুজন পেশেন্ট সামনে। কুঞ্জু বসল বেঞ্চে। দুজন পুলিশ ভিতরে গেল। কুঞ্জু পকেট থেকে যখন সিগারেট বের করছে ঠিক তখনই পাশের পেশেন্ট বলল, ভাই একটা সিগারেট হবে? কুঞ্জু হেসে আবার পকেটে হাত ঢোকাল। এই পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে আবার হাত ভাঙা, হাতে পুরোটাই প্লাস্টার। সিগারেট এক হাতে ধরাবে কীভাবে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিগারেট দিয়ে তাকিয়ে রইল কুঞ্জু। আর তখন বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে পেল পেশেন্ট উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাতে বাঁধা প্লাস্টার হঠাৎ এক টানে খুলে ফেলেই পিছনের পকেট থেকে বের করে আনা হল রিভলভার। কুঞ্জু এক সেকেন্ডে বুঝতে পারল কী হতে যাচ্ছে। পরপর গুলি মারল সেই পেশেন্ট সেজে আসা যুবক। কিন্তু তড়িৎ গতিতে কুঞ্জু ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে ভিতরের অ্যান্টি চেম্বারে চলে যেতে পারল। তবে আবার গুলি লেগেছে হাতে। একাধিক। কিন্তু আশ্চর্য কুঞ্জুর জান! এবারও বেঁচে গেল। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গেল ছোটা রাজন হাল মোটেই ছাড়েনি। কুঞ্জুকে হয়তো হত্যা করা সম্ভব হল না। কিন্তু জে জে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে এরকম একটি আক্রমণের প্ল্যান করা রাজনের নাম বম্বের মাফিয়া জগতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আগামীদিনে এই ছেলেটি যে এই শহরের বিধাতা হতে যাচ্ছে, এরকম একটি ধারণা দ্রুত ছড়াচ্ছে। সকলেই চাইছে এই ছেলেটি নিজের গ্যাং নিয়ে তাদের হয়ে কাজ করুক।

সান্তাক্রুজ ওয়েস্টের থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটি সোজা খার পুলিশ স্টেশনের দিকে যায়, সেখানে থাকা একটি কাপড়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে ছোটা রাজনের বন্ধুত্ব

অনেকদিনের। আগস্ট মাসের প্রবল বৃষ্টিতে রাজন সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। বম্বেতে ছড়িয়ে থাকা কাপড়ের মিলগুলির নিজস্ব জমি তখন একটু একটু করে বিক্রি হচ্ছে। অনেক এলাকা নিয়ে জমি। কিন্তু মিলের ব্যবসা তেমন আগের মতো নেই। শোনা যাচ্ছে কয়েকজন মিলমালিক জমি বিক্রি করবে। এসব প্রাইম লোকেশনে জমি মানে সোনার থেকে দামি। সেই খোঁজখবর তাবৎ মাফিয়া ডনই রাখছে। ক্রাইমের সাফল্যে ছোট হলেও রাজনও আগ্রহী। তাই এই বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিটিং করতে যাচ্ছে সে। মিটিং শেষ। তখন বৃষ্টি ধরেছে। রাজন আর তার দুই শাগরেদ বেরিয়ে কুলফির দোকানে দাঁড়িয়ে কুলফির অর্ডার দিল। হঠাৎ একটি মোটরবাইক । ইয়াজদি মডেল। দুটি যুবক নেমে এল। স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে রাজন সতর্ক। সঙ্গের দুই যুবকেরও শ্যেন দৃষ্টি। এবং সেই নবাগত দুই যুবক সোজা রাজনের সামনে। নানা? রাজন মাথা নেড়ে বলল তুম কৌন? আজ রাত আট বাজে কোই ফোন আয়েগা আপকে পাস। কৌনসি নম্বরপে লাগানা হ্যায়? রাজন বলল, কেন? কার ফোন? ছেলেদুটি হাসল। বলল, তখনই জানতে পারবে নানা। চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। বিজনেস ডিল। নানা নম্বর দিল একটি। তখন তো আর যত্রতত্র ফোন আর মোবাইল নেই। তাই এই বিশেষ নম্বরটি একটি আস্তানার। ডায়মন্ড ক্রিকেট ক্লাবের অফিসরুমের। চলে গেল ছেলেদুটি। রাজন চিন্তায়। কীসের ফোন? কোনো নতুন সুপারি? কোন গ্যাং এটা? রাত আটটায় ডায়মন্ড ক্রিকেট ক্লাবে।

ফোনটি এল। রাজন জানতে চাইল কে বলছেন? অন্যপ্রান্ত থেকে একটি গম্ভীর গলা। ইব্রাহিম ভাই বলছি...কেমন আছো নানা? রাজন তখনও বুঝতে পারছে না কে ইব্রাহিম ভাই। সে আবার জানতে চাইছে ইব্রাহিম ভাই? মতলব..। হাসির শব্দ। দাউদ ভাই..। রাজনের শিরদাঁড়া থেকে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সে তখনই ভাবতে শুরু করছে কী এমন কাজ করেছে যা দাউদ ভাইকে খেপিয়ে দিয়েছে! তা না হলে দাউদ নিজেই ফোন করবে কেন? দাউদ ইব্রাহিম কে? আশির দশকের সেই প্রথমভাগে ক্রমেই কণ্টকহীন হয়ে ওঠা এক নতুন সম্রাট। দাঙ্গার কারণে বম্বের পুলিশ কমিশনার ঠিক করলেন নটোরিয়াস ক্রিমিনাল আর তাদের বসদের আগে গ্রেপ্তার করা হোক। সেইমতো ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (নাসা) অনুযায়ী সবার আগে জুহুর বাংলো থেকে গ্রেপ্তার করা হল হাজি মস্তানকে।

গ্র্যান্ট রোডের তাহির মঞ্জিলে লুকিয়ে থাকা করিম লালাকে গ্রেপ্তার করা হল। মাসের পর মাস থানে জেল থেকে ইয়েরাডা জেল তাদের ঘোরানো হল। আর মাঝের এই সময়টায় স্মাগলিং এর গোটা ব্যবসা সরাসরি আয়ত্তে চলে এল ঝড়ের গতিতে মাফিয়া রাজ্যে উঠে আসা এক যুবকের কাছে। করিম লালা আর হাজি মাস্তান স্মাগলিং করত এজেন্ট মারফত। এই নতুন যুবক সরাসরি আরব আর আফগানিস্তানের কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে কীভাবে যেন যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গেই আদানপ্রদান শুরু করে দিয়ে অনেক বেশি মুনাফা করে। কারণ মাঝপথে কোনো এজেন্ট রাখেনি সে। এভাবে বম্বে আন্ডারওয়ার্ল্ডের দুই সেরা ডন ক্রমেই জেলে গিয়ে শক্তিহীন হয়ে যাওয়ায় বম্বে তখন খোলা মাঠ। অতএব একজনের নামই স্পেশাল ব্রাঞ্চের খাতায় সবথেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দিনের পর দিন। ইব্রাহিম কাসকর। ডাক নাম দাউদ। যাকে পাকোমোড়িগ স্ট্রিটের যুবকেরা সম্বোধন করে একটি অদ্ভুত নামে। সেই নাম পরবর্তীকালে বম্বে মাফিয়া জগতের কাছে একটি ব্র্যান্ডনেমে পরিণত হবে। নামটি হল—ভাই!

এহেন দাউদ নিজেই ফোন করে রাজনকে বলল, আমার সঙ্গে কাজ করবে? রাজন আপ্লুত মনে মনে। এরকম একটা অফারের জন্য সে কবে থেকে অপেক্ষা করছে। দাউদ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়া মানে বম্বে হাতের মুঠোয়। কারণ দাউদ ভাই সব ডনের তুলনায় সবথেকে বেশি শার্প আর সাহসী। রাজন সাহস পছন্দ করে। কিন্তু বাধা এল ঘর থেকেই। রাজন নায়ারের দলের পুরানো সদস্য এবং গুঙ্গার দল বলল, আমরা কেন অন্যের গ্যাং এর চাকরবাকর হতে যাব? আমরা ছোট গ্যাং ঠিক আছে। কিন্তু অন্তত নিজেদের মর্জির মালিক। দাউদের মতো গ্যাং-এ ঢুকলে আমাদের নিজেদের কোনো সম্মান থাকবে না। দাউদের ঘরে থাকা বাকি সব সদস্যদের মধ্যে বরং আমাদের হাল হবে নতুন আসা ছোকরা লোগ । আমাদের নিজেদের কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। আমরা যেমন আছি তেমন থেকেই বরং নিজেদের কাজের এরিয়া বাড়ানো দরকার। তাহলে আমরা তোমার লিডারশিপে অনেক কিছু পাব। রাজন এরকম বিপাকে পড়েনি। কারণ একদিকে দাউদের গ্রুপে কাজ করার সুযোগ। আবার অন্যদিকে নিজের গ্রুপের এতদিনের বন্ধুদের চাপ। সবথেকে বড় সমস্যা হল, দাউদকে আবার না বলা যায় নাকি? একবার না বলা হলে

দাউদের বিষনজরে পড়তে হবে। সেই ঝুঁকি নিয়ে কি সম্ভব বম্বেতে কাজ করা? এই দোলাচলে সময় নিল রাজন। এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে নিজের টিম মেম্বারদের বুঝিয়ে অবশেষে স্থির হল রাজনের টিম যোগ দেবে দাউদের দলে। তবে পাশাপাশি নিজের টিমটির অস্তিত্বও থাকবে তার। এই মধ্যপন্থাতেও দাউদ রাজি। কারণ সে জানে একবার রাজন গ্রুপে এলে তার দক্ষিণ বম্বে নিয়ে আর ভাবতে হবে না। ছোটা রাজন আর দাউদ ইব্রাহিমের মধ্যে দোস্তি হল। যা সবথেকে বেশি চিন্তায় ফেলল, বম্বে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চকে। শুরু হল এক নতুন অপরাধের অধ্যায় বম্বের মাফিয়া সাম্রাজ্যে।

দাউদের গ্রুপে সবার আগে ছোটা রাজন কী করল? নিজের মেন্টর রাজন নায়ারের খুনি কুঞ্জুকে ছেড়ে দিল রাজন? তাহলে তো কুঞ্জুর জয় হল! ১৯৮৬ সালে দাউদ ইব্রাহিম আর বম্বেতে থাকতে পারল না। তার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মাফিয়া হওয়া। আরব দেশ, আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের ড্রাগ লর্ড ও মাফিয়াদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রক্ষা করতে দরকার দুবাই যাওয়া। আর বম্বে পুলিশ জাল গোটাচ্ছে এরকম খবরও পাওয়া যাচ্ছে। অতএব দাউদ পালালো দেশ ছেড়ে। যাওয়ার কারণ বম্বে থাকছে সুরক্ষিত এক বিশ্বস্ত হাতে। ছোটা রাজন। অবশেষে একক ভাবে বম্বে শহরের রাজত্বের ভার এল রাজনের হাতে। সবার প্রথম কাজটি কী? চেম্বুর গ্রাউন্ডে জানুয়ারির সকালে ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে। সাধারণ ক্যাম্বিস বলের নয়। রীতিমতো ক্রিকেট প্যাড, ব্যাট, কোকাবুরা বল নিয়ে। সাদা পোশাক দুই প্রতিপক্ষ দলের। লাঞ্চের পর খেলা জমে উঠেছে । তবে প্রথমে লক্ষ্য করা যায়নি যে কিছু নতুন প্লেয়ার হিসাবে উঠে এসেছে মাঠে। এরা কারা? ফার্স্ট স্লিপে দাঁড়িয়ে আছে আবদুল কুঞ্জু । বাউন্ডারি লাইনে একবার বল গেল। একটি ছেলে বলটি তুলে সেখান থেকে চিৎকার করে উঠল বল ছুড়ে, কুঞ্জু ভাইয়া ইয়ে কছু বাহার কে লেড়কে কাহাসে আ টপকা? কুঞ্জু ক্যাচটি নিল। বাইরের ছেলে মাঠে ঢুকেছে? সাদা পোশাক পরা ফিল্ডার সেজে? কারা? এরা কেউ তার টিমের নয়। তাহলে? বেশি ভাবার সময় দেওয়া হল না তাকে। পিচের ডান ও বাঁদিকে ফিল্ড করা তিনটি ছেলে আচমকা ছুটে এল স্লিপে। পকেট থেকে দুটি রিভলবার আর ছুরি বের করে প্রথমে পায়ে গুলি, তারপর পেটে উপর্যুপরি গুলি চালাতে শুরু করল। গুলি যখন আছেই, তখন আবার ছুরির দরকার

কেন? কারণ কুঞ্জু এর আগে একের পর এক অ্যাটাকে গুলিতে বেঁচে গিয়েছে। অতএব এবার কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি ছোটা রাজন। নিজে শার্প শুটারদের বলে দিয়েছে সঙ্গে ছুরিও নিতে। টার্গেট এবার যেন মিস না হয়। হয়ওনি। কুঞ্জু স্পট ডেড। রাজন এতদিন পর প্রতিশোধ নিতে পেরে আরও বেশি করে ভীতির সঞ্চার করে দিল প্রতিপক্ষ গ্যাংদের কাছে। কারণ এতদিন বম্বে সাম্রাজ্যের একটি অলিখিত নিয়ম ছিল। করিম লালা, হাজি মাস্তান, আমিরজাদা, আওরঙ্গজেব, রমা নায়েক, অরুণ গাউলি, মনোহর ওরফে মানিয়া সুরভে সকলের নিজেদের এলাকা ছিল। যা কিছু গ্যাং ওয়ার হয়েছে সবই এই এলাকা দখল নিয়ে। কিন্তু তাও কারও মনোপলি ছিল না। ছোটা রাজন নামক এক ডেয়ার ডেভিল চরিত্র এসে সেই নিয়মটি কি ভেঙে দিতে চায়? গোপন মিটিং ডাকল তার পালটা মাফিয়া জগৎ। ঠিক তখনই ১৯৮৭ সালেই দাউদ ঠিক করল রাজনকে তার দুবাইতে দরকার। অতএব বম্বের মায়া কাটাতে হল রাজনকে। দাউদ ফোন করে বলল, চলে এসো। রাজন বলল, ভাই, এখানকার বিজনেস কী হবে? দাউদ জবাব দিয়েছিল, তোমার লোককে দায়িত্ব দাও...তোমাকে এখানে দরকার..আ যাও তুম..। রাজন চলে গেল বম্বে ছেড়ে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দাউদের ডি কোম্পানিতে সবথেকে বেশি গ্যাং মেম্বার হয়ে গেল রাজনের রিক্রুট। কারা তারা? বম্বে পুলিশকে নাজেহাল করে দেওয়া সব নাম। সাধু শেট্টি, মোহন কৈতান, গুরু শাতম, রোহিত ভার্মা, ভরত নেপালি, ও পি সিং এবং ঠান্ডা মাথার মামা। রাজন হয়ে উঠল দাউদের বিজনেস মডেলের প্রধান ম্যানেজার। বম্বের সরকারি সংস্থা সিডকো রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা, সেতু, বিল্ডিং বানানোর টেন্ডার বের করত নিয়ম করে। রাজনের মেম্বাররা সিডকো অফিসারদের ভয় দেখিয়ে আর টাকা দিয়ে প্রথমেই জানিয়ে দিত আমাদের কন্ট্রাক্টর যেন কাজটা পায়। সেরকমই দেওয়া হত। কন্ট্রাক্টের ৩ শতাংশ রাজনের ফান্ডে যায়। প্রতিটি হোটেল আর বার মালিক মাসে ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা করে দিত রাজনের ফান্ডে। এভাবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একা রাজনের অবদান ডি কোম্পানিতে ২৭৬ কোটি টাকা। ভাই আনিস ইব্রাহিম নয় রাজনই দাউদ কোম্পানির সেকেন্ড ম্যান। সুতরাং গ্রুপের মধ্যেই শুরু হল শত্রুতা। কারণ তিন স্ট্রংম্যান কিছুতেই সহ্য করতে পারে না রাজনের এই রমরমা। দাউদ ভাই রাজনের কথায়

যেন ওঠেন বসেন। আর কাউকে কোনো গুরুত্ব দেওয়াই যেন হয় না। এভাবে চলে নাকি? তাই প্ল্যান করা হল রাজনকে ভাইয়ের থেকে সরাতে হবে। একদিন সন্ধ্যায় দাউদ যখন সান্ধ্য ড্রিংক নিয়ে বসেছে তার কাছে গেল, দুই অনুগামী। শারদ শেট্টি আর সুনীল সাওয়ান্ত। শারদের কথার মূল্য দাউদের কাছে বেশি। শারদ শেট্টি সরাসরি বলল, ভাই, রাজন নিজেকে কোম্পানির এক নম্বর ভাবছে?

দাউদ : এসব গল্প তোমায় কে বলছে শারদ ভাই? বিশ্বাস কোরো না। এরকম নয় নানা। শারদ বলল, ভাই নানার ছেলেরা আজকাল বলে আমরা দাউদকে চিনি না। আমরা নানার লোক। এই বলে টাকা তুলছে। এর মধ্যে ১২২টা বেনামি প্রপার্টি রাজনের নামে তুমি জানো? আসল বোমাটি ফেলল সুনীল সাওয়ান্ত। যেটি দাউদের অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা। সাওয়ান্ত বলল, এখনও ইব্রাহিম ভাইয়ের মার্ডারের বদলা হচ্ছে না কেন? আপনি তো রাজনকে সেই কবে বলেছেন! কিছুই তো করছে না! কেন? আজও গাউলি ওপেন ঘুরছে। বিজনেস করছে।

খটকা লাগল দাউদের। সত্যিই তো! তার বোন হাসিনা পার্কারের স্বামী ইব্রাহিম পার্কারকে অরুণ গাউলির টিম খুন করেছে। নিছক ভগ্নিপতি নয়। ইব্রাহিম ছিল দক্ষিণ বম্বের প্রধান শক্তি। তাকে খুন করার পর রাজন বলেছিল, বদলা নেবে। কেন নেওয়া হচ্ছে না? তাহলে কি এরা যা বলছে তাই ঠিক? রাজনের মনে আসলে তাকে সরিয়ে কোম্পানির এক নম্বর হওয়ার স্বপ্ন? দাউদ পরদিন সেই রাতেই ফোন করল রাজনকে।

রাজন : হ্যাঁ ভাই!

দাউদ : সকালে একবার এসো! কথা আছে! ভাইয়ের গলা ঠান্ডা। এসব গলা শুনলে ভয় লাগে। কী হয়েছে হঠাৎ? কেন কী হয়েছে ভাই? দাউদ সত্যিই আরও শীতল কণ্ঠে বলল, কাল সকালে এসে যেও কিন্তু...।

কী হল পরদিন সকালে?

ইব্রাহিমকে কে মেরেছে নানা? – দাউদের প্রশ্ন।

ছোটা রাজন একটু বিস্মিত। তবু দাউদ ভাইয়ের কথার উপর সে কখনও কথা বলেনি। উত্তর দিল, ইব্রাহিম ভাইকে গাউলির ছেলেরা মেরেছে।

কবে মেরেছে? দাউদ আরও ঠান্ডা চোখে জানতে চাইল। রাজন আরও বিস্মিত। কারণ দাউদ ভাই তো সবই জানে। তাহলে কেন এই জেরা? রাজন উত্তর দিল, জুলাইতে। দাউদ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, এটা কোন মাস নানা? রাজনের কণ্ঠস্বর নেমে এল। এবার আর থাকতে না পেরে জানতে চাইছে সে, কেন ভাই? কী হয়েছে?

দাউদের উত্তর, এটা সেপ্টেম্বর। এই দুই মাসে তোমার কী করার কথা ছিল? রাজন এবার ভয় পেল। সত্যিই তো। দাউদের আদরের বোন হাসিনা পার্কারের স্বামী ইব্রাহিম পার্কারকে তার বাড়ির কাছেই অরুণ গাউলি গ্যাং-এর কয়েকজন গুলি করে মেরে গিয়েছে। হাসিনা আপার সঙ্গে রাজনের সম্পর্ক ভাইবোনের। বোনের বিধবা হওয়া দাউদ মেনে নিতে পারছে না সেটা বলাই বাহুল্য। রাজন নিজেই দাউদকে বলেছিল ভাই যেন চিন্তা না করে। বদলা নেবে সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু দু মাস কেটে গিয়েছে এখনও কোনো প্ল্যান করা যায়নি। আসলে এই দুমাসে রাজন ডি কোম্পানিকে অন্য এক আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একঝাঁক কাজ করেছে। পাকিস্তানে যারা উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল ভারত থেকে, তাদের মধ্যে করাচিতে যাওয়া মোহাজিরদের অবস্থা সবথেকে খারাপ। সরকারি চাকরি, ব্যবসা, কাজকর্ম কিছুই না পেয়ে, দরিদ্র জীবন যাপন করতে করতে তাদের পরিবারগুলির যুবকরা অপরাধের পথে পা বাড়ায়। সেই মোহাজিরদের সঙ্গে যোগাযোগ করে করাচি বন্দরে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে রাজন। এখানেই শেষ নয়। তুরস্ক আর সাইপ্রাসের আন্ডারওয়ার্ল্ড টিমের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এসবের কৃতিত্ব রাজনের। আর এই কারণে দাউদ সাম্রাজ্যের প্রায় একচ্ছত্র দু'নম্বর ডন রাজনই। সেটাই সহ্য হয়নি শারদ শেট্টিদের। তাহলে কি তারাই কিছু উস্কানিমূলক কথা বলেছে? রাজন এক মুহূর্ত ভাবল এবং তার চোয়াল শক্ত হল। কিন্তু সঠিক না জেনে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। দাউদ বলল, ঠিক আছে। আমার জানার দরকার ছিল প্ল্যান রেডি

কিনা। ও কে, আমরা পরে আবার কথা বলব। রাজন শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বলল, ভাই আমিই করাব কাজটা। আর কয়েকদিনের মধ্যে। দাউদের মুখে হাসি।

দাউদের বোন হাসিনা কাসকর বিয়ে করেছিল ইব্রাহিম পার্কারকে। জুনিয়র ফিল্ম আর্টিস্ট। যাকে সিনেমাজগতে বলা হয় এক্সট্রা। তবে সেটা ছিল নেশা। তার আসল পেশা হল কাদরি হোটেল। নাগাপাড়ার আরব গলিতে। দাউদের সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ ছিল অরুণ গাউলি। এই দুই গ্যাং এর লড়াইয়ে, হত্যা পালটা হত্যায় তটস্থ গোটা মুম্বই। ঠিক এভাবেই একদিন গাউলির ভাইকে হত্যা করেছিল দাউদের গ্যাং মেম্বাররা। মাফিয়া দুনিয়ার নিয়ম হল চোখের বদলে চোখ। অতএব এর বদলা তখনই নেওয়া সম্ভব যদি দাউদের পরিবারের কাউকে খুন করা যায়। কিন্তু কীভাবে? কাকে টার্গেট করা সম্ভব? একমাত্র বোন হাসিনা থাকে মুম্বইতে। তাছাড়া তো ভাইয়েরা সবাই দেশের বাইরে। অতএব স্থির করা হল হাসিনার স্বামীকেই সরাতে হবে দুনিয়া থেকে। ২৬ জুলাই ১৯৯২। কাদরি হোটেলের ক্যাশ রেজিস্টারে বসে সারাদিনের আয়ের হিসাব মিলিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ইব্রাহিম। বাড়ি কাছেই। তবু গাড়ি থাকে সঙ্গে। সারাদিনে কখন কোথায় যেতে হয়। সেই গাড়ির ড্রাইভার সেলিম প্যাটেল হোটেলে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, ইব্রাহিম ভাই, এখন কোথায় যাওয়া হবে? তখন সন্ধ্যা হয় হয়। এই পাকমোড়িয়া স্ট্রিট আস্তে আস্তে ফাঁকা হচ্ছে। সেলিম প্যাটেলের সঙ্গে হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই চারজন যুবক আচমকা এগিয়ে এল। জামার ভিতর থেকে রিভলবার বের করে তৎক্ষণাৎ গুলি চালাল তারা। সেলিম পালাল। কিন্তু গুলি করে পালাতে পারল না ওই চারজন। তাদের ধরে ফেলা হয়েছিল। এবং পাবলিকের গণপিটুনিতে মারা যাওয়ার আগেই পুলিশ এসে রক্ষা করে তাদের। কিন্তু কতদিন রক্ষা করতে পারল পুলিশ?

ছোটা রাজন দাউদকে বলেছিল, ভাই বদলা নেওয়া হবেই। আর কয়েকদিন। আমিই করাব কাজটি। দাউদ কোনো উত্তর না দিয়ে হেসেছিল। এবং ওই হাসিটির ঠিক চারদিন পর জানা গেল মুম্বইয়ের জে জে হাসপাতালে মারাত্মক এক শুটআউট হয়েছে। হাসপাতালের ইনডোরে ঢুকে সেখানে ভর্তি শৈলেশ হালদাংকর আর দুই পুলিশ

কনস্টেবলকে খুন করে পালিয়েছে দুই গ্যাংস্টার। এমনই সাংঘাতিক সেই অ্যাটাক যে শৈলেশ আর বিপিন নামে আর এক অপরাধীকে ৫০০ রাউন্ড গুলি করেছে সেই আক্রমণকারীরা। কে শৈলেশ? কে বিপিন? মুম্বইয়ের সেই সময়ের কুখ্যাত মাফিয়া অরুণ গাউলির অন্যতম প্রধান দুই শাপ শুটার। তারাই খুন করেছিল দাউদের ভগ্নীপতি ইব্রাহিম পার্কারকে। সঙ্গে ছিল পাপ্পু কালানি আর ব্রিজেশ সিং। তারা পালাতে সক্ষম হলেও ইব্রাহিমকে খুন করে দৌড়ানোর সময় শৈলেশ আর বিপিনকে সেদিন ভি পি রোডে ধরে ফেলে জনতা। এবং গণপিটুনি দেয়। এতটা আঘাত ছিল না যে সেদিন থেকে দুমাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। আসলে গাউলিই প্ল্যান করেছিল এরকম। তার নিজের চ্যানেল নিয়ে জেল প্রশাসনকে জানিয়েছিল এরা জেলে থাকলে নিরাপদ নয়। হাসপাতালই সুরক্ষিত। কারণ কোনো সন্দেহ নেই দাউদ বদলা নেবেই নেবে। নিজের বোনের স্বামীকে মেরেছে যারা, তাদের দাউদ ছেড়ে দেবে নাকি? তাই এই দুই হিটম্যান সেদিন থেকেই হাসপাতালে ভর্তি। দাউদের নেটওয়ার্ক কতটা শক্তিশালী এবং দুর্ধর্ষ তা সেই ১৯৯২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর প্রমাণ হয়েছিল। হাসপাতালে ঢুকে হত্যাকাণ্ড! ভাবাই যায় না। তাও আবার পুলিশি নিরাপত্তা আছে জেনেও। বিপিন অবশ্য জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল। শৈলেশ সেই সুযোগ পায়নি। তাদের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা দুই কনস্টেবলও মারা যায়। এত বুলেট বৃষ্টির ফলে একাধিক রোগীও আহত হয়। গোটা মুম্বই এবং মুম্বই পুলিশ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এসব থেকে অনেক দূরে, দুবাইতে বসে সবথেকে বেশি স্তব্ধ হয়েছিল যে লোকটি, তার নাম ছোটা রাজন। কারণ এই কাজটি সে তার ছেলেদের দিয়ে করায়নি। তার থেকেও বড় কথা হল এই ঘটনাটি যে ঘটবে তার বিন্দুমাত্র আঁচও পায়নি রাজন। কিন্তু জানা গেল হ্যাঁ, দাউদ ভাইই করিয়েছে। রাজনকে না জানিয়ে, সাউথ মুম্বইয়ের গ্যাংস্টার ছাড়া কারা করল এই কাজ? কাদের এত সাহস? সেদিনই দাউদ ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে রাজন জানতে পারল তার গদি টলমল করছে। কারণ কাজটি করেছে সুভাষ সিং ঠাকুর আর সুনীল সাওয়ান্ত। কারা তারা? একদিন এই সুনীল সাওয়ান্তকে হাতে ধরে মাফিয়া জগতে এনেছে রাজনই। আজ সেই সাওয়ান্ত আর ঠাকুর দাউদ ভাইয়ের কাছে হয়ে উঠেছে নতুন সাথী! তাদের দিয়েই কাজটা করিয়েছে দাউদ।

তাহলে রাজনের ১০ বছরের আস্থার কোনো দাম নেই। রাজন ভাবছিল। কে এই সাওয়ান্ত আর ঠাকুর? যাদের জন্য দাউদ রাজনকে পর্যন্ত অবহেলা করতে শুরু করেছে? সেই সূত্রপাত মাফিয়া সাম্রাজ্যের ভাঙনের। দাউদ ইব্রাহিমের একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি ছোট রাজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে শুরু করল।

এক হাতে কালাশনিকভ নিয়ে ওই এক হাতেই উপর্যুপরি গুলি চালিয়ে স্থিরভাবে চলে যেতে পারে কে? তার নাম সুভাষ সিং ঠাকুর। ছ ফুটের মতো হাইট। দুর্দান্ত কাঠামো। ফর্সা। ছোটা রাজনের টিমের বাইরে মুম্বইয়ে এরকম এক শার্প শুটার বেড়ে উঠছিল গোকুলে। এবং দাউদের কানে সে খবর পৌঁছতে দেরি হয়নি। রাজনও জানে না কবে যেন খোদ দাউদ সুভাষ সিং ঠাকুরকে দুবাইতে ডেকে পাঠিয়েছিল। মুম্বইয়ের নতুন উঠতি গ্যাং স্টারদের একটাই স্বপ্ন। দাউদ ভাইয়ের সঙ্গে একবার অন্তত কথা বলতে পারার সুযোগ। সুভাষ ঠাকুরের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে শুধু তাই নয়। তাকে দাউদ ডেকে পাঠাল। আর সে খবর ছড়াতে দেরি হয়নি। সুভাষ সিং ঠাকুর আর সুনীল সাওয়ান্ত ছিল একপ্রকার ক্রাইম পার্টনার। বহু কাজ তারা একসঙ্গে করেছে। আর এই ডাবল শুটার দাউদের কাছে হয়ে উঠল এক দুর্দান্ত অস্ত্র। মাফিয়া সাম্রাজ্যের নিয়ম হল যেকোনও কর্পোরেট অফিস অথবা রাজনৈতিক দল চালানোর মতোই। কোনো একজন ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভ অথবা দ্বিতীয় সারির নেতাকে কোনো সময় পূর্ণ ক্ষমতা দিতে নেই। সর্বদা একজন দুজন করে প্রতিযোগী রেখে দিতে হয়। এই প্রতিযোগীরা সর্বদাই চেষ্টা করে বসকে খুশি করতে। নিজেদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা করে । বসের কাজ একবাক্যে করে দিতে চায় গুডবুকে থাকার জন্য। রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারাও ঠিক এই স্ট্র্যাটেজি নেন। তাঁরা সর্বদাই নিজেদের দলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে কিছু রাখেন না। ছদ্ম প্রতিযোগিতার আবহ রেখে দেন। যাতে একাধিক নেতা মনে করে তারাই আসলে দ্বিতীয় স্থানটি পাওয়ার যোগ্য। সেই পদে যেতে জান লড়িয়ে দেয়। প্রচুর খাটাখাটনি করে দলের পক্ষে লাভজনক কাজ করে। এভাবে আদতে সবথেকে নিশ্চিন্ত থাকে নেতা থেকে ডন সকলে। কারণ অন্য কারও সামান্য বেচাল অথবা সন্দেহজনক আচরণ আর একজন নিশ্চিতভাবে বলে দেবে গোপনে। এই একই ফরমুলায় ডি কোম্পানিতে ছোটা রাজনের সঙ্গে শারদ শেট্টি, আনিস

ইব্রাহিমের সঙ্গে ছোটা শাকিলের বিরোধ ছিল মারাত্মক। যাকে বলা যেতে পারে ইনার গ্যাং রাইভ্যালরি। এহেন এক কৌশলেই দাউদের দলে দ্রুত উপরে উঠে আসছিল ঠাকুর আর সুনীল।

ঠিক এরকম সময় গোটা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এবং ভবিতব্য বদলে ফেলা এক মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল মুম্বই কিংবা দুবাই থেকে অনেক দূরের এক ছোট্ট জায়গায়। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের কাছে অযোধ্যায়। সাড়ে চারশো বছরের একটি মসজিদ আদতে রামমন্দিরের উপর তৈরি হয়েছিল এই বিবাদ অনেকদিনের। সেই মসজিদ ভেঙে পড়ল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। আর গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই সুযোগটির অপেক্ষায় ছিল কারা? দেশভাগের ৪৫ বছর ধরে এরকমই একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল পাকিস্তান। তারা তৎক্ষণাৎ ভারতের মুসলিমদের ক্ষোভকে আরও উসকে দেওয়া এবং বড়সড় ভাবে কোনো একটি পালটা বদলা নেওয়ার প্ল্যান করতে শুরু করে দিল। এমন কাউকে এই কাজের জন্য চাই যে ভারতকে সবথেকে ভালোভাবে চেনে। আর ওই প্ল্যান প্রয়োগ করা হবে বম্বেতে। দেশের অর্থনৈতিক ক্যাপিটাল। দাউদ ইব্রাহিম আদর্শ লোক এই ব্যাপারে। কারণ তার নেটওয়ার্ক তৈরি বম্বে শহরে। আর কী চাই। অতএব ১৯৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর দুবাইতে আইএসআই এর দুই এজেন্ট দাউদ ইব্রাহিমের সাদা বাংলোয় হাজির হল। প্রাথমিক পরিচয়ের পর তাদের প্রশ্ন, দাউদ ভাই, বদলা নেবে না তোমার মুসলিম ভাইবোনদের এই অবস্থার জন্য? এই দ্যাখো কী অবস্থা ওখানে। এটা বলে আই এস আই এজেন্টরা একটি ভিডিও ক্যাসেট চালাল। বলা হল এই দ্যাখো কীভাবে মুসলিম মহিলাদের উপর অত্যাচার করছে হিন্দুরা। এই দ্যাখো এটা হল সুরাটের দাঙ্গা। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেকে মারছে। দাউদের বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আইএসআই যেসব ভিডিও দেখাচ্ছে তা সত্যি নাকি মিথ্যে এসব কথা তার মাথায় এল না। সে চাইল বম্বে তথা ভারতের মুসলিমদের কাছে একজন মসিহা হয়ে উঠত। যে নিজের সম্প্রদায়ের মান বাঁচাতে বদলা নিয়েছে। আই এস আই-এর প্রথম পদক্ষেপ সফল। তারা বলল, একবার এই কাজটি যদি করতে পারো তোমার ব্যবসার জন্য বালুচ আর আফগান বর্ডার খোলা। দাউদের চোখে স্বপ্ন। কারণ

তখন থেকেই তার প্ল্যান ড্রাগের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। টোপে কাজ হল। ঠিক এরকম সময় ছোটা শাকিল দাউদকে বলেছিল ভাই এই অপারেশনে নানাকে নেওয়া যাবে না। কারণ ও হিন্দু। আমাদের মনের ব্যথা বুঝতে পারবে না। উলটে পুলিশকে জানিয়ে দিলে আমাদের বিপদ বাড়বে। সেই সময় এমনিতে রাজনের উপর দাউদ ক্ষিপ্ত। কিছুদিন আগেই কিম বাহাদুর থাপা নামে এক রাজনীতিককে রাজনের ছেলেরা মঙ্গতরাম পেট্রল পাম্পে প্রকাশ্যে খুন করেছে। অথচ সেই থাপা আসলে দাউদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। রাজন কি জানে না? জানে। তা সত্ত্বেও শিবসেনার ওই নেতাকে ফোন করে রাজনের ছেলেরা থ্রেট করেছে। টাকা চেয়েছিল। সেকথা থাপা নিজেই বলেছে সুভাষ সিং ঠাকুরকে। আর স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই খবরটি দাউদের কানে দিয়েছিল। দাউদ শুধু চুপ করে শুনেছে। কারণ যে কোনো কারণেই হোক দাউদের মনে বরাবর রাজনের সম্পর্কে দুর্বলতা সামান্য হলেও রয়েছে। কিন্তু খোদ দাউদ ভাইয়ের থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর যখন সেই থাপা রাজনের ফোন ধরা বন্ধ করে দিলেন, টাকা দিতেও অস্বীকার করলেন, তখন রাজন ধৈর্য ধরতে পারেনি। তার ছেলেরা গুলি করে দিল থাপাকে। আর এই প্রথম দলে থেকেও রাজন বনাম দাউদের একটি ইজ্জতের লড়াই তথা গ্যাং ওয়ার শুরু হয়ে গেল। কারণ দাউদ এই অপমান মেনে নিতে পারছে না সেটা এক নিমেষে বুঝে যাওয়ার পর সুভাষ সিং ঠাকুর বলেছিল, ভাই থাপাকে যারা খুন করেছে তাদের আমরা খতম করে দিচ্ছি না কেন? এটা দাউদের মনের কথা। সে চুপ করে রইল। একবার বলল, ওরা রাজনের ছেলে। ঠাকুর বলে উঠল, এরা তো আপনাকেও আর মানছে না ভাই। শিক্ষা দেওয়া দরকার। দাউদ মাথা নাড়িয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি রাজনের দীর্ঘদিনের সাথী, দুর্দান্ত বন্দুক চালানোয় পারদর্শী তিন সদস্য দিবাকর, সঞ্জয় আর অমরকে সুভাষ সিং ঠাকুর ফোন করিয়ে ডেকে আনিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের গোন্দার এক খামার বাড়িতে। বলেছিল তোমাদের ভয় নেই। আমি গোপন জায়গায় রেখে দেব। পুলিশ সন্ধান পাবে না। তারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। কিন্তু আর ফিরতে পারেনি। সেখানেই তাদের গুলি করে হত্যা করা হয় এবং ওই বাড়ির মধ্যেই পুঁতে ফেলা হয় বডিগুলি। বাড়িটি কার ছিল? এক এমপির!

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে বম্বে থেকে ৩০ জন যুবকের একটি দল গেল করাচিতে। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের এক জনশূন্য স্থানে। সেখানেই শেখানো হয়েছিল আরডিএক্স কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে টাইমার রেখে ব্লাস্ট করানো হয় বিস্ফোরণের আগে। প্রায় দেড় মাসের লাগাতার ট্রেনিং এর পর তারা ফিরে এল বম্বেতে। এবার সেই প্ল্যান। এই ৩০ জন যুবক কারা? তারা সকলেই টাইগার মেমনের রিক্রুট। অর্থাৎ রাজনকে জানানো বা যুক্ত করা হবে না। দাউদের বম্বের নতুন রিমোট কন্ট্রোলের নাম টাইগার। দাউদের দুবাইয়ের বাড়িতে হঠাৎ করে অচেনা লোকের আনাগোনা বেড়ে গেল। কিন্তু কারা এরা? রাজন জানতে পারছে না। তাকে কোনো মিটিং এ ডাকা হচ্ছে না। কিছু জানতে চাইলে আনিস ভাই বলছে এটা শাকিল দেখছে। তুমি ছেড়ে দাও। অন্য বিজনেস বাড়ানোর চেষ্টা করো। তোমার ওটাই কাজ। রাজন এভাবে কোনোদিন দেখেনি তাদের কোম্পানি চলতে। একটা গোপন প্ল্যান চলবে, অথচ সে কিছুই জানতে পারছে না! এরকম ভাগাভাগি তো ছিল না! প্ল্যান ছিল এপ্রিল মাসে বম্বেতে বিরাট বড় এক বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। কারণ সেই মাসেই শিবসেনার প্রতিষ্ঠা দিবস। আঘাত হানতে হবে তখনই। সব পরিকল্পনা রেডি। ৮ টন আর ডি এক্স রায়গড়ের উপকূল থেকে ঢুকিয়ে আনা হয়েছে। দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু আচমকা সব হিসাব উলটে গেল। ১০ মার্চ গুল নুর মহম্মদ নামের এক পেটি ক্রিমিনাল, যে এলাকায় চুরি ছিনতাই পকেট কেটে বেড়ায়, সে বম্বের নির্মল নগর পুলিশ স্টেশনে সাত সকালে এসে গালগল্প শুরু করল। পুলিশ অফিসার আর কনস্টেবলরা হাসাহাসি করছে। কারণ গুল মহম্মদ বলছে, শীঘ্রই শহরে নাকি সিরিয়াল ব্লাস্ট হবে। কারা করবে? পাকিস্তান করাবে দাউদকে দিয়ে। সামান্য এক পকেটমার গুল। সে এসব কথা বললে ঠাট্টাতামাশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু গুল মহম্মদ যখন জানাল, সে নিজেই ২২ জানুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, তখন পুলিশের মধ্যে হইচই পড়ে গেল। গুল মহম্মদকে গ্রেপ্তার করা হল। যতটা সম্ভব সে জানাল কী হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোথায় কোথায় বিস্ফোরণ হবে তা সে জানে না। কারণ তখনও জানানো হয়নি। একেবারে শেষ মুহূর্তে সেসব জানানো হবে। গুল মহম্মদ পুলিশের কাছে সারেন্ডার করেছে সেই খবর দ্রুত পৌঁছে

গেল দুবাইয়ে। তারও আগে টাইগার মেমনের কাছে। তাহলে? এবার কী করা যাবে? প্ল্যান বন্ধ? একেবারেই না। বরং উলটো। মাত্র একদিন পরই ঘটনা ঘটাতে হবে। যাতে পুলিশ তৈরি হওয়ার সুযোগই না পায়। এবং সত্যিই তাই। গোটা ভারতকে হতচকিত করে ১২ মার্চ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ হয়ে গেল বম্বের সবথেকে দামি জায়গাগুলিতে। ৩০০ ছাড়িয়ে যায় মৃত্যুর সংখ্যা। এটা কী করল দাউদ ভাই? রাজন রীতিমতো ক্রুদ্ধ। নিজের শহরের প্রতি তার টান সাংঘাতিক। দাউদ ভাইও তো বম্বেকে প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসে। তাহলে? এরকম কেন? আর তাকে কেন কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি? শাকিল এক বিকেলে এই প্রশ্নটা শুনে দাউদের সামনেই বলেছিল, তোকে বলা হবে কেন? তুই তো কাফের! হিন্দু! দাউদ কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঠিক একমাস পরই রাজনের কানে খবর গেল শাকিল আর সুনীল তাকে হত্যার ছক কষছে। তাকে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেওয়া হবে। দাউদ ভাইয়ের ডাকা একটি পার্টিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল সে। তখনই ফোন। দাউদের এক গ্যাং মেম্বারই জানিয়ে দিল সেকথা। দাউদ ভাই তাকে খুন করতে চাইছে? এতটা বিশ্বাসঘাতকতা? আর তো থাকাই চলে না। দুবাই আর নিরাপদ নয়। তাই রাজন এক পরিচিত সিন্ধি ব্যবসায়ী বন্ধুর সাহায্য নিয়ে দুবাই থেকে পালানোর সুযোগ পেল। ভায়া নেপাল সোজা কুয়ালালামপুর। মালয়েশিয়া রাজনের চেনা জায়গা। তার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এখানে আছে। আপাতত সুযোগের অপেক্ষা দল গোছানোর। কারণ এবার একটাই লক্ষ্য। খতম দাউদ! তবে মালয়েশিয়ায় থাকলে তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে দাউদ বাহিনী। তাই এখানে বেশিদিন নয়। কোথায় যাওয়া যায়? বম্বের তার গ্যাংস্টারদের গোপন আস্তানা একটাই। ব্যাংকক! অতএব রাজন ব্যাংককে গেল। ব্যাংককে থাকার নিয়ম হল নাম পালটে ফেলতে হবে। সেই নতুন নামের পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। চিন্তা নেই। বম্বের বাইকুল্লার বাসিন্দা মিঠুন চক্রবর্তীর একসময়ের ডাই হার্ড ফ্যান রাজেন্দ্র নিকলজের ওরফে ছোটা রাজনের নতুন নাম হল বিজয় দমন। কিছুদিন ব্যাংককে থেকে পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে হবে। এবং সম্পূর্ণ গোপনে থাকতে হবে। কারণ দাউদের লোকজন এই ব্যাংককে যথেষ্ট। ওয়ান রুম ফ্ল্যাট। ঠিক এক বছর চুপচাপ থাকার পর কাজে নামল রাজন। বম্বের গ্যাং সেভাবে ভাঙেনি। তারা তাদের মতোই কাজ করে যাচ্ছে।

সবথেকে আশ্বস্ত হওয়ার মতো ঘটনা হল গ্যাং মেম্বারকে ভাঙাতে পারেনি দাউদ। তারা রাজনের প্রতি এখনও বিশ্বস্ত। ব্যাংককে থেকে নতুন যে ব্যবসায় প্রথম হাত দিল রাজন সেটি হল ড্রাগস। ২০ লক্ষ ডলার দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বটামে খোলা হল এক ম্যানড্রাক্স তৈরির কারখানা। মারাত্মক লাভজনক ড্রাগ এই ম্যানড্রাক্স। এর ঠিক পাশাপাশি বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলিতে সাপ্লাই করার জন্য তৈরি হল আর একটু কড়া ডোজের র মেটিরিয়াল থেকে তৈরি ড্রাগ, যার নাম 'কোয়ালুড'। কোটি কোটি টাকার বিজনেসে রাজনের সম্পত্তি উত্তরোত্তর আরও বাড়তে লাগল। রাজনের সঙ্গে রয়েছে তার সবথেকে বিশ্বস্ত সাথী সন্তোষ শেট্টি। সে থাকে বম্বেতে। এভাবে কেটে গেল পাঁচ বছর। রাজন নিশ্চিন্ত, তাকে আর হয়তো মারবে না দাউদ। আর কেউ খুঁজছেও না। ঠিক তখনই ২০০০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ছোটা রাজনের দুনিয়া কেঁপে উঠল। তার ব্যাংককের বাড়ি ছিল সুখুমবিট সইয়ের চরণ কোর্ট নামক এলাকায়। চারজন যুবক ওইদিন হাতে এক বিরাট কেক নিয়ে হাজির। বিল্ডিং এর সিকিউরিটি গার্ডকে বলা হল, দামন সাহেবকে জন্মদিনের গিফট দিতে হবে। উঠে এল চার যুবক। রাজনের ঘরে তখন ছিল তার আর এক সাথী রোহিত ভার্মা আর রোহিতের স্ত্রী সঙ্গীতা। তারা ছিল বাইরের ড্রইংরুমে। বেডরুমে রাজন। ডোরবেল বাজছে। দরজা খুলে দিল রোহিত। এক মুহূর্তের মধ্যে ভিতরে ঢুকে এল চারজন। তাদের হাতে পয়েন্ট ফোর ফাইভ বোরের পিস্তল। তৎক্ষণাৎ গুলি। গুলি লাগল রোহিতের কাঁধে। গুলি লেগেছে সঙ্গীতার হাতেও। কিন্তু এরা তো টার্গেট নয়! টার্গেট যে সে কোথায়? ততক্ষণে রাজন এক লাফে উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় নাকি? ল্যাচ লকে গুলি করল আগন্তুকরা। একটি..দুটি..তিনটি। আর তার মধ্যেই দুটি গুলি দরজা ভেদ করে রাজনের পেটে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে রাজন। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। ওরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলে আর কোনো রক্ষা নেই। অতএব দোতলার ওই ঘরের জানালা থেকে রাজন সোজা নীচে ঝাঁপ দিল। প্রথমেই ভেঙে গেল গোড়ালিটা। পেট থেকে অনবরত রক্ত বেরোচ্ছে। ওই অবস্থায় রাজন সোজা গেল সামনের দিকে। একটি ঝোপ। তার আড়ালে শুয়ে পড়ল সে। ততক্ষণে দোতলায় রাজনের ঘরে ঢুকে

পড়েছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু রাজনকে পায়নি তারা। আর এদিকে প্রবল গুলির শব্দে হইচই, সিকিউরিটিরা ছুটে এসেছে। অতএব পালানো ছাড়া উপায় নেই তাদের।

রাজন হাসপাতালে ভর্তি। পেটের অপারেশনে দুটি গুলি বের করে ফেলা হয়েছে। আরও গুলি থাকতে পারে। তাই বারংবার স্ক্যান করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও বিপদ কাটেনি। ইনফেকশন হয়ে যেতেই পারে। ঠিক ২০ দিন পর রাজন যখন আইসিইউ থেকে বেরিয়েছে এবং কেবিনে দেওয়া হয়েছে তাকে, সে ফোন করল বিনোদ শেট্টিকে। বিনোদ, এই অ্যাটাক কে করেছে? আমি বদলা চাই! বলল রাজন। বিনোদ রাজনকে শান্ত করে জানিয়ে দিল, অল্পদিনের মধ্যে সে সব খবর নিচ্ছে। চিন্তা নেই। আর কেউ নয়। জানা গেল গোটা অপারেশনের পিছনে রয়েছে দাউদের সঙ্গী শরদ শেট্টি। অর্থাৎ দাউদের নির্দেশেই। রাজনের মনে বদলার আগুন। রাজন হাসপাতালে। সে চায় হাসপাতালে থাকতেই থাকতেই যেন প্রতিশোধ সম্পন্ন হয়। অন্তত দাউদ জেনে যাক রাজন কতটা ভয়ংকর। বম্বে থেকে পাঠানো হল চার গ্যাংস্টারকে। করণ সিং, মনোজ কোটিয়ান, বিমলা কুমার আর অমর বাম ওরফে নেপালি। দাউদের দুবাইয়ের বিজনেস দেখে শরদ শেট্টি আর ছোটা শাকিল। দুবাইতে শরদের হোটেল চেইনের নাম রামী গ্রুপ অফ হোটেলস। যা আদতে দাউদেরই। তবে দুবাইতে থাকলে শরদ আন্নার (এই নামে পরিচিত সে) প্রিয় জায়গা হল ইন্ডিয়া ক্লাব। চার যুবক সাতদিন ধরে ফলো করল শরদ আন্নাকে। দেখা গেল বেস্ট জায়গা হল ওই ইন্ডিয়া ক্লাব। কিন্তু কীভাবে সম্ভব ইন্ডিয়া ক্লাবে ঢোকা! রাজনের পরিচিত এক বিজনেসম্যান সেই ব্যবস্থা করে দিতে রাজি। ওই চার যুবক পেয়ে গেল অস্থায়ী ক্লাব মেম্বারশিপ। মূল্য? ১২ লক্ষ টাকা! ক্লাবে ঢুকে প্রথম থেকে চেষ্টা করা হল শরদ শেট্টির সঙ্গে আলাপের। তবে সবাই নয়। মনোজ কোটিয়ান। কন্নড় যুবক। দারুণ ইংরাজি বলতে পারে। সহজে তাকে দেখে ভেবে নেওয়া যায় যে ধনী পরিবারের শিক্ষিত সন্তান। হীরের ব্যবসা আছে তার জেড্ডায়। এরকমই বলেছিল কোটিয়ান শরদকে। সেকথা বিশ্বাস করে হীরে ব্যবসায় আগ্রহ হয় শরদ আন্না। ২০০৩ সালের ১৯ জানুয়ারি। রাতে ক্লাব থেকে বেরোচ্ছে শরদ আন্না। সঙ্গে কোটিয়ান। আগে থেকে প্ল্যান ছিলই। শরদ আন্না পোর্টিকোর দিকে যাচ্ছে। আচমকা তিন

যুবক সামনে। প্রথমে সামনে থেকে গুলি। আন্না মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে মাথায় গুলি। কটা? কুড়িটা!! রাজনের বদলা!

রাজনের তো সন্তুষ্ট হওয়ার কথা! দাউদকে এর থেকে বড় ধাক্কা আর কেউ দেয়নি। সত্যিই রাজন খুশি। কিন্তু সেই খুশি বেশিদিনের জন্য নয়। কারণ হঠাৎ জানা যাচ্ছে বম্বে পুলিশ গোপনে আসছে ব্যাংকক। রাজনকে ধরতে। কারণ রাজনের লোকেরা একের পর এক দাউদ সঙ্গীকে হত্যা করছে। আবার পালটা দাউদও নিচ্ছে বদলা। বম্বে হয়ে উঠেছে এক গ্যাং ওয়ারের নগরী। তাই রাজনকে ধরতে চায় বম্বে পুলিশ। ধরা দেওয়া চলবে না। তাহলে কী করা যায়? এবার জানা গেল ছোটা রাজনের নেটওয়ার্ক কতটা স্ট্রং। ২৪ নভেম্বর ২০০৩ সালে রাজন হাসপাতালের বেড থেকে উধাও। কীভাবে সম্ভব? জানালা থেকে ঝুলছে দড়ি, রক ক্লাইম্বিং এর উপকরণ। জানালা থেকে তাকে নামিয়ে এনেছিল থাইল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর একটি দল। যাদের সঙ্গে রাজনের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। জানালা থেকে নামিয়েই তাকে চাপানো হয় মিলিটারি ট্রাকে। সেখান থেকে সোজা কম্বোডিয়ার বর্ডারে। তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল মিলিটারি ট্রাক। তারপর? ১৫ মিনিট পর একটি হেলিকপ্টার এল আকাশে। নেমে আসার পর বেরিয়ে এলেন যে ব্যক্তি তিনি কম্বোডিয়ার এক প্রদেশের গভর্নর। রাজন হাঁটতে পারছে না। তাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে বসানো হল চপারে। সেই গভর্নরের পাশে। চপারটি কোথায় পোঁছে দিল রাজনকে? সিয়েম রিপ প্রদেশের রাজধানী শহর সিয়েম রিপে। আঙ্কোরভাটের গেটওয়ে। ৬ মাস সেখানে সম্পূর্ণ গোপনে চিকিৎসা হল রাজনের। গোটা দুনিয়া জানতে পারছে না রাজন বেঁচে নাকি মারা গিয়েছে! যখন ধরেই নেওয়া হচ্ছে রাজনের আর সন্ধান পাওয়া যাবে না, তখন সে আসলে সিয়েম রিপ থেকে চলে গিয়েছে বিশেষ বিমানে চেপে তেহরান। ইরানের রাজধানী। সেখান থেকে বাগদাদ, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি...। পালিয়ে বেড়াচ্ছে রাজন। কারণ ইতিমধ্যে দাউদের দক্ষিণ হস্ত ছোটা শাকিল দু বার অ্যাটাক করেছে তার উপর। আরব মাফিয়াদের দিয়ে। আর পালিয়ে পালিয়ে এভাবে ভয়ের জীবন কাটাতে পারছে না ডায়াবেটিসের রোগী ছোটা রাজন। তাই বছর কয়েক আগে অবশেষে সে সারেন্ডার করার প্রস্তাব দেয় ভারত সরকারের কাছে। ছোট রাজন এখন তিহার জেলে।

এবং এবার এক ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ উপস্থিত দিল্লি পুলিশ আর তিহার জেল কর্তাদের সামনে। রাজনকে রক্ষা করার পরীক্ষা। কারণ রাজনকে আদালত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়ার পরই করাচি থেকে দাউদ সঙ্গী ছোটা শাকিল ফোন করে দিল্লির সংবাদমাধ্যমগুলিকে ঘোষণা করেছে, তিহার জেলে ঢুকে রাজনকে খতম করা হবে! ইন্ডিয়ান পুলিশ ঠেকাতে পারবে না! দাউদ ভাইয়ের চ্যালেঞ্জ!

৮

গোলাম আব্বাস লেন ধরে ছুটছে আহমেদ। ছুটছে নবাব শেখ। উদভ্রান্ত হয়ে ছুটছে জব্বার। পিছনে তাকানোর সময় নেই। পুলিশের দলটি একটু আগেই শ্যামলাল লেন ক্রস করেছে বলে খবর দিল আবদুল। এখনই আসবে এই গলিতে। যেভাবেই হোক বিচালি ঘাট পৌঁছতে হবে পুলিশের আগেই। গোটা চোরাই মাল বিচালি ঘাটের সংলগ্ন বাঁশ আড়তে রাখা আছে। কথা ছিল আজ সকালেই কার্তিকের নৌকা করে ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একবার হাওড়ায় পৌঁছে দিলে আর চিন্তা নেই। মাল যাবে জামালপুর। সেখানেই থাকে কুদ্দুসভাই। সব প্ল্যান আগে থেকেই হয়ে আছে। কিন্তু তার মধ্যে পুলিশের রেইড। আশ্চর্য! পুলিশ কীভাবে খবর পেল? এলাকায় কী খোঁচড় ঢুকেছে? নাকি ডাবল এজেন্ট? আমাদের খবর পুলিশকে দিচ্ছে? আবার আমাদের সঙ্গেও রয়েছে! ছুটতে ছুটতে এসব ভাবছে জব্বার। এই টিমের লিডার। প্রায় পৌঁছে গিয়েছে বিচালি ঘাট। এমন সময় আচমকা সামনে এসে উপস্থিত লতিফের ছেলে নুর। হাঁফাচ্ছে। জব্বার চাচা..... পুলিশ! থমকে গেল জব্বাররা। কোথায় পুলিশ? পিছনেই তো ছিল। সামনেও নাকি? এইমাত্র লেডিস পাড়ায় জিপ এসেছে। বিচালি ঘাটের দিকেও নাকি একটা দল গেল। কতজন আছে? আছে প্রায় ১০ জন। ১০ জন? জব্বার এক মুহূর্তে ভেবে নিল। কি করা উচিত? এই পুলিশবাহিনী কি লোকাল থানার? নাকি লালবাজারের ইডি সেকশন? লোকাল থানার হলে তো আগে জানা উচিত ছিল। ঠিক চলে আসে এসব রেইডের অ্যাডভান্স খবর। তাই আগেভাগেই মাল সরিয়ে ফেলা নিয়ম। কিন্তু কিছুদিন হল ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর আর গার্ডেনরিচের পুলিশের হাবভাব ভালো ঠেকছে না। কাঠ কাঠ কথাবার্তা বলে কয়েকজন অফিসার। আগে যাঁরা যথেষ্ট হেসে কথা বলতেন। আর সবথেকে বড় কথা হল নাসো ভাইয়াকে ডেকে নাকি বেশ গরম গরম ধমকও দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা এতদিন চলে এসেছে, সেইসব কারবার গোটাতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতে জব্বার ঠিক করল বাতিখো দিকে চলে যাওয়াই বেস্ট। ওই দিকটার গলি বেশি সরু। জিপ তো ঢুকবেই না। রুট চেঞ্জ করল জব্বার, নবাব, আহমেদ। কোনোমতে বেরিয়ে সুহানের গ্যারাজে গিয়ে

সামনে রাখা মোটরবাইকে বসে স্টার্ট। সুহান জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে কিছু জানতে চাইছিল। হাত নাড়িয়ে জব্বার বলল, ফোর্স এসেছে। হাওয়া গরম আছে। রাতে আসছি। ম্যানেজ করিস।

ঠিক তখন পুলিশবাহিনীটি পৌঁছে গিয়েছে কারবালা লেনে। মুন্না আর শরাফত মসজিদের পিছনের গলিতে আছে, খবর আছে। ওদের ধরতে হবে। এস আই আর দুজন কনস্টেবল জিপ ছেড়ে রাস্তায়। দৌড়চ্ছেন তাঁরাও। শুধু রেইড করে লাভ নেই। মাল ধরা না পড়লে জবাবদিহি করতে হবে বড়সাহেবকে। অবশেষে বিচালিঘাট। খবর ঠিক ছিল। বাঁশের স্তূপ ডাঁই করে রাখা। তার আড়ালেই কাঠের বাক্স। একটি বাক্সের ডালা খুলতেই বেরিয়ে গেল রুপোর বাট। সারি সারি। উপরে রুপোর বাট। প্রত্যেক বাক্সের নীচে কী এগুলো? সাদা সাদা প্যাকেট। একটা প্যাকেট সামনে নিয়েই সাব ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক চমকে গেলেন। গাঁজা! ধরতে এসেছিলেন স্মাগলিং-এর রুপো। কিন্তু এ তো দেখা যাচ্ছে নতুন বিজনেস। । গাঁজার সাপ্লাই শুরু হয়েছে? কতদিন ধরে? ভ্রু কুঁচকে গেল। নারকোটিক সেল তার মানে ইনভলভড হয়ে গেল? অন্যমনস্ক হয়ে সাব ইনস্পেক্টর বললেন, জিপ আনাও! সিজার লিস্ট বড় হবে। একটু দূরে বসে সস্তায় রুমাল বিক্রি করতে বসা ৫ বছরের ইকবাল গোটা ঘটনাটি দেখে পুলিশের দলটি চলে যাওয়ার পরক্ষণেই ছুটল হানিফ চাচাকে বলতে... পুলিশ এসেছিল। মাল হাপিশ! কথাটি শুনেই হানিফের মুখ শক্ত হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলল, ইয়ে ওহি নয়ি ডিসি কা কাম হ্যায়। নাক মে দম কর রকখা হ্যায়..অব তো কুছ করনা পড়েগা..সাহাব কুছ করতে কিঁউ নেহি? কে এই সাহাব?

আমার এলাকায় আমি কোনো গ্যাং ওয়ার সহ্য করব না। প্রথম মিটিং-এই বলছিলেন বিনোদ মেহতা। কোনো এলাকা দখল ফখল চলবে না। নতুন দায়িত্বে আসা কলকাতা পুলিশের পোর্ট ডিভিশনের এই ডেপুটি কমিশনার ৩৫ বছরের ঝকঝকে যুবক। বন্দরে আসার পর থেকে তাঁর একটাই মিশন দেখা যাচ্ছে। অপারেশন, রেইড, সার্চ আর শুট। নাম বিনোদ মেহতা। পঞ্জাব ক্যাডারের আইপিএস। প্রবল সাহসী। ১৯৮৪ সাল। কলকাতা

পোর্টের ডকইয়ার্ডের অপরাধ চিত্রটি পৃথিবীর সব বন্দর এলাকার মতোই। যেসব কন্টেনার আসে, সেগুলি রাতের অন্ধকারে ভাঙা হয়। কন্টেনারের আসা যাওয়ার মধ্যেই করাচি আর কাবুল থেকে আসে রুপো, গাঁজা, এলএসডি। আর বাইরে স্মাগলিং করা হয় সোনা, বেআইনি ডলার। আর মেটিয়াব্রুজ, গার্ডেনরিচের গরিব মহল্লাগুলির ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে কেরোসিনের ব্ল্যাকের জন্য। রেশনে নয়, এসব জায়গায় কার্ডে কেরোসিন পাওয়ার থেকে ব্ল্যাকেই কিনতে হয়। একইভাবে রেশনের চাল, ডাল চলে যাচ্ছে দোকানগুলিতে। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আশরাফের কথা মনে আছে সকলের। আশরাফ আর গুড্ডু শান্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিল এলাকায়। ঠিক আড়াই মাসের মাথায় গুড্ডু লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। এবং সেখান থেকে ভ্যানিশ! ভ্যানিশ তো ভ্যানিশই। আর পাওয়াই গেল না। এবং আশরাফকে তারপর থেকে আর কেউ এলাকার কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাতে দেখেনি কেউ। সঠিক বার্তা ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তুললেই ভ্যানিশ! পোর্টের অপরাধ জগতে ক্ষমা নেই। ঠিক এরকমই চলছিল। ধরেই নেওয়া হল আর কোনো পরিবর্তন আসবে না বোধহয়। এই অপরাধ সাম্রাজ্য নিয়তি। আচমকা বন্দর এলাকার অপরাধ জগতে বিনা মেঘে বজ্রপাত। ডিসি বিনোদ মেহতা। এই যুবক আইপিএস অফিসার আসার পর বিজনেস মার খেতে লাগল প্রবলভাবে। কারণ একদিকে যেমন যখন তখন রেইড। মাল ধরা পড়ছে ওয়াটগঞ্জে। ডক ইয়ার্ডে মাঝরাতে হানা। ফ্যান্সি মার্কেটের রিসিভারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফাঁস হয়েছে পকেটমার আর ছিনতাইয়ের র‍্যাকেট। চুরি, পকেটমার আর ছিনতাই করে অপরাধীরা নিজেদের কাছে সেগুলি রাখে না। ক্যাশ ছাড়া অন্য মূল্যবান সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করাই রিসিভারের কাজ। একের পর এক রিসিভার অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে। স্মাগলিং প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। মেটিয়াব্রুজের নিয়ম হল সারাদিন দলের পর দল যুবক, তরুণের দল রাস্তায় আড্ডা মারছে। ক্যারম খেলছে। অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে টাকা কামাচ্ছে। আর অন্যদিকে বাড়ির মেয়ে ও স্ত্রীরা সকাল থেকে রাত প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছে সেলাই এর কারখানায়। কারখানা মানে কী? একটি ঘরে আট থেকে ১০ জন বসে দিনভর সেলাই করা, জামাকাপড় তৈরি করা। ঘুড়ি নির্মাণের কারখানাগুলিও এরকমই। মহিলা আর বাচ্চা বাচ্চা

ছেলেমেয়েরাই এই দুই ক্ষুদ্র কিন্তু বিস্তীর্ণ ইন্ডাস্ট্রির মূল কারিগর। অথচ সেলাইপিছু টাকা পাওয়া যায় নামমাত্র। যেসব বড় টেলার বা কাপড়ের ব্যবসায়ী অর্ডার দিয়ে যায় তারা ঘরে তোলে মুনাফা। আর এই কারিগরদের দারিদ্র্য আর কখনওই মেটে না। অপরাধ, সেলাইমেশিন, পাঁচ ওয়ক্ত নমাজ আর আজানের শব্দ এবং অন্তহীন বেঁচে থাকার সংগ্রামের ঠিক এরকম একটি সময়ে বন্দর এলাকার রোজনামচায় নতুন একটি চরিত্রের আবির্ভাব হল। ডি সি বিনোদ মেহতা!

এলাকার বম্ব সাপ্লায়ার কার্তিক। জব্বার একদিন এসে কার্তিককে বলল, কোনো খবর পাচ্ছ? কার্তিক বিস্মিত। কী খবর? এলাকা নাকি গরম হচ্ছে? কার্তিক এরকম কোনো খবর পায়নি। তবে আচমকা তার থেকে বোমা সাপ্লাই বেড়ে গিয়েছে। তাহলে কি কোনো আগাম প্ল্যান চলছে? জানা যাচ্ছে না। তবে আচমকা একটা বড় ঘটনা ঘটল। প্রবল ঝামেলা শুরু হয়ে গেল দুই অপরাধ জগতের মধ্যে। ডিসি বিনোদ মেহতার স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশ আছে। পাবলিককে বিপদে ফেলা যে কোনো গোলমাল ঠেকাতে প্রথমে নরমে বোঝাতে হবে। তারপর টিয়ার গ্যাস। কিন্তু এসব কিছুতেই সামলানো না গেলে কোনো দ্বিধা না করে গুলি চালাবে। ক্রিমিনালদের প্রতি বিনোদ মেহতার কোনো দয়া মায়া নেই। তাঁর ফিলোসফি হল যেভাবেই হোক সাধারণ খেটে খাওয়া শান্তিপ্রিয় মানুষ যেন কোনোভাবেই নিজেদের বিপন্ন বোধ না করে। আর এটা যেন কেউ না ভাবে যে গার্ডেনরিচ মেটিয়াব্রুজে আইনের শাসন নেই। দাদা মস্তান মাফিয়ারাই এলাকায় প্যারালাল সরকার চালাবে এসব বরদাস্ত করা হবে না। সোজা কথা। একজন ডিসি লেভেলের অফিসারকে কেউ কোনোদিন ওয়াটগঞ্জ, মেটিয়াব্রুজ, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচে নিত্যদিন এত বেশি টহল দিতে দেখেনি। তাই সেদিন গুলি চলল। আর দুই যুবকের মৃত্যু হল। ব্যস! জ্বলে উঠল ভিতরে ভিতরে গার্ডেনরিচ। আর এই সুযোগটি নিতে স্রেফ সময়ের অপেক্ষায় রইল লোকাল মাফিয়া গোষ্ঠী। পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে সঙ্গে পেলে আর কী চাই। আর ওই ঘটনার পরই খুনি পুলিশের শাস্তির দাবিতে ওয়াটগঞ্জ থেকে গার্ডেনরিচ বিস্তীর্ণ এলাকার গলি মহল্লার দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়ে গেল। কিন্তু এসবের আড়ালে আসলে কারা আছে? শুধুই কি মাফিয়া জগৎ না। বিনোদ মেহতা নিজের নেটওয়ার্কে

ক্রমেই জানতে পেরেছে বন্দর এলাকার অপরাধ সাম্রাজ্য আর কালো অর্থনীতির করিডরটি চলে রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলনে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই কালো জগৎ। রাজনৈতিক সেই নেতাদের তাঁদের পার্টি রাশ টানে না। কারণ তাঁরা পার্টির ফান্ডে বিপুল যে টাকা জমা দেয় তার একটি বড় অংশই আসছে এই বন্দর থেকে। তাহলে আর পার্টি রাশ টানবে কেন? অতএব ওই নেতা বা তাঁদের টিম উত্তরোত্তর হয়ে উঠেছে অঘোষিত সম্রাট। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের একদা ফেলে যাওয়া সাম্রাজ্যের অধুনা অধীশ্বর। সুতরাং বিনোদ মেহতার লড়াইটা হয়ে গেল ত্রিমুখী। লোকাল পুলিশের একাংশ, রাজনীতিক এবং মাফিয়া গ্যাং। এই তিন প্রতিপক্ষ একদিকে। আর অন্যদিকে তিনি একা।

ঠিক ১০ টায় ফোন বাজছে বিনোদ মেহতার ঘরের ফোনে। ১৮ মার্চ। হোলির দিন। গতকাল ছিল দোলযাত্রা। শহরে ছুটির আমেজ। কোনো গোলমালের খবর তেমন নেই। আর হোলির দিন একটু হালকা প্রিকশান নিলেই হবে। প্রধানত অবাঙালি শ্রেণির মধ্যেই প্রচলিত আজকের উৎসব। ফোন বাজছে। বিনোদ মেহতাকে রাইটার্স বিল্ডিং-এর এক প্রশাসনিক কর্তা বললেন, ওয়াটগঞ্জ পিএস (পুলিশ স্টেশন) ঠিক আছে? মেহতা বললেন, স্যার শুনেছি কিছু ঝামেলা হয়েছে। লোকাল পিএস গেছে স্যার! ওপার থেকে কর্তাটি বললেন, বাট সিএম পার্টি সোর্সে খবর পাচ্ছেন ঝঞ্ঝাটটা নাকি বাড়ছে। একটু মনিটর করে আমায় রিপোর্ট দিন তো! মেহতা বললেন, স্যার আমি স্পটে যাচ্ছি। গুড! বলে ফোন রাখলেন সেই কর্তা। বিনোদ মেহতা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে একমাত্র বডিগার্ড মোক্তার আলি। ডিসি আসছেন। এই খবর দেওয়া হল থানায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে আগেই স্পটে পৌঁছেছেন বিনোদ। ঠিক আধঘণ্টা পর স্থানীয় থানার পুলিশ ফোর্স আরও কয়েকজন অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে হাজির। এবং তাঁরা আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ইটবৃষ্টি। এবং সঙ্গে বোমাবাজি। পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রবল বোমা পড়ছে গার্ডেনরিচ রোডে। দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল বাহিনী। একটি রইল ব্যাকআপ হিসাবে। বাকি টিম রাস্তা পেরিয়ে আক্রমণকারীদের পালটা জবাব দিতে এগোল। আচমকা একটা ইট সোজা এসে লাগল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ কে শর্মার মাথায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে

পড়লেন। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। এরকম একটি এসিপি র‌্যাংকের অফিসারকে এভাবে জখম হতে দেখে পুলিশ কিছুটা দিশাহারা। তাঁকে চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং সেই যাওয়ার পথে আবিষ্কৃত হল ডি সি বিনোদ মেহতার গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি নেই। কোথায় গেলেন বড়সাহেব? চালক জানালেন, সাহেব ভেতরে! সর্বনাশ! ভিতরে মানে? এই অন্তহীন সর্পিল রহস্যময় গলিগুলির ভিতরে? যেখান থেকে দলে দলে যুবক বেরিয়ে আসছে বোমা আর ইট নিয়ে? সঙ্গে কি ফোর্স আছে? চালক জানালেন কোনো বড় ফোর্স তিনি দেখেননি। শুধু বডিগার্ড মোক্তার। সঙ্গে আরও কিছু পুলিশ কর্মী আছেন। তাঁরা ওই সামনের দিকে প্রথমে গিয়ে তারপর আবার অন্য গলির মধ্যে ছুটেছেন। গোটা পুলিশ বাহিনীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কারণ গলিতে এখন আর ঢোকাও যাচ্ছে না। কমপ্লিট ব্যারিকেড। হ্যান্ড মাইক আনো। বললেন, এক অফিসার। হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা করা শুরু হল আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিন...আইন নিজের হাতে নেবেন না... আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন...এসব কথার কথা। কেউ শুনছে না। একের পর এক গলি তখন দুর্গ। বাইরে প্রহরা। ভিতরে কী চলছে? তখন ফতেপুরী ভিলেজ রোডের লাগোয়া রমানজান রোডে ছুটছেন বিনোদ মেহতা। মাথায় হেলমেট। প্রথমে ঢোকার পরই সামনের ভিড় থেকে বোমা আর ইটবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এবং মোক্তার আলি তৎক্ষণাৎ গুলি চালান। একটি আর্তনাদ শোনা গেল। কিন্তু কার গায়ে লাগল সেই গুলি? কিছু বোঝার আগেই আচমকা পাশের একটি গলি থেকে একঝাঁক জনতা বেরিয়ে এসে তাড়া করল। তাদের হাতে রড, তলোয়ার এবং কান্ট্রিমেড রিভলবার। এরা কোনোভাবেই থামবে না। অতএব আগে বাঁচতে হবে। বিনোদ মেহতা পিছু হটলেন। তিনি ধরে রেখেছেন এখনই আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে বাকি ফোর্স। থানা আসছে না কেন এখনও? মোক্তার কোথায় গেল? দুটো ইট এসে লাগল বিনোদের কাঁধে আর পায়ে। তিনি আরও জোরে দৌড়োচ্ছেন। পিছনে উন্মত্ত একদল লোক। মুখে আওয়াজ মার ডালো...সামনেই মসজিদ। একমিনিটও ভাবার সময় নেই। মসজিদ চত্বরে ঢুকে পড়লেন বিনোদ। কিন্তু নিমেষের মধ্যে গোটা মসজিদ ঘিরে ফেলা হল। মানা হল না কোনো রীতিনীতি। বোমা বৃষ্টি চলছে। মসজিদ লক্ষ্য করেই। এরকম অবস্থায় মসজিদ-এর

মধ্যে লুকিয়ে লাভ নেই। এখনই ওই জনতা ঢুকে আসবে। বিনোদ একটি জানালা থেকে রাস্তায় লাফ মারলেন। গার্ডেনরিচ রোডের দিকে বাতিকল। আর একটু দূরে যেতে পারলে গার্ডেনরিচ রোডে যাওয়া যাবে। কিন্তু জনতা পিছনে চলে এসেছে। সবথেকে বড় আতঙ্ক হল সংখ্যাটা বাড়ছে। প্রতিটি গলি পেরনোর সময় আরও দু চারজন করে তাড়া করতে শুরু করেছে। সামনেই হাউস নম্বর ২২৮ বাই থ্রি। ইতিমধ্যেই সেখানে সাহেবের কাছে চলে এসেছেন মোক্তার। তিনি সামনে রুখে দাঁড়ালেন। সাহেবকে বললেন, স্যার আপনি পালান। আমি দেখছি। বিনোদ পাগলের মতো হাত ধরে টানছেন মোক্তারকে। মোক্তার পাগল হয়ে গেলে নাকি? তুমি একা কী করবে? চলো আমার সঙ্গে। গোটা ঘটনাটি দেখছে ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া এই সরু গুলির নিরীহ কিছু সাধারণ বাসিন্দা। তারা জানে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিলে তাদেরও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। কারা আছে ওই দলে? এলাকার একের পর এক নটোরিয়াস ক্রিমিনাল। বিনোদ মেহতা জোর করে মোক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আবার ছুটলেন। গার্ডেনরিচের বন্দর এলাকায় এক গলির গলি তস্য গলিতে ভরদুপুরে চলছে মরণপণ এক চেজিং। কোথায় আর বেশিদূর যাবেন? উপায় নেই। এবার আবার সামনে পেলেন দুটি বাড়ি। মোক্তার ঢুকলেন সামনের বাড়িতে। বিনোদ ঘটনাচক্রে যে বাড়িতে ঢুকেছেন সেটি এক পুলিশ কনস্টেবলের বাড়ি। আবদুল লতিফ খান। দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে দিয়েছিল মহম্মদ হাদিস খান। আবদুল লতিফ খানের পুত্র। বিনোদ হাঁফাচ্ছেন। তিনি এতক্ষণে পিছনে আসা জনতার কয়েকজনকে চিনে গিয়েছেন। নামকরা গুন্ডা। আর আচরণ থেকেই পরিষ্কার জনতার হাতে গণপিটুনির নামে এদের আজকের প্ল্যান তাঁকে হত্যা করা। মহম্মদ হাদিস খান কাঁপছে ভয়ে। খাকি পোশাক। মাথায় হেলমেট। হাতে পিস্তল। গোটা শরীর ঘামছে। মাথায় যেন সামান্য রক্তের ছাপ। বিনোদ মেহতা কোনোমতে বললেন, ভেতরে ঢুকতে দাও...আমাকে মেরে ফেলতে আসছে..। হাদিস সরে এল দরজা ছেড়ে। দ্রুত ঘরে ঢুকে এলেন বিনোদ। কেউ কি দেখেছে তাঁকে এই বাড়িতে ঢুকতে? তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন না। পাছে বাইরে থেকে শ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়! শুধু কোনোমতে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ করেছে হাদিস। একটুক্ষণের স্বস্তি। এক সেকেন্ড......তিন সেকেন্ড....এক মিনিট...প্রতিটি মুহূর্ত যেন

একটি করে ঘণ্টা। হঠাৎ হো হো হো হো করে শব্দ। খুঁজছে ওরা। এই বাড়ির বাইরে এসে পড়েছে। কী করবেন এখন বিনোদ? বিনোদ চাপা স্বরে জানতে চাইলেন বাথরুম কোনদিকে? তিনি নিজেকে এখানে নিরাপদ বোধ করছেন না। জানেন যে কোনো মোমেন্টে অ্যাটাক করবে। কারণ এই বাড়িতে তাঁকে ঢুকতে অনেকেই দেখেছে। তারা ভয়ে হোক বা ইচ্ছা করেই হোক বলে দেবেই। একটি হেরে যাওয়া লড়াইয়ের শেষ দৃশ্যের যেন অভিনয় সম্পাদিত হচ্ছে। কারণ বাথরুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন বিনোদ মেহতা। এক মিনিটের পরই দরজায় প্রবল ধাক্কা। তাঁকে টেনে বের করে আনা হল। কিচেনের সামনে দাঁড় করানোর পর বিনোদ মেহতা প্রথমেই বললেন, আমি ডিসি পোর্ট। তুমলোগ বহোত বড়ি এক গলতি কর রহে হো...মুঝ পর আঁচ আনে সে কেয়া হো সাকতা হ্যায় পাতা হ্যায় তুমহে?... খাকি ড্রেস, মাথায় হেলমেট। পুলিশ তো বোঝা গেল। ডিসি যে তার প্রমাণ কী? দুষ্কৃতীরা ভাবল বাঁচার জন্য ডিসি সাজছে। আসলে ডিসি. নয়। অতএব মারো! কিছু একটা পকেট থেকে বের করতে যাচ্ছিলেন বিনোদ। হয়তো আই কার্ড। কিন্তু সেই সুযোগ পাননি। প্রথমেই মাথায় একটি লোহার রড দিয়ে মারা হল। ওই ধাক্কা সামলাতে পারেননি বিনোদ। মাটিতে পড়ে যান। এবং তৎক্ষণাৎ হেলমেট খুলে আসে। লোহার রডটি ছিল নাসিমের হাতে। আশেপাশে জড়ো হওয়াদের মধ্যে রয়েছে লোকমান, পুত্তন, চৌধুরী আর আখতার আর আলি। হেলমেট খুলে যেতেই খোলা মাথায় দ্বিতীয়বার লোহার রড দিয়ে মারা হল। যাতে মাথাটি চৌচির হয়ে যায়। বিনোদ মেহতাকে ঘিরে তখন উন্মত্ত কিছু হত্যাকারী। বিনোদ তখনও জানেন না একটু আগেই মোক্তার আলিকে আশ্রয় নেওয়া বাড়ি থেকে বের করে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পা কেটে নেওয়া হয়েছে। শরীরের কয়েকটি অংশ ছিন্ন করা হয়েছে। আর এবার রডের দ্বিতীয় আঘাতে বিনোদের মাথা ফেটে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। এরপর বাকিদের পালা। তলোয়ার আর ড্যাগার চালানো হল। কেউ পেটে। কেউ পিঠের দিক থেকে। বুকের বাঁদিক লক্ষ্য করে একবার ছুরি ঝলসে উঠল। একটুখানি কেঁপে নিথর হয়ে গেলেন বিনোদ মেহতা। তবে তাঁর চোখটি তখনও খোলা। সেটিকে ছুরি দিয়ে কেটে দেওয়া হল। এখানেই সমাপ্ত নয় এই রক্তলীলা। কলকাতার বুকে হোলির দিন এক আইপিএস অফিসারের

শরীর থেকে এরপর পুলিশের ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে নগ্ন করা হল। তাঁকে ওই সরু গলির পাশের নর্দমায় পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হল। আর বডিগার্ড মোক্তারের ভাগ্যে কী ঘটল? তাঁর ছিন্নভিন্ন শরীরে স্রেফ আগুন ধরিয়ে দিল একঝাঁক উন্মাদ। কলকাতা পুলিশ, রাজ্য সরকার এবং ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কাছে কলঙ্কদাগ হয়ে গেল ডিসি পোর্ট বিনোদ মেহতা হত্যাকাণ্ড।

মাত্র ১৯ বছর বয়স ছিল বীণার। বিয়ে হয়েছিল মাত্র ২৪ বছরের যুবকের সঙ্গে। ছেলেটি ছিল পাঞ্জাবি পরিবারের এক নিখাদ ভালোমানুষ। আইপিএস পরীক্ষা দিয়ে সবেমাত্র নতুন পোস্টিং। কী সুন্দর এই বাংলাটা তাই না? লোকগুলো একেবারে আমাদের পাঞ্জাবের মতো জানো তো? অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ জাতি। বিনোদ এভাবেই প্রতিদিন খাবার টেবলে গল্প করত। জেলাগুলোয় পাওয়া যেত এক নিরালা নির্জনতার সময়। অবসরে বই পড়ত বিনোদ। কোনোদিন সেভাবে অপরাধ জগতের কাহিনি কিংবা কোন অপারেশনে তাঁকে কতটা বিপদে পড়তে হয়েছিল এসব কথা বলেনি বিনোদ। বীণা মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন এই লোকটিকে পাশে পেয়ে। দুজনের সময় কীভাবে কাটত? বিনোদের প্রিয় শখ ছিল হর্স রাইডিং আর সুইমিং। কিন্তু একা নয়। ছুটির দিন সকালে বীণাকে জলদি ঘুম থেকে তুলে বিনোদের একমাত্র কাজ ছিল তাঁকে রাজি করানো একসঙ্গে হর্স রাইডে যাবে। কলকাতাকে বিশ্বের সেরা শহর লাগে বিনোদের। কারণ একটাই। এই যে ময়দান। এরকম এক মন ভালো করা সবুজের সমারোহ আর কোথায় আছে? ভালো লাগে কলকাতা। ভালো লাগে কলকাতার মানুষগুলোকে।

কতবার তো বাড়ি থেকে বলছিল দিল্লিতে ডেপুটেশনে চলে আসতে। তাহলে আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকা সম্ভব। কিন্তু না। বিনোদ যাবেন না কলকাতা ছেড়ে। ৯ বছরের পুত্র ঋশুকে সঙ্গে নিয়ে এই দম্পতিটি ছিল সুখী পরিবারের একটি ফোটোফ্রেম। তাই ১৯৮৪ সালের ১৮ মার্চের পর বীণা মেহতার পৃথিবীটি দুলে উঠেছিল। বিনোদকে এভাবে কেউ হত্যা করতে পারে? বিনোদকে? সম্ভব নাকি? বিশ্বাসই করেননি বীণা। তিনি চলে গিয়েছিলেন এক অতল ডিপ্রেশনের অন্ধকার জগতে। দিনের পর দিন চলেছে চিকিৎসা।

পুত্র ঋশুকে নিয়ে এক অবসাদগ্রস্ত মায়ের সেই লড়াই চলেছিল মাসের পর মাস বছরের পর বছর। কলকাতা পুলিশে নিয়মমাফিক চাকরি হয়েছিল। কিন্তু ২৯ বছর কোনো প্রমোশন হয়নি। বিনোদ মেহতার স্ত্রী। এই পরিচয়টি হয়ে উঠেছিল যেন এক মিউজিয়মে দ্রষ্টব্য বস্তু। সেই বীণা আর বিনোদের পুত্র পরবর্তী সময়ে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। পুত্র অনেকবার বলেছিলেন মাকে সেখানে চলে যেতে। কলকাতা তো তাঁদের হৃদপিন্ডকে কেড়ে নিয়েছে। তাহলে কেন কলকাতায় থাকব আমরা? কিন্তু বীণা কলকাতা ছেড়ে যেতে চাননি। বিনোদ এই শহরকে ভালোবেসেছিল। এই শহরে বিনোদ আছে। কিন্তু এই শহর কী মনে রেখেছে বিনোদ মেহতাকে?

১৯৮৪ সালে গার্ডেনরিচের একাধিক স্থানে অভিযান আর সার্চ অপারেশন হবে এরকম আগেই ঠিক ছিল। তাহলে সেদিনই বেছে বেছে দাঙ্গা বাঁধানোর উপক্রম হয়েছিল কেন? কেনই বা নকল দাঙ্গার আতঙ্ক ছড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল গুন্ডাবাহিনী? অপারেশনের ঠিক আগের দিনই কেন একের পর এক পুলিশ অফিসার ছুটির দরখাস্ত দিয়ে ছুটি নিয়েছিলেন? অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ইদ্রিশ আলিকে এত কষ্ট করে গয়া থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হল। অথচ লালবাজারের পুলিশ লক আপে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। কেন? জেরার সময় ঠিক কোন কোন রাজনীতিকের নাম ফাঁস করেছিল ইদ্রিশ আলি? শুধুই মাফিয়া অথবা স্মাগলার? নাকি এদের পিছনে থাকা সেই রাজনীতিকদের সাজানো বাগানে হানা দিয়েছিলেন বিনোদ মেহতা। তাই কি তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি কিন্তু! কে ছিল সেই হানিফের 'সাহাব'? জানা গেল না আজও....।

৯

হ্যালো জেন্টলম্যান।

ব্লন্ড চুল। টিপিক্যাল আমেরিকান উচ্চারণে মে আই। বলে একটি ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়ল লোকটি। হংকং-এর কাই টেক এয়ারপোর্টের ভি টেন রেস্তোরাঁয় বাইরের কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এই ছোট্ট পরিসরটি শুধুই এয়ারক্র্যাফট ক্রু, পাইলট আর গ্রাউন্ড মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য। ১৯৫৫ সালের ১১ এপ্রিল। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। ভেতরে কুলার চলছে। তবুও ঘামছেন এয়ার ইন্ডিয়া সেভেন ফোর নাইন এ এয়ারক্র্যাফটের পাইলট ডি কে জাতার, কো পাইলট এম সি দীক্ষিত, মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার অনন্ত কার্নিক, নেভিগেটর জে সি পাঠক। এয়ারহোস্টেস গ্লোরিয়া বেরিকে দেখা যাচ্ছে না। সে কোথায় গেল? কার্নিক বললেন, গ্লোরিকে দেখলাম ডিউটি ফ্রির দিকে যেতে। হাসলেন পাঠক। আরে এই একদিনের মাত্র জার্নি। তার মধ্যেও মিস গ্লোরি আবার কেনাকাটা করবে? উফফ, আমার বউও গেলে ছেঁকে ধরবে কী কী এনেছি হংকং থেকে? কালই তো বম্বে ফেরত যাব। কী দরকার ভাই পয়সা খরচ করে। সকলেই হেসে উঠলেন উচ্চস্বরে। ঠিক তখন সেই আগন্তুকের প্রবেশ। একবারও জানতে চাইল না ওই টেবিল বুকড কিনা..একবারও টেবিলে বসা অন্যদের অনুমতির অপেক্ষাই করল না..। স্রেফ ‘মে আই’ বলে বসে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন সোজা ক্যাপ্টেন জাতারের দিকে তাকিয়ে, আপনারা তো চাইনিজ ডেলিগেশন নিয়ে বান্দুং যাচ্ছেন? তাই না? এয়ার ইন্ডিয়ার ক্রু ও পাইলটরা পরস্পরের দিকে একবার দ্রুত চোখাচোখি করলেন। কেউ কোনো উত্তর না দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের দিকে। সে অগ্রাহ্য করল। আবার বলল, এইসব চিংকসগুলো খুব সিক্রেটিভ হয়..আপনাদের কিছুই বলছে না তাই না? চিনা প্রতিনিধিদের ‘চিংকস’ বলে লোকটি বুঝিয়ে দিল সে অবশ্যই আমেরিকান। কিন্তু কে এই লোকটি? এয়ারপোর্টের স্টাফ? আজ হংকং এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ চার্টার্ড প্লেন যে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ যাবে একঝাঁক চীনের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি নিয়ে, সেটা আপাতত গোপন আছে। একমাত্র এয়ারপোর্টের স্টাফদের পক্ষে জানা সম্ভব। এমনকী

কোনো অন্য ফ্লাইট রাখাই হয়নি ওই সময়সীমায়। গোপনীয়তা বজায় রাখতে মিলিটারি রানওয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ লোকটি জানল কীভাবে? কোন ডিপার্টমেন্ট? আপনারা তো বাই ইভনিং রিচ করবেন জাকার্তা তাই না? উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এবং মুখে একটা কূট হাসি ঝুলিয়ে। একটু কড়াভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন দীক্ষিত। তখনই এয়ারপোর্টের এক কর্মী এসে গেলেন। ক্যাপ্টেন জাতারকে তিনি বললেন, স্যার, প্যাসেঞ্জারস লাগেজ লোড করা কমপ্লিট। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স? জানতে চাইছেন ক্যাপ্টেন! একটু থমকে সেই কর্মী উত্তর দিলেন, না কাস্টমস এক্সামিনেশন নিডেড স্যার.. দে আর ডিপ্লোম্যাটস। সামনের লোকটির মুখে একথা শুনে চাপা হাসি। হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওকে জেন্টলম্যান...হ্যাভ আ নাইস জার্নি। বলেই দ্রুত হেঁটে চলে গেল। সকলেই এক মুহূর্তের জন্য চিন্তান্বিত। লোকটি কে? কেনই বা এল? রহস্যময় কিছু আচরণ করে আবার উধাও হয়ে গেল! এয়ারপোর্ট কর্মীকে জিজ্ঞাসা করা হল এই বিদেশি লোকটা কে? চিনতে পারছ? সেই কর্মী মাথা নাড়িয়ে বললেন, আমি তো জানি না স্যার...চিনি না..।

ট্রানজিট ড্রিল সমাপ্ত। রিফুয়েলিং শেষ। এবার উড়ে যেতে প্রস্তুত 'কাশ্মীর প্রিন্সেস'। এই এয়ারক্র্যাফটের নাম। প্যাসেঞ্জার কারা? চীনের একদল হাই পাওয়ার প্রতিনিধি। কিন্তু শেষ মুহূর্তেও তাঁদের নাম পরিচয় জানা যাচ্ছে না। একেবারে টেক অফের পর তাঁদের টিকিট চেক করা হবে। সেই সময়, একটি লিস্ট তৈরি করে রাখতে হবে এয়ারক্র্যাফটে। সেটি বান্দুং-এ গিয়ে জমা করতে হবে চাইনিজ আর ভারতীয় অফিসিয়ালদের হাতে। আপাতত এটাই বলে দেওয়া হয়েছে এই এয়ারক্র্যাফটের কর্মীদের। কিন্তু সব কিছু চাপা থাকে? ভারতের এয়ারইন্ডিয়ার এই হাই প্রোফাইল বিমানে যে চীনের প্রতিনিধিরা যাবেন, তার মধ্যে থাকার কথা স্বয়ং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের, সেকথা ক্যাপ্টেন জাতারের এই টিম জানে। তাই এত গোপনীয়তা? আফ্রো এশিয়ান কনফারেন্স হবে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। জওহরলাল নেহরু যার প্রধান উদ্যোক্তা। এপ্রিলের ১৮ থেকে ২৪ হবে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ। তাই তার নাম বান্দুং কনফারেন্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নির্জোট আন্দোলনকে আরও অগ্রসর করতে সম্মেলনের সফল হওয়া খুব দরকার। সবেমাত্র

স্বাধীন হওয়া এশিয়া আর আফ্রিকার ২৫টি রাষ্ট্র মিলে এই সম্মেলনের আয়োজক। বোম্বে থেকে পিকিং। পিকিং থেকে ব্যাংকক। ব্যাংকক থেকে হংকং। হংকং থেকে জাকার্তা। এই হল এয়ার ইন্ডিয়ার রুট। চীনের অনুরোধে জওহরললাল নেহরু এয়ার ইন্ডিয়াকে পাঠিয়েছেন ওই হাইপ্রোফাইল ডেলিগেট টিমকে জাকার্তা নিয়ে আসার জন্য।

গুড আফটারনুন জেন্টলমেন...এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলকামস ইউ অ্যাবর্ড দ্য কাশ্মীর প্রিন্সেস...দ্য লোকাল টাইম ইজ টুয়েলভ পাস্ট টেন আওয়ারস....উই আর অ্যাবাউট টু টেক অফ..। মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এল অন বোর্ড এয়ারক্র্যাফটের মধ্যে। গ্লোরিয়া বেরি। একমাত্র এয়ারহোস্টেস। নর্মাল রুটিন হল লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন বলা। এক্ষেত্রে শুধুই জেন্টলমেন বলার কারণ হল এয়ারক্র্যাফটে কোনো মহিলা যাত্রী নেই। আকাশ নীল, একদিকে সমুদ্র। তিনদিকে পাহাড়। হংকং এয়ারপোর্টের এই অংশটিতে ল্যান্ডিং টেকঅফের জন্য চাই প্রচণ্ড অভিজ্ঞ আর আত্মবিশ্বাসী কোনো পাইলট। যেমন এই ক্যাপ্টেন জাতার। তিনি অনায়াসে এসব টেক অফ করে চলেছেন বিগত ৮ বছর ধরে। সাত ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটের নন স্টপ ফ্লাইট শুরু করল কাশ্মীর প্রিন্সেস। এবং ততক্ষণে এটিসি থেকে কোড ল্যাংগুয়েজে পাইলটকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে চৌ এন লাই..চিনের প্রিমিয়ার বিমানে নেই। ওঠেননি। কেন? আশ্চর্য তো! ভিআইপি মুভমেন্ট লাস্ট মোমেন্টে ক্যান্সেল হলে আগে থেকে জানানো নিয়ম। সেসব করা হল না। অ্যানাউন্সমেন্টের পর ফ্লাইট। মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার অনন্ত কার্নিকের পাশে এসে বসলেন গ্লোরিয়া। বললেন, আমি এসব ভিআইপি ফ্লাইট পছন্দ করি না ইউ নো..। কার্নিক জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন। গ্লোরিয়া একটা সফট ড্রিংকসের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললেন, সিকিউরিটি নিয়ে ভয় লাগে। আর এত কড়াকড়ি নিয়ে কাজ করা যায় নাকি? কার্নিক হাসলেন।

আরে ধুস...একদম এসব ভেব না। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ..। কিচ্ছু চিন্তা নেই। কাল এই সময় আমরা সবাই বম্বে। লিভ ইট। এনজয় দ্য ড্রিংক। তোমারটা কি অরেঞ্জ? গ্লোরিয়া হেসে বলল, জানো তো ডিকুনহো ক্যামেরা এনেছে। ডিকুনহো হলেন একজন কেবিন ক্রু। তাঁর ফোটো তোলার শখ সবাই জানে। জাকার্তায় মাত্র কয়েকঘণ্টা থাকা।

আজ সন্ধ্যায় পৌঁছে, কাল ভোরেই ব্যাক। এইটুকুর জন্য আবার ক্যামেরা! পাগল আছে ডিকুনহো। হাসলেন দুজনেই। কার্নিকের খিদে পেয়েছে। উঠে গিয়ে দুটো স্যান্ডউইচ, একটা কেক আর কফি নিয়ে রেডিও অফিসারের টেবলে বসলেন। ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। সঠিক রুটে এগোচ্ছে 'কাশ্মীর প্রিন্সেস'। ঠিক আধ ঘণ্টা পর ককপিট থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন জাতার। আপাতত প্রিন্সেসের দায়িত্ব কো পাইলটের হাতে। একটা কফি নিয়ে ক্যাপ্টেন জাতার নেভিগেটর জে সি পাঠকের কাছে এসে বললেন, পাঠক, আমরা ঠিক কোথায়? পাঠক চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে হাতে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে চার্টের উপর রাখলেন। বললেন, স্যার, এই যে..আমরা এই মাত্র প্যারাকেল আইল্যান্ড ক্রস করলাম। এখন বম্বে রিফের উপর দিয়ে যাব। বম্বে রিফ? হাসলেন জাতার। কী আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখো পাঠক! সাউথ চায়না সমুদ্রের একটা ছোট কোরালের টিলার নাম কে যেন দিয়েছে ভারতের একটা শহরের নামে..। অদ্ভুত না? পাঠকও হাসলেন। ককপিটে ফিরে এসে দীক্ষিতকে সিঙ্গাপুর কন্ট্রোলকে ধরতে বললেন ক্যাপ্টেন জাতার। দীক্ষিত মাইক্রোফোন নিয়ে সিঙ্গাপুর কন্ট্রোল টাওয়ার ট্রাই করছেন। হ্যালো সিঙ্গাপুর..দিস ইজ ভিক্টর ইকো পাপা কলিং..(এটাই হল কাশ্মীর প্রিন্সেসের রেডিও কল সাইন, কোড ল্যাংগুয়েজ)। পজিশন ল্যাটিচিউড ফোর নর্থ অ্যান্ড লংগিচিউড ওয়ান ও থ্রি ইস্ট...হাইট এইট্টিন থাউজ্যান্ড ফিট...। সিঙ্গাপুর কন্ট্রোল রুমের ভয়েস স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে... বেশ চিৎকার করে জানতে চাইছে, চাইনিজ প্রিমিয়ার কি এয়ারক্র্যাফটে আছেন? দীক্ষিত তাকালেন ক্যাপ্টেনের দিকে। ক্যাপ্টেন জাতার মাথা নাড়ার পর দীক্ষিত মাইক্রোফোন মুখের কাছে নিয়ে এসে বললেন, নেগেটিভ....। অর্থাৎ না, তিনি নেই। বাট এরকম প্রশ্ন মিড এয়ারে পাইলটকে করার মানে কী? আর তখনই...

ভুউউস! শোঁ..শোঁ...শোঁ...। আচমকা তীব্র শব্দ শোনা গেল। প্রায় হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলে ঢুকে এলেন পাঠক। স্যার...রাইট উইং এ ফায়ার..। ফায়ার? আগুন? হ্যাঁ স্যার। তার আগে ব্লাস্ট হয়েছে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের কাছে। ব্লাস্ট? তাহলে কি স্যাবোটেজ? একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল ককপিটে। নিজের কেবিনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অনন্ত কার্নিক।

মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার। প্রবল হইচইয়ের শব্দে ঘুম ভাঙল। উঠেই বেরিয়ে এসে দেখলেন গ্লোরিয়ার মুখ হলুদ। চোখ স্থির। এক্সট্রা লাইফ জ্যাকেট বের করছে। কী হয়েছে গ্লোরি? ফ্যাকাশে ভাবে হাসার চেষ্টা করল গ্লোরিয়া...ফায়ার...। অনন্ত কার্নিক এয়ারহোস্টেস গ্লোরিকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন, বি ব্রেভ গ্লোরি...কোথায় ফায়ার?..আমাকে বলো... রিয়ার ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টে। ছুটে ককপিটে গেলেন কার্নিক। তাকালেন ক্যাপ্টেন জাতার। সেই সময় দীক্ষিত ঠান্ডা স্বরে জানতে চাইলেন, ক্যাপ্টেন, 'মে ডে' সিগন্যাল দেব? 'মে ডে' সিগন্যাল হল আকাশে উড়ান চলাকালীন বিরাট বিপদে পড়া এয়ারক্র্যাফটের এস ও এস কোড ওয়ার্ড, যার অর্থ যে কোনো সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে....যে কোনো ঘটনা হতে পারে, এমনকী ক্র্যাশ করার আগের মুহূর্তে পাইলট ইস্যু করেন 'মে ডে' সিগন্যাল।

এক মুহূর্ত ভাবলেন ক্যাপ্টেন। তারপর বললেন, এখনই দরকার নেই। আমি একটু ট্রাই করি কী করা যায়। শীতল স্বর ক্যাপ্টেনের। কার্নিক বললেন, ক্যাপ্টেন একটাই অলটারনেটিভ আছে.. ডিচ ইট...(অর্থাৎ সমুদ্রের জলে এয়ারক্র্যাফটকে ফেলা) তার আগে পরে ইমার্জেন্সি ডোর ওপেন করে সবাইকে বের করা হবে লাইফ জ্যাকেট দিয়ে। ঠিক তখনই ডি কুনহা এসে জানালেন চরম দুঃসংবাদ। হাইড্রলিক সিস্টেম ফেল করেছে স্যার। সর্বনাশ। তার মানে তো ক্র্যাশের দিকে এগোচ্ছে। সকলের মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছে। কোনো আশা নেই? ক্যাপ্টেন জাতার শুধু কো পাইলটকে বললেন, ডিক্কি তুমি কন্ট্রোল নাও। আমি একটু দেখে আসি ফায়ারের কী অবস্থা.. তারপর দেখি কী করা যায়। দীক্ষিত অটোমেটিক পাইলট কন্ট্রোল সুইচ অফ করে ম্যানুয়াল কনভারসন করতে শুরু করলেন। কারণ ততক্ষণে বাঁদিকে হেলে যাচ্ছে এয়ারক্র্যাফট। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ককপিটে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন। আর ধীর কণ্ঠে বললেন, দীক্ষিত মে ডে সিগন্যাল পাঠাও। ততক্ষণে কার্নিক তাঁর কাজে নেমেছেন। কীভাবে আগুন লাগল? বিস্ফোরণের ফলে প্রথম সন্দেহ হয়েছিল। কিছুপরেই নিশ্চিত হওয়া গেল কেন এই বিস্ফোরণ আর কেন এই আগুন দ্রুত ছড়াচ্ছে। টাইম বম্ব! রাখা হয়েছিল রাইট হুইলের উপরের ক্যাভিটিতে। আর তার কাছেই ফুয়েল ট্যাংক। সেই টাইম বম্ব ব্লাস্ট করেছে। গ্লোরিয়া আর ডি কুনহোকে বলা হল

ফায়ার এস্টিংগুইশার নিয়ে চেষ্টা করতে। ততক্ষণে ভিতরে চলে এসেছে আগুন। কিন্তু ওই লেলিহান আগুন সামান্য হ্যান্ড এস্টিংগুইশার দিয়ে সামলানো সম্ভব নয়। তাহলে উপায় কী? ততক্ষণে ভয়ংকরভাবে প্লেন দুলছে। কারণ প্রায় রাইট উইং ভস্মীভূত। একটু পরই ফুয়েল ট্যাংকে আগুন পৌঁছবে। তারপর মিড এয়ারেই বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র উপায় ছিল কাছে কোনো ভূমিখণ্ডে ল্যান্ড করা। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ সবথেকে কাছের ভূমিখণ্ড আপাতত সিঙ্গাপুরে। প্রায় ৩৫০ মাইল দূরে। তাহলে? অবশেষে যেটি প্রত্যাশিত তাই স্থির হল। ক্যাপ্টেন জাতার জানিয়ে দিলেন আমরা ডিচ করছি। অর্থাৎ জলেই ঝাঁপ দেবে 'কাশ্মীর প্রিন্সেস'। এতক্ষণে ককপিটের এই সিদ্ধান্তগ্রহণের আলোচনায় কারও মাথায় আসেনি প্যাসেঞ্জারদের কথা। সেখানে কী হচ্ছে? জলে ঝাঁপ দিতে হলে এখনও সমস্ত যাত্রীকে তো তৈরি করতে হবে! অনন্ত কার্নিক কেবিনের দরজা খুলে সামনে এসেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। প্রত্যেক যাত্রী নিজেদের সিটে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আর প্রত্যেকের পরনে লাইফ জ্যাকেট। মুখের সামনে ইতিমধ্যেই অক্সিজেন মাস্ক ঝুলছে। অর্থাৎ তাঁরা ককপিটের মধ্যে যখন কী করা হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিলেন, তখন একাকী এয়ার হোস্টেস গ্লোরিয়া নিজের কাজটি সুসম্পন্ন করে চলেছেন নিঃশব্দে। প্রত্যেক যাত্রীর চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্ক। কয়েকজন প্রায় কাঁদছেন। সকলেই চাইছেন ইমার্জেন্সি ডোর খুলে দেওয়া হোক। অন্তত কিছুটা হলেও বাঁচার চান্স থাকবে ঝাঁপ দিলে। ততক্ষণে পোলান্ড থেকে আসা এক যাত্রী বুকে চেপে বসে পড়েছেন। চোখমুখ লাল। হার্ট অ্যাটাক হল নাকি? গ্লোরিয়া ছুটে গিয়ে তাঁকে ফার্স্ট এইড দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সকলেই প্রায় জানালা থেকে বাইরে তাকাচ্ছেন। তাকিয়ে আছেন গ্লোরিয়া। তাকিয়ে আছেন কার্নিক। তাকিয়ে আছেন পাঠক। যাত্রীদের চোখে শূন্যতা। কারণ জানালা থেকে বাইরে তাকানোর অর্থ জীবনের শেষ কয়েকটি মুহূর্ত বাইরের জগৎ, এই পৃথিবীর দৃশ্যকে দেখে নেওয়া...। এক মিনিট...দু মিনিট...তিন মিনিট...চার মিনিট... কয়েকজন যাত্রী চোখ বুজে ফেললেন। কেউ আর কোনোদিন নিজের পরিবারকে দেখতে পাবেন না। কেউই আর ছেলেমেয়ের মুখ দেখতে পাবেন না। বাঁদিকের জানালার দিক থেকে প্রথম ব্লাস্ট। আর আগুন এল কেবিনে। নেভিগেটর জি সি পাঠকের হাতে তখনও চার্ট। কারণ তাঁকেই বেছে দিতে হবে ঠিক

কোথায় ঝাঁপ দেবে কাশ্মীর প্রিন্সেস। বাঁচার ঝাঁপ হবে? নাকি মৃত্যুঝাঁপ হবে? ততক্ষণে ওই মরণপণ পরিস্থিতির মধ্যেই সকলের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছে এক উত্তর না মেলা প্রশ্ন। যে উত্তরটি না পেয়েই তাঁদের চলে যেতে হবে পৃথিবী ছেড়ে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আপাতত শেষ বারের বাঁচার আশা। পাঠক জানাচ্ছেন সামনেই ইন্দোনেশিয়া আর সিঙ্গাপুরের মাঝে নাতুনা গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস। সেখানে পাহাড়। আর জলে ঘেরা দ্বীপপুঞ্জে থাকতে পারে ভূমিখণ্ড। অন্তত সমুদ্রের জলে পড়ার পর বেঁচে গেলে লাইফ জ্যাকেটের ভরসায় কাছাকাছি সেই পাহাড়ি পাদদেশে পৌঁছনোর সম্ভাবনা আছে। আর কয়েক মিনিট। হু হু করে ধোঁয়া ঢুকছে কেবিনে। চোখ জ্বালা করছে সকলের। বুকে যেন পাথর বসে আছে। শ্বাস নেওয়া অসম্ভব। সকলে অপেক্ষা করছেন কখন ইমার্জেন্সি ডোর খোলা হবে। ক্যাপ্টেন জাতার সকলের দিকে একবার শেষবারের জন্য তাকালেন। বললেন, ডিক্কি, ওদের বলে দাও আমাদের প্লেনে কেউ অন্তর্ঘাত করে বোমা রেখেছিল। আমরা ঝাঁপ দিচ্ছি।

দীক্ষিত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাঁদিকে রাখা হুক থেকে মাইক্রোফোন খুলে আনলেন। বটন টিপলেন। কিন্তু একি! বাটন টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুরু হয়ে যায়। এখন কোনো শব্দ নেই। স্তব্ধ ট্রান্সমিটার। আবার বাটন টিপছেন দীক্ষিত। সেই অবস্থায় বললেন, দিস ইজ ভিক্টর ইকো পাপা..মে ডে..। কোনো সাড়া নেই অন্য প্রান্তের। তার মানে রেডিও ট্রান্সমিটার ডেড? ক্যাপ্টেন! আরটি ইজ ডেড আই বিলিভ...ইলেকট্রিকাল সিস্টেম ফেল করছে। ক্যাপ্টেন জাতার শূন্য চোখে তাকাচ্ছেন। শুধু যন্ত্রের মতো বললেন, ডিকুনহো জেনারেটর আর ব্যাটারি বন্ধ করে দাও। আর তোমরা সকলেই ভেস্ট পরেছ তো? আমি থ্রি বলার সঙ্গে সঙ্গে জাম্প করবে। আর আপনি? প্রায় মরিয়া হয়ে জানতে চাইছেন কার্নিক। ক্যাপ্টেন হাসলেন। বললেন, জেন্টলমেন..আই অ্যাম দ্য ক্যাপ্টেন...আই কান্ট লিভ দ্য সিট..অ্যাট এনি কস্ট...না স্যার.. এই রিস্কের মানেই হয় না। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্যাপ্টেন বলছেন, আমার জন্য ভেবো না। জ্যাকেট পরাই আছে। লেটস হোপ এভরিথিং উইল বি অলরাইট...। গ্লোরি...ওপেন দ্য ইমার্জেন্সি ডোর...ক্যাপ্টেন জাতারের শেষ বাক্য শোনা গেল....জেন্টলমেন....উই আর ডিচিং...। আর তখনই জল

স্পর্শ করার আগেই প্রবল শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ‘কাশ্মীর প্রিন্সেস’ ভস্মীভূত। ভেঙে পড়ল দক্ষিণ চীন সাগরে। আপনি কীভাবে বেঁচে গেলেন?

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন আর এন কাও। ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (সিকিউরিটি)। বস্তুত ভারতের সেরা গোয়েন্দা অফিসার। তাঁর সামনে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন অনন্ত কার্নিক। কাশ্মীর প্রিন্সেসের ফ্লাইট মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার। কার্নিক, নেভিগেটর জি সি পাঠক আর কো পাইলট দীক্ষিত বিস্ময়করভাবে বেঁচে গিয়েছেন। কীভাবে? ‘কাশ্মীর প্রিন্সেস’ জল স্পর্শ করার আগেই তাঁরা ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ককপিটের জানালা থেকে।

ইমার্জেন্সি ডোর খোলা হয়েছিল। অনেকেই ঝাঁপ দিয়েছেন বটে। কিন্তু ঝাঁপ দেওয়ার সময় পাননি হতভাগ্য বাকিরা। ১৬ জন যাত্রী। যাঁদের মধ্যে প্রায় সিংহভাগই দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, মারা গেলেন তৎক্ষণাৎ। পোল্যান্ডের সাংবাদিক জেরেমি স্টার্ক, অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেডেরিক জেনসেন। আর বাকিরা ভিয়েতমিং, চীনের সরকারি প্রতিনিধি, মিডিয়া ডিরেক্টরের দল। বাঁচলেন না এয়ার হোস্টেস গ্লোরিয়া। কারণ তিনি ঝাঁপ দেননি। সকলের পিছনে ছিলেন। যাতে যাত্রীরা আগে নিরাপদে ঝাঁপ দিতে পারে। কালান্তক আগুনে ঝলসে গেলেন গ্লোরিয়া। আত্মাহুতি দিয়ে চলে গেলেন ডিকুনহো। আর পাঁচদিন পর সিঙ্গাপুরের উদ্ধারকারী টিম এসে যখন ধ্বংসস্তূপ সন্ধান করছে, তখন দেখা যায় ভস্মীভূত একটি দেহ তখনও পাইলটের সিট আঁকড়ে রয়েছে। দেহটি ক্যাপ্টেন জাতারের। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যিনি ঝাঁপ দেননি।

ঠিক সাতদিন পর বম্বের হাসপাতালে শুয়ে আর এন কাও প্রশ্ন করলেন অনন্ত কার্নিককে, আপনি কীভাবে বেঁচে গেলেন? অনন্ত কার্নিক প্রশ্নটা শুনে বললেন, আমি কীভাবে বেঁচে গেলাম? এতক্ষণ আপনাকে প্রিন্সেসের ধ্বংস হওয়ার যে বিবরণটি দিলাম, আমার বেঁচে থাকার গল্পটি কিন্তু তার থেকেও দীর্ঘ। সেটি এই ঘটনার তদন্তের জন্য খুব প্রয়োজনীয় নয়। পরে আপনি ফ্রি হলে শুনবেন। চাইলে এখনও বলতে পারি। গোটা বিশ্ব কিন্তু জানতে চাইছে আসল তথ্য। কে রেখেছিল বোমা? আপনার যতটা সহায়তা দরকার,

আমি করতে রাজি। যখনই দরকার হবে বলবেন। কার্নিক ঠিকই বলেছেন, সেই ঝাঁপ দেওয়ার পর তিনি দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ৯ ঘণ্টা ভেসে ছিলেন। দুবার দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ভয়াল হাঙর প্রায় তাঁকে গিলে ফেলেছিল। কিন্তু দুবার অসীম সাহসিকতায় আর প্রবল মনের জোরে তিনি সেই গ্রাস থেকে বেঁচেছেন। ৯ ঘণ্টা সাঁতারের পর অবশেষে সম্পূর্ণ অজানা এবং জনবসতিহীন একটি ছোট পাহাড় ঘেরা দ্বীপে পৌঁছলেন। দ্বীপ নয়, আসলে একটি ভূমিখণ্ড। খাবার নেই। পানীয় জল নেই। কীভাবে বাঁচলেন কার্নিক, পাঠক এবং দীক্ষিত? সেটি সম্পূর্ণ আলাদা এক রোমহর্ষক কাহিনি। ঠিক যেরকম কাহিনি আমরা হলিউডের বহু সিনেমায় দেখেছি। আমরা বরং শুধু এটুকু জেনে নিই এক ব্রিটিশ মাছধরা জাহাজ উদ্ধার করে তাঁদের আলাদাভাবে। কিন্তু আর এন কাও এখানে হঠাৎ করে ঢুকলেন কীভাবে? তাঁর আবার কী ভূমিকা? কে তিনি? এখান থেকে শুরু হচ্ছে 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' রহস্যের দ্বিতীয় পর্ব। বিমান দুর্ঘটনার ঠিক পরেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছিল— যে বিমানে চীনের প্রিমিয়ার চৌ এন লাইয়ের যাওয়ার কথা ছিল সেই বিমানেই বোমা বিস্ফোরণ? তার মানে তো টার্গেট ছিলেন তিনিই। অথচ তাঁর যাওয়া যেখানে নিশ্চিত, সেখানে কেন তিনি এলেন না? কারণ হিসাবে জানা গেল চৌ এন লাইয়ের সেদিনই অ্যাপেন্ডিক্স ব্যথা প্রবল আকার নিয়েছিল। আর সেই বিকেলেই তাঁর অপারেশন হয় অ্যাপেন্ডিক্স। সেই ১৯৫৫ সালে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের পর একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের অন্তত কতদিন বিশ্রামে থাকা উচিত ছিল? উত্তরটি যাই হোক না কেন, চৌ এন লাই অপারেশন এবং সেই দুর্ঘটনার ঠিক তিন দিন পরই রেঙ্গুন চলে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় জওহরলাল নেহরুর। দুজনের একটি বৈঠকে চৌ এন লাই নেহরুকে বলেন, ব্রিটিশরা তদন্ত করবে বলেছে। আমি ওদের বিশ্বাস করি না। আমার দরকার নিরপেক্ষ একটি তদন্ত। আপনি প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন। নেহরু আশ্বাস দিলেন, আপনি চিন্তা করবেন না । আমাদের সবথেকে সেরা গোয়েন্দা টিম যাবে হংকং। কারণ আমাদের এয়ার ইন্ডিয়াকে টার্গেট করা হয়েছে। আমাদেরই এত সব অমূল্য জীবন চলে গিয়েছে। আমাকে জানতেই হবে এসবের পিছনে কে? ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর বি এন মল্লিককে নেহরু বললেন, সেরা টিম পাঠাতে হবে মল্লিক। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস্টিজ। অসামান্য এক

ইন্টেলিজেন্স অফিসার বি এন মল্লিক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কম কথা বলেন। কিন্তু অত্যন্ত কাজের ও ঠান্ডা মাথার। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর টিম চীন সীমান্তে পায়ে হেঁটে গিয়ে মাসের পর মাস থেকে ভারতের সীমান্ত চিহ্নিত করেছেন মান্ধাতার আমলের এক ব্রিটিশ মানচিত্র সঙ্গে নিয়ে। সেই কাহিনিগুলো কম রোমহর্ষক নয়। সুতরাং স্বাধীন ভারতের সেই প্রথম যুগে দুর্ধর্ষ সব গোয়েন্দা আর গুপ্তচর ছিলেন ভারতীয় আইবি দপ্তরে। বি এন মল্লিক নেহরুকে বললেন, ইটস ডান স্যার। তিনিই স্থির করলেন কে যাবেন হংকং এবং তদন্ত করবেন এই হাই প্রোফাইল ইন্টারন্যাশনাল কেস। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আর এন কাও। আর ডেপুটি সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স অফিসার চন্দ্র পল সিং এবং হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট ফ্যাক্টরির সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জি বিশ্বনাথন। এই হল গোয়েন্দা টিম। সেরার সেরা।

এই দায়িত্ব পেয়েই আর এন কাও সর্বাগ্রে বেঁচে যাওয়া তিন অফিসার কার্নিক, পাঠক এবং দীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ২০ এপ্রিল। বম্বে। একেবারে শুরু থেকে, শুনতে চান আর এন কাও।

কাও জানতে চাইলেন, এয়ারক্র্যাফটের একেবারে ডাইরেক্ট টাচে কারা আসতে পারে? কার্নিক : গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়াররা, রিফুয়েলিং স্টাফ, ট্রানজিট চলাকালীন মেনটেন্যান্স পার্সন। কাও : কারা মেনটেন্যান্সে আছে হংকং এ?

কার্নিক : এয়ারক্র্যাফট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।

কাও : আপনার সেদিনের টেক অফের আগের মোমেন্টগুলো মনে আছে মিস্টার কার্নিক? ঠিক কী কী হয়েছিল? মিনিট বাই মিনিট বলা সম্ভব? অবশ্য আপনার যদি শরীর পারমিট করে। এই স্টেটমেন্ট ভেরি মাচ ইমপরট্যান্ট ইউ নো..

কার্নিক হাসলেন। এবং একটা শ্বাস ফেলে পুরোটা বললেন। নোট নিচ্ছেন কাও। একটা জায়গায় এসে নলেন, বাট আপনি রেস্তোরাঁর পার্টটা ভুলে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে? বিস্মিত কার্নিক। রেস্তোরাঁ মানে? কাও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তারপর বললেন, সামথিং স্পেশাল হ্যাপেনড ইন দ্য গ্রাউন্ড রেস্টোরান্ট। আপনার মনে আছে? কার্নিকের ভুরু

কুঁচকে গেল। এবার মনে পড়েছে। ইয়েস। সেই ব্লন্ড চুলের লোক। যে আচমকা এসে জিজ্ঞাসা করেছিল ফ্লাইট সম্পর্কে। কাও জানলেন কীভাবে? কার্নিক বিস্মিত। তারপর বললেন, হ হয়েছিল..। কাও হেসে বললেন, ইওরস ইজ আ লাভলি মেমারি। আই অ্যাপ্রিসিয়েট! কেমন দেখতে সেই লোকটিকে? কার্নিক যথাসম্ভব বললেন। কাও বিদায় নেওয়ার আগের মুহূর্তে কার্নিক জানতে চাইলেন, বাট হাউ ডিড ইউ নো দ্যাট স্যার? আর এন কাও রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, আপনি সেদিন ব্লু শার্ট পরেছিলেন? আর গ্লোরিয়া সেদিন ওই রেস্তোরাঁয় আসেননি, তাই না? কার্নিক বুঝলেন আর এন কাও হংকং যাওয়ার আগেই হোমওয়ার্ক সেরে নিয়েছেন তুখড়ভাবে। রহস্যভেদ করতে পারলে এই লোকটাই পারবে। তীক্ষ্ণ নাক। চোখ সর্বদা যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে। ব্যাকব্রাশ করা চুল।

চিবুকে আত্মবিশ্বাস লেগে আছে। গম্ভীর থাকলেও ঠোঁট দেখে মনে হয় সর্বদা একটু স্মিত হাসি লেগে আছে। থ্রি পিস স্যুট পরা। এই হলেন ভারতের অন্যতম সেরা গোয়েন্দা আর এন কাও।

২৩ এপ্রিল ১৯৫৫। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আর এন কাও আর তাঁর সহকারী চন্দ্রপল সিং সিঙ্গাপুরে গেলেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিরেক্টর অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের সঙ্গে। ভারতের। তিনি ওখানে তখন। কারণ কাশ্মীর প্রিন্সেসের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার চলছে তখনও। তারই সুপারভাইজ করতে হচ্ছে। ভদ্রলোকের নাম জানা গেল ডক্টর এস রাহা। তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল ঠিক কী ধরনের টাইম বোমা ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছিল। আর সবথেকে বড় যে তথ্য সেটি হল কারা কারা সেদিন ওই গ্রাউন্ড মেনটেনান্সে ডিউটিতে ছিল। সেখান থেকে সোজা বান্দুং। জওহরলাল নেহরু কাওকে বললেন আপনি একবার কথা বলুন চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে। উনি আপনার সঙ্গে মিট করতে চান। চৌ এন লাই বললেন, আমাকে এক্সাকটলি বলুন তো ঠিক আপনি কী কী পাচ্ছেন? কাও একটা কাগজ নিয়ে স্কেচ করে আঁকলেন দক্ষিণ চীন সাগরের নাতুনা আইল্যান্ডের পটভূমি। এবং বোঝালেন কীভাবে ব্লাস্ট হয়েছিল কোথায়। এটা করতে গিয়ে

আঙুলে আচমকা কালি লেগে গেল কাও-এর। তারপর ঘটল এক আশ্চর্য দৃশ্য। চীনের প্রধানমন্ত্রী উঠে গিয়ে দরজা খুলে এক অ্যাটেন্ডেন্টকে ডাকলেন এবং একটা ট্রেতে টাওয়েল নিয়ে এসে বললেন, কালিটা মুছে নিন। কাও এতই অভিভূত এই ঘটনায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। চৌ এন লাই বললেন, আপনাকে একটা কথা দিতে হবে। যা ইনফেরমেশন পাবেন, ব্রিটিশ সরকারকে দেবেন না। আমি ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এম আই সিক্সকে বিশ্বাস করি না। কাও বললেন, বাট স্যার সেটা কীভাবে সম্ভব? হংকং-এ ঘটনা। সেখানে আমাকে তদন্ত করতে হবে। সেটা ব্রিটিশ পুলিশ ছাড়া তো সম্ভবই নয়। চৌ এন লাই একটু চুপ। তারপর বললেন, আপনি ঠিক করুন যে কতটা শেয়ার করবেন। তবে আমার পরামর্শ হল ওদের বেশি বিশ্বাস করবেন না। আমি কিন্তু তাই চেয়েছি ইন্ডিয়ার হেল্প। আর শুনেছি আপনিই বেস্ট! কাও সম্মতি জানালেন। এবং বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে তাঁর যাওয়াটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখলেন চীনের প্রিমিয়ার। আর তারপরই একটি হটলাইন কানেকশনে পিপলস লিবারেশন আর্মির মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরকে মান্দারিন ভাষায় কিছু বললেন। অন্যমনস্ক হয়ে একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে।

কাও এবার যাবেন অবশেষে হংকং। গাড়ি ছুটছে দ্রুত। আচমকা রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল কাও-এর। পিছনে একটা গাড়ি চাইনিজ নম্বরপ্লেট। খুব আস্তে আস্তে আসছে। তাঁকে কি ফলো করা হচ্ছে? কাও ভাবলেন। এখানে কে জানবে তাঁর গতিবিধি? জানা সম্ভব নয়। কেউ চেনেও না। তাহলে? সুতরাং ভুল ধারণা। কেউ ফলো করছে না। একটাই বিস্ময়। তাঁর গাড়ির চালক বারংবার সাইড দেওয়া সত্ত্বেও পিছনের গাড়িটি ওভারটেক করছে না কেন? কাও-এর গাড়ি খুবই আস্তে চলছে। তাঁর তাড়া নেই। আর একবার পিছনে তাকিয়ে দেখলেন ড্রাইভিং সিটের পাশে বসা এক সওয়ারি আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ভাবনা ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিন্তে কাও আর একবার খুললেন নোটবুক। ডুবে গেলেন কিছু মিসিং লিংকে। এবং সোজা এয়ারপোর্ট। সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সে শেষ। কাও এক কাপ কফি খাবেন। কফিশপে এগোলেন। আধ ঘণ্টা পর অ্যানাউন্সমেন্ট বোর্ডিংয়ে। কাও টাকা মেটানোর জন্য কাউন্টারে আসতেই আগে থেকে সেখানে থাকা একটি লং কোট পরা মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের লোক পেমেন্ট করছিলেন। তিনি

সরে যেতে কাও এগোলেন। এবং লোকটি পিছনে না তাকিয়ে এত দ্রুত সরে এলেন যে কাও কিছুটা ধাক্কা খেয়ে পিছু হটলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে কালো সুটকেস পড়ে গেল মাটিতে। তৎক্ষণাৎ লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। বলে উঠলেন, ও আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি...হোপ ইউ আর অলরাইত..। নিজেই সুটকেস কুড়িয়ে নিয়ে কাও-এর হাতে দিয়ে বললেন, এই নিন। আমি আসলে দেখতে পাইনি। কাও ঠান্ডা মাথায় লোকটিকে দেখলেন। হেসে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তিনি ঠিক আছেন। কিন্তু....কিন্তু....কিন্তু..। লোকটি চেনা নয়? কোথায় দেখেছেন? বান্দুং-এ? মনে আসছে না। কাও মুখে হাসি টেনে বললেন, ওহ নো নো ইটস পারফেক্টলি অলরাইট...। বলেই সুটকেসের দিকে তাকালেন কাও। এটা তো তাঁর নয়? আরে? কোথায় গেল তাঁর সুটকেস? নিমেষে চোখ পড়ল লোকটি চলে যাচ্ছে। অবিকল একই রকম সুটকেস হাতে। দুটিই একরকম। তাহলে? কোনটা তাঁর? এক্সকিউজ মি স্যার... কাও চিৎকার করলেন। লোকটি শুনতে পেল না। এগিয়ে যাচ্ছে আরও দ্রুত। ঠিক সেই সময় একজন মহিলা পাশ থেকে যাচ্ছিলেন। এবং লোকটিকে ডেকে দেখালেন যে কেউ একজন ডাকছেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে এবার মুখ ফেরাতেই হল। স্পষ্ট হতাশা মুখে। কাও দ্রুত এগোলেন। বললেন, আমাদের সুটকেস বদল হয়ে গিয়েছে মনে হয়। লোকটি বিস্মিত! অবাক চোখে তাকালেন কাও-এর হাতের দিকে। তিনি বললেন, আই সি! লেটস চেক ইট। দুজনের সুটকেস খুলে দেখা গেল সত্যিই অদল বদল হয়ে গিয়েছে। কী আশ্চর্য একেবারে একই রকম সুটকেস! হাসিমুখে করমর্দন করে এবার দুজনে দুদিকে চললেন। আরও আধঘণ্টা পর। এয়ারক্র্যাফটের মধ্যে বসে যখন সিকিউরিটি অ্যালার্ট সংক্রান্ত এয়ারহোস্টেসের অ্যাড্রেস চলছে, তখনও কাও-এর ভ্রু কুঁচকে আছে। কিছু একটা টিকটিক করছে তাঁর মনে। সামথিং ফিশি..। জানালা থেকে বাইরে তাকিয়ে আচমকা কাও-এর মনে পড়ল, ইয়েস.. এই লোকটিই ছিল পিছনের গাড়িতে। সেই যখন এয়ারপোর্টে আসছিলেন। ধূসর লং কোট আর চোখে রিমলেস চশমা ছিল তখনও। বাক্স বদলটা কি নেহা চোখে ধূলো দেওয়া? কাও তৎক্ষণাৎ বুঝলেন ওই যে নিজের সুটকেস খুলে লোকটিকে দেখিয়ে দেওয়া হল, ওটাই মস্ত ভুল হয়েছে। ওটাই কি আসলে প্ল্যান ছিল লোকটির? এক ঝলকে তাঁর সুটকেসটি দেখে নেওয়া কী আছে

ভিতরে? তার মানে কী? কাওকে এখন থেকেই ফলো করা হচ্ছে! কারা করছে? তাহলে কি কাশ্মীর প্রিন্সেসের ক্র্যাশ হওয়ার পিছনে আছে কোনো আন্তর্জাতিক প্ল্যান? কী সেটা? ইন্টারেস্টিং কেস তো? কী অপেক্ষা করে আছে হংকং-এ? রহস্য ভেদ করতে পারা যাবে তো? ভারতের প্রেস্টিজও তো যুক্ত হয়ে আছে! জাকার্তা এয়ারপোর্ট থ্রি এ থেকে ফ্লাইট টেক অফ করল। এবার লক্ষ্য হংকং। একরাশ দুশ্চিন্তা থাকলেও ঠান্ডা মাথার আইবি অফিসার আর এন কাও চোখ বুজলেন উইনডো সিটে বসে....।

সবটাই ধোঁকা। আসলে কিন্তু ভারতের গোয়েন্দা কর্তা আর এন কাও মোটেই সেই বিমানে হংকং যাচ্ছেন না। বিমানটি ছিল ভায়া পিকিং। এবং কাও জাকার্তা থেকে হংকং যাবেন বলে উঠলেও আসলে পিকিং এ নেমে যাবেন। এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে সেরকমই কথা রয়েছে। টিকিটও সেরকমই। কিন্তু জাকার্তার সকলে জেনেছে তিনি যাচ্ছেন হংকং। কেন এই লুকোচুরি? তাঁকে একটা জরুরি কাজে যেতেই হবে পিকিং। চীনের প্রিমিয়ারের সঙ্গে সেই বৈঠকটির দু ঘণ্টার মধ্যেই আবার জাকার্তার হোটেলে একটি ফোন এসেছিল কাও-এর কাছে। অজানা কণ্ঠ তাঁকে জানাল মিস্টার কাও, ইওর লাইফ মে বি ইন ডেঞ্জার! হংকং এ আপনার একা যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার জন্য একটা বিশেষ মেসেজ অপেক্ষা করছে। প্লিজ প্রসিড টু পিকিং। কাও জানতে চান, আপনি কে? কণ্ঠটি জানাল, আমার নাম আমি জানাতে পারব না। বাট আপনি চীন সরকারের সঙ্গে কথা বলুন। এমব্যাসি আপনার ফোনকলের অপেক্ষায় আছে। তারা বলে দেবে আপনার নেক্সট মুভ। কাও ঠান্ডা গলায় কেটে কেটে বললেন, আপনাকে কে বলেছে চীন সরকার আমার মুভমেন্ট ঠিক করে দেবে? আমি ভারত সরকারের কর্মী। ভারত সরকারের নির্দেশে আমার কাজকর্ম। ওপার প্রান্তের লোকটি একটু চুপ। তারপর বলল, আপনার সরকার এসবই জানে মিস্টার কাও। মনে রাখবেন আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনে যাচ্ছেন। সুতরাং ব্যাপারটা এত হালকাভাবে নেবেন না। আর এন কাও এই ফোনটির পরই সোজা হোটেলের লবিতে গিয়ে চীনের এমব্যাসিতে ফোন করলেন। এবং তাঁকে বলা হল আপনাকে আমাদেরই লোক ফোন করেছে। আপনি অপেক্ষা করুন। আপনার জন্য পিকিং এর টিকিট যাচ্ছে। এরপরই কাও ট্রাংক কল বুক করে কথা বলে নিলেন তাঁর

বসের সঙ্গে। দিল্লিতে বসে থাকা বি এন মল্লিক। ডিরেক্টর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। তিনি হেসে বললেন, আই নো কাও..ইউ ক্যান প্রসিড। বেস্ট অফ লাক। কাও বিস্মিত। তাঁকে জানানো হল না কেন আগে? তবে কোনো প্রশ্ন করার নিয়ম নেই বিশ্বের কোনো গুপ্তচর আর গোয়েন্দা সংস্থায়। শুধু নির্দেশ পালন করতে হয়।

এয়ারক্র্যাফটের উইন্ডো সিটে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আর এন কাও। পাইলটের অ্যাড্রেসে ঘুম ভাঙল। সামনেই পিকিং আসছে। ল্যান্ডিং অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হওয়ার আগেই কাও একবার টয়লেট গেলেন। তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিলেন কোনো সন্দেহজনক চোখ তাঁকে দেখছে কিনা। সেরকম কেউ চোখে পড়ল না। তবে একেবারে সামনের সারিতে একজন প্যাসেঞ্জার অস্বাভাবিকভাবে চোখের সামনে কাগজ খুলে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। সেই যাত্রীর মুখ দেখা গেল না। পিকিং এ নেমে কাও কী করবেন? কাউকে তো চেনেন না! আগে থেকেই বলা ছিল। একটি লাল ব্যানারে সাদা কালিতে লেখা থাকবে ওয়েলকাম টু পিআরসি। সাধারণত এয়ারপোর্ট বা স্টেশনে অচেনা মানুষকে রিসিভ করতে আসেন যাঁরা তাঁদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা থাকে নাম। এক্ষেত্রে অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হয়েছে আর এন কাও-এর ভিজিট। তাই নাম লেখা প্ল্যাকার্ড রাখা হয়নি। লেখা হয়েছে পি আর সি। অর্থাৎ পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না। যথারীতি দূর থেকে সেটা দেখতে পেয়েছেন কাও। এবং এগিয়ে এসে দেখলেন একজন নয়, দুজন ধরে আছেন সেই প্ল্যাকার্ড। তাঁদের একজন অন্য হাতে ধরা একটি কাগজের দিকে মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছেন। তিনি সেদিকে এগিয়ে যেতেই তাঁরাও এগিয়ে এলেন। এবং আবার সেই হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে হেসে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আড়চোখে কাও দেখলেন ওই লোকটির হাতে কাগজ নয়, রয়েছে তাঁর একটি ফোটোগ্রাফ। সেটি দেখেই যাতে চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই ছবি কবে তোলা হল? এটা তো অফিসিয়াল একটি ছবি। প্রশ্ন এল কাও-এর মনে। কিন্তু ওই যে বলছিলাম, গুপ্তচর আর গোয়েন্দা দুনিয়ায় পালটা প্রশ্ন করার নিয়ম নেই কূটনীতিক স্তরে। গাড়িটি চলছে হাইওয়ে ধরে। সবথেকে বিস্ময়কর কেউ কোনো কথাই বলছেন না। একটা সময় কাও ভাবলেন চিনে অতিথি আপ্যায়ন তো দেখা যাচ্ছে খুবই খারাপ। অতিথির সঙ্গে কেউ কথা

বলে না? কাও একবার কিছু একটা জানতে চাইলেন। সামনে বসা পাথরের মতো মুখ চিনা লোকটি শুধু বলল, নো ইংলিশ...। অর্থাৎ ইংরাজি জানে না। আশ্চর্য! ইংরাজি না জানা লোককে পাঠানো হয়েছে? ইচ্ছে করেই? কেন? প্রায় ৪৫ মিনিট পর একটি বিরাট বড় বিল্ডিং। সেখানে ঢুকে যাওয়ার পর গাড়ি থেকে নেমে কাও-এর দরজা খুলে দেওয়া হল। এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল তিনতলার একটি বিরাট কনফারেন্স হলে। সেখানে আগে থেকেই বসে আছেন চার ব্যক্তি। দুজন ইংরাজি জানেন। দুজন জানেন না।

মাত্র আধঘণ্টা। শুধু আধঘণ্টা কথা বলার জন্য এতদূর আসা? মাত্র ৩০ মিনিটের একটা মিটিংয়ের জন্য এত গোপনীয়তা? নাটকীয়তা? কিন্তু যে আর এন কাও ওই মিটিং-এ ঢুকেছিলেন, আর যিনি বেরোলেন আধঘণ্টা পর, তাঁরা আসলে দুটি আলাদা মানুষ। কারণ চীন সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের চার কর্তা কাওকে জানালেন, যে তাঁরা জানেন কারা কাশ্মীর প্রিন্সেস অন্তর্ঘাতের পিছনে। কাও চমকে উঠেছিলেন। তার মানে? এই কদিনের মধ্যেই চীন জেনে গেল কারা এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানে টাইম বোমা রেখেছিল? কারা? আর জানেই যখন তখন আর এভাবে ভারতের সাহায্য নেওয়ার দরকার কী? প্রশ্নটা কাও করেছিলেন। চীনের গোয়েন্দা কর্তাদের জবাব, আমরা আরও জানতে চাই যে কীভাবে গোটা ব্যাপারটা সংঘটিত হল। কাও পালটা প্রশ্ন করলেন কারা আছে এর পিছনে? চীনের গোয়েন্দারা জানালেন, কেএমটি এজেন্টরা। আবার চমক? কেএমটি? তার মানে কুয়ো মিন টিং! ১৯১১ সালে সান ইয়াৎ সেন প্রতিষ্ঠা করেন কে এম টি। তখন নাম ছিল রিভলিউশনারি অ্যালায়েন্স। পরবর্তীকালে চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বে এই কে এম টি গঠন করেছিল একটি জাতীয় আর্মি। দীর্ঘকাল ধরে চীনের মূল ভূখণ্ডকে শাসন করার পর কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়নার সঙ্গে কে এম টির সংঘাত শুরু হয়। শুরু হয় এক গৃহযুদ্ধ। ১৯৪৯ সালে কে এম টি নিরবচ্ছিন্নভাবে পিছু হটে তাইওয়ানেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে প্রায় ২০ লক্ষ অধিবাসী, যাদের মধ্যে উদ্বাস্তু আর সামরিক বাহিনীও আছে। এবং সেই থেকে কে এম টি বনাম কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়নার বিবাদ অব্যাহত। কে এম টির প্রধান টার্গেট হয় কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। তাহলে কি ওই রাজনৈতিক সংঘাতটি একটি ক্রাইম থ্রিলারে রূপান্তরিত হয়ে গেল? চীনের

গোয়েন্দারা জানালেন, আমাদের সোর্স থেকে আমরা জেনেছি কেএমটি এজেন্টরা করেছে। তাদের টার্গেট প্রাইম মিনিস্টার চৌ এন লাই। ওই এয়ারক্র্যাফটে প্রধানমন্ত্রীর যাওয়ার কথা ছিল। সেটি আগাম ফাঁস হয়ে যায়। আর সেই থেকেই চক্রান্ত শুরু। লাস্ট মোমেন্টে প্রাইম মিনিস্টার যেতে পারেননি। তাই বেঁচে গেলেন। কিন্তু জানতেই হবে কীভাবে ওই বিমানে রাখা হয়েছিল টাইম বোমা। তাই আপনাকে সাহায্য করতে হবে। স্থির হয়ে আর এন কাও পুরোটা শুনলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি উত্তেজিত। কিন্তু এই ঝকঝকে শাণিত বুদ্ধির গোয়েন্দাটি অনেক পোড় খাওয়া। তিনি অবশেষে বললেন, আমার কিছু জানার আছে। কী? চিনা গোয়েন্দারা সতর্ক। কারণ তাঁরা জানেন এই লোকটি বিপজ্জনক গোয়েন্দা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সিদ্ধান্তের পর অবিভক্ত ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের হেডকোয়ার্টারে একদিন আগুন ধরে যায়। বহু নথিপত্র ধ্বংস হয়েছিল। কী ছিল সেইসব নথিপত্রে? কারা আগুন দিল? জানা যায় বেশিরভাগ নথি ছিল ভারতের রাজনীতিক আর স্বদেশি রাজ্যগুলির রাজাদের সম্পর্কে গোপন ফাইল। তাঁদের গোপন জীবন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের কাছে রিপোর্ট করা হত। সেই ফাইল অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। আর সেই অগ্নিকাণ্ডের তদন্তের দায়িত্বেও একটা সময় ছিলেন এই আর এন কাও। সুতরাং খুব সাবধানে থাকতে হবে লোকটির সম্পর্কে। চিনা গোয়েন্দাদের অনুমান তথা আশঙ্কা সঠিক ছিল। কারণ আর এন কাও তারপর একটি মোক্ষম প্রশ্ন করেছিলেন, ঠিক কবে এবং কখন ঠিক হয়েছিল যে আপনাদের প্রাইম মিনিস্টার যাবেন না ওই বিমানে? কোন সময় তাঁর অ্যাপেনডিক্সের ব্যথা শুরু হয়েছিল? চার চিনা গোয়েন্দা কর্তা এক পলকের জন্য একে অন্যের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর হেসে বললেন, আমরা আপনার সঙ্গে এই নিয়ে পরে কমিউনিকেট করব ইন ডিটেইলস! আপাতত আপনি বাই রোড যাবেন হংকং। ওকে? কাও মৃদু হাসলেন। এবং বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

হংকং এ কাও-এর জন্য বুক করা হয়েছে হোটেল মীরামার। ততক্ষণে জানা হয়েছে কারা এয়ারক্র্যাফট মেনটেন্যান্সের দায়িত্বে থাকে। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে আর এন কাও হংকং এর পুলিশ কমিশনার ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ম্যাক্সওয়েল নিজেও তুখড় পুলিশ অফিসার। ততদিনে তিনি নিজেও অনেকটা তদন্তের কাজ

এগিয়েছেন। বললেন, আমাদের সন্দেহের তালিকায় আছে এয়ারক্র্যাফট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির কয়েকজন স্টাফ। কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। ওই কোম্পানির তাইওয়ানের এক আমেরিকান অফিসার রিড জোনস। আর যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা কোথায়? কাও জানতে চাইলেন। ম্যাক্সওয়েল বললেন, তাদের অনেককে জেরা করে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি সেই লিস্ট পেতে পারি? কাও বললেন। ম্যাক্সওয়েল লিস্ট দিলেন কাওকে।

হোটেলে ফিরেছেন কাও। সামনে লিস্ট। এক কাপ কফি। একবার টেম্পল স্ট্রিটে যেতে হবে। এয়ারক্র্যাফট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির অফিসে। সেই অফিসে যখন গেলেন কাও তখন প্রায় সকলেই চলে গিয়েছে। কাও-এর সঙ্গে রয়েছেন হংকং পুলিশের গোয়েন্দা। সন্ধ্যা হয়েছে। তিনজনের মধ্যে একজন টাইপ করছে একমনে। আর বাকি দুজনের হাতে ফাইল। কাও এসে পরিচয় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। দোভাষীর কাজ করলেন হংকং পুলিশের গোয়েন্দারা। কাও-এর দরকার লিস্ট। কারা ছিলেন সেদিনের এয়ারক্র্যাফট মেনটেন্যান্সে? জানা গেল পাঁচজন। তাঁদের পাওয়া যাবে? আজ তো আর পাওয়া যাবে না। কাল নিশ্চয়ই আসবে। তবে তাদের মধ্যে একজন আগামীকালই জয়েন করবে। সে পরশু ছিল ছুটিতে। আজ তো তার ডিউটিই নেই। তার নাম কী? চাও চু। লিস্ট নিয়ে আর এন কাও ফিরছেন হোটেলে। একটি ফোনকল আছে। জানালেন রিসেপশনিস্ট। কে ফোন করেছে? সামবডি ফ্রম চায়না। আবার চীন থেকে ফোন? অপেক্ষা করলেন কাও।. আবার যাতে ফোনটি আসে। কিন্তু এল না কোনো ফোন। এল পরদিন খুব ভোরে। চীনের সেই চার গোয়েন্দার মধ্যে একজন। তিনি জানতে চাইলেন, কোনো ডেভেলপমেন্ট আছে? কাও বললেন, এগোচ্ছে। এবার সেই গোয়েন্দাটি কাওকে বললেন, আপনাকে একটি ইমপরট্যান্ট মেসেজ দেওয়ার ছিল। আমরা জানতে পেরেছি কার মাধ্যমে গোটা অপারেশন করা হয়েছে। কাও বিস্মিত। এত বড় একটা ইনপুট, এভাবে উদাসীন ভাবে দেওয়া হচ্ছে? তিনি অপেক্ষা করছেন চিনা গোয়েন্দা কী বলেন তা শোনার জন্য। ওপ্রান্ত থেকে বলা হল, কালপ্রিটের নাম চাও চু। চমকে গেলেন নামটি শুনে কাও। কারণ এই নামটিই তো কয়েকদিন হল আসছে না সেই মেনটেন্যান্স অফিসে। তার

মানে সেই আসল অপরাধী? কাও তবু জানতে চাইলেন আপনারা কীভাবে জানছেন? চিনা গোয়েন্দাটি বলল আমাদের আনঅফিসিয়াল সোর্স। তবে এটা আমরা অফিসিয়াল করছি। আমরা হংকং অথরিটিকে সরকারিভাবে জানাব আমাদের সাসপেক্ট কে? আমরা চাই আপনি দেখুন কীভাবে চাও চুকে ধরা যায়।

সেদিন বিকেলের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল আসল অপরাধীর নাম। চাও চু। চীন সরকার একটি প্রেস স্টেটমেন্ট ইস্যু করে জানিয়ে দিয়েছে তাদের সন্দেহের কথা। হংকং সরকার সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি প্রকাশ করে পালটা জানাল আমাদের কাছে এরকম কোনো তথ্য এখনও আসেনি। তাই আমরা যতক্ষণ না খতিয়ে দেখছি ততক্ষণ এই নামের কাউকে মেইন সাসপেক্ট হিসাবে ধরতে পারছি না। কাও কিন্তু আবার গেলেন সেই অফিসে। এবং তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন কোথায় চাও চু। বজ্রপাত হল! চাও চু অফিসেই আসছে না। সেকী? কবে থেকে? ১১ এপ্রিলের সেই দুর্ঘটনার পর এসেছিল? কর্মীরা জানালেন, হ্যাঁ তারপর তো প্রতিদিনই সে কার্ড পাঞ্চ করেছে। এমনকী এয়ারপোর্টেও গিয়েছে। আপনি একটা কাজ করবেন? কী? কাও জানতে চান। আপনাকে একটা ফ্ল্যাটের নম্বর দিচ্ছি। সেখানে গেলে পেতে পারেন। হয়তো অসুস্থ। ফ্ল্যাটের নম্বরটি নিয়ে কাও সোজা এলেন হংকং স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর জন উইলকক্সের অফিসে। এবং তাঁকে সবটা বলার পরই ঠিক হল তাঁরা দুজনে যাবেন। গেলেনও। ডোরবেল বাজছে। কেউ খুলছে না। এবার দরজায় ধাক্কা। খুলল দরজা। ভয়ে ভয়ে। একটি আতঙ্কিত মুখ বেরিয়ে এল। চৌ সি হক তার নাম। হ্যাঁ। এই ফ্ল্যাটেই তার সঙ্গে রুম শেয়ার করে থাকে চাও চু। কিন্তু সে তো এখন নেই? অফিসে গিয়েছে? অফিসে? সে অফিসে ইদানীং যাচ্ছে না আপনি জানেন না? লোকটি অবাক। যাচ্ছে না? সেকি? কবে থেকে? দুদিন তো নাইট ডিউটি ছিল? নাইট ডিউটি? কাও জানতে চাইলেন। লোকটি উত্তরে বলল, হ্যাঁ স্যার, আমাকে তো সেরকমই বলেছিল। কাও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লোকটির দিকে। তারপর উইলকক্সকে বললেন, চলুন তাহলে আর কী করা যাবে? দুজনেই ফিরে এলেন।

রাত গভীর হয়েছে। হোটেল মীরামার থেকে সম্পূর্ণ লং কোট পরা একটি মূর্তি বেরিয়ে এল। কোনো গাড়ি নেই। লোকটি হাঁটছে। যথাসম্ভব নিজেকে লুকিয়ে। মাঝেমধ্যেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছেনও। কেউ ফলো করছে না তো? এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে কেউ ফলো করছে না। গতি বাড়িয়ে দিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় এসে একটি নাইট ট্যাক্সি পেয়ে লোকটি একটি ঠিকানা বলল। দেখা যাচ্ছে ট্যাক্সিটি ঠিক সেই ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে চাও চু আর চৌ সি হক থাকে রুম শেয়ার করে। ট্যাক্সি থেকে নামা লোকটি আর কেউ নয়। আর এন কাও। সোজা দোতলায় উঠে এলেন। এবং ডোরবেল না বাজিয়ে শুধু নক করলেন কয়েকবার। কয়েকবার নক করার পরই দরজা খুলে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করার চেষ্টা। কারণ লোকটি চিনতে পেরেছে কাওকে। কাও এজন্য তৎপর ছিলেন। আগে থেকে একটি হাত বাড়িয়ে লোকটিকে ধাক্কা। রোগা বেঁটে চৌ সি হক কাও-এর শক্তির কাছে শিশু। অতএব কাও ঢুকলেন ঘরে। কাও ঠান্ডা স্বরে বললেন, আমাকে হেল্প করলে আপনার বিরাট লাভ হবে। লোকটি বলল, আমি তো যেটা জানতাম সবই বলেছি। আমি আর তো কিছু জানি না। কাও বললেন, জানেন। বলুন। লোকটি মুখ বন্ধ করে বসে রইল। কাও ফিসফিস করে বলছেন, লক্ষ ডলার পেতে কেমন লাগবে? চেয়ারে বসে ছিল চৌ সি হক। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ১ লক্ষ ডলার! মানে! কাও এবার হাসলেন। বললেন, আপনি চাইলেই কিন্তু ১ লক্ষ ডলার পেতে পারেন চাও চু সম্পর্কে যতটুকু জানেন তা বললে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটি। ১ লক্ষ হংকং ডলার তার কাছে কেন, যে কোনো সাধারণ হংকংবাসীর কাছে স্বপ্ন। সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কাওকে জিজ্ঞাসা করল, কে দেবে এত টাকা? কাও বললেন, সরকার দেবে। চৌ সি হক তাও অবিশ্বাসী। কারণ কই, সরকার তো এরকম তো কিছু বলেনি? তাহলে? কাও বললেন, ঠিক আছে, আপনি আগামীকাল সকাল ১০ টার সময় আসবেন পুলিশ কমিশনার অফিসে। সেখানেই বুঝে যাবেন। কাও বেরিয়ে এলেন ফ্ল্যাট থেকে।

ঠিক পরদিন সকালে হংকংয়ের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হল একটি বিজ্ঞাপন। হংকং পুলিশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা। ১ লক্ষ ডলার পুরস্কার পাওয়া যাবে যদি কেউ চাও চু সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। সর্বপ্রথম যে লোকটি হংকং পুলিশ কমিশনারের অফিসে

এসেছিল তার নাম সেই চৌ সি হক। সে স্টেটমেন্ট দিতে চায়। সে জানাল চাও চু তাকে একদিন রাতে মদ খেয়ে এসে সব ফাঁস করে দিয়েছে। আর মুখ বন্ধ রাখার জন্য দিয়েছে ১ হাজার ডলার। কী হয়েছিল আগে থেকে সেখানে থাকা কাও জানতে চাইছেন। চৌ সি হকের বক্তব্য হল, সেদিন ৩০ এপ্রিল। অনেক রাতে ফিরল চাও। এসেই কাবার্ড থেকে হেরোইন পাউডার বের করল। ওটা চাও-এর অনেকদিনের নেশা। অন্তত দুটি পুরিয়া শেষ করার পর চাও-এর জিভ জড়িয়ে এসেছিল। সে জড়ানো কণ্ঠে বলেছিল, তার কষ্টের দিন শেষ। এবার বড়লোক হওয়ার সময় এসেছে। সেই এয়ার ইন্ডিয়ায় বোমা রেখেছিল। হ্যাঁ। চিনা গোয়েন্দাদের খবরই ঠিক। কেএমটি এজেন্টরাই এই চক্রান্ত করেছে। চাও চুকে দেওয়ার কথা ছিল ৬ লক্ষ ডলার। পরিবর্তে তাকে ওই বোমা রাখতে হবে। ঠিক যেদিন 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল সমুদ্রে তার আগের রাতে চাও চুকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল মুভিল্যান্ড হোটেলে। সেখানেই তার হাতে তুলে দেওয়া হয় র‍্যাপ করা টাইম বোমা। পরদিন সকালে একটি গাড়ি আসে তাদের ফ্ল্যাটের সামনে। গাড়িতে ছিল কেএমটি এজেন্টরাই। তারাই এয়ারপোর্টে ড্রপ করে দেয় চাও চুকে। আপনাদের ফ্ল্যাটে আর কে এসেছিল? জানতে চাইলেন কাও। চৌ সি হক একটু ভেবে বললেন, চাও-এর কাকা তো মাঝেমধ্যেই আসতেন। তিনিও তো একই কোম্পানিতে কাজ করেন। এমনকী যেদিন 'কাশ্মীর প্রিন্সেসকে' বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হল সেদিন তিনিও ছিলেন ডিউটিতে। কে তিনি? নাম কী? তার নাম পার্সি চাও। পাওয়া যাবে তাঁকে? কেন পাওয়া যাবে না? আজ খুব ভোরে এসেছিলেন তো আমাদের ফ্ল্যাটে। চাও চু নেই জেনেও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এর মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কিনা! আমি বললাম কাল মাঝরাতে মিস্টার কাও এসেছিলেন। আর এন কাও হিসহিস করে বলে উঠলেন, মাই গড! সেকি? আপনি বলে দিলেন? তারপর? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চৌ সি হক বললেন, তারপর পার্সি আমাকে বাজে একটা গালাগাল দিয়ে দৌড়ে নেমে গেলেন। একথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে আর এন কাও লাফ দিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে এবং ইন্টারোগেশন রুমে থাকা অন্যদের বললেন, জেন্টলমেন আমি আসছি একটু। হংকং পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে ছুটছেন কাও। পার্কিং লটে গাড়ি চালককে বললেন, টেম্পল স্ট্রিট! গুরুত্ব

বুঝলেন চালক। ঝড়ের গতিতে সেই এয়ারক্র্যাফট মেনটেন্যান্স অফিসে পৌঁছল গাড়ি কাও এক নিমেষে নেমেই অফিসের মধ্যে। সোজা ম্যানেজারের ঘরে। জানতে চাইলেন পার্সি চাও লাস্ট কবে কার্ড পাঞ্চ করেছে? ম্যানেজার বলছেন, পার্সি চাও? হ্যাঁ। তিনি রোজই ডিউটি করছেন। এখন কোথায়? ম্যানেজার বললেন, এয়ারপোর্টে। বাট কী হয়েছে? চাও চুর খবরটা পেপারে আমরা দেখলাম। আমাদের হেল্প চাইলে আমরা আছি। কাও কোনো কথা না বলে সেখান থেকে হংকং পুলিশকে বললেন, আপনারা এয়ারপোর্টে আসুন। বলেই দৌড়লেন কাও। এয়ারপোর্ট। ঠিক দেড় ঘণ্টা পর একটি বিমান উড়বে। ফরমোজার দিকে। সেই বিমানের প্যাসেঞ্জার লিস্ট চাই কাও-এর। কাউন্টারে যেতেই কাও লিস্ট পেয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর হিসাব মিলে যাচ্ছে। এই তো পার্সি চাও। তার মানে আজ সকালে সংবাদপত্রে ভাগ্নের নামের পুরস্কারের বিজ্ঞাপনটি দেখেই পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনিও। নিমেষে গোটা ওয়েটিং হল আর বোর্ডিং লাউঞ্জ কর্ডন করে দিল হংকং পুলিশ। টয়লেট থেকে আসার পরই কোনো কিছু বোঝার সুযোগ না পেয়েই ধরা পড়ে গেল পার্সি চাও। এবং তাঁকে জেরা করে জানা গেল মারাত্মক তথ্য। ঠিক যেদিন আর এন কাও পিকিং থেকে হংকং-এ প্রবেশ করেছেন, তার ৬ ঘণ্টা আগে চাও চু একটি আমেরিকান বিমানে চেপে ফরমোজা অর্থাৎ তাইওয়ানে চলে গিয়েছে। তাহলে যে এতদিন ধরে তাকে দেখা গিয়েছে ডিউটি করতে হংকং এয়ারপোর্টে? এবার জানা যাচ্ছে আসলে মোটেই সে ডিউটি করেনি। তার কার্ড নিয়ে তার কাকা এতদিন ধরে পাঞ্চ করেছে অফিসে অ্যাটেনডেন্স। সকলে জানছে চাও চু রোজকার মতোই নর্মাল ডিউটি করছে। আসলে সে তাইওয়ানে।

এই গোটা চক্রান্তের সূত্রপাত হয় ১১৩ টেম্পল স্ট্রিটের একটি ইলেকট্রিকের দোকানে। দোকানটি আসলে কেএমটি এজেন্টদের আড্ডারকভার কেন্দ্র। সেখানেই পার্সি চাও-এর যাতায়াত ছিল। কেএমটি প্রথমে চেয়েছিল চৌ এন লাই কে হত্যা করবে ১৯৫৪ সালে যখন তিনি জেনিভা থেকে ফিরছেন। কিন্তু সেই প্ল্যান সফল হয়নি। তারপর প্ল্যান করা হল ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কনফারেন্সে যাওয়া চীন সরকারের অন্যতম প্রধান এক কর্তা কুয়ো মোও ঝুকে হত্যা করা হবে। কিন্তু ঠিক তখনই খবর পাওয়া গেল স্বয়ং চীনের

প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই যাচ্ছেন বান্দুং। তাও আবার হংকং থেকে। একটি বিরাট চিনা প্রতিনিধিদল নিয়ে। এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া যায় না। তাই কে এম টি গোটা অপারেশনটি সাজিয়েছিল। কিন্তু 'কাশ্মীর প্রিন্সেসের' বিস্ফোরণের পরদিন যখন প্রধান অভিযুক্ত চাও চু ওই টেম্পল স্ট্রিটের ইলেকট্রনিক দোকানে গিয়ে টাকা চাইল, তাকে বলা হয়েছিল যেহেতু চৌ এন লাই নিজে বিমানে ছিলেন না, তাই টাকার অঙ্ক অত দেওয়া যাবে না। তবে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময়েই। কবে? সেটা কে এম টি বলে দেবে। কিন্তু আর এন কাও যেদিন পিকিং থেকে হংকং এ ঢুকলেন সেদিনই দুপুরের ফ্লাইটে ঠিক ৬ ঘণ্টা আগে চাও চু হংকং ছেড়ে পালালেন কেন? কে খবর দিয়েছিল যে ভারতীয় কোনো গোয়েন্দা আসছে গোটা তদন্তে সহায়তা করার জন্য? চাও চুকে আর চিনে ফেরত আনা সম্ভব হয়নি। বহু আবেদন নিবেদন কূটনৈতিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এসবের থেকেও বড় প্রশ্ন অন্য। কেন শেষ মূহূর্তে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বিমানে সফর করলেন না? তাহলে কি তিনি বা চীন সরকার আগেই জেনে গিয়েছিল এই অন্তর্ঘাতের কথা? কারণ ওই ফ্লাইট আগে স্থির ছিল ১৮ এপ্রিল যাবে। পরে হঠাৎ পরিবর্তন করা হয়ে ঠিক হয়েছিল ১১ এপ্রিল। এবং ৭ এপ্রিল হঠাৎ করেই যাত্রী তালিকায়। পরিবর্তন হয়। আর একেবারে শেষ মুহূর্তে চৌ এন লাই এর অ্যাপেন্ডিক্স যন্ত্রণা শুরু হল? যদি তাই হয় তাহলে তো তৎক্ষণাৎ এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটও ক্যান্সেল হওয়া উচিত ছিল। প্রাইম মিনিস্টারের চার্টার্ড ফ্লাইট তাঁকে না নিয়েই চলে গেল? সোজা কথায় এই গোটা মার্ডার প্লট আগাম জানা সত্ত্বেও এতগুলো নির্দোষ মানুষকে বিমানে পাঠিয়ে দেওয়া হল? কেন? ধোঁয়াশা রয়েই গেল। তবে আর এন কাও-এর তুখোড় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে মুগ্ধ চীন সরকার তাঁকে বিশেষ সম্মানিত করে। তাঁর অনারে ডিনার দেওয়া হয়। ঠিক পরের বছর গোয়েন্দা অফিসার আর এন কাও-এর ডাক পড়বে আফ্রিকার ঘানায় এক অন্য অভিযানে। কিন্তু সে এক অন্য কাহিনি। পরে বলা যাবে কোনোদিন।

আপাতত মোক্ষম প্রশ্ন, কে ছিল 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' উড়ে যাওয়ার আগে সেই আমেরিকান যুবকটি? যিনি পাইলটদের কাছে এসে যেচে আলাপ করে সন্দেহজনক

আচরণ করছিলেন! চাও চু যে বিমানে তাইওয়ানে পালিয়েছিল সেটি ছিল আমেরিকান বিমান! তাহলে কি আমেরিকার দুর্ধর্ষ গুপ্তচর সংস্থা সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির (সি আই এ) কোনো ভূমিকা ছিল আড়ালে? চিনা গোয়েন্দারা সেরকমই রিপোর্ট দিয়েছিল। অনেক পরে ১৯৭১ সালে চৌ এন লাই বেজিং-এর গ্রেট হলে আয়োজিত একটি স্টেট ডিনারের মধ্যেই সরাসরি আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর হেনরি কিসিংগারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনাদের স্পাই এজেন্সি কি সত্যিই ছিল? কিসিংগার শীতল কণ্ঠে বলেছিলেন, অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, আপনারা সিআইএ-র ক্ষমতাকে একটু বেশিই মূল্য দিয়ে ফেলছেন! আমাদের সিআইএ অতটা শক্তিশালী নয়। তারপর দুজনেই দুজনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পলক না ফেলে!

এয়ার ইন্ডিয়া 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' আজও একটি রহস্যময় অধ্যায়!

১০

চারদিকে অন্ধকার। দূরের বাসস্টপ থেকে সামান্য আলো আসছে। গিরনা রিভার ব্রিজের নীচে একটি আবছা মানুষ দাঁড়িয়ে। হাতে ব্যাগ। জায়গাটা মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও টাউন থেকে অন্তত তিন কিলোমিটার দূরে। গিরনা নদীতে জল নেই তেমন। ব্রিজের নীচে তাই অনায়াসে নেমে যাওয়া যায়। দুপুরে কিংবা বিকেলে প্রেমিক প্রেমিকাদের শহর থেকে দূরে এসে কিছু সময় কাটানোর আদর্শ স্পট হিসাবে পরিচিত গিরনা ব্রিজ। কিন্তু সন্ধে হলেই শুনশান। লোকটির সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবি। হাইট তেমন বেশি নয়। চশমা পরা। মুখে দাড়ি আছে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখা গেল আর কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। তবু সাবধানের মার নেই। এবার ব্যাগটি খুলে লোকটি কিছু টুকরো জিনিস বের করল। অন্ধকারে বোঝা সম্ভব নয়। অন্য পকেটে অবশ্য টর্চ আছে। টর্চ জ্বালিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দুই হাতে অত্যন্ত সাবধানে লোকটি ওই টুকরো জিনিসগুলি একটির সঙ্গে অন্যটি লাগাচ্ছে। মন দিয়ে। বেশি সময় লাগেনি। কাজ শেষ। তৈরি হল যে জিনিসটি তাকে অপরাধজগৎ আর পুলিশের পরিভাষায় বলা হয় আইইডি। ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। সাধারণ ভাষায়বিস্ফোরক! কিন্তু বাস আসছে। যদিও এই নির্জন বাসস্ট্যান্ডে এই রাতে খুব বেশি যাত্রীর ওঠানামার সম্ভাবনা নেই। সিংহভাগ যাত্রী যাবে দূরে। তবু বাসটি যেতে দিল লোকটি। যদি এক আধজন যাত্রী এসে যায়। তাহলে প্ল্যান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। অবশেষে বাস চলে গেল। হয়তো যাত্রীদেরও পদশব্দ মিলিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় লোকটি ওই বিস্ফোরকের টাইমার অন করেই অনেকটা পিছিয়ে চলে গেল ব্রিজের নীচেরই অন্য প্রান্তে। যাতে দূরত্ব তৈরি হয়। ১০ সেকেন্ড....২০ সেকেন্ড....৩০ সেকেন্ড...প্রবল শব্দ। ফেটে গেল এক শক্তিশালী বোমা। যার উপকরণ লোকটি ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিল। একটা আগুনের শিখা দপ করে জ্বলে উঠে এক নিমেষের জন্য জায়গাটি আলোকিত করে তুলল। তারপর ধোঁয়ায় ঢেকে গেল গিরনা ব্রিজের নীচের চরাচর। এবং মধ্যচল্লিশের লোকটি বাচ্চা ছেলের মতো আনন্দে হাততালি দিয়ে হা হা হা হা করে হাসতে শুরু করল। সাকসেসফুল তার পরীক্ষা... অবশেষে একক প্রয়াসে সে একটি বিধ্বংসী

বিস্ফোরক তৈরি করতে সফল। অনেকদিন ধরেই তার টার্গেট ছিল ফাঁকা কোনো জায়গায় পরীক্ষা করা। এই জায়গাটি দেখে যাওয়া হয়েছিল আগে কয়েকবার। সেইমতোই প্ল্যান করা। তবে আজ শুধুই পরীক্ষা। কোনো নির্দিষ্ট টার্গেট ছিল না। ছিল না ক্ষয়ক্ষতির লক্ষ্য। শুধু নিজেদেরই যাচাই করা যে সন্ত্রাসের দুনিয়ায় পা রাখার কতটা যোগ্য আমি।

বাসটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেও শুনশান অন্ধকার। কোনো শব্দও নেই। কিন্তু আসলে শব্দ আছে। ফিসফিস করে কয়েকটি গলার শব্দ। কয়েকফুট দূরের কেউই শুনতে পাবে না। চারজন কিশোরের কণ্ঠস্বর। তারা হল চোর। মালেগাঁও বাসস্ট্যান্ড থেকে যে কোনো দূরপাল্লার বাস রাতে যখন এই পথে যাওয়ার সময় এই গিরনা ব্রিজের নিকটের বাসস্টপেজে দাঁড়ায় তখন এই কিশোরদের অপারেশন শুরু হয়। বাসটি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে একটি কিশোর বেরিয়ে পিছনে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে চোখের পলকে নিঃশব্দে বাসের ছাদে উঠে যায়। এবং ত্বরিৎগতিতে সামনে থাকা ডাঁই করে রাখা যাত্রীদের লাগেজের ব্যাগগুলি পরীক্ষা শুরু করে। কয়েকটি চেইন খুলে চেক করেই সে বুঝে যায় কোনটায় মাল পাওয়া যাবে। সেইমতো একটি দুটি ব্যাগ সে নিমেষে ছাদ থেকে মাটিতে ফেলে দেয় পিছনদিকে। কিন্তু শব্দ হয় না। কারণ নীচে দাঁড়িয়ে আছে তার শাগরেদ বাকি ছেলেরা। তারা নিখুঁতভাবে ক্যাচ নেয়। এবং দ্রুত পালায় ব্রিজের দিকে। বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না কনডাক্টর, চালক ও যাত্রীরা। এরপর বাসটি চলতে শুরু করলেই বাসের ছাদে থাকা সেই কিশোর সেকেন্ডের মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে আবার নেমে আসে। বাস অন্ধকার রাতে ফাঁকা রাস্তায় দ্রুত স্পিড নেয়। পিছনে পড়ে থাকে হতভাগ্য কোনো কোনো যাত্রীর ব্যাগ। যারা তখন ঘুমাচ্ছে। এই অপারেশনের পর চার কিশোর আবার মিলিত হয় ব্রিজের কাছে কোনো এক জায়গায়। এবং ব্যাগ থেকে মালপত্র বের করে নিজেদের কাছে থাকা ব্যাগে ভরে যাত্রীদের ব্যাগ ছুড়ে ফেলে দেয় নদীর জলে। এটাই নিয়ম। যাকে বলা হয় মোডাস অপারেন্ডি। এদিনও ঠিক ওই অভিযানে বেরিয়েছিল চার কিশোর। লক্ষ্য নাসিকের বাস। তবে সেদিন বাসস্ট্যান্ডের আলোর তেজ কম। কারণ একটি বালব ভাঙা। এই কিশোরের দলই ভেঙে দেয় অপারেশনের আগের দিন ভোরে। কম আলোয় চুরি করে পালানো সহজ। কেউ দেখলেও চিনতে পারবে না। ঠিক যেভাবে প্রতিদিনই ব্যাগচুরির

পর্বটি শুরু হয় সেরকমই হয়েছিল। এবং শেষটিও তাই। বাস চলে গেল। যাত্রী বিশেষ কেউ ছিল না। আজ দুটি ব্যাগ জোগাড় করা গিয়েছে। কারণ বেশি যাত্রী না থাকায় বাস দাঁড়ায়নি। সেটা বোঝাও যাচ্ছিল। সেভাবেই ক্যালকুলেশন করা হয়েছে। ব্যাগ থেকে একে একে বিভিন্ন জিনিস বের করে নিয়ে ফাঁকা ব্যাগ ব্রিজের কাছে নিয়ে গিয়ে নদীতে ছোড়ার আগেই আচমকা ওই ব্যাগ চোর কিশোরের দল চমকে গেল। কারণ একটা আলোর ঝলক দূর থেকে। আর প্রচণ্ড শব্দ। চমকে দিয়ে প্রথমে চার কিশোর ছুটতে শুরু করল উলটোদিকে। কিছুটা যাওয়ার পরই থেমে গেল তারা। এবং পরস্পরের মধ্যে চোখাচোখি করে স্থির করল আবার যাওয়া হবে ব্রিজের দিকে। দেখতে হবে কী ব্যাপার! সেইমতো তারা ব্রিজের কাছে এল। কিন্তু ভয় কাজ করছে। তাই নীচে নামার সাহস হল না। ব্রিজের উপর থেকেই উঁকি মেরে তাকাল চারজন। এবং তাকিয়ে দেখতে পেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। তখনও রয়ে গিয়েছে কিছু আগুনের শিখা। জ্বলছে নদীতীরের শুকনো ঘাস, পাতা ঝরে যাওয়া ছোট গাছ আর স্তূপীকৃত কিছু জঞ্জাল। আর সেসবের সামনে হা হা হা হা করে উন্মত্তের মতো হাসছে একটি লোক। হাত দুটি উঁচু করা।

দৃশ্যটা দেখেই চমকে গেল তারা। কিন্তু একটা ইনস্টিংকট সঙ্গে সঙ্গে কাজ করল। টেররিস্ট! দৌড়ে গেল চারজন। পিছনে থেকে জাপটে ধরল। লোকটি হাসতে হাসতে পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়েছে। ওই অন্ধকার নিকষ কালো রাতে এই চরাচরের মধ্যে যে সে ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে তা কল্পনাই করেনি। তাই বাধা দেওয়ার আগেই সে এতটাই বিস্মিত হয়েছিল যে নড়তেই পারল না। কিছু করে ওঠার আগেই বন্দি হয়ে গেল চার কিশোরের হাতে। মধ্যবয়স্ক লোকটিকে তুলে দেওয়া হল মালেগাঁও পুলিশের হাতে।

মালেগাঁও টাউনের পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশ ওয়ালিশেট্টি প্রায় চেয়ার ছেড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন জেরা করার সময়। এই আনইম্প্রেসিভ সাধারণ চেহারার সাদা পাজামা পাঞ্জাবি আর দাড়িমুখের মতো লোক মালেগাঁও টাউনের মেইন মার্কেটে কমপক্ষে হাজারের বেশি পাওয়া যাবে। আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো কিছুই নেই। একেবারে সাধারণ ফিচার। । জানা গেল লোকটি নিজেই বোমা বানিয়ে সেটি টেস্ট করতে এসেছিল। তাও না হয় মেনে

নেওয়া গেল। কিন্তু লোকটির পরিচয় জেনে ওই ইনস্পেক্টর হতভম্ব। তিনি তৎক্ষণাৎ বড়সাহেবদের খবর দিলেন। পুলিশ সুপার, ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী ছুটে এল মালেগাঁও পুলিশ স্টেশনের মধ্যে। কারণ ঘটনাটি আপাতভাবে অবিশ্বাস্য! কে লোকটি? ডক্টর জালিস আনসারি! মুম্বইয়ের অন্যতম খ্যাতনামা আন্ধেরি ওয়েস্টের কুপার হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার। মুম্বইয়ের মদনপুরায় বাড়ি এবং সবথেকে বড় কথা হল তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। জালিস আনসারি গ্রেপ্তার হয়ে গেল। এবং তাঁর গ্রেপ্তারির খবর পেয়েই ছুটে এলেন তাঁর স্ত্রী এবং ভাইয়েরা। তাঁরা স্তম্ভিত।

মদনপুরার আনসারি পরিবারের সবথেকে বড় ছেলের নাম জালিস আনসারি। আর একেবারে ছোট ভাই মেডিকেল কলেজে পড়ছে। সেও ডাক্তার হয়ে যাবে। আনসারি পরিবারের সাত পুত্রকন্যা। দুজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। দুই মেয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার পর শিক্ষিকা। এক ভাই মুম্বইয়ের বিখ্যাত এক কলেজের লেকচারার। সেটা আশির দশকের শেষ দিক। গোটা মদনপুরায় আনসারি পরিবারের খ্যাতি তাই আকাশছোঁয়া। ডক্টর আনসারি নিজে মেডিকেল পড়াশোনা করেছেন জে জে গ্রুপ অফ হসপিটাল মেডিকেল কলেজ থেকে অনেক বেশি গ্রেড পেয়ে। কুপার হাসপাতালে শুরুতেই তাঁকে দেওয়া হয় রেডিওলজির ভার। এবং একসময় ডক্টর আনসারির পরিচয় হয় হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিওলজি প্লাস এক্স রে ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু ঠিক যখন তার কেরিয়ার ধীরে ধীরে আকাশ স্পর্শ করার কথা ছিল তখনই আচমকা দিক বদল করতে শুরু করল আনসারির পথচলা। কারণ দেখা হল আবদুল করিম টুন্ডার সঙ্গে। উত্তরপ্রদেশের হাপুর জেলার পিলখুয়া গ্রামের বাসিন্দা আবদুল করিম টুন্ডা এসে জালিস আনসারি তো বটেই, ভারতের নিরাপত্তার আকাশে একটি কালো মেঘের সঞ্চার করল। মদনপুরার কাছেই এক অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হতে শুরু করল তবলিগি জামাত। তবলিগি জামাতের অর্থ যে গোষ্ঠী বাণীপ্রচার করে বক্তৃতার মাধ্যমে। সেই তবলিগি জামাতের প্রত্যেকটি সমাবেশে দিন দিন প্রবল ভিড় হতে শুরু করে। কারণ একের পর এক তুখড় বক্তা সেখানে এসে ইসলামের পথ এবং দিশা নিয়ে সহজ সরল ভাষায় মানুষকে বুঝিয়ে প্রকৃত ইসলামের বাণী শোনাতেন। কিন্তু আবদুল করিম টুন্ডা এসে সেই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইয়ে দিতে

শুরু করে। তার বক্তৃতার প্রধান টার্গেট যুব সম্প্রদায়। তাদের সে নিয়ম করে বলতে শুরু করল ইসলামকে তার হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। তার জন্য দরকার অবিশ্বাসী কাফেরদের ধ্বংস করা। এই গোটা দুনিয়া হয়ে উঠবে শুদ্ধ ইসলামের সাম্রাজ্য। কিন্তু মদনপুরার সকলে এই ধরনের বক্তৃতা পছন্দ করছে না। তারা প্রফেট মহম্মদের বাণী শুনতে চায়, পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যা শুনতে চায়। সুতরাং ধীরে ধীরে আবদুল করিম টুন্ডার জমায়েতে লোক কমছে। কয়েক সপ্তাহ পর টুন্ডা নিজেই বুঝে গেল জমছে না। মদনুপরার আয়োজকরা তাকে জানিয়ে দিল এসব প্ররোচনামূলক কথাবার্তা তারা শুনতে চায় না। ইসলামের শান্তির বাণীই তাঁদের লক্ষ্য। যদি তিনি সেসব বলতে পারেন তাহলে বলুন। নয়তো আর তাঁকে ডাকা হবে না। অতএব টুন্ডা বাছাই করা কিছু মানুষকে নিয়ে মোমিনপুরের এক সভাগৃহ বুক করল। সেখানে সে আমন্ত্রিত বক্তা নয়। নিজেই প্রচারক। এবং আর কোনো বাধা নেই। প্রধান কাজই হল যুবকদের বোঝানো যে তাদের একমাত্র লক্ষ্য ইসলামকে হৃতসাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া। ভারত ছিল মুসলিম শাসকদের হাতে। আবার যেন সেই সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়। প্রত্যেক শুক্রবার সন্ধ্যায় ফুফাতো ভাই সেলিমের সঙ্গে নমাজ সেরে মদনপুরায় ওই তবলিগি জামাতে আসা যাওয়া ছিল কুপার হাসপাতালের ডাক্তার জালিস আনসারির। এবং সকলের অজান্তে তার মধ্যে সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করল আর কোনো প্রচারক নয়। আবদুল করিম টুন্ডা। সুতরাং সেই আবদুল করিম যদি না থাকে বক্তা তালিকায়, তাহলে আর আসার দরকার কী? অতএব ডক্টরসাব আর এল না। বরং যাওয়া মনস্থ করল মোমিনপুরায়। এবং নিয়ম করে যেতে শুরু করল। সেই আলাপ টুন্ডার সঙ্গে। সন্ত্রাসের সঙ্গে।

টুন্ডা তার সাপ্তাহিক বক্তৃতায় একদিন বলল, আমি যখন ছোট ছিলাম একদিন আমাদের পাড়ায় এক ম্যাজিসিয়ান এল। সেই জাদুকর একটা স্টিক হাতে নিয়ে সেটার গায়ে কিছু সাদা ময়দার মতো জিনিস লাগাল। এবং হাতে গ্লাভস পড়ে আর একরকম সাদা পাউডার নিয়ে সেই স্টিকে ঘষতে ঘষতে বলল, বাচ্চারা এবার দ্যাখো..এবার এই লাঠি থেকে বেরোতে শুরু করবে আগুনের শিখা...তাকিয়ে থাকো তোমরা...তাকিয়ে থাকো...চোখ সরিও না..। সামনে বসে থাকা বাচ্চারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকত।

আর সত্যিই আচমকা এক আগুনের শিখা দপ করে জ্বলে উঠত লাঠিতে। বাচ্চাদের হাততালিতে ভরে উঠত পাড়ার ওই ছোট্ট মাঠ। কীভাবে সম্ভব হল? আবদুল করিম টুন্ডা বাচ্চা বয়স থেকেই কৌতূহলী। সে তারপর থেকেই তক্কে তক্কে থাকত কীভাবে জ্বলে ওই আগুন তা জানতে হবে। এবং অবশেষে ম্যাজিসিয়ানের সহকারীকে অনেকদিন ধরে নানারকম উপহার দিয়ে দিয়ে জানা গেল ওই সাদা পাউডার হল পটাশিয়াম এবং গুঁড়ো করা চিনি। এবং এই দুটির কম্বিনেশন যদি অ্যাসিডে মেশানো যায় তৎক্ষণাৎ জ্বলে ওঠে আগুনের শিখা। আবদুল করিম টুন্ডা সেই ছেলেবেলায় জেনে গেল বোমা তৈরির প্রাথমিক ফরমুলা! টুন্ডার সামনে এইসব সময় বসে থাকত একদঙ্গল মুসলিম যুবা। যাদের সে ব্রেইন ওয়াশ করানোর জন্য সারাক্ষণ বলে যেত বিভিন্ন কাল্পনিক সত্য মিথ্যা মেশানো মুসলিমদের বঞ্চনার কথা। যুবকবৃন্দ ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হত। এবং সেই উত্তেজনার আগুনে ঘি দিয়ে টুন্ডা বলেছিল, তোমরা কেউ জন্নত যেতে চাও না? একমাত্র কওমের জন্য যদি কিছু করে যেতে পারো তাহলেই যেতে পারবে জন্নত। আমাকে দ্যাখো...আমি গোটা যৌবন সেই ছোটবেলার শিক্ষা কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি কীভাবে একটা মহা বোমা তৈরি করা যায়। আর এই বানানো আর টেস্ট করতে করতে একদিন আমার বাঁ হাতটাই উড়ে গেল বিস্ফোরণে। বলেই বরাবর কাঁধে জড়ানো সবুজ রঙের চাদরটা এক নিমেষে খুলে ফেলল আবদুল করিম টুন্ডা। সকলেই চমকে উঠে দেখতে পেল টুন্ডার বাঁ হাত নেই। আর তাই...বন্ধুরা...আর তাই আজ আর আমি বোমা বানাতে পারি না। তোমরা পারবে না আমার স্বপ্নকে পূরণ করতে? তোমাদের মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে....। তোমরা পারবে এই দেশে আমাদের কওমের জন্য ইতিহাস তৈরি করতে। টুন্ডা আশা করেছিল কেউ কেউ হাত তুলবে। কেউ বলবে আমি আছি জনাব..আমি করব আপনাকে সাহায্য। কিন্তু সেভাবে কেউই সাড়া দেয়নি। সভা সমাপ্ত। টুন্ডা সামান্য হতাশ। সে ভাবছিল কাজ শেষ হয়নি। মুখ ধোয়ার জন্য টয়লেটে গিয়ে যখন বেরোচ্ছে, তখনই দেখতে পেল দুই ব্যক্তি বাইরে দাঁড়িয়ে। দুজনেই ছিল একটু আগেই সভায়। তার মধ্যে একজন টুন্ডার হাত ধরে বলল, জনাব আমি আপনার ভক্ত! আমি পারব আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে। আর আপনি আমাকে যদি শিখিয়ে দেন কীভাবে বোমা

তৈরি হয় তাহলে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিখে আপনাকে দেখিয়ে দেব যে আমি সত্যিই কী পারি! বিশ্বাস রাখুন জনাব..। লোকটির নাম ডক্টর জালিস আনসারি। মহাভারতের যুগের হাজার হাজার বছর পর আজও প্রত্যেক সমাজের একজন করে দ্রোণাচার্য থাকেন যিনি সর্বদা এক প্রিয়, আদর্শ আর যোগ্যতম শিষ্যের খোঁজে থাকেন। আবদুল করিম টুন্ডা অবশেষে খুঁজে পেল এক আদর্শ শিষ্য। মৃদু হাসল টুন্ডা। বলল, কাল থেকে তুমি আমার বাড়িতে এসো। আমি শেখাব আমি যতটুকু জানি! এক্স রে মেশিন আর রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে সারাদিন কাটানো ব্যস্ত ডাক্তার ডক্টর জালিস আনসারির নতুন জীবন শুরু হল রাতে। সকলের অজান্তে সে হয়ে উঠতে লাগল মুম্বইয়ের ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড...।

প্রত্যেকদিন নিয়ম করে বোমার ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর জালিসের কাজ ছিল বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিজের স্টাডিরুমে চলে যাওয়া। এবং সেখানে বসে বসে রিসার্চ করে বের করা কতটা কম উপাদান ব্যবহার করে কতটা বেশি বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। এভাবেই জালিস আনসারি রাতের পর রাত জেগে একটি করে বোমা তৈরি করে দেখাতে নিয়ে যায় গুরু আবদুল করিম টুন্ডাকে। এবং সেটি হাতে নেড়েচেড়ে দেখার পর টুন্ডা মতামত প্রদান করে ভালো হয়েছে অথবা হয়নি। এভাবেই একদিন যখন টুন্ডা স্থিরভাবে বিশ্বাস করেছে যে জালিস একজন বোমা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে তখনই জালিস জানাল সে নিজে তখনই সন্তুষ্ট হবে যখন পুরোদস্তুর টেস্ট করা সম্ভব হবে। কিন্তু কোথায়? মুম্বই শহরে তো আর বোমা ফাটিয়ে টেস্ট করা সম্ভব নয়। তাহলে? হদিশ দিল টুন্ডাই। তার চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি মালেগাঁও। চলো কদিন সেখান থেকে ঘুরে আসা যাক। সেই যাওয়া। কয়েকদিন থাকাই শুধু নয়। প্রচুর ঘোরাঘুরি করে জেনে নেওয়া গেল মালেগাঁওয়ের সুযোগসুবিধা। শহর নয়। শহরের বাইরেটা কেমন? এবং সেভাবেই আবিষ্কার হল গিরনা ব্রিজ। সকালে....দুপুরে........... সন্ধ্যায়...রাতে। স্থির হল রাতে হবে পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা করতেই মালেগাঁও এসে হাজির হয়েছিল ডক্টর জালিস আনসারি। আর ধরা পড়ে গেল চারটি বাচ্চা ছেলের হাতে। এরপর? গুরু কি কখনও শিষ্যের বিপদ দেখে দূরে থাকতে পারে? তাই চুপ করে বসে নেই আবদুল করিম টুন্ডা। কোনোভাবেই এতদিনের

পরিশ্রমে গড়ে তোলা শিষ্যকে এভাবে জেলের অন্ধকারে যেতে দেওয়া চলে না। এবং টুন্ডার ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে হেরে গেল মালেগাঁও পুলিশ। কারণ দিনের পর দিন মাসের পর মাস যাওয়া আসা করতে করতেই টুন্ডা দেখেছে মাঝেমধ্যে. জালিসের হিস্টিরিয়া গোছের হয়। হাত পা বেঁকে যায়...মুখ থেকে কথা বেরোয় না... দাঁত আটকে যায়। সেলিমকে জেরা করে টুন্ডা জেনে নিল আসলে জালিস ভাইয়ার এপিলেপসি বা মৃগী আছে। আগে যখন তখন হত অ্যাটাক। আজকাল আর হয় না। ডাক্তারও দেখানো হয়েছিল। জালিস ভাইয়া ওষুধও খায়। ব্যস! সেকথা মনে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ জালিস আনসারির উকিলদের কাছে টুন্ডা পৌঁছে দিল তাব প্রেসক্রিপশন। এবং আদালতে বলা হল জালিস আনসারির মাথার ঠিক নেই। পাগলামোর রোগ আছে। সন্ত্রাসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। সে নিশ্চয়ই পাগলামির ঝোঁকে এসব করেছে।

আদালত সমস্ত কাগজপত্র এবং জালিস আনসারির কোনোরকম অপরাধের ইতিহাস নেই জেনে বিস্ফোরণের মামলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে দিল। জালিস ফের এক মুক্ত পুরুষ। কিন্তু একজন মানসিক ভারসাম্যহীন পেশেন্টকে কুপার হাসপাতাল কেন চাকরিতে রাখবে? রাখেওনি। চাকরি গেল জালিসের। আয় নেই। তিনটি সন্তান। স্ত্রী। কী করবে ডক্টর জালিস আনসারি? তার নিজের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। সে মদনপুরায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ক্লিনিক চালু করল। রোজ সকালে শুরু হয় জালিস ভাইয়ার চেম্বার। কিন্তু সন্ধ্যায় সেই চেম্বার খোলা হবে না। কারণ কোথায় যেন যায় জালিস ভাইয়া। অতএব সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যখন আসো ক্ষতি নেই। সন্ধ্যায় পাওয়া যাবে না। কারণ কী? কারণ ততদিনে মোমিনপুরায় একটি এক কামরার ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সেখানে রোজ দরজা বন্ধ করে একদল মানুষ ভিতরে আলোচনা করে। কী আলোচনা? কেউ জানে না। প্রত্যেক শনিবার শুধু বেছে বেছে ১০ জন আসে সেই ঘরে। কংক্রিটের ছাদ দেওয়া সেই ঘরে আদতে জালিস আনসারি ১০জন শিষ্যকে বিস্ফোরক বানাতে শেখায়। আর ওই শনিবার শনিবার আসে জালিস আনসারির মুর্শিদ আবদুল করিম টুন্ডা। ঠিক এক বছর এভাবেই কেটে গেল। জালিস আনসারি পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে ১ বছরের

বেশি। সকালে কোনোমতে চেম্বার চলে। আর অপেক্ষা নয়। এবার কাজ করতে হবে। না হলে এই সাধনার দাম কী? অতএব এক শনিবার শপথ নেওয়ার দিন। এবার অ্যাটাক।

প্ল্যান হল অভিনব। প্রত্যেক শুক্রবার একটি করে ব্যাগে বিস্ফোরক রেখে আসা হবে কোনো একটি রেলস্টেশনে অথবা লোকাল ট্রেনে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাস থেকে আচমকা মুম্বইয়ের একের পর এক স্টেশনে কিংবা ট্রেনে শুরু হল ছোট ছোট বিস্ফোরণ। কল্যাণ...মাতুঙ্গা....কুরলা...। একটি নয়...দুটি নয়...তিনটি নয়... কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে মুম্বই শহর ও শহরতলির স্টেশনগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। কারণ ৮০টি বোমা ফেটেছে। কে এর পিছনে? এভাবে কখন সকলের অজান্তে বোমা রেখে যাচ্ছে তারা? সমস্ত স্টেশনে যখন প্রচুর পুলিশ বাড়িয়ে দেওয়া হল তখন দেখা গেল আক্রমণকারীদের প্ল্যান আরও বৃহত্তর। কারণ এতদিন মনে করা হচ্ছিল নিছক রেলস্টেশন টার্গেট। আদতে তা নয়। গোটা মুম্বই টার্গেট। কারণ এরপর বিস্ফোরণ হতে শুরু করল কোলাবার রিগাল সিনেমা....মালাড ..কান্দিভিলি...সেন্ট্রাল মুম্বইয়ের শিবসেনা অফিস...অন্ধেরির কারশেডে....দাদরের সিমেন্ট কারখানায়...। কে করছে? মুম্বই পুলিশ দিশাহারা।

থিওডর জন কাগনিস্কিকে আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন নাম দিয়েছিল আনবম্বার। ইলিনয়েসের এভারগ্রিন পার্কে বড় হওয়া কাগনিস্কি হার্ভার্ড থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি পেয়েছিল ১৯৬২ সালে মিশিগান ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি। মাত্র ২৫ বছর বয়সে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর।

১৯৭১ সালে এই চূড়ান্ত উজ্জ্বল কেরিয়ার ছেড়ে কাগনিস্কি আচমকা চলে যায় এক নির্জন নির্বাসনে। মনটানার লিংকনে সে একাকী থাকতে শুরু করে। সে ঠিক করে গরম জল লাগবে না....ফোন লাগবে না...কিছু লাগবে না। শুধু সে একা থাকবে প্রকৃতির মধ্যে। এবং তার কাজ হবে বোমা তৈরি করা। সেগুলি ফাটছে কিনা কীভাবে প্রমাণ হবে? তার জন্য আছে ক্যুরিয়ার সার্ভিস! সে কী প্রমাণ করতে চায়? প্রমাণ করতে চায় মানুষের

লোভ সাংঘাতিক। বিরাট বড় প্যাকেট পেলেই ভাবে একটা উপহার এসেছে। সেই লোভ সে ভাঙতে চায় মানবসমাজ থেকে।

১৯৭৮ সালের ২৫ মে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর বাকলে ক্রিস্ট নিজের বাড়িতে গিয়ে পেলেন একটি প্যাকেট। পার্কিং লটে রাখা। উপরে তার নাম উইথ লাভ...রিটার্ন অ্যাড্রেস সহ। থমকে গেলেন ক্রিস্ট। কাছেই থাকা পুলিশ অফিসারকে ক্রিস্ট ভাগ্যক্রমে বললেন এই প্যাকেটের কথা। পুলিশ অফিসার টেরি মার্কার। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ও মাই গড! মিস্টিরিয়াস গিফট! লেস ওপেন স্যার..। বলে নিজেই এগিয়ে এসে প্যাকেটটি হাতে নিলেন এবং ধুম ধুম ধুম করে সেটি বিস্ফোরণ! উড়ে গেল পুলিশ অফিসার টেরি মার্কারের বাঁ হাত! ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট নম্বর ৪৪৪ বোয়িং সেভেন ফোর সেভেনের কার্গো হোল্ডে প্রবল ধোঁয়া। এবং বিস্ফোরণ...। সল্ট লেক সিটিতে একটি কম্পিউটার ফার্মের রিসেপশনে বিস্ফোরণ..ইয়েল ইউনিভার্সিটির ইনফরমেশন টেকনলজি ডিপার্টমেন্টে একটি ক্যুরিয়ার এল। সেটি খুলেছিলেন ডেভিড গার্লনার। খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ। নিউ জার্সির নর্থ কাল্ডওয়ালে বার্সন মার্স্টেলার সংস্থার এক্সিকিউটিভ টমাস মোজার এরকমই এক মেইল বক্স ডেলিভারি নিতেই সেই ক্যুরিয়ার বক্সে বিস্ফোরণ। সব মিলিয়ে ১৬টি বোমা বিস্ফোরণ...তিনজনের মৃত্যু...২৩ জন আশঙ্কাজনক। এবং অসংখ্য আহত। বছরের পর বছর চলছে এরকম অদৃশ্য এক অপরাধীর বোমা নিক্ষেপ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে আমেরিকার শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেউ আর কোনো প্যাকেট ডেলিভারি নিতে চাইছে না। চরম আতঙ্ক। কেন ধরতে পারছে না বিশ্বের সেরা তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই? কারণ তাদের থেকেও বুদ্ধিমান ছিল সেই কাগনিস্কি। সে প্রতিটি বোমার প্যাকেটে এমন কিছু প্রমাণ বা ক্লু রেখে দিয়েছিল যা প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। কখনও লেখা এফ সি। কোথাও লেখা একটা মেটাল বক্সের মধ্যে থাকা চিরকুট। যেখানে লেখা, ইউ..ইট ওয়ার্কস..আই টোল্ড ইউ ইট উড..আর ভি...। কোথাও একটি বক্সে ১ ডলারের ইউজেন ও নিলের স্ট্যাম্প লাগানো। সবটাই আসলে তদন্তকারীদের বোকা বানানো। অবশেষে এক হলিউড থ্রিলারের কায়দায় বছরের পর

বছরের তদন্তের পর জানা যায় আসল কালপ্রিট কে। টেড কাগনিস্কি। তাহলে আজ ডক্টর জালিস আনসারির কাহিনি বলতে গিয়ে হঠাৎ থিওডর ওরফে টেড কাগনিস্কির কথা টেনে আনার কারণ কী? কারণ হল টেডকে নাম দেওয়া হয়েছিল আনবম্বার। অদৃশ্য এক বোমারু। সে কবে কোথায় কীভাবে কেন এবং কখন বিস্ফোরক ঘটাবে কেউ জানত না। তবে এটা জানা গিয়েছিল সে থাকে শিকাগোতে। এবং তাই নাম দেওয়া হয়েছিল 'শিকাগো আনবম্বার'। মুম্বই পুলিশকে হতচকিত করে নাজেহাল করে দেওয়া ডক্টর জালিস আনসারির নতুন নাম হয়েছিল সেরকমই 'মুম্বই আনবম্বার...।

কিন্তু এসব ছোটখাটো লোকাল ট্রেন আর মুম্বই শহরের আনাচে কানাচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তো বিরাট কোনো প্রভাব ফেলা যাচ্ছে না? তাহলে আমরা কী এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকব? জালিস জানতে চাইছে আবদুল করিম টুন্ডার কাছে। শনিবার সন্ধ্যা। মোমিনপুরার সেই ঘর। এর মধ্যে টিম মেম্বারের সংখ্যা বেড়েছে। অন্তত ১৮ জন আছে আজকের মিটিংয়ে। সকলে একজোট হয়েছে। আজ নতুন প্ল্যান। টুন্ডা তার শিষ্য জালিসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সকলে চুপ। তার উত্তরের দিকে তাকিয়ে সবাই। আবদুল করিম একটা পান মুখে দিয়ে বলল, আর স্যাকরার মতো খুটখুট করে লাভ নেই। এবার আমাদের কামারের মতো বয়স। ঘা দিতে হবে। কী সেই ঘা? রাজধানী এক্সপ্রেস উড়িয়ে দিতে হবে। দিল্লি-হাওড়া...। সকলে চমকে গেল? এত বড় কাজ! এটা আদৌ সম্ভব? কীভাবে? অবশ্যই সম্ভব, বলল টুন্ডা। সবার আগে দরকার নতুন রিক্রুটমেন্ট। আর ফান্ডিং। সকলে মন দিয়ে শোনো। কার কী দায়িত্ব এখনই বলে দিচ্ছি। টুন্ডা বলতে শুরু করল রাজধানী এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের ব্লু প্রিন্ট!

আর সকলের অলক্ষ্যে ওই ঘরে উপস্থিত থাকা একজন জেহাদি তার পকেটে থাকা গোপন ছোট টেপ রেকর্ডারটিতে সব কথা রেকর্ড করতে লাগল! কে সে? এই দলে থেকে গোপন প্ল্যান কেন রেকর্ড করছে? তার নাম জুলফিকার...ভারতের গুপ্তচর সংস্থা আইবির আন্ডারকভার এক এজেন্ট....।

মুম্বইয়ের মাজেগাঁও ডকে নতুন এক কর্মী এসেছে। দীপক। লোকটি দেখতে সুন্দর। সবথেকে বড় কথা সর্বদাই হাসছে। বয়স বেশি নয়। যুবক বলাই ভালো। আর এরকম অদ্ভুত ভালোমানুষি দেখা যায় না। দীপক নিজে থেকেই সকলের কাজ করে দেয়। কেউ যদি বলে ধুস, আজ আর ভালো লাগছে না.. সকাল থেকে জ্বর... তার মধ্যেই ডিউটি...পারছি না। সেকথা কানে গেলে দীপক এগিয়ে আসবে। আর সুপারভাইজারের অলক্ষ্যে সেই শ্রমিক ভাইয়ের হয়ে সে কাজ করে দেবে। নিজের ডিউটির পাশাপাশি অন্যদের জন্য এরকম জান কবুল মানুষকে তাই ভালো না বেসে পারা যায় না। সবেমাত্র এক দুমাস হয়েছে লোকটি এসেছে। এবং এখনও পর্যন্ত একদিনও কামাই করেনি। রোজ আসে সময় মতো। রোজ যায় সমস্ত কাজ হয়ে যাওয়ার পর। সকলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে কুশল সংবাদ নেয়। এই মাজেগাঁও ডকস লিমিটেডের এক সিনিয়র কর্মীকে সবাই সমীহ করে। তার নাম সেলিম আনসারি। ডক্টর জালিস আনসারির সম্পর্কিত ভাই। আবার অন্যদিকে সেলিমের এক বোনের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে জালিস আনসারির। সেলিম জালিস আনসারির সবথেকে প্রিয় এক সাথী। আবদুল করিম টুন্ডার সাপ্তাহিক ভাষণে এই সেলিমের সঙ্গেই যাতায়াত করেছে জালিস। আর তারপর থেকে তার প্রতিটি প্ল্যানের নিখুঁত প্রয়োগের জন্য সঠিক লোক বেছে দেওয়ার দায়িত্বে থাকে এই সেলিম। মাজেগাঁও ডকসে অবশ্য সেলিম সকলের সঙ্গে মেশে না। তার বৃত্তটি অত্যন্ত ছোট। কেউ যেচে এসে কথা বললেও সেলিম সচরাচর এড়িয়ে যায়। কারণ সেলিমের একটি গুণ হল বিশেষ করে মুসলিম শ্রমিকের কাছে সে হল মুশকিল আসান ভাই। বাড়িতে কেউ অসুস্থ, ডাক্তার দেখাতে টাকা লাগবে। সেলিম ভাই আছে। মেয়ের বিয়ে..সাহায্য চাই। সেলিম ভাই আছে। ডকের কাছেই থাকার জায়গা চাই। সেলিম ভাই ব্যবস্থা করে দেবে। তাই সেলিম ভাই এক জনপ্রিয় নাম। এই জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে কারণ সেলিম ভাইয়ের এক দাদা আছে। ডাক্তার। তিনি তো সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ রবিবার সারাদিন তিনি রোগী দেখেন বিনা পয়সায়। সপ্তাহের অন্যদিন কিছু টাকা দিতে হয়। কিন্তু সেও সামান্য। জালিস আনসারি সেই ডাক্তারের নাম। সব মিলিয়ে সেলিম আর জালিস দুজনকে মদনপুরা, মোমিনপুরা, মাজেগাঁও এলাকার মানুষ প্রচণ্ড বিশ্বাস করে।

সেলিমের কানে খবর এল নতুন একটি কর্মীর নাম। দীপক। সে নাকি হঠাৎ করে খুব বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে সকলের কাছে। সকলেই তাকে ভালোবাসে। দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা! এরকম তো হয়নি! তাও আবার হিন্দু এক নতুন লেবার মুসলিম শ্রমিকদের মধ্যেও পপুলার! সেলিম চিন্তিত। তাকে বলা হল কর্মীটি হিন্দু হলেও মুসলিমদের উপর যে নানারকম অত্যাচার আর বঞ্চনা হয়, সে ব্যাপারে খুবই সহানুভূতি জানায়। আর সকলের আপদে বিপদেই দৌড়ে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রবল ভিড় ডক ক্যান্টিনে। খাবার পচা। দুপুরে সকলে বাড়ির খাবার খায় না। অনেকেই বাড়ি থেকে সবজি বা রুটি নিয়ে আসে। বাকিটা ক্যান্টিন থেকে ডাল বা অন্য কিছু নিয়ে নেয়। সেই ডাল থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। এই ডাল খাওয়া যায়? গোটা ডালের গামলা উলটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে থইথই করছে ডাল। মুস্তাক ভাই ক্যান্টিনের মালিক। সে বলছে, আমি কি ইচ্ছে করে ডাল নষ্ট করেছি? কেন ডাল পচে গিয়েছে তা কীভাবে জানব? সেসব কথা শুনতে রাজি না বিক্ষুব্ধ শ্রমিকের দল। তারা প্রায় মারতে উদ্যত। ঠিক সেই সময় একটি শ্রমিক হঠাৎ পিছন থেকে বলল ভাইসব, এই দ্যাখো। সবাই ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা মরা ছুঁচো তার হাতে ধরা। আর সেটা থেকে প্রবল দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। মুস্তাক ভাইয়ের কোনো দোষ নেই। জলের কন্টেনারে এই মরা ইঁদুর ছিল। সেই জল মেশানো হয়েছে ডালে। তাই এই অবস্থা। পরিস্থিতি শান্ত হল। মুস্তাক ভাই অভিভূত। সে তো সেই সকালে সমস্ত এঁটো কন্টেনার বারান্দার পিছনে ডাঁই করে রেখেছে। তার তো মনে পড়েনি একবারও চেক করতে। এই লোকটা তাকে তো বিরাট বাঁচা বাঁচিয়ে দিল! সবার আগে সে দৌড়ে এল লোকটির কাছে। হাত দুটো জড়িয়ে বলল আল্লার কাছে দোয়া করি তোমার জন্য ভাইয়া। তুমি বাঁচালে আমার ইজ্জৎ। লজ্জা পেয়ে দীপক বলল, একটু সাবধানে রেখো এরপর জিনিসপত্র। এই কাণ্ডটি প্রচার পেল যথেষ্ট। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে লক্ষ করেছে একজন। সেলিম আনসারি। এবং এক মুহূর্তে তার মনোভাব পালটে গেল এই লোকটির প্রতি। মুস্তাক ভাইয়ের মতো একজন মুসলমানকে যেভাবে আজ রক্ষা করেছে দীপক তাতে অবশ্যই গোটা কমিউনিটির কাছে সে হিরো। এই লোকের সঙ্গে কথা বলে ধন্যবাদ জানাতে হবে। তাই পরদিনই ডিউটির পর সেলিম চলে এল অন্য ইউনিটে। যেখানে দীপক

কাজ করে। এবং বেরনোর সময় নিজেই এগিয়ে গিয়ে কথা বলল। দীপক বিস্মিত। সে বলল, ও আচ্ছা..আপনিই সেলিমভাই। অনেক কথা শুনেছি আপনার নামে। সকলে আপনাকে কত ভালোবাসে। আমার কথা বলার খুব ইচ্ছে ছিল। মুখে সরল হাসি... কী সুন্দরভাবে বলছে দীপক। চকিতে সে মন জয় করে নিয়েছে সেলিমের। আর তারপর থেকে দেখা গেল সেলিম আর দীপক একসঙ্গে ক্যান্টিনে লাঞ্চ খায়। কোথায় থাকে দীপক? সেলিম জানতে চায়। দীপক হেসে বলে, তার এক মাসি আছে ভাহিন্দরে। সেখানে। এত দূর থেকে? কেন? এখানে একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি..সেলিম কাঁধে হাত রাখল। দীপক আরও বেশি হাসছে। না না ভাইয়া...আমার মাসি আমাকে পেয়ে খুব খুশি। আমার ওখানেই ঠিক আছে। তাছাড়া আমার ওখানে একটা বস্তি আছে। ওদের আমি ছুটির দিন পড়াই, একটু ছবি আঁকা শেখাই। সব মুসলিম তো। তেমন লেখাপড়াও নেই। তাই একটু হেল্প করি। সেলিম চমৎকৃত। এভাবে একটা হিন্দু ছেলের মতো আমাদেরই কমিউনিটির ছেলেরাও যদি ভাবত আমাদের দুর্দশার কথা..তাহলে এত খারাপ অবস্থা হয় না...ভাবছে সেলিম। আর তখন দীপক কানে কানে বলল আপনারা নিজেদের কমিউনিটির জন্য কিছু একটা করুন। চমকে উঠল। সেলিম। ছেলেটি কি মনের কথাও পড়তে পারে নাকি? ক্রমেই বোঝা গেল দীপক সেলিমকে খুবই পছন্দ করে ফেলেছে। এবং সে একটা সামান্য জামা কিনতে হলেও সেলিমকে জিজ্ঞাসা করে। অর্থাৎ দীপক শিষ্য, সেলিম গুরু। এর মধ্যে একদিন মোমিনপুরায় নিয়ে গিয়েছিল দীপককে। ঠিক হয়েছে সেখানে একটা সাপ্তাহিক স্কুলে দীপক ইংরাজি শেখাবে লোকাল বাচ্চাদের। আর এসবের আড়ালে সেলিম কিন্তু একবারও বুঝতে দেয়নি তার আসল পরিচয়। এই যে একের পর এক মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেন আর স্টেশনগুলিতে বিস্ফোরণ হচ্ছে তার পিছনে প্রধান মাস্টারমাইন্ড সেলিমের দাদা জালিস। আর রিক্রুটার কে? সেলিম! ঠিক একমাস পর সেলিমকে একদিন ক্যান্টিনে দীপক বলল, ভাইয়া..একটা কথা আছে...আজ ছুটির পর তোমাকে বলব... এখন না। ছুটির পর দুজনেই বেরিয়ে এল। আজ সেলিম তার সঙ্গীদের বলেছে কাউকে আসতে হবে না সঙ্গে। আজ তার অন্য কাজ আছে। আন্ধেরি ওয়েস্ট স্টেশনের বাইরের এক জায়গায় চা খাওয়ার পর দীপক বলল, ভাইয়া আমি

মুসলিম হতে চাই...! আমি বুঝেছি মুসলিম ধর্ম আমাকে টানছে। তুমি আমাকে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও..। সেলিম চমকে গেল। এরকম একটা কথা যে দীপক বলতে পারে তা ভাবা যায়নি। যদিও বিগত একমাসে টের পাওয়া যাচ্ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে একটা কোনো এনজিও খোলা যায় কিনা কিংবা কীভাবে তাদের আর একটু শিক্ষা বা টাকাপয়সা দিয়ে উন্নতি করা যায় সেসব নিয়ে খুবই চিন্তিত দীপক। তাই বলে একেবারে মুসলিম হতে চাওয়া? এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে? অতএব সেলিম সানন্দে সেদিনই রাতে ডক্টর জালিস আনসারিকে একথা জানাল। জালিস আনসারিও খুশি। এটা তো ভালো কথা। একটা দিন ফিক্সড করা হোক। সেদিনই ধর্মান্তর হবে দীপকের। সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সকলে একটা ব্যাপারেই চিন্তিত ছিল। এত বড় বয়সে সুন্নৎ হলে সেটি খুবই কষ্টদায়ক হবে নিশ্চয়ই। দীপক কি পারবে সেটা সহ্য করতে? দেখা গেল সে নিজেই আগ্রহী। কারণ প্রকৃত মুসলিম হয়ে উঠতে চায় সে। অতএব সব প্রক্রিয়াই সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেল। দীপক হয়ে উঠল সেলিম আনসারি, জালিস আনসারির কাছের লোক। কিন্তু নাম পালটাতে হবে তো? সেটাই তো নিয়ম। দীপকের নতুন নামকরণ হল। জুলফিকার। রাজস্থানের গঙ্গানগরের যুবক রবীন্দর দারুণ নাটক করে। গ্রামেগঞ্জে, কোনো অনুষ্ঠানে, মেলায় রবীন্দর ঘুরে বেড়ায় নাটকের দলের সঙ্গে। তার সবথেকে বড় যে শক্তি, সেটি হল দুর্দান্ত ভাষাজ্ঞান। অন্য যে কোনো ভাষা কয়েকদিন শুনলেই সে ওই উচ্চারণটি হুবহু তুলে নেয়। পুষ্কর মেলায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। রবীন্দর সেজেছে দারা শিকোহ। অতএব সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের এক কর্মী ঠিক করল এই টিমকেই পাঠানো হবে ইন্টারস্টেট ড্রামা ফেস্টিভ্যালে। হবে লখনউতে। ১৯৭৩ সাল। লখনউ এর সেই ড্রামা ফেস্টিভ্যালে রাজস্থানের গ্রুপের দারা শিকোহকে দেখার পর করতালিতে ফেটে যাচ্ছে রাণাপ্রতাপ ময়দান। আর সকলের আড়ালে একটি সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এক ব্যক্তি। মাথায় টুপি। ভিড় কমে গেল। ওই নাটকের দলের কলাকুশলীরা দ্রুত জামাকাপড় গোছাচ্ছেন। আগামীকাল ভোরের ট্রেনেই ব্যাক করতে হবে। তাই গ্রিনরুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে হোটেলে ফিরে গোছানো বাকি। সকলেই ব্যস্ত। ঠিক দারা শিকোহের রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন সেই মাথায় টুপি পরা লোকটি। রাজস্থানের এক রাজনৈতিক নেতা

এই দারা শিকোহের খবর দিয়েছে। যার নাম রবীন্দর কৌশিক। সরাসরি তাকে বলা হল একটা চাকরি করবে? রবীন্দর বিস্মিত। এরকম নিশুত রাতে তাকে চাকরির অফার দিচ্ছে কে? লোকটি রহস্যময় হেসে বলল, তোমার বাবা রিটায়ার্ড তো! টেক্সটাইলস মিলের কর্মী ছিলেন না? রবীন্দর আরও চমকে গেল! কে এই লোক? সবই জানে তার সম্পর্কে! ভেবে দ্যাখো...এই নাটক করে সংসার কি চলবে? তার থেকে ফিক্সড সরকারি চাকরি করো। তিনদিন পর জয়পুরে চলে আসবে এই ঠিকানায় বলে একটা চিরকুট হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেল সেই লোক। হতভম্ব হয়েই বাড়ি ফিরল। বাবাকে সবটা বলার পর বাবা জানালেন একবার দেখা করা উচিত। সরকারি চাকরি তো বলে বলে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনদিন পর রবীন্দর জয়পুরে। এবং জানা গেল চাকরিটা করার আগে ২ বছরের একটা ট্রেনিং হবে। তারপর তাকে যেতে হবে পাকিস্তানে। পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য তাকেই বেছে নেওয়া হল কেন? কারণ সে অনায়াসে উর্দু ভাষাটা শিখে নিতে পারবে। যেভাবে নাটকে সে উর্দু বলেছে, তা চমকপ্রদ। সুতরাং সেই এই কাজে আদর্শ। চাকরির শর্ত হল পাকিস্তান থেকে ভারতে আবার বাড়ি ফেরা যাবে তা নিশ্চিত নয়। চাকরিটা কী? চাকরিটা হল ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা RAW এর এজেন্ট হতে হবে। এবং রবীন্দরকে পাকিস্তানে যাওয়ার আগে হতে হবে মুসলিম। করতে হবে সুন্নৎ। রবীন্দর কৌশিক। জীবনে বোর হতে শেখেনি। একটাই জীবন। একটু অ্যাডভেঞ্চার করে নিতে আপত্তি কী? আমি সত্যি কতটা পারি? নিজের সহজ জীবনযাপনের বৃত্তের বাইরে গিয়ে আগুনের মধ্যে বাস করার মতো আত্মপরীক্ষার সুযোগ তো আসবে না বেশি! তাই চান্সটা হারাল না রবীন্দর কৌশিক। ২ বছরের ট্রেনিং। একজন দুর্ধর্ষ RAW এজেন্ট হতে হলে সম্পূর্ণ পাকিস্তানী হয়ে যেতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল, কালচার এবং মুখের লব্জ। সবই অবিকল হতে হবে পাকিস্তানের ঘরের ছেলের মতো। রবীন্দর কৌশিক এক মহা বিস্ময়ের নাম। সে ১৯৭৯ সালের এক মধ্যরাতে পেরিয়ে গেল বর্ডার। এবং করাচিতে গিয়ে তার শুরু হল এক একক লড়াই। প্রতিবেশীরা সকলে জানতে পারছে মুলতান থেকে এসেছে একটি নতুন যুবক। নাম নাবি আহমেদ শাকির। পড়াশোনা করবে। প্রথম ভর্তি হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইন পড়ার জন্য। তার জন্য তো বি এ পাশ করা দরকার! সে ব্যবস্থাও আগে থেকেই তৈরি ছিল।

ভারতের দূতাবাস থেকে জাল মার্কশিট কিনে নেওয়া আছে নাবি আহমেদ শাকিরের নামে। করাচিতে এক চাচাতো ভাই এল একদিন নাবির সঙ্গে দেখা করতে। সে দিয়ে গেল একটা ট্রাংক। সকলেই জানছে, মুলতান থেকে আসা এক আত্মীয়। আসলে কিন্তু তা নয়। ওই চাচাতো ভাই আগে থেকেই করাচিতে গোপনে থাকা আর এক ভারতীয় স্পাই। পাকিস্তানে পয়সা দিলে. পাওয়া যায় জাল মার্কশিট। সেই জাল মার্কশিট নিয়ে রবীন্দর ওরফে নাবি ভর্তি হয়ে গেল আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে। দু বছর ধরে পড়াশোনা। আসল লক্ষ্য কিন্তু অন্য। পাকিস্তান আর্মিতে ঢোকা! হ্যাঁ। এই অসম্ভব আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজটিই ছিল রবীন্দরের প্রধান মিশন। যেভাবেই হোক পাকিস্তানের আর্মির মধ্যে এক ভারতীয় স্পাই ঢুকিয়ে দিতে হবে এটা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর ব্রেইনচাইল্ড। সুতরাং সেই প্ল্যান সামনে রেখে আর্মির পরীক্ষায় বসা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করা এমএএলএলবি-দের বেশি সুযোগ। লিগ্যাল সেলে ঢোকার। যত গোপন কাগজপত্র আর নথি তো থাকবে আর্মির লিগ্যাল সেলেই। অসামান্য পারফরম্যান্স রবীন্দরের। সে পাশ করে গেল। এবং পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের পর সেই প্রথম সবথেকে বড় গোপন যুদ্ধে পরাজিত। তাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছে এক ভারতীয় স্পাই। রবীন্দর ওরফে নাবি নিজেকে এতটাই পাকিস্তানী করে তুলতে বদ্ধপরিকর, যে এর পরের ধাপ বিয়ে। যাকে তাকে নয়। এক প্রাক্তন এয়ারফোর্স অফিসারের মেয়ে আমানতকে বিয়ে করে ফেলল। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত লাগাতার নাবি আহমেদ ওরফে রবীন্দর ভারত সরকারের কাছে সাপ্লাই করে গিয়েছে একের পর এক গোপন তথ্য। ১৯৮৩ সালে ঘটল সবথেকে বড় বজ্রপাত। আগে থেকেই রবীন্দর খবর পাঠিয়েছিল যে একটা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ নথি তার হাতে এসেছে। সেটি সে হাতে করে যাচ্ছে অমৃতসর বর্ডারের কাছে। কাউকে একটা পাঠাতে হবে। ভারতের গুপ্তচর সংস্থা RAW তাদের এক নতুন এজেন্টকে এই কাজে নিয়োগ করেছিল। যুবক। এর আগে ছোটখাটো কাজ করেছে। কিন্তু অমৃতসর বর্ডার পেরিয়ে একেবারে লাহোরের কাছে জাল্লো পার্কে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। পরনে থাকতে হবে হলুদ জামা। ছেলেটির নাম মাশিত। হাতে লাহোর টাইমস। অন্যদিক থেকে আসছে রবীন্দর। বাসে। কিন্তু দুদিক থেকে দুজনে আসছে। দুটি বাসে। এবং মাশিত চরম একটি ভুল করেছিল। হাতে ছিল ব্যাগ।

যেটিতে লেখা জলন্ধরের নাম। ব্যস! ধরা পড়ে গেল সে। এবং ফাঁস করে দিয়েছিল রবীন্দর কৌশিকের নাম। লাহোরের দিক থেকে আসা বাস থেকে নামানো হয়েছিল রবীন্দরকে। এবং গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ বছর পাকিস্তানের এক জেল থেকে অন্য জেলে ঘোরানো হয়েছে রবীন্দরকে। সঙ্গে অত্যাচার। ২০০১ সালে মুলতান জেলে রবীন্দর কৌশিক একাকী এক নির্জন সেলে মারা গেল। যক্ষ্মা।

এই কাহিনিটি নতুন নয়। কমবেশি সকলেরই জানা। চর্চিতও বটে। তাই গোটা অপারেশনের বিস্তারিত পুনরায় বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ করে সলমন খানের ‘এক থা টাইগার' সিনেমার আসল টাইগার যে এই রবীন্দর, সেকথাও সর্বজনবিদিত। রবীন্দর কৌশিকের সেই অপারেশনের নামও ছিল ‘অপারেশন ব্ল্যাক টাইগার’। এই ডক্টর জালিস আনসারির কাহিনির মধ্যেই একটি উপকাহিনি হিসাবে ঢুকে পড়ল কেন? কারণ ভারতীয় গুপ্তচর বাহিনীর স্পাই ও গোয়েন্দাদের অসাধ্যসাধনের, জীবনকে বাজি রেখে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার কাহিনিগুলোর মধ্যে এটি একটি সর্বোৎকৃষ্ট রেফারেন্স। প্রতিপক্ষের গোপন খবর পাওয়ার জন্য চর ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রচলন নতুন নয়। এতকাল ছিল শত্রুপক্ষ বলতে শত্রুরাষ্ট্র। নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু হল আর এক ট্রেন্ড। সন্ত্রাস। সুতরাং নতুন শত্রুপক্ষ হয়ে উঠল একের পর এক জঙ্গি গোষ্ঠী আর তাদের স্লিপার সেল। কীভাবে পাওয়া যাবে তাদের গোপনীয় প্ল্যানের সন্ধান? সেই কারণে তখন থেকে শুরু হয়েছিল অন্য রাষ্ট্রের উপর গোপন নজরদারির পাশাপাশি দিকে দিকে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাহিনীর মধ্যেও ঢুকিয়ে দেওয়া সরকারি স্পাই। অথবা স্পাইবাহিনীর গোপন ইনফর্মার। কিন্তু অপারেশনে নিছক ইনফর্মার ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ একটাই। যে কোনো সময় ইনফর্মার হয়ে যায় ডাবল এজেন্ট। আবদুল করিম টুন্ডার ওপর নজরদারি ছিলই। সে যে মুম্বইয়ের মদনপুরা এলাকার সমাবেশে ঘৃণা ছড়াচ্ছে এবং উত্তেজক ভাষণ দিচ্ছে, সেসব রিপোর্ট জমা পড়ছিল মুম্বইয়ের ক্র্যাফোর্ড মার্কেটের উলটোদিকে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে। অতএব প্রথম কাজ ছিল কারা আসছে টুন্ডার কাছে জানা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল সবথেকে বেশি কাদের আনাগোনা। এবং মোমিনপুরের শনিবারের বৈঠকের খবরও জানা ছিল। কিন্তু সবথেকে বড় সমস্যা হল কীভাবে জানা সম্ভব যে

আদতে ওইসব বৈঠকে কী হচ্ছে ওই ছোট্ট ঘরটির মধ্যে? আর ডক্টর জালিস আনসারি এলাকায় প্রবল জনপ্রিয়। নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় তাকে আগাম গ্রেপ্তার করা। কিন্তু সেসব তো পরে। আগে জানা দরকার এদের আসল প্ল্যান কী? এবং সেখানেই ছিল চরম এক নাটকীয়তা। কারণ যেহেতু একের পর এক বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে স্টেশন ও লোকাল ট্রেনে, তাই স্বাভাবিকভাবেই রেলমন্ত্রক সবথেকে বেশি উদ্বিগ্ন। তারাই জানাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে উদ্বেগের কথা। এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দায়িত্ব দিল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও সিবিআই দু পক্ষকেই। একদল স্পাইং করে। অন্য গোয়েন্দারা তদন্ত করে। আর ওই দুই বাহিনীর যৌথ প্ল্যান— চর ঢুকিয়ে দেওয়া হোক জালিস আনসারির গ্রুপে। কে সেই চর? দীপক। না না...ভুল বলা হল..এখন তো আর সে দীপক নয়! জুলফিকার....! ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এক তুখড় আন্ডারকভার স্পাই। যাঁর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যেভাবেই হোক ঢুকে পড়তে হবে জালিস আনসারির গ্রুপে। প্রমাণ বের করতে হবে এই গ্রুপই আছে তাও মুম্বই বিস্ফোরণের পিছনে। জেনে নিতে হবে পরবর্তী অপারেশন কী! অতএব দীপক সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করে নিয়ে ঢুকে পড়লেন নিঃশব্দে জালিসের গ্রুপে। দীপক ধর্মান্তর করে মুসলিম হয়ে গেলেন। ওহ! সরি! দীপক না। জুলফিকার...।

প্রথম টার্গেট তাহলে নিউ দিল্লি হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস? কিন্তু কবে? সেটাই তো সবথেকে দামি প্রশ্ন। কারণ সময়টা জানা না থাকলে তা কোনো ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের অর্থই হয় না। অতএব শনিবারের সেই মিটিং থেকে বেরিয়ে জুলফিকারের প্রথম কাজই হল সিদ্ধান্ত নেওয়া এরপর কী? মিটিং-এ সেলিম আছে। সকলে চলে গেল। একসঙ্গে ফিরবে সেলিম আর জালিস আনসারি। দাঁড়িয়ে আছে জুলফিকার। রওনা হওয়ার আগে তার দিকে চোখ পড়ল সেলিমের। কিছু বলার আছে? জানতে চাইছে, সেলিম ভাইয়া আমাদের ডিউটি কী? আমাকে কোথায় রাখতে হবে বোমা? আমি কাজ করতে চাই। সেলিম কিছু বলার আগে জালিস আনসারি এগিয়ে এসে বলল, আমরা ঠিক টাইমেই জানিয়ে দেব। এত অস্থির হতে হবে না। আর তোমাকে তো কাজে লাগানো হবেই।

জুলফিকার আর কিছু না বলে হাসল। সে কিন্তু জানতেও পারল না আদতে তাকে কোনো কাজের ভার দেওয়া হবে না। কারণ জালিসের মাথায় আছে অন্য প্ল্যান। তার গ্রুপের কেউই ওই কাজে যুক্ত হবে না। রিক্রুট করতে হবে অন্য লোক। লখনউ-এর ছেলে বোমা রেখে আসবে দিল্লিতে। জয়পুরের ছেলে বোমা রাখতে যাবে জম্মু। সেইমতো কাউকে কিছু না জানিয়ে পরদিন ভোরে বেরিয়ে পড়ল জালিস। আসলে তার লক্ষ্য আরও বেশি। ভারতের সর্বত্র একসঙ্গেই রাজধানী এক্সপ্রেসগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। যাত্রা শুরু হল। প্রথমে কানপুর, তারপর রায়বেরেলি, হায়দরাবাদ আর নাগপুর। এই সফরে সে কাদের সঙ্গ পেল?

একঝাঁক প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীকেও। জামাল আলভি অর্থনীতির মাস্টার্স ডিগ্রি করা শিক্ষক, রায়বেরিলি থেকে হাবিব আহমেদ। দিল্লি থেকে কাইরি কাশ্মীরি। কিন্তু টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? এদের থেকে বেশি টাকা পাওয়া সম্ভব নয়। টুন্ডার নেটওয়ার্কের এক সোর্স ছিল। তার নাম মির্জা দিলশাদ বেগ। থাকে কাঠমান্ডুতে। কপিলাবস্তু কেন্দ্র থেকে তিনবারের নির্বাচিত এমএলএ। রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির। তার কাছে অগাধ টাকা। আর ভারতে কোনো অপারেশন করতে হলে তাকে সাহায্য করার জন্য আছে দুবাইয়ের একটি লোক। মির্জার মেন্টর। লোকটির নাম দাউদ ইব্রাহিম। জালিস আনসারি ঠিক করল এরপর তাহলে যেতে হবে তাকে কাঠমান্ডু। এবং সব পরিকল্পনা যখন চলছে ঠিক তখনই আচমকা একটি দুপুরে জালিস আনসারি আর সেলিম আনসারি এবং আবদুল করিম টুন্ডারা সকলে কেঁপে উঠল। কারণ গোটা বম্বে শহরে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ। এবং অন্তত ৩০০ লোক মৃত। চমকে উঠেছিল জালিস। সে থাকতে এতবড় একটা ঘটনা অন্য কেউ ঘটাল? কয়েকদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল কে করেছে? দাউদ। কাকে দিয়ে করিয়েছে? মেমন পরিবারকে দিয়ে। মাহিমের মেমন ভাইয়েরা এতবড় কাজ করে ফেলল? আর আমি পারলাম না কিছুই? জালিস ছটফট করছে। এবং চেপে বসল রকসৌলের ট্রেনে। এবং রকসৌল থেকে বেরিয়েই কাঠমান্ডু। কিন্তু জালিসের কপাল খারাপ। বম্বের বিস্ফোরণের পরই গোটা অপরাধ সাম্রাজ্য তছনছ হতে শুরু করেছে। দাউদ দুবাই ছেড়ে চিরতরে চলে গেল করাচি। বম্বের ড্রাগ মাফিয়াদের সম্রাট ইকবাল মির্চি

পালিয়ে গেল লন্ডন। আর কাঠমান্ডুতে মির্জার কোনো ক্ষমতাই রইল না আর। তাই খালি হাতেই ফিরল জালিস। কিন্তু তাই বলে কী হাল ছেড়ে দিতে হবে? একদমই না। নিজেই ঠিক করল যতটা ক্ষমতা সেই দিয়েই আঘাত হানতে হবে। অতএব বিভিন্ন শহর ঘুরে তৈরি করা সেইসব যুবককে নিয়ে তৈরি হল এক নয়া বাহিনী যার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রাশ ইন্ডিয়া ফোর্স!

এদিকে জুলফিকার অস্থির হয়ে যাচ্ছে। কোথায় গেল জালিস আনসারি? অলক্ষ্যে কী ঘটে যাচ্ছে? কোনোরকম ভাবে ঠেকাতে তো হবেই। কিন্তু আগে তো জানতে হবে? সেলিমকে একবার জিজ্ঞাসা করার পরও কোনো উত্তর পায়নি। বেশি জানতে চাওয়া বোকামি। সন্দেহ হবে। এদিকে কেউই জানে না যে আসলে জালিস ফিরবেও না। কারণ ইতিমধ্যেই সে ঠিক করেছে গোটা অপারেশন লখনউ থেকে প্ল্যান আর এক্সিকিউট করা হবে। হাওড়া রাজধানীতে বোমা রাখবে মকসুদ। হায়দরাবাদে রাখবে সামসুদ্দিন। দিল্লিতে যাবে জয়পুর থেকে রুখবানুর। সকলকে বলা হয়েছে টাইম।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩। প্রথম বোমাটি ফাটবে দিল্লি হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেসে। সেরকমই প্ল্যান। কিন্তু একী? ওই ট্রেনে বোমা ফেটে গেল ৫ ডিসেম্বর রাত ১১ টায়। যাত্রীরা সবাই ঘুমোচ্ছে। এটা কী হল? কিছুই হল না। শুধু আতঙ্ক ছড়াল একটু। কারণ কোনো বড় মাপের বিস্ফোরকই ছিল না। পরদিন মরিয়া হয়ে আবার টার্গেট করা হল। এবার হাওড়া থেকে দিল্লি যাওয়ার রাজধানী। এটা ফেটে গেল ভোর ৫ টায়। টয়লেটে। এবং এবারও কোনো হতাহত নেই। তৃতীয় বোমা বিস্ফোরণ হল বম্বে দিল্লি রাজধানীতে। চতুর্থ বোমা বিস্ফোরণ সুরাত থেকে দিল্লি ফ্লাইং কুইন এক্সপ্রেসে। পঞ্চম বোমা ফাটল এপি এক্সপ্রেসে। হায়দরাবাদ থেকে নিজামউদ্দিনগামী রুটে। আর এটাই সবথেকে মারাত্মক। বহু যাত্রী আহত। দুজন মৃত। কিন্তু যতটা সাড়া ফেলার কথা ততটা ক্ষতি করা গেল না। অতএব জালিস আনসারি সম্পূর্ণ হতাশ। এবং তার থেকেও হতাশ আর একজন। জুলফিকার। কারণ তিনি জালিসের গ্রুপে আছেন। অথচ জানতেই পারছেন না কবে কোথায় অপারেশন। তাহলে ওপরতলায় কী জবাব দেবেন? জালিস এতটাই হতাশ যে শনিবারের

মিটিং বন্ধ হয়ে গেল। এইসব বিস্ফোরণের সঙ্গে জালিসই যুক্ত। সেটা জানা। কিন্তু প্রমাণ কই? একমাত্র একটা টেপরেকর্ডারের কথাবার্তা। ওটা তো প্রমাণ করে না যে সে করেছে। তাহলে কি জালিস আর কোনো অপারেশন করবে না? ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এই গ্রুপ? ভাবছিল জুলফিকার ওরফে দীপক। তবু তাকে তার দিল্লির বসেরা বলল থেকে যেতে হবে গ্রুপে। কারণ এখনও সন্দেহ আছে। কোনো একটা মিশন হবেই। আর এত কাছে এসে জালিসকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। অতএব থেকে গেল জুলফিকার। এবং সত্যিই সুযোগ এসে গেল। এক মাস উধাও থাকার পর একদিন আবার শহরে হাজির আবদুল করিম টুন্ডা। এবং এসেই মিটিং ডাকা হল। শনিবার। সন্ধ্যায়। মোমিনপুরার সেই কংক্রিটের ভাড়া করা বাড়ি। এবার জমায়েতে লোক একটু কম। কিছু ছেলে ছিটকে গিয়েছে। আবদুল করিম টুন্ডা সকলকে দেখে নিয়ে বলল, ডক্টরসাব খুব ভেঙে পড়েছে। এই খেলায় করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। তাই হাল ছেড়ে দেওয়া বেওকুফি...না মর্দওয়ালি বাত... আমরা এবার সেরা কাজটা করব। ভারতে আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। আগামীদিনে কেউ পারবেও না। আমরাই প্রথম আমরাই লাস্ট..। সকলে ব্যগ্র। কী এমন অপারেশন? টুন্ডা একটু থেমে গেল। সকলের মুখের দিকে দেখে নিল। জালিস ভাই উদাসীন। একদৃষ্টিতে সামনে তাকালো। কারণ সে জানে প্ল্যানের কথা। তাই এখন থেকেই মনোনিবেশ করছে যেন। যাতে আগের ভুল না হয়। টুন্ডার কণ্ঠ শোনা গেল, ২৬ জানুয়ারি..দিল্লি... প্যারেডে..। এবার আমি আর জালিস বোমা বানাব। আর কেউ না। বোমা প্ল্যান্ট করতে যাবে জুলফিকার আর সেলিম। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না জুলফিকার। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা বড় কথা নয়। বম্বের একটি ঘিঞ্জি এলাকা মোমিনপুরায় প্ল্যান হচ্ছে ১৯৯৪ সালের ২৬ জানুয়ারি রিপাবলিক ডের প্যারেডে ব্লাস্ট হবে! চোয়াল শক্ত হয়ে গেল জুলফিকারের। অবশেষে। এবার আর কোনো ভুল হবে না। সময় জায়গা আর মিশন জানা হয়ে গেছে। পকেটে টেপ রেকর্ডার ঘুরছে। কাউন্টডাউন শুরু। জুলফিকার মনে মনে বলল..জালিস আনসারি তুমহারা অন্ত শুরু হো রাহা হ্যায়... তৈয়ার হো যাও...।

সকলে একে একে জড়িয়ে ধরছে জুলফিকার আর সেলিমকে। কারণ তারা এত বড় একটা কাজের দায়িত্ব পেয়েছে। মৃদু হাসি জালিস আনসারির মুখে। এই দুজনের প্রতি তার

সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আর বিশেষ করে দুজনেই জালিস আনসারির একেবারে নিজের লোক। কোনোরকম পাকামি নেই কারও। এদের দিয়ে কাজ করানো সহজ। সে এগিয়ে এসে সেলিম আর জুলফিকারের কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে ধরে বলল, ক্রাশ ইন্ডিয়া ফোর্সের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে। তোমাদের নাম উঠবে আমাদের এই যুদ্ধের ইতিহাসে। আমার পুরো বিশ্বাস তোমরাই পারবে। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। কোনো চিন্তা নেই। আর এবার এমন এক বোমা বানাব যা গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবে...। জুলফিকার হাসল। জুলফিকার হাসির জন্যই সকলের কাছে এত প্রিয়। সেলিম হাসল। তার ঠোঁটে একটি রহস্যময় হাসি। সেদিন মধ্যরাতে একটি টেলিফোন বুথে ঢুকতে দেখা গেল জুলফিকারকে। জায়গাটা ছিল চার্চ গেটের উলটোদিকের রাস্তার পিছনে। নিউ সিভিল লাইনস..।

১৫ জানুয়ারি ক্রাশ ইন্ডিয়া টিম দিল্লিতে পৌঁছে যাবে। কারণ রিপাবলিক ডে উপলক্ষ্যে যা কিছু কড়াকড়ি সেসব শুরু হয়ে যাবে ২০ জানুয়ারি থেকে। অতএব তার আগে এই টিম ঢুকে যাবে তিনটি আলাদা হোটেলে। দরিয়াগঞ্জ, ওখলা আর আজাদপুর মান্ডি। সেই কংক্রিটের ভাড়া করা ঘরে দিনরাত দরজা বন্ধ। কারণ কী? কারণ টুন্ডা আর জালিস বোমা বানাচ্ছে। সবথেকে শক্তিশালী হওয়া চাই। ৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা। জুলফিকারকে শেষবারের জন্য দেখা গেল বম্বের বাইকুল্লা স্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে একটি ব্যাগ। আর সেদিন রাত দেড়টায় বিআইটি ব্লকের বিল্ডিং নম্বর ওয়ানে দেখা গেল প্রায় এক ডজন লোক ঢুকছে। দোতলার সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে যাচ্ছে তারা। যাতে শব্দ না হয়। চারদিকে অন্ধকার, সরু গলি। শুনশান। তবে বম্বের এই জায়গাগুলো মোটেই অতটা শুনশান নয়। তাই যখনই একটি অ্যামবাসাডর আর দুটি জিপ থেকে শক্তপোক্ত এই লোকগুলো নেমে গলিতে ঢুকল তৎক্ষণাৎ খবর ছড়িয়ে গেল। রুম নম্বর ৩৬ এ টোকা দেওয়া হল। যে টিমটি মদনপুরার এই এলাকায় ঢুকল তারা হল সিবিআই-এর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। লিড করছেন ডিআইজি এসসি ঝা। সঙ্গে এমন এক অফিসার যার অপারেশন সিবিআই-তে মিথ হয়ে গিয়েছে। তাঁর নাম ইনস্পেক্টর ত্যাগী। ত্যাগীর দুবারের টোকায় দরজা খুলে গেল। সেটি খুলেই মুখে হাত চাপা দিয়ে পিছনে সরে গেলেন

যে ভদ্রমহিলা তার চোখেমুখে ঘুম স্পষ্ট। মৃদু আর্তনাদ। নিমেষে ঢুকে এলেন ত্যাগী আর আরও দুজন অফিসার। মেঝেতে একটি সস্তার কার্পেটে শুয়ে আছে এক ব্যক্তি। শব্দ শুনেও ঘুম ভাঙেনি। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ত্যাগী হাঁটু মুড়ে বসে লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে বলল ডক্টর সাব...। হ্যাঁ সেই লোকটি ছিল ডক্টর জালিস আনসারি..। বম্বে আনবম্বার। লাফ দিয়ে উঠল জালিস। এবং ততক্ষণে বোঝা হয়ে গিয়েছে কী হতে পারে। কারণ ত্যাগীর চোখেই পুলিশ পুলিশ ছাপ। যা জালিসের চেনা। জালিস কিন্তু কোনো বাধা দিল না। শুধু বলল লুঙ্গিটা চেঞ্জ করে নেব? ত্যাগী রাজি নয়। আমরা জামাকাপড় নিয়ে যাচ্ছি। ওখানেই চেঞ্জ করবে। বেরিয়ে এল জালিস..। এবং সে বাধা না দিলেও বাইরে বেরিয়েই হতভম্ব গোটা বাহিনী। গোটা মহল্লা ভেঙে পড়েছে সামনে। দুজন এগিয়ে এল। জালিস ভাইকা কুসুর কেয়া হ্যায়....

ত্যাগী বললেন, জনাব পহেলে তো তহকিকা ত করনা পয়েগা...উসকে বাদ হি পাতা চলেগা কুসুর ...কিন্তু একটি মুখও স্বাভাবিক হল না। বরং আরও ভিড় বাড়ছে। গুঞ্জন বাড়ছে। যে কোনো সময় অ্যাটাক হতে পারে।

একটা সময় ভিড়ের মধ্যে থেকেই কেউ বলে উঠল..হাম জালিস ভাইয়াকো লে যানে নেহি দেঙ্গে।।।

এবার টেনশন বাড়ছে। কারণ একটাই। এই গোটা অপারেশন সিবিআই এর। লোকাল পুলিশ থানা জানেই না। এখন তাদের খবর দিতে গেলে ইগো আর প্রোটোকলের ঝামেলা থাকবে। তবু ত্যাগী বলল, দেখিয়ে হামলোগ আনে সে পহলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সকো খবর কর দিয়া থা। উও লোগ আতে হি হোঙ্গে..। অর উসকে বাদ মাহোল ভি খারাব হোগা... কথাগুলি বলতে বলতে ত্যাগী জালিসকে এক হাতে ধরে এগোচ্ছেন। তাঁর টার্গেট এভাবেই বড় রাস্তায় গাড়ির কাছে যাওয়া। পিছনে জনতা। এবং পৌঁছে গেলেনও। আগে থেকেই সেগুলি স্টার্ট দেওয়া ছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ত্যাগী এক ধাক্কায় জালিসকে জিপের মধ্যে তুলে ফেললেন.... আর জনাত গর্জন করার আগেই জিপ আর গাড়ির ইঞ্জিন তীব্রভাবে গর্জন করে বেরিয়ে গেল...। জালিস আনসারি গ্রেপ্তার।

অপারেশন রিপাবলিক ডে আটকে গেল। অবশেষে ধরা পড়ে গেল রহস্যময় সেই বম্বে আনবম্বার!!

এত বড় একটা সন্ত্রাসের ছক আটকে দিলেন জুলফিকার। সেই মিটিং-এর দিন মাঝরাতে পাবলিক বুথ থেকে দিল্লিতে ফোন করেছিলেন। তখনই টিম তৈরি হয়ে যায় সিবিআই আর আইবির। সেই টিমই ৭ জানুয়ারি মাঝরাতে আচমকা হানা দিল মিশন জালিস আনসারি অ্যারেস্টে। আর সেই ৭ জানুয়ারি সকালেই বাইকুল্লা স্টেশন থেকে উধাও হয়ে যায় জুলফিকার। ও না না ....জুলফিকার নয়। দীপক। এবার আসল কথাটা বলা যাক। দীপকও নয়। ওটাও ছদ্মনাম। আন্ডারকভার এজেন্টের প্রকৃত পরিচয় কখনওই জানায় না কোনো স্পাইবাহিনী। তাই তাঁর নাম যে আসলে কী কেউ জানে না। কারণ আজ হয়তো সেই যুবক অনেক পরিণত এক স্পাইতে পরিণত হয়েছেন।

এবং এই মুহূর্তে অন্য কোনো মারাত্মক অপারেশনে নেই কে বলতে পারে!! কোনো টেররিস্ট গ্রুপে হয়তো আজও তিনি এক আন্ডারকভার এজেন্ট....।

১১

চোখের একটা ফিল্ড টেস্ট করতে হবে। ভাবছিলেন সুরেখা চিখানে। ডাক্তারবাবু সেরকমই বলেছেন। তার আগে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বুঝে নিতে হবে কী কী টেস্ট করানো বাকি। গ্রামের নাম উদাওলি। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা। ২০০৩। ৩০ বছরের সুরেখা চিখানে এক গৃহবধূ। আজ ডাক্তারবাবু আসছেন গ্রামে। সেরকমই কথা আছে। তাই সকাল থেকে সুরেখা ব্যস্ত। চোখের সমস্যা চসবেমাত্র ধরা পড়েছে। তার আগে পর্যন্ত খুব মাথাব্যথা হত। আর চোখ দিয়ে অবিরত জল। আলোর দিকে তাকানোই যায় না। এরকমই এক সময়ে বছর খানেক হল গ্রামের মধ্যেই এক ডাক্তারবাবু আসা যাওয়া শুরু করলেন। বেশ সুন্দরভাবে কথা বলেন। অনেক সময় ধরে শোনেন কার কী অসুবিধা হচ্ছে। আর একদম কম টাকা চার্জ নেন। যেন না দিলেও চলে। অনেকে তো বাড়ি থেকে খেতের সবজি, চাল, কিংবা ফলও নিয়ে যায়। এই ডাক্তারবাবুকে একবার দেখানো হল। তিনি কী যেন একটা ওষুধ দিলেন। বেশ মাথাব্যথাটা কমে গেল। চোখ থেকে জলও পড়ছে না। দারুণ ডাক্তার তো! পাশের গ্রামে আজও বেশ উৎসব। ওরা খুব লাকি। ওখানে মাঝেমাঝেই বড় বড় হিরো হিরোইন আসে সিনেমার শুটিং করতে। একটা মারাঠা সিনেমার শুটিং এ একবার গিয়েছিলেন সুরেখা। তারপর আর যাওয়া হয়নি। সুরেখাকে সুন্দরী বলা যায়। রঙটা শ্যামলা অবশ্য। তাঁর একটাই শখ। খুব গহনা পড়তে ভালোবাসেন। হ্যাঁ, ঘরেও। বাড়ি থেকে বেরোলে তো কথাই নেই। সাড়ে ১০টা বাজতে যাচ্ছে। এখনই চলে আসবেন ডাক্তারবাবু। অবশ্য আজ ডাক্তারবাবুর আসার দিন নয়। মঙ্গলবার আসেন না তিনি । আগামীকাল আসার ডেট। কেন যেন গত শনিবার তাঁকে বলেছিলেন এই সপ্তাহে মঙ্গলবার শুধু তাঁকে দেখতেই আসবেন। কারণ তাঁর চোখের কিছু পরীক্ষার ব্যাপার আছে। কাগজপত্র টাউনে পাঠানো হয়েছিল। সেই রিপোর্ট আসবে। দ্রুত বেরোলেন সুরেখা। হ্যাঁ। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে স্কুটার। এসে গিয়েছেন ডাক্তারবাবু।

আসুন আসুন। সুরেখাকে দেখেই হেসে উঠে বললেন ডাক্তার সন্তোষ পল। তিনি এরকমই। খুব আন্তরিক। কিছু কাগজপত্র পাশে রাখা ব্যাগ থেকে বের করে বললেন,

একটা প্রবলেম হয়েছে। আপনাকে আগের দিন বললাম না যে একটা ফিল্ড টেস্ট করা দরকার, সেটা একটু আর্জেন্ট। কারণ এই যা রিপোর্ট এসেছে, দেখছি ওরা বলছে গ্লুকোমা অ্যাডভান্সড স্টেজ হতে পারে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা চেক আপ দরকার আছে। এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। চিন্তিত ডাক্তার পল। মুখে একটা ছায়া পড়ল সুরেখার। তিনি জানেন না কাকে বলে গ্লুকোমা। হলে কী হয়? তাহলে কী করা যাবে স্যার? জানতে চাইলেন। অনেক পরে কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে বললেন, আজই যেতে পারবেন? ভালো হত তাহলে। কাজটা হয়ে যেত তাড়াতাড়ি। সুরেখা দ্বিধায়। আজই? স্বামীকে বলা নেই তো! কী করা উচিত? তিনি বললেন, সমস্যাটা। ডাক্তার পল ভাবলেন, সত্যিই তো এটা একটা সমস্যা। একজন গৃহবধূ তো আর ধুম করে বাড়িতে না বলে এভাবে গ্রামের বাইরে টাউনে যেতে পারেন না? সুরেখা একটু ভেবে বলল, কীভাবে যাব? ডাক্তার পল বললেন, আমার স্কুটারে। সেটা প্রবলেম না। আমাকে কিছু অন্য রিপোর্টও আনতে হবে। যেতে আমাকে হতই। তাই আপনাকে বললাম। তবে বাড়িতে না বলে যাওয়াটা ঠিক নয়। আপনাকে ফিল্ড টেস্ট করিয়ে আমি বাসস্ট্যান্ডে ছেড়ে দেব। আপনি বাসে ফিরে আসবেন। আমার ফিরতে দেরি হবে। কারণ একবার হাসপাতালে কাজ আছে। সুরেখা বললেন, স্যার, একটু বাড়ির কাছে যাব। পাশের বাড়িতে বলে আসি। সুরেখার স্বামী গ্রামে থাকেন না। লক্ষ্মণ চিখানে। সাতারায় কাজ করেন কনস্ট্রাকশন সংস্থায়। মাসে এক দুবার আসেন। বাচ্চাকে নিয়ে একা সুরেখা। তাই পাশের বাড়িতে গিয়ে বলে আসবেন ছেলে স্কুল থেকে এলে যেন বলে দেয় মা টাউনে গিয়েছে ডাক্তার দেখাতে। চলে আসবে তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর সাথে। সুরেখা ফিরে এলেন। এবং তাঁকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে ডাক্তারবাবু হাইওয়েতে উঠে বললেন, চিন্তা নেই। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। খুব সাবধানে কিন্তু যথেষ্ট গতি নিয়ে স্কুটার চালালেন ডাক্তার পল। একজন অন্য মহিলা সঙ্গে রয়েছে। তাঁর দায়িত্ব তাঁকে নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা। পিছনে বসে সুরেখা প্রথমে বুঝতে পারছেন না কোথায় হাতটা রাখবেন। পিছনের ব্যাকরেস্টে ধরার অসুবিধা। কিন্তু কী উদার মনের ডাক্তারবাবু। নিজে থেকেই বললেন, আমার কাঁধ ধরে নিন। শক্ত করে ধরবেন চিন্তা নেই। সুরেখা আপ্লুত। অবশ্য লজ্জাও করছে। কেউ যদি দেখে ফেলে এভাবে? যদিও সেই চিন্তা

ভিত্তিহীন। কারণ ডাক্তারবাবুর এটা তো রুটিন। যখনই উনি নিজের টাউনে যাবেন এভাবেই কোনো পেশেন্টকে হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে যান। ডাক্তার তো নয়....ভগবান। মাত্র ১৫ টাকা ভিজিট নেন। নিজের কাছে যা ওষুধ থাকে সেইসব ওষুধ দিয়ে দেন রোগীদের। নয় নয় করে কিন্তু ঘণ্টা তিনেক লেগেই গেল। ডাক্তারবাবু অবশ্য আগে থেকেই বলে রাখার কারণে চোখের ক্লিনিকে বিশেষ দেরি হয়নি। তবে চোখের টেস্ট এত সময় ধরে হয় তা জানাই ছিল না। সুরেখাকে আই সেন্টারে বসিয়ে দিয়ে ডাক্তার পল নিজের কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সুরেখার সব টেস্ট হয়ে যাওয়ার আগেই অবশ্য তিনি পৌঁছে গিয়েছেন। এবার ফেরা। আগেভাগেই বলা আছে আর সুরেখার গ্রাম পর্যন্ত তিনি যাবেন না। হাইওয়ের কাছেই যে বাসস্টপ আছে সেখানে নামিয়ে দেবেন। ওখান থেকে হেঁটেই ফিরে যেতে পারেন সুরেখা। তবে তার আগে একবার ডাক্তারবাবুর গ্রামে যেতে হবে সুরেখাকে। কারণ আসার পথেই ডাক্তারবাবু বললেন, আপনাকে যে ওষুধগুলো দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দুটো আমার কাছে আছে বাড়িতে। শুধু শুধু কিনবেন কেন? আমি দিয়ে দেব। একবার আমার বাড়ি থেকে ওষুধটা নিয়ে নিন। আর এখন তো দুপুর। চিন্তা কীসের? আপত্তি নেই তো? সুরেখার আপত্তির প্রশ্নই নেই। ফ্রিতে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে যখন তিনি আপত্তি করবেন কেন? একদম পাশের গ্রাম। তাই সেভাবে দেরি হওয়ার কথাই নয়। সুরেখার সমস্যা নেই। ডাক্তারবাবু স্কুটার নিয়ে নিমেষে চলে এলেন একটা বেশ খোলামেলা বাড়ির সামনে। বাড়ি নয়। অনেক বড় একটা বাগান। দূরে একটাই ছোট্ট ঘরের মতো আছে। দেখা যাচ্ছে পোলট্রিও আছে। বাগানটি বেশ ঘন। বড় বড় গাছ। ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। স্কুটার সোজা ভেতরে ঢুকে এল। ভেতরে মানে সেই ঘন বাগানের মধ্যে। নামুন। বললেন, ডাক্তার পল। সুরেখা নামলেন। আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমি ভেতর থেকে একটা ফাইল নিয়ে আসছি। সুরেখা ঘাড় নেড়ে বাড়ি দেখছেন। এটাই ডাক্তারবাবুর বাড়ি? এরকম আবার বাড়ি হয়? ডাক্তারবাবু তাঁর মনোভাব আঁচ করে হাসতে হাসতে বললেন, কী ভাবছেন? এটা আমার বাড়ি কিনা? ঠিক ধরেছেন। এটা বাড়ি না। এটা আসলে আমার একটা ছোট খামার। এখানে ওই ঘরে আমার ওই সোসাইটির কিছু কাজ করি। বাড়ি তো উত্তরদিকে। আজ কেমন ফাঁকা ফাঁকা দেখছেন। কারণ সবাই

মেলা দেখতে গিয়েছে। সুরেখা হেসে ফেললেন। তিনি জানেন। দাঁড়ান আপনি...বলে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু। বাগানে ঘুরছেন সুরেখা। বেশ অনেক রকম গাছ। আর সারি দিয়ে ফুলের বাগান অন্যদিকটায়। মিনিট পাঁচেক। ডাক্তার পল নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন সুরেখার পিছনে। টের পাচ্ছেন না সুরেখা। কারণ তিনি দেখছেন প্রজাপতির একটা খাঁচা। কত রঙবেরঙের। ঠিক সেই একাগ্রতার মুহূর্তে ডাক্তার পল একটা ব্যাট দিয়ে ঠিক মাথার পিছনে মারলেন সুরেখার। পড়ে গেলেন সুরেখা। উঁক করে একটা শব্দ বেরল শুধু মুখ থেকে। মাথার পিছনটা ফেটে গেছে। সেটা যথেষ্ট নয়। তাই এবার সামনে থেকে আবার মারলেন ব্যাট দিয়ে। ক্রিকেট ব্যাট। প্রায় ঘিলু বেরিয়ে এল। এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত। চোখ খোলা। অঝোরে রক্ত পড়ছে। সুরেখার চোখে অবিশ্বাস তখনও লেগে। বেঁচে আছে নাকি? ডাক্তার পল নিঃসংশয় হওয়ার জন্য একটু শ্বাস নিয়ে ধীরে সুস্থে শেষবারও মারলেন। এবং সুরেখা আর নড়লেন না। ব্যাট হাতে ডক্টর পল একটু হাঁপাচ্ছেন। ধাতস্থ হতে দেরি হল না। এবার আর একটা কাজ আছে। বডিটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে একটু। খুব বেশি রক্ত গড়াচ্ছে। সেটাও মোছা দরকার। তবে এই জায়গাটা ইচ্ছে করে বাছা হয়েছে। এখানেই মুর্গি জবাই করা হয় পোলট্রির। তাই রক্ত এদিক ওদিক একটু আধটু থাকেই। কাজের লোক অজয়কে আজ টাউনে পাঠানো হয়েছে মুরগির খাবার কিনতে। আগে থেকেই প্ল্যান করে। যাতে ফার্ম ফাঁকা থাকে। অতএব ভয়ের কিছু নেই। তবু সাবধানে দ্রুত কাজটা সারতে হবে। ডক্টর পল সুরেখার বডিটাকে প্রথমেই একটা স্ট্রেচারে তুললেন। সেটায় হুইল লাগানো। একা টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। সেরকমভাবেই টেনে নিয়ে যাওয়া হল বাগানের আরও গভীরে। দেখা যাচ্ছে আগে থেকেই সেখানে একটা বিরাট গর্ত। আয়তাকার। ঠিক যেন একটা কবর। হ্যাঁ। কবরটা ডক্টর পল খুঁড়ে রেখেছেন। সুরেখার বডি সেখানে নিয়ে এসে একটা সামান্য ঠেলা দিলেন। গড়িয়ে পড়ল মৃতদেহ। মাটি ফেলা শুরু হল। যতক্ষণ না গর্ত বুজে গেল সম্পূর্ণভাবে। কাজ শেষ? না এখনও একটা ছোট পর্ব বাকি। একটা জল দেওয়ার ঝারি, সার আর অনেক গাছের চারা ঘরের বারান্দায় রাখা ছিল। চারটে চারা আনা হল। সেগুলি এই বুজে যাওয়া গর্তের উপর মনোযোগ দিয়ে যত্নের সঙ্গে রোপণ করলেন ডক্টর পল। তারপর সামান্য জল। এখনই বেশি

জল নয়। প্রথমে বেশি জল দিয়ে এই সুন্দর ছোট ছোট গাছগুলো মরে যাবে। ডাক্তার পল গাছ ভালোবাসেন। ফুল ভালোবাসেন। সমাজসেবী মানুষটি আশেপাশের চারটি গ্রামের মানুষের কাছে দেবতুল্য। তারপর বৃষ্টি নামল জোরে।

ওমকারা সিনেমার শুটিং দেখতে যাওয়া হবে। এর আগে অজয় দেবগণকে দেখা হয়ে গিয়েছে। গঙ্গাজলের শুটিংও এখানেই হয়েছে। এবার সঈফ আলি খান। তাঁকে খুব পছন্দ সন্তোষ পলের দুই ছেলেমেয়ের। বাবার কাছে আবদার ওই শুটিং দেখাতেই হবে। সকলেই তো যাচ্ছে। এমনকী স্কুলও ছুটি দেওয়া হয়েছে। অতএব আজ আর কিছু কাজ নেই। সন্তোষ পলের চেম্বার আছে অবশ্য। কিছু রোগী দেখতেই হবে। ডাক্তারবাবু সন্তোষ পল। কখনও রোগী ফেরান না। এলাকায় খুব নামডাক। আর সমাজেসবাতেও পিছিয়ে নেই। যে কেউ বিপদে পড়লে ডক্টর সাব আছেন। মাত্র ১৫ টাকা তার ভিজিট। তাই ভিড় লেগেই আছে সন্তোষ পলের চেম্বারে। হবে নাই বা কেন? সবথেকে কাছের হসপিটাল হল ওয়াই টাউনে। ২০ কিলোমিটার দূরে। তাই সকলেই আসে ডাক্তারবাবুর কাছে। এরকম একটি গ্রামে যে এমন এক ডাক্তার আছেন এটাই তো অনেক বড় আশীর্বাদ। শুধু একটি গ্রামেই নয়। কাছাকাছি আরও দুটি গ্রাম আছে। যেখানে সপ্তাহের দু তিনদিন সন্তোষ পল চেম্বার করতে যান। সেই গ্রামদুটির নাম উদাওলি আর রানাভেলে। সোজা কথায় একটা জিনিস স্পষ্ট। ৪২ বছরের ডাক্তার সন্তোষ পলের মতো মানুষ সত্যিই পাওয়া যায় না আজকাল! শুধু কি চেম্বারে বসে চিকিৎসা? না। তিনি অনেক পেশেন্টকে সঙ্গে করে টাউনে নিয়ে যান হাসপাতালে। কিংবা কোনো একটা টেস্ট করাতে। মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। এরকম একটা লোক আবার পরিবারঅন্ত প্রাণ। ভারি মিশুকে মানুষটা। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার এক ছোট্ট জনপদ ধম। গ্রামই বলা যায়। একদিকে কৃষ্ণা নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীতীরে সারি দিয়ে একের পর এক মন্দির। আর গোটা গ্রামকে ঘিরে রেখেছে ঘন সবুজ গাছ আর অরণ্য। দূরে দেখা যায় টিলাসদৃশ পাহাড়শ্রেণি। ঠিক এই কারণেই এই জায়গাটা মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রিয় শুটিং স্পট। এই তো গঙ্গাজল নামে একটি সিনেমার শুটিং হল কিছুদিন আগেই। অনেক আগে থেকে জানা হয়ে যায় যে আবার আসছে সিনেমার লোকেরা। শুধু যে গ্রামের মানুষ শ্যুটিং দেখতেই যান তা নয়।

তারা চান্স পান সিনেমায়। এক্সট্রা হিসাবে। অতএব সিনেমার গ্রামবাসীরা আসলে সত্যিকারের গ্রামবাসীবৃন্দই। তাই ডাবল মজা। সকাল থেকে প্রস্তুতি শুরু হয় শুটিং দেখার জন্যই শুধু তাই নয়, শুটিং করার জন্যও। কারণ তারাও তো সিনেমাটির অঙ্গ। অতএব সিনেমার শুটিং মানে বেশ কয়েকদিন ধরে ধর্ম গ্রামে এক উৎসবের পরিবেশ। মেলা বসে কৃষ্ণা নদীর অদূরে। আসে কতরকম খাবারের দোকান। মুম্বইয়ের হালফ্যাশনের জামাকাপড় নিয়ে আসে কিছু স্টল। একদিকে চলে শুটিং। আর অন্যদিকে কিছুটা দূরে বসে যায় মেলা। তাই ধর্ম গ্রামের নিত্যবছরের এক অন্য পরবের নাম শুটিং উৎসব। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হবে নাকি? তাহলে তো শুটিং ক্যান্সেল! আশঙ্কায় ধর্ম গ্রামের বাসিন্দারা। বারংবার সকলেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। যদি মেঘ কেটে যায়। একটা সমস্যা হয়েছে। ডক্টর সন্তোষ পলের আজ একটু জরুরি কাজ আছে। তাই তিনি ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেতে পারছেন না। স্ত্রী সন্ধ্যাকে বললেন, তুমি একটু প্লিজ নিয়ে যাও। আমার একটা জরুরি পেশেন্ট আসবে। আর ওয়াই টাউন থেকে কিছু রিপোর্ট আসার কথা। সেগুলো এসে পড়ে থাকলে হবে না। সন্ধ্যা হাসলেন। তিনি জানেন স্বামী এরকমই। একদম যাকে বলে কাজপাগল। তাই স্বামীর মাথায় হাত রেখে আদরের ভঙ্গিতে বললেন, চিন্তা কোরো না তো! আমিই নিয়ে যাব। সন্তোষ ২০০ টাকা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও..ওদের কিছু কিনে টিনে দিও। আর সেজেগুজে যেও। বলা যায় না আমার সুন্দরী বউকেও হয়তো সিনেমার লোকদের পছন্দ হয়ে যাবে। আর তুমিও চান্স পেয়ে যাবে সঈফ আলি খানের সঙ্গে। আমরা হয়ে যাব সেলেব্রিটি। বলে হা হা হা হা করে হাসতে লাগলেন সন্তোষ পল। হেসে উঠলেন সন্ধ্যাও। এই লোকটাকে বাড়িতে দেখলে কে বলবে এত ব্যস্ত আর জনপ্রিয় এক ডাক্তার। অথচ কী নরম মন। এই তো কালই একটা বিয়েবাড়ি ছিল। নামেই বিয়েবাড়ি। আসলে পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে। গ্রামের জমাদারের মেয়ের বিয়ে। সন্তোষ পলের নিজের একটা সমাজসেবার সংস্থাও আছে। সেই সংস্থা থেকেই এই জমাদারকে অর্থসাহায্য করা হয়েছে। নামে সংস্থা। আসলে তো সবই ডাক্তারবাবু। গ্রামের মানুষ বিয়েতে এসে ধন্য ধন্য করেছেন ডাক্তারবাবুর। সন্ধ্যার এইসব সময় গর্বে প্রাণটা ভরে যায়। কত যে ভাগ্য করে এরকম একটা মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। আর ফুটফুটে দুটি

ছেলেমেয়ে। লোকটাকে কাজ করতে দিলে আর কোনো ঝামেলা নেই। সন্ধ্যা বললেন, কোনো চিন্তা কোরো না। বাচ্চাদের নিয়ে আমি যাব। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সন্তোষ পল। তিনি চলে গেলেন চেম্বারে। যদিও আজ চেম্বারে তেমন লোকজন নেই। রোগীর সংখ্যা কম। কারণ আজ শুটিং। বেশিরভাগ মানুষই শুটিং দেখতে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ চেম্বার করার পর যখন সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল তখন বেরোলেন ডাক্তার পল। নিজের বাড়ির দিকে। কিন্তু পিছনের রাস্তা দিয়ে। নিজের বাড়ির ঠিক উলটোদিকের একটি বাড়িতে ঢুকলেন। পিছনের দরজা দিয়ে। তিনি নক করেছিলেন। দরজা খুলে গেল। বোঝা গেল এই যাতায়াতটি আছে। আর তিনি যে পিছনের দরজা দিয়েই যাতায়াত করেন তাও এই বাড়ির বাসিন্দাদের জানা। বাসিন্দারা বলতে কেউ নেই। থাকেন একা এক মহিলা। বনিতা গায়কোয়াড়। ওজন কমে যাচ্ছিল বনিতার। ৪৩ বছর বয়স। হু হু করে ওজন কমছে। চুলও পড়তে শুরু করেছে। সবথেকে বড় সমস্যা খুব ঘন ঘন জ্বর আসছে। কই ওষুধ খেলেও তো জ্বর কমে না। কেন? ডাক্তার পল কয়েকটি রক্ত পরীক্ষা করার পর বনিতাকে জানিয়েছেন আপনার একটা কঠিন রোগ হয়েছে। তবে ঘাবড়াবেন না। আমি ঠিক করে দেব। কী রোগ? এটাকে বলে অ্যাকিউট ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। তার মানে কী? বনিতা বোঝেন না এত জটিল নাম। ডাক্তার পল একটু থেমে বলেছিলেন, এর নাম এইচ আই ভি পজিটিভ। আপনার এইডস ইনফেকশন হয়েছে। চমকে উঠেছিলেন বনিতা। রোগটার নাম তিনি শুনেছেন। মানুষ তো মারা যায় এই রোগে! তাহলে কি তিনিও মারা যাবেন? বিনয়ী সহানুভূতিশীল আর প্রচণ্ড দয়ালু ডাক্তার সন্তোষ পল তাঁকে বলেছিলেন অনেক মানুষ বেঁচে আছে। কোনো চিন্তা নেই। আমি আছি। মাঝেমধ্যেই টাউনে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা। আর কিছু কিছু ব্যাপার মেইনটেইন করতে হবে। তবে সাবধান কেউ যেন না জানে। তাহলে আপনাকে সবাই গ্রাম থেকে বের করে দেবে। বনিতার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এরকম এক মানুষ তাঁর চিকিৎসা করেন ভেবে। আজ ডাক্তার পল আবার এসেছেন। আজকাল তিনি নিজেই আসেন। চেম্বারে যেতে বারণ করেন। ছোট্ট চেম্বার। ভিতরে ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে কী কথা হচ্ছে তা সবই শোনা যায় বাইরে থেকে। অনেক রোগী অপেক্ষা করে বাইরের বেঞ্চে। তাই কখন কার কানে যায়। দরকার কী? আমিই আসব। বলেছিলেন

ডাক্তার। রেডি হয়ে নিন ম্যাডাম! বনিতা অবাক! কী ব্যাপার? ডাক্তার বললেন, একটা টেস্ট আছে। ব্লাড নিতে হবে। বনিতা বললেন, সেই টাউনে যেতে হবে? না না ...আজ আর টাউন নয়...আমার ফার্মের ঘরেই অ্যাপারেটাস আছে। ওখানে আজ ওয়াই হাসপাতাল থেকে একটা ছেলে আসবে। ছেলেটা কয়েকটা স্যাম্পল নিয়ে চলে যাবে। ভাবলাম তাই আপনিও করিয়ে নিন। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল। আধঘণ্টার ব্যাপার। চলুন। এখনই ? বনিতার প্রশ্ন? হ্যাঁ। এখনই। অগত্যা। বনিতা গেলেন। এবং ফিরলেন না। রাস্তায় কারও সঙ্গে দেখা হয়নি। কেউ দেখেনি তিনি কোথায় যাচ্ছেন। ডাক্তারের স্কুটারে চেপে সেই ফার্ম হাউস। তবে এবার একটু ফারাক আছে। বনিতাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন যে সত্যিই তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে। কারণ এবার আর বাগান নয়। নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফার্মের মধ্যে ছোট ঘরের মধ্যে। একটা ক্যাম্প খাট পাতা। সেখানে বনিতাকে শুয়ে পড়তে বললেন ডাক্তার পল। বললেন, একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে। হাতে নেবেন নাকি কোমরে? বনিতার খুব ইঞ্জেকশনে আতঙ্ক। ভয়ে ভয়ে বললেন, আপনি যা ঠিক মনে করবেন। কিন্তু ইঞ্জেকশন কেন? আপনি তো বললেন ব্লাড টেস্ট। ডক্টর পল হাসলেন..। সিরিঞ্জ একটা ভায়ালে ঢুকিয়ে টেনে নিচ্ছেন একটি তরল....জবাব দিলেন না...। বনিতার ভয় লাগছে। খুব লাগবে না তো! এবার মুখ খুলছেন ডাক্তারবাবু। বললেন, একদম বুঝতেই পারবেন না। শুধু সামান্য ঘুম আসবে। বাড়ি ফিরে খেয়েই ঘুম দেবেন। আবার কাল আমি গিয়ে ব্লাড রিপোর্ট দিয়ে আসব আপনাকে। বনিতা ইঞ্জেকশনটি তাঁর শরীরে ঢোকার মুহূর্তে চোখ বুজলেন। চোখ আর খোলেনি। সেটি ছিল হাই ডোজের এক অ্যানাস্থেশিয়া। চিরঘুমে চলে যাওয়ার পর বনিতার বডি স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল বাগানে। সেখানে আগে থেকেই খোঁড়া ছিল একটি বড় গর্ত। আয়তাকার। মানুষের দেহ যাতে মাপমতো ঢুকে যায়। বনিতার দেহ মাটিতে পুঁতে দেওয়ার পর সেখানে লাগানো হল নতুন গাছের চারা। এবার দেবদারু...। তখন বৃষ্টি পড়ছে। একটু আগেই ছিল ঝিরিঝিরি। এখন মুষলধারে।

আর সেখান থেকে সোজা কৃষ্ণানদীর তীরে। বৃষ্টি ধরেছে। তবে শুটিং হচ্ছে না। আকাশে মেঘ। একটু পরিষ্কার হলে শুরু হবে। ভিড় ঠেলে এগনো যাচ্ছে না। প্রায় মিনিট দশেক দাঁড়িয়েও সন্ধ্যাকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ একজন জড়িয়ে ধরল। চমকে উঠলেন ডক্টর পল। পরক্ষণেই হেসে উঠলেন। ছেলে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। একটু দূরে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন সন্ধ্যা। জানতে চাইলেন..কাজ হয়ে গেল তোমার? ডক্টর পল হেসে জবাব দিলেন, হ্যাঁ...আরে হাসপাতালের ছেলেটা এত দেরি করে এল...তা না হলে তো আরও আগে আসতাম...চলো কিছু খাওয়া যাক....। সুখী পরিবারটি হেঁটে গেল মেলার দিকে..।

২০০৭। ডক্টর সন্তোষ পল একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। শুধুই ডাক্তার নয়। সমাজসেবী। তাই তাঁকে গ্রামবাসী বিপুল ভোটে জয়ী করিয়েছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে। ওই ঘটনাগুলির পর এখন ডক্টর সন্তোষ পল একজন পঞ্চায়েত সদস্য। এখন আর তিনি ওই ধর্ম গ্রামে থাকছেন না। বাড়ি, ফার্ম হাউস সবই আছে। তিনি নিজে শিফট হয়েছেন ওয়াই টাউনে। কাজের চাপ এত বেশি যে প্রায় সপ্তাহে দু তিনদিন আসতেই হয়। তার থেকে বরং ওয়াই টাউনে থাকা ভালো। আর নিয়ম করে ধর্ম গ্রামে গিয়ে চেম্বার করা কিংবা ফার্ম হাউসের দেখভাল। ওয়াই টাউনে শিফট হওয়ার আর একটি কারণ আছে। একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চাকরি পাওয়া গিয়েছে। ৩৫ বেডেড হাসপাতালটির মালিক ডক্টর বিদ্যাধর ঘোটওয়াদেকর। কী কারণে হাসপাতালটির নামডাক দারুণ বেড়ে গেল? কারণ আইসিইউ বিভাগে একজন নতুন ডাক্তার এসেছে। তার কাজ অবশ্য আইসিইউতে নয়। নেহাৎ সার্জারিতে সাহায্য করা তাঁর ডিউটি। তাছাড়া হাসপাতালের আউটডোরে বসা। কিন্তু সারারাত আইসিইউতে থাকেন ওই ডাক্তার। নাম ডক্টর সন্তোষ পল। একটাই সুবিধা তাঁকে রাখার। ইনি হোম ভিজিট করতে ভালোবাসেন। তাই কোনো অপারগ রোগী যদি হাসপাতালে বা ক্লিনিকে আসতে না পারে তাহলে হাসপাতালে খবর দিলে বা রোগীর আত্মীয়রা নিয়ে গেলে একমাত্র যখন তখন যেতে রাজি একজনই। ডক্টর পল। তিনি যে পরিপূর্ণ চিকিৎসা করেন সেখানে গিয়ে তা নয়। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষা করে ফিরে এসে রিপোর্ট দেন। তারপর সেইমতো অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হবে দরকার পড়লে। ডক্টর

পলের উপর কর্মীরা খুশি। ডক্টর পলের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক মালিকেরও। সকলেই এরকম এক মানুষকে পেয়ে খুব আনন্দিত। এই প্রথম একজন ডাক্তার যার টাকার প্রতি লোভ নেই। ডিউটিতে কোনো ফাঁকি নেই। অন্যের কাজ করে দেন। এমনকী অন্যের নাইট ডিউটির সময় বলেন তোমরা ঘুমাও, আমি আছি। লোকটা কী অদ্ভুত! তাই ডক্টর পলের প্রেমে পড়লেন সালমা শেখ। হাসপাতালের এক নার্স। ২৮ বছর বয়স। তবে অনাথ। পেয়িং গেস্ট হিসাবে কাছেই থাকেন। আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। তাঁর এই একাকিত্বে প্রধান সহায় হয়ে উঠেছেন ডাক্তারবাবু। বিভিন্ন রোগীর বাড়ি থেকে কল এলে ডাক্তার ছাড়াও একজন নার্স সঙ্গে যায়। আজকাল দেখা যাচ্ছে। সেই নার্স সর্বদাই সালমা। কখন কী দরকার হয় তাই। এছাড়া আবার ডক্টর পলের গুণের শেষ নেই। তিনি দুর্দান্ত ফিজিওথেরাপিস্টও বটে। আজকাল ফিজিওথেরাপিস্টের চাহিদা আকাশছোঁয়া। তাই এই ব্যাপারেও প্রচণ্ড কাজের চাপ তাঁর। বাড়িতে গিয়ে ফিজিওথেরাপি করে আসেন এবং হাসপাতালেও একটি পৃথক রুম তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

ওয়াই শহরের স্বর্ণকার নাথমল ভান্ডারির বয়স ৬৩ বছর। অনেকদিন হয়ে গেল বিছানায় শোয়া। প্রায় প্যারালাইসিস। তাঁকে নিয়ম করে করতে হয় ফিজিওথেরাপি। এতদিনে মোটামুটি জানা হয়ে গিয়েছে রোগীকে দেখতে বাইরের কল থাকলে সাধারণত যাবেন ডক্টর পল আর সঙ্গী বেশিরভাগ সময় সালমা। আজ পর্যন্ত সালমাকে কখনও অন্য কোথাও নিয়ে যাননি ডাক্তারসাব। তাঁদের যাবতীয় দেখাসাক্ষাতের স্থান এক ও একমাত্র হাসপাতাল। কতবার সালমা চেয়েছে একটু বেড়াতে যেতে। ডক্টর পল রাজি নয়। কারণ তিনি একদিনও কাজ ছাড়া নাকি থাকতে পারেন না। সালমার প্রশ্ন আমি কী করব ডাক্তারসাব? আমার তো আর কেউ নেই! আপনি ছাড়াও আর কাউকে আমার বিয়ে করাও আর সম্ভব নয়। ডক্টর পল সময় পেলেই বোঝান সালমাকে। আমার একটা পরিবার আছে। আমি তাদের ভালোবাসি। তোমাকেও আমি ভালোবাসি। কিন্তু তাই বলে তো আমি তোমাকে নিয়ে আলাদা সংসার করতে পারি না। সেটা আমার পক্ষে সম্ভবই না। ঠিক এই কারণেই সালমা আরও বেশি করে ভালোবেসে ফেলছে লোকটাকে। এই সততা তাঁকে খুব টানে। আর ওই যে নিজের স্ত্রী আর ফ্যামিলির প্রতি একটা টান।

আজকাল দেখাই যায় না। সালমা মুগ্ধ। তাঁর কাছে স্বপ্নের মানুষ এই লোকটা। রবিবার যেতে হবে আবার সেই ভান্ডারির কাছে। সালমাও যাবে। ভান্ডারি যে একা থাকে তা নয়। তবে তাঁর কাছে নাসিক থেকে ছেলেরা আসে সপ্তাহে একদিন। আর একজন সর্বক্ষণের কাজের লোক আছে। তবে রাতে সে চলে যায়। নিয়ম হল যখনই তাঁরা সেখানে যান তখন ওই লোকটি কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। সাধারণত রাতে যাওয়া হয় ফিজিওথেরাপির জন্য। ফিজিওথেরাপিতে অনেক সময় লাগে। সেই ফাঁকে ওই পরিচারক রান্নাবান্না সেরে নেয়। এবং চলে যায় নিজের বাড়ি এই ব্যবস্থা ডাক্তারবাবুই করেছেন। তাই ডাক্তারবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ সেই কাজের লোকটিও। রবিবার সালমা দেখলেন আজ ডক্টর পলের হাতে ফার্স্ট এইড বক্স। এবং গাড়ি নিয়ে এসেছেন। কী ব্যাপার? কোনো বিশেষ দরকার? ডক্টর পল বললেন, একটা স্টেরয়েড দিতে হবে আজ ভান্ডারিকে। আর আমাকে একবার গ্রামে যেতে হচ্ছে। কাল ফিরব। আজ থেকে ভান্ডারির নতুন একটা কোর্স শুরু হচ্ছে। সালমার সন্দেহ হল না কিছু। তাঁর চোখের সামনেই একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। ইনজেকশনের নাম স্কোলিন। মাসল রিলাক্সেন্ট। ভান্ডারির প্যারালিসিস। তাঁর বোধ হল না কী ঢুকছে শরীরে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর সালমাকে ফিজিওথেরাপির কিট বের করতে বললেন ডাক্তার। সেইমতো সালমা সবই নিয়ে এসেছেন। রোজের মতোই চলতে লাগল। তবে আজ পেশেন্ট নড়ছে না একটুও। সালমার মনে একটু খুঁতখুঁত করছে। কী ব্যাপার? সালমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। ডাক্তার পল আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। আর বললেন, সালমা ইউ আর সুইট অ্যান্ড সিম্পল..। মানে কী? হঠাৎ সালমাকে একটু কাছে টেনে নিচ্ছেন ডাক্তার। একী? সালমা অপ্রস্তুত। এরকম তো কখনও করেন না উনি। কিন্তু সে বাধা দিল না। সে তো কবে থেকেই ভালোবাসে। তাহলে ডাক্তারসাহেবের ধ্যান ভেঙেছে অবশেষে? সালমা একটু ঘন হয়ে কাছে সরে আসতেই আচমকা কোমরে তীব্র এক যন্ত্রণা। হাসছেন ডাক্তার তখনও। এটা আর একটা ইঞ্জেকশন। এটাও স্কোলিন। গোটা ভায়াল ঢুকে গেল সালমা শেখের শরীরে। রাতের অন্ধকারে দুটি মৃতদেহ একা হাতে বের করে গাড়িতে তুলেছেন ডাক্তার পল। আর সোজা ড্রাইভ করে তাঁর মৃত্যু সাধনা কেন্দ্র সেই ধর্ম গ্রামের নিজের ফার্ম হাউস। এবং সেই একই দৃশ্য। আগে থেকেই দুটি

আয়তাকার গর্ত খোঁড়া আছে। সেই দুটি গর্তে দুজনকে সমাধিস্থ করে হাত ধুচ্ছেন ডক্টর পল। কারণ মাটি লেগে গিয়েছে হাতে। অন্ধকারে কবরের উপর গাছ লাগাতে হয়েছে তো...!! তবে মাটি ধুয়ে যাচ্ছে কবরেরও। কারণ একটু পর বৃষ্টি নামল। একটি নয়..দুটি নয়...তিনটি নয়। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এরকমভাবে সকলের অলক্ষে প্রায় সাতটি খুন করেছে যে সাইকিক ডাক্তার, তার নাম সন্তোষ পল। এবং যেদিন সে খুনগুলি করেছে প্রতিটি দিনই বৃষ্টি হয়েছে তুমুল। অথবা গ্রামে ছিল শ্যুটিং। সে কী বর্ষার সম্ভাবনা দেখেই খুনের প্লট ঠিক করত? ২০১৬ সালে সে গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিন্তু কেন খুন করেছে একের পর এক ? ডাক্তারবাবু তাঁর সামনে জেরা করতে বসা পুলিশ সুপার সন্দীপ পাতিলের চোখে চোখ রেখে বলেছেন, আমিই খুন করেছি। কিন্তু কেন করেছি? তা আমি বলব না? আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে। পারবেন? মোটিভ কী? জানা যাবে? ডক্টর সন্তোষ পলের নাম কেন হয়ে উঠেছিল ডক্টর ডেথ? পুলিশকে প্রথম কু দিয়েছিলেন কে? একটি নিরীহ মেয়ে।..ডাক্তার ডেথ জানতেই পারেননি তাঁর আড়ালে সেই মেয়ে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ করছে বাগানের গর্ত খোঁড়া...। মেয়েটির কী হল?

গুলাবরাও পল মুম্বইয়ের বাস কোম্পানি বেস্টের একজন সাধারণ কর্মী। সন্তোষ পল তাঁর মেজ ছেলে। ছোট থেকে চুপচাপ। তার জীবনের দুটি লক্ষ্য। ডাক্তার হওয়া আর প্রশাসনের অনিয়ম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। এমন এক শক্তিশালী সংস্থা গড়ে তোলা যাকে পুলিশ থেকে কালেক্টর সকলেই যেন ভয় পায়। সেকেন্ডারি পরীক্ষা পাশ করার পর সন্তোষ পল ঢুকেছিলেন গৌরী শংকর মেডিকেল কলেজে। মহারাষ্ট্রের সাতারা টাউন । ১৯৯৪। পাশ করলেন অদ্ভুত নামের কোর্স। ইলেকট্রোপ্যাথি মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি। ১৯৮৬ সাল থেকে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজে এই বিশেষ চিকিৎসা প্রক্রিয়ার কোর্স চালু হয়েছিল। অ্যালোপ্যাথির বিকল্প অন্য একরকমের চিকিৎসা পদ্ধতি। কিন্তু ফের আর একটি অল্টারনেটিভ চিকিসা ব্যবস্থা শুরু হলে আবার মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে না তো? গ্রামেগঞ্জে শুরু হবে না তো অন্তহীন মৃত্যু মিছিল? হাতুড়ে ডাক্তারদের হাতে! বিধানসভায় বিরোধীদের এবং বাইরে বিভিন্ন ডাক্তারি সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু হল। এই ব্যবস্থা যেন বন্ধ হয়। সন্তোষ পলের দুর্ভাগ্য, ঠিক যে বছর

তিনি পাশ করলেন, সেই বছরেই এই কোর্সকে সরকার বাতিল করে দিল। এই কোর্স থেকে পাশ করা কেউই আর নিজেকে চিকিৎসক আখ্যা দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবে না। বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেল। সন্তোষ পল ডাক্তারি পাশ করেছেন। কিন্তু ডাক্তার হওয়া তাঁর হল না। অথচ জীবনের একমাত্র শপথ ডাক্তারি করা। তাই তিনি হাল ছাড়লেন না। সোজা নিজের জন্মভূমি যেখানে সেই ধর্ম গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। আর শুরু করলেন প্রাইভেট প্র্যাকটিস। সাদা রঙের বাড়ির বাইরে একদিন গ্রামবাসী আবিষ্কার করলেন একটি নেমপ্লেট লেখা-ডক্টর এস জি পল! গ্রামে নতুন ডাক্তার? গুলাবরাও পলের এটাই পিতৃপুরুষের বাড়ি। তিন প্রজন্ম ধরে আছেন তাঁরা। আজ তিনি নেই। তাঁর ছেলে মুম্বই থাকে। সেই মেজ ছেলেই এতদিন পর গ্রামে ফিরে এসেছে ডাক্তার হয়ে। গ্রামের ছেলে ডাক্তার! আর গ্রামেই প্র্যাকটিস করবে? বাহ! এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে? অতএব অল্পদিনের মধ্যে শুধু যে পসার সাংঘাতিক জমে গেল তাই নয়, চারটি গ্রাম ডাক্তারসাব বলতে অজ্ঞান।

এহেন এক নিরীহ ও জনপ্রিয় ডাক্তার একের পর এক সাতটি খুন করেছিলেন! কেন? যা গোটা মহারাষ্ট্র ছাপিয়ে দিল্লির গোয়েন্দাদের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুটি গ্রাম পিছু একজন করে থাকে পুলিশ পাতিল। কাকে বলে পুলিশ পাতিল? পুলিশের ইনফর্মারকে। মহারাষ্ট্রে যাদের নাম হয় পুলিশ পাতিল। সাধারণ গ্রামবাসী কিংবা কোনো ছোটখাটো ব্যবসা করে। আসলে পুলিশের চর। মাসিক বেতনের বন্দোবস্ত আছে। এই হল পুলিশ পাতিল। ধম গ্রামের পুলিশ পাতিলের নাম বসন্ত নায়গোয়াডে। চায়ের দোকান। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মঙ্গলা জেরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে পূর্ব প্রাথমিক শিক্ষা সেবিকা কেন্দ্রের। একটি রাজনৈতিক সংগঠন। সেখানে যাতায়াত আছে মঙ্গলার। বছরভর আশেপাশের চারটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাঁর ডিউটি। তাই প্রায় প্রতিটি গ্রামবাসীর পরিবারকে তিনি চেনেন। এই যে সুরেখা, বনিতা আর তারপর আবার জাহ্নবী উধাও হয়ে গেল এর মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল আছে না? একদিন নিজের সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে আচমকা মাথায় এল মঙ্গলার। ডক্টরের সঙ্গে কী কোনো সম্পর্ক আছে ওই সব ভ্যানিশের!

ওহ, জাহ্নবীর উধাও হওয়ার গল্পটি তো এখনও জানা হয়নি। কৃষ্ণা নদীর তীর ধরে সোজা হেঁটে গেলে ধম গ্রামের শেষপ্রান্তে পড়বে একটি বাঁশবাগান। সেটি পেরোলেই এক ছোট্ট জনপদ। আছে প্রাইমারি স্কুল, সপ্তাহে দুদিনের হাট আর ধানকল। গ্রামের নাম নায়াগা। এখানে থাকেন জাহ্নবী পল। ডক্টর পলের দূর সম্পর্কিত বোন। জাহ্নবীর সংসারে প্রবল অশান্তি। পরিবারের মধ্যে নয়। আত্মীয়দের নিয়ে। কারণ চার একর জমি। পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে সেই জমি পাওয়ার কথা জাহ্নবীর স্বামীর। কিন্তু স্বামীর দুই ভাই কিছুতেই সেই জমির কাগজপত্র দেবে না। মাসের পর মাস...এবং বেশ কয়েক বছর চলে গেল। জমি আর পাওয়া হল না। এভাবেই একদিন স্বামী অজয় জমির দখল পাওয়ার আগেই মারা গেলেন। এক মেয়েকে নিয়ে জাহ্নবী একা। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ওই জমিটির অধিকার পাওয়া। স্বামীর অন্তিম ইচ্ছে। তিনি কিছুতেই অধিকার ছাড়বেন না। কিন্তু এজন্য তো ল্যান্ড রেভিনিউ দপ্তরে যাতায়াত করা দরকার। তিনি যে একা বিধবা। কিছুই জানেন না। কার কাছে সহায়তা চাইলেন? দাদার কাছে। ডক্টর সন্তোষ পল। প্রায় সপ্তাহে দুদিন ধরে দেখা হচ্ছে। চেম্বার করে সন্তোষ পল সোজা চলে আসেন এই বাড়ি। শুধু যে জমির কাগজপত্র নিয়ে আলোচনা তাই নয়। জাহ্নবীর মেয়ে পল্লবীকে একটু অঙ্ক দেখিয়ে দিতে হয়। বাবা নেই। মেয়েটিকে দাঁড় করাতে হবে না? এটুকু সাহায্য না করলে আর আত্মীয় কিংবা স্বজন কীসের? নিয়ম করে আসতেন জাহ্নবীর সন্তোষ ভাইয়া। ওয়াই টাউনের জমিজমা সংক্রান্ত কেস হ্যান্ডল করেন এক উকিল। তিনি সন্তোষ ভাইয়ার বন্ধু। তাঁর কাছেই কাগজপত্র দেখিয়েছে সন্তোষ ভাইয়া। জাহ্নবীকে বলেছেন, কোনো চিন্তা নেই। মনে হচ্ছে দলিল বের করা যাবে। যদি তোমার শ্বশুরবাড়ির ওরা না দেয়, আমাদের মামলা করা ছাড়া উপায় নেই। সেসব আমি দেখব। তুমি ভেবো না। ভাববেই বা কেন জাহ্নবী? এরকম এক পরোপকারী মানুষ তাঁদের পাশে আছেন। অতএব পল্লবীর সেকেন্ডারি পরীক্ষার টেস্ট এক্সাম শেষ হলে এক বুধবার সন্তোষ বললেন, জানু, কাল একবার যেতে হবে টাউনে। উকিলের সঙ্গে ল্যান্ড অফিসে যাব। আমি একা গেলে তো আমাকে কোনো দলিল দেখতে দেবে না। তোমাকে দরকার। জাহ্নবীর ভালো লাগল। জমি পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে সেই আশার আলোর জন্য নয়। এই যে একটি দিন পাওয়া যাবে এই বদ্ধ

জীবন থেকে মুক্তির। খোলা আকাশের বাইরে। সারাদিন ওয়াই টাউনে কাটানো। একটা যেন দখিনা বাতাস। কতদিন 'উর্বশী' হলে সিনেমা দেখা হয়নি। কতদিন খাওয়া হয়নি আলু টিক্কি। জাহ্নবীর মন ভালো হয়ে গেল। কোন শাড়িটা পরা যায়? পরদিন বৃহস্পতিবার। এই দিনেই গণপতি পুজো করেন জাহ্নবী। আজ সকাল সকাল সেরে নিলেন। ভাইয়াকে বলা আছে। জাহ্নবী সোজা ভাইয়ার কাছে যাবেন। সেখান থেকে টাউনে যাওয়া হবে। স্কুটারে। ভাইয়া তো আবার সকালের চেম্বার মিস করবে না। রোগী দেখা আছে। জাহ্নবী একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে ডক্টর পল হাত নেড়ে বললেন, দারুণ দেখাচ্ছে! লজ্জা পেলেন জাহ্নবী! ডক্টর পল জাহ্নবীকে নিয়ে ওয়াই টাউনে গিয়ে সবার আগে ঢুকেছিলেন লস্যির দোকানে। জাহ্নবীর কী যে ভালো লাগল! কতদিন পর..। এরপর উকিলের বাড়ি। দেখা গেল লোকটিকে আগে থেকে সব বলা আছে। এবং স্ট্যাম্প পেপারের ওপর কিছু কাগজপত্র লাগানো। সেখানে সই করা। কাগজগুলি নিয়ে যেতে হবে ল্যান্ড অফিসে। প্রতাপ ফড়ানবিস। ল্যান্ড রেকর্ড সুপারভাইজার। সন্তোষকে দেখেই হাসলেন। স্যার কেমন আছেন?

প্রতাপের চোখ ততক্ষণে জাহ্নবীর দিকে। চোখে প্রশ্ন। সন্তোষের প্রশ্নের জবাবে বললেন, আমি ভালো।

ইনিই জমির মালিকানা চাইছেন?

হ্যাঁ স্যার। ইনিই। আমার বোন।

আচ্ছা। কাগজপত্র এনেছেন?

হ্যাঁ এই যে দেখুন এমনিতে ঠিক আছে। কিন্তু চেইন দলিল তো আপনাদের কাছে নেই। অন্য পার্টির কাছে। তাই ঝামেলা আছে।

স্যার, ইনি তো কোনো বেআইনি ক্লেইম করছেন না। আপনি চাইলে কী না হয়। প্রতাপ হাসলেন। আমি তো চাইলেই হবে না। আপনাদেরও চাইতে হবে । আপনারা কত তাড়াতাড়ি চান? ভেবে দেখুন!

ডক্টর সন্তোষ পল নিমেষে বুঝে গেলেন ইঙ্গিত। তাঁর মুখে একটা রহস্যময় হাসি। বললেন, কত স্যার?

প্রতাপ বললেন, একা তো নই...আরও অনেক লোক আছে..ভাগ দিতে হয়। তবু আপনি এক দেবেন।

এক লাখ? বেশি হয়ে যাচ্ছে স্যার আমাদের কাছে।

আরে জমির পরিমাণটা ভাবুন।

আচ্ছা স্যার। ওটাই হবে। কবে? প্রতাপ বললেন, আগে দলিলটা আদায় করি। তারপর। আমার কোনো কাঁচা কাজ নেই।

এক কাজ করুন আপনি। প্রতাপ এবার তাকালেন জাহ্নবীর দিকে। পরশু একবার আসুন। সন্তোষ বলছেন, স্যার পরশু আমার চেম্বার আছে অন্য জায়গায়। পারব না। প্রতাপ বললেন, আপনার আসার দরকার নেই। উনি সকালে চলে আসবেন। আমি শুধুমাত্র কয়েকটা কাগজে সই করিয়ে নেব। আধ ঘণ্টার ব্যাপার। প্রতাপ কথা বলছেন, আর বারংবার জাহ্নবীর দিকে তাকাচ্ছেন। জাহ্নবীর মুখেও একটা চাপা হাসি কেন? সন্তোষ পলের চোখে পড়ছে।

জাহ্নবী বললেন, ঠিক আছে ভাইয়া। কতবার তুমি আসবে? আমি এবার পারব। একদিনের ব্যাপার তো। চিন্তা কোরো না। চিনেই তো গেলাম।

সন্তোষের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। জাহ্নবী যে তাঁকে ছাড়া নিজেই একা আসতে রাজি হবে তা তিনি ভাবেননি। যাই হোক। কাজটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। অতএব তাঁর আপত্তি নেই। তাই হবে।

জাহ্নবীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন সন্তোষ। এবার কিছু খাওয়া যেতে পারে। সেইমতো লাঞ্চ সেরে একবার মার্কেটে যেতে চান জাহ্নবী। তাই হোক। মেয়ে আর নিজের জন্য কিছু কেনাকাটা সেরে জাহ্নবী ফিরলেন ডাক্তার ভাইয়ার সঙ্গে। সন্ধ্যা হয়েছে। স্কুটার এসে

দাঁড়াল ডাক্তার পলের ফার্ম হাউসে। কিছু জরুরি ফাইল নিতে হবে। দু মিনিটের ব্যাপার। আমি এখান থেকে চলে যাই ভাইয়া? বললেন জাহ্নবী। সন্তোষ পল মাথা নেড়ে বলছেন, না না দাঁড়াও। আমি দুটো পেপারের ফোটোকপি দিচ্ছি। সেটায় সই করে রাখবে। সোমবার আবার সেই উকিলের কাছে যেতে হবে। আর তুমি তো পরশু যাবেই। ওই প্রতাপকে জিজ্ঞাসা কোরো ভাইয়ার ডেথ সার্টিফিকেট কিংবা কোনো অফিসের কাগজপত্র চাই কিনা। স্কুটার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে এলেন ডক্টর পল। এবার আর কোনো প্রস্তুতি নয়। নেমেই গলা চেপে ধরলেন জাহ্নবীর। চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে। হাত দিয়ে ছাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু জাহ্নবীর সেই শক্তি নেই। ধীরে ধীরে লোহার মতো শক্ত ডাক্তারের হাতটা গলায় চেপে বসছে। হাঁ করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা। ততক্ষণে মাটিতে বসে পড়েছেন জাহ্নবী। পা দুটো ছটফট করছে। কী হচ্ছে এসব? কেন হচ্ছে? বুঝতে পারলেন না। হিসহিস করে ডক্টর সন্তোষ পল বলছেন, প্রতাপকে খুব ভালো লেগেছে জানু... একটা ঘুষখোরকে খুব ভালো লেগেছে... একা একা পরশু দেখা করতে যাবে জানু.. গলায় সাঁড়াশির চাপ বাড়াচ্ছেন সন্তোষ ভাইয়া। হাত নাড়াচ্ছেন...বলার চেষ্টা করছেন কিছু...কিন্তু আর কথা নেই। সন্তোষ পল সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন। সুতরাং বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না জাহ্নবী। ঢলে পড়লেন নিস্তেজ হয়ে। মুখের কষ বেয়ে বেরোচ্ছে রক্ত। তখনও চোখ বিস্ফারিত। সেই চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু একটাই সমস্যা। আপাতত কোনো গর্ত খোঁড়া তো নেই। এই কাজটা তো প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। মেয়েটা এমনিতে ভালো। কিন্তু ওই যে বলে লোভ। সামান্য সংযম নেই। একজনকে ভালো লেগেছে ঠিক আছে। তাই বলে চোখের সামনে এক মিনিট আগে যে ঘুষ চাইছে তাঁর চোখের ইশারায় সাড়া দিয়ে একা দেখা করতে যেতে রাজি হয়ে গেল? ছি ছি ছি..আজকাল মহিলাদের কোনো সংযমই নেই..ভাবলেন ডক্টর।

কিন্তু রাখাটা কোথায় হবে বডিটা? এবার থেকে আগেই কিছু খুঁড়ে রাখতে হবে। কখন কবে দরকার হয়। এই তো আজকেই বিনা প্ল্যানে করতে হল। কেন এভাবে একজন মেয়ের মা, বিধবা এবং ভাইয়ের প্রতি আস্থাশীল মহিলা এক মিনিটের মধ্যে অন্য পুরুষের কথায় আকৃষ্ট হবে? এসব পছন্দ করেন না ডক্টর পল। তাই তো এসব করতে হল। হাতে সময়

নেই একদম। তাই ফার্ম হাউসের পিছনেই যেতে হল। সেখানে রাখা আছে কোদাল আর কুড়ুল। এমনিতে যখনই বডি পুঁতে ফেলার দরকার হয় তার আগে জেসিবি কোম্পানির মাটি খোদাই মেশিন বুক করে ডাকিয়ে আনেন। ওই মেশিন এসে খোদাই করে রাখে। তারা ভাবে ডাক্তারবাবু এখানে বোধহয় সার আর ইঞ্জেকশন বা চিকিৎসার বর্জ্য পুঁতে ফেলেন। আসলে পোঁতা হয় ডেডবডি। সবাই তো জানে তাঁর বাগানের শখ। এখন আর সেসব করা হল না। তাই ওই কোদাল আর কুড়ুল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় একটা গর্ত খোঁড়া সম্ভব হল। তবে বড় হল না। মনের মতো নয়। জাহ্নবীর দেহকে একটু ভাঁজ করে রাখতে হবে ছোট গর্তে। তাই করলেন তিনি। পুঁতে ফেলা হল। তবে মনটা খুব খারাপ। বেচারি জাহ্নবীর ওভাবে পা ভাঁজ করে শুয়ে থাকতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে। আমিই তো চিকিৎসা করতাম ওর বাতের ব্যথার। অস্টিও আরথ্রারাইটিস ছিল মেয়েটার..আহারে..। ভাবলেন ডক্টর পল।

তারপর স্নান করে নিলেন। সর্বদাই এই ফার্ম হাউসে একসেট জামাকাপড় থাকেই। এই খুন করার পর আগের জামাকাপড় পরতে ভালো লাগে না। তাই চেঞ্জ করে নেন তিনি। ফিটফাট। তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। কারণ এরপর একটা প্ল্যান আছে। জামাকাপড় পরে বেরোলেন ডক্টর পল। হাতে জাহ্নবীর শপিং এর জিনিসপত্র। স্কুটার নিয়ে সোজা হাজির পাশের গ্রাম নাগারায়। জাহ্নবীর বাড়িতে। মেয়ে পল্লবী পড়তে বসেছে বটে। কিন্তু এখনও মা আসছে না কেন ভাবছে। খাবারটা কি নিজেই করে নেবে? কখন মা আসবে কে জানে? বাইরে স্কুটারের আওয়াজ। ওই তো এসেছে নিশ্চয়ই।

কই! না তো! মামা একা। কী ব্যাপার। মামা সন্তোষ পল এসে বললেন, দ্যাখ তোর জন্য মা কতকিছু কিনেছে। একটু চা কর তো! তোর মা আসছে। মুদি দোকানে গেল। বলল কিছু রান্নার জিনিসপত্র কিনে ঢুকছে। আর এই দ্যাখ তোর জন্য কত কিছু কিনেছে। পল্লবীর চোখে আলো জ্বলে উঠল। নতুন জামাকাপড় দেখে খুশি হয়ে সে গেল চা করতে। এক ঘণ্টা...দু ঘণ্টা...রাত ১০টা বাজতে যায়। মা আসছে না কেন? ডক্টর পলেরও মুখে খুব দুশ্চিন্তা। কোথায় গেল রে? এই তো আমার স্কুটার থেকে নেমে বলল ১০ মিনিটের

মধ্যেই নাকি আসবে। আমাকেও তো ওয়েট করতে বলেছে। আর কারও বাড়ি যেতে পারে? পল্লবী মাথা নেড়ে বলছে জানি না। কখনও তো এতক্ষণ বাইরে থাকেনি অনেকদিন। তবে মুদিবাজারে গেলে অন্য কোথাও যায় না! চল তো বেরিয়ে দেখি। বললেন, ডক্টর পল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্তও যখন জাহ্নবী ফিরলেন না, তখন মেয়ে পল্লবীকে নিয়ে ডক্টর পল গেলেন থানায়। মিসিং ডায়েরি করতে। স্যার..যেভাবেই হোক সিরিয়াসলি দেখুন..এই বাচ্চা মেয়েটা কার কাছে থাকবে বলুন! পুলিশ ফাঁড়ির সাব ইনস্পেক্টর টিকারাম ওয়াগলের মাথায় প্রথম যেটা এল তা হল এই গ্রামগুলো থেকে একের পর এক মহিলা উধাও হচ্ছে কেন? কোথায় যাচ্ছে তারা?

আর পরদিন সকালে আবার ওয়াই টাউনে গিয়ে ডক্টর সন্তোষ পল ডেপুটি পুলিশ সুপারের অফিসে অভিযোগ দায়ের করে বললেন, ল্যান্ড রেকর্ড দপ্তরের প্রতাপ ফাড়নবিস একটা কাজ করে দেওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছেন। এর বিহিত করতে হবে। তা না হলে আমাদের সংগঠন কিন্তু আন্দোলনে নামবে। ততদিনে ডক্টর পল অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো নামক একটি সামাজিক দুর্নীতি বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং তাঁকে চিনে গিয়েছে পুলিশ কর্তারা। কারণ একের পর এক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এসে পল লড়ে যাচ্ছেন উচ্চপদস্থ কর্তাদের বিরুদ্ধে। তিনি তখন একাধারে গ্রামে ডাক্তারি করেন, সমাজসেবী এবং দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের মুখ ওয়াই টাউনে। নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবু। তাঁর নতুন এক ফ্যান হয়েছে। এক নার্স। জ্যোতি। ডাক্তারবাবুকে জ্যোতি ভালোবাসে। ঠিক যেমন সালমা শেখ ভালোবাসে। কিন্তু সে যে কোথায় গেল? হঠাৎ এক রাতে ভ্যানিশ! ডাক্তারবাবুর সাথেই তো বেরিয়েছিল। তারপর? অনাথ সালমা শেখের হয়ে বারংবার পুলিশের কাছে গিয়ে খোঁজ করার কেউ নেই। তাই। সে আর ফিরে এল না।

৬ মাস পর। সারাদিন এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বাচ্চাদের ট্যাবলেট, মিল্ক পাউডার আর প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার কাজ সেরে বসন্ত নায়গোয়াড়ের চায়ের দোকানে এসে বসলেন মঙ্গলা জেরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। এবং বসন্ত ভাইয়াকে বললেন, ভাইয়া আপনি লক্ষ

করেছেন একটা ব্যাপার? এ পর্যন্ত সুরেখা থেকে জাহ্নবী যাঁরাই নিখোঁজ হয়েছে সবাই ডক্টর পলের পেশেন্ট? ধর্ম গ্রামের পুলিশ পাতিলের চোখ কুঁচকে গেল। তাই তো! কিন্তু ডক্টরকে তো পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে গিয়েছে এর আগেও। কিছুই ধরা পড়েনি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুরেখার স্বামী পুলিশে এফআইআর করে বলেছেন, ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন সুরেখা। ডাক্তারকে জেরা করেছে পুলিশ। তিনি বলেছিলেন, আমি তো হাইওয়েতে ছেড়ে দিয়েছিলাম ওনাকে। তারপর তো আর কিছু জানা নেই। পুলিশ তাঁর কথামতো প্রত্যেক লোকেশনে গিয়ে দেখেছে ডাক্তার ঠিক বলছেন। সত্যিই তিনি সুরেখাকে নিয়ে আই সেন্টারে যান। সত্যিই হাসপাতালে যান। ফিরেছেনও সুরেখাকে নিয়ে। একটি রাস্তার পাশের ধাবায় খেয়েছেন দুজনে। তারাও সাক্ষী দিয়েছে। সুতরাং ঠিক হাইওয়েতে তিনি যেভাবে নিখোঁজ হয়েছেন সেটা স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না মঙ্গলাকে। জানতেই হবে কী ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলেন জাহ্নবী টাউন থেকে ফিরে? কই মুদিখানায় তো তাঁকে কেউ দেখেনি? তবে? সোমবার। সেদিন সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি। আজ গ্রামের চেম্বারে আসবেন ডক্টর পল। রোগীরা বসে আছেন। এবং এসে বসে আছেন আর একজন। মঙ্গলা। তিনি ডাক্তারের অপেক্ষা করছেন। কেন? আজ একটা দীর্ঘদিনের সন্দেহ দূর করা দরকার। আধঘন্টা পর ডক্টর পল এসে নামলেন চেম্বারে। ঢুকছেন। এবং মঙ্গলাকে তিনি চেনেন। মেয়েটা অনেক সমাজসেবার কাজ করে। অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী। ওকে তো ওয়াই টাউনেও দেখেছেন। কী ব্যাপার? কেমন আছো?

মঙ্গলা হেসে মাথা নাড়ল।

ডক্টর পল বললেন, এসো ভিতরে।

মঙ্গলা চেম্বারে ঢুকে চেয়ারে বসে বললেন, ডাক্তারসাব একটা কথা বলার ছিল। আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা দেবেন? আমাদের অফিসে একটা ক্লিনিক খুলতে চাই। সবরকম ডাক্তার থাকবে। কিন্তু পারমিশনের জন্য নাকি ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর চাই। হাসলেন ডক্টর পল। বললেন, আরে আমাকে তো সবাই চেনে। আমার জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর দরকার কী?

মঙ্গলা স্থির চোখে তাকিয়ে। আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর মনে নেই ডাক্তারসাব? ডক্টর পল থমকে গেলেন। মেয়েটির কণ্ঠে যেন সন্দেহের গন্ধ? কী ব্যাপার? তিনি বললেন, তোমাদের ক্লিনিকে কবে কবে বসতে হবে আমাকে? মঙ্গলা শীতল কণ্ঠে বললেন, দুদিন। শনি আর রবি। ওয়ার্কাররা তো এই দুদিন টাইম পাবে।

এবার মুখের হাসি চওড়া হল ডক্টরের। বললেন, ও হো! তাহলে তো হবে না। ওই দুদিন তো আমার চেম্বার অন্য জায়গায়।

মঙ্গলাও মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন বোধহয়। শনিবার আপনার সকালে চেম্বার ওয়াইতে। আর রবিবার বিকেলে এখানে। আমাদের ওখানে তো শনিবার রাতে আর রবিবার বিকেলে। তাই কোনো অসুবিধা নেই।

এবার ডক্টর পলের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। তিনি বলছেন, দেখি যদি সম্ভব হয়। স্যার তাহলে কবে ফোন করব আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বরের জন্য?

ডক্টর পল কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আজ সোমবার। তুমি আমাকে বৃহস্পতিবার ফোন করো। এখানেই তো আসব।

মঙ্গলা মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

বৃহস্পতিবার ধম গ্রামের বাইরে একটি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে ছিল। হাইওয়েতে। চারজন যাত্রী অপেক্ষা করছে বাসস্টপে। একজন মঙ্গলা। একটি মেয়ে এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। মেয়েটিকে চেনেন মঙ্গলা। নাম জ্যোতি। কিছু একটা কথা হচ্ছে। হাসছেন দুজনেই। বাস এসে গিয়েছে। মঙ্গলা সেই বাসে উঠতে যাবেন। তবে জ্যোতি হাত বাড়িয়ে তাঁকে কিছু বলার পর তিনি গেলেন না। বাসটি চলে গেল। জ্যোতি বলেছে, আমি আবার নার্সিং হোমেই ফিরব। আমার সঙ্গে চলো। এখানে একটা ব্লাড ক্যাম্প ছিল। তাই আসা হয়েছিল। চলো গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। মঙ্গলা ফিরবে ওয়াই টাউনে। সকালেই কথা হয়েছে ডক্টর পলের সঙ্গে। তিনি ফোন ধরেননি। এখন আর একবার করা দরকার। করবেন করবেন ভাবছিলেন। সেই সময় এই জ্যোতি। এই মেয়েটি যেখানে নার্সের কাজ করে সেখানেই তো ডক্টর পল আছেন। অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা পাথর হয়ে গেলেন। কারণ

চালকের আসনে ডক্টর পল। জ্যোতি ধড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন। মঙ্গলা একটু ভয় পাচ্ছেন। কেন তা তিনি জানেন না। ডক্টর পল পিছনে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী কেমন সারপ্রাইজ দিলাম। চলো তোমাকে আমার রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ফোটোকপিটা দেব। মঙ্গলা ধাতস্থ হয়ে বলল, না না স্যার..আমার ফোটোকপি চাই না। শুধু নম্বরটা হলেই তো হবে।

ডক্টর পল শুনে হাসছেন। আরে তবু নিজের চোখে দেখে নেওয়া ভালো। আমাকে তো সন্দেহও হতে পারে! তাই না? শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ মঙ্গলার মুখে। মঙ্গলার মনে গভীর শঙ্কা। তাহলে কি লোকটা ধরে ফেলছে যে তাঁকে সন্দেহ করা হচ্ছে? লোকটার এই সামাজিক চেহারাটা মুখ নাকি মুখোশ সেটা মঙ্গলা যে আসলে জানতে চাইছে, তা কি আন্দাজ করছে ডাক্তার? তাহলে এরপর কী হবে? মঙ্গলার বুক কাঁপছে। কিন্তু মুখ স্বাভাবিক। অ্যাম্বুলেন্স ঘুরপথে যাচ্ছে ধম গ্রামে।

এটা জঙ্গলের পথ। সোজা রাস্তা নয়। উঁচুনীচু। সমতল দেখে একটা জায়গায় আচমকা দাঁড়িয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। চারদিক ফাঁকা। জ্যোতি চুপ করে তাকিয়ে আছে। ডক্টর পল দরজা খুলে নেমে এসে পিছনে উঠলেন। মঙ্গলা এবার আন্দাজ করছেন কিছু। তিনি চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু কে শুনবে। জনমানবহীন জঙ্গল। একটা ইনজেকশন দেওয়া হল মুখ চেপে ধরে। একটু পর নিস্তেজ হয়ে গেল মঙ্গলা। ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্যোতিকে জড়িয়ে ধরে একটা চুম্বন করলেন ডক্টর পল। গ্রেট জব ডিয়ার..। এই মেয়েটা আমাকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছিল বুঝলে। আমার সংগঠনের কাজকর্ম এদের সংগঠনের লোকজন দুচক্ষে দেখতে পারে না। তাই হিংসায় সরিয়ে দিতে প্ল্যান করেছে। জ্যোতি জানে। গতকালই তাঁকে এসব কথা ডক্টর সাব বলেছেন। ডক্টর সাবকে কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করলে জ্যোতি ছেড়ে দেবে না। দরকার হলে খুন করবে। তাই করেছে। এরপর সেই অ্যাম্বুলেন্স যথারীতি সেই ফার্ম হাউসে এসেছিল। এবং আগে থেকেই খোঁড়া ছিল গর্ত। মঙ্গলার স্থান হল বাকিদের আশেপাশেই। তাঁর কবরে বসানো হল গোলাপ গাছ। কালই কেনা হয়েছে। মঙ্গলার মোবাইল ফোনটা ডক্টর পল দিয়ে দিলেন জ্যোতিকে। বললেন, আগামী দুদিন তুমি এটা ব্যবহার করো। কিছু দোকান, অফিসে ফোন করবে মাঝেমধ্যে।

আর সকালে চলে যাও নাসিক। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কেন? কারণ আছে। বললেন ডক্টর।

কারণটা আর কিছুই নয়। পরদিন দুটি মিসিং ডায়েরি দায়ের করা হল। একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং আর একটি মঙ্গলার। মঙ্গলার পরিবার থানায় মেয়ের উধাও হওয়ার খবর জানিয়ে ডায়েরি করেছে। আবার অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছে না বলে এফআইআর হয়েছে একটি। সেই যে নার্সিং হোমে ডক্টর পল কাজ করেন সেই নার্সিং হোমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। পুলিশ মঙ্গলার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে দেখছে সেটি তো যথারীতি কাজ করছে। এমনকী বেশ কয়েকটি কলও করা হয়েছে। দেখা গেল মঙ্গলা নাসিকে কোথাও ঘুরছে। কারণ মোবাইলের সিগন্যাল তেমনই দেখাচ্ছে। তার মানে তো নিখোঁজ নয়। কিন্তু কেন নাসিকে যাবে সে? পরিবার মানতে নারাজ? ফোন করা হলে কেন ফোন ধরছে না? অথচ ওই মোবাইল থেকেই ফোন করা হচ্ছে অন্যত্র। এরকম অদ্ভুত আচরণ কেন করবে কেউ? ঠিক তিনদিন পর ওয়াই থানার পুলিশের কাছে এল পুলিশ পাতিল। বসন্ত। সেই ধর্ম গ্রামের চায়ের দোকান। আসলে পুলিশের চর। পুলিশকে জানালেন, সব কথা। বললেন, মঙ্গলা কয়েকদিন আগে তাঁকে বলেছেন ডক্টর পলের ব্যাপারে। সে নিজে এসব ব্যাপারে খোঁজ করতে শুরু করেছিল। সেই কারণে কিছু হয়নি তো?

এদিকে ঠিক সেই মুহূর্তে নাসিকে থাকা জ্যোতির হাতের মোবাইলে একটি মেসেজ এল। ডক্টর পল। জানাচ্ছেন বেশিদিন বাইরে থাকা যাবে না। এবার ওয়াই টাউনে ফিরে যাও। আমিও ফিরছি। কারও সন্দেহ হবে না। কিন্তু সে গিয়ে কী বলবে সবাইকে? সে কোথায় গিয়েছিল? এটা তো জানা হল না। তাই ডক্টর পলকে জ্যোতি ফোন করে বসল। মারাত্মক ভুল! কারণ ফোনটা টেনশনে সে করেছে মঙ্গলার ফোন থেকে। ফোনটা ধরলেন ডক্টর পল। এবং প্রথমেই জানতে চাইলেন এটা থেকে কেন করেছ? অত মনে নেই স্যার..ইউ ইডিয়ট...চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর পল। তিনি তখন ধম গ্রামে। একটু পরই বেরোলেন। মুম্বইয়ে যেতে হবে। পুলিশ কিন্তু গোটাটাই সক্রিয়। মঙ্গলার মোবাইল নেটওয়ার্ক ফলো করে দেখা গেল সেটি চলে এসেছে ওয়াই টাউনে। জ্যোতি তখনও মঙ্গলার ফোনটি

সুইচ অফ করেনি। ভুলে গিয়েছে। তাই সে ধরা পড়ে গেল। এবং এক সাইকিক ডাক্তারকে ভালোবেসে ফাঁদে পড়া মেয়েটি স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের জেরায় ভয়ে সব বলে দিল। ডক্টর পল তখন মুম্বইয়ের দাদরে। একটা প্লট কেনার কথা আছে বোরিভিলিতে। সেই বিষয়ে কথা বলতে। একটা ফোন এল। জ্যোতির। ডক্টর পল বললেন, হ্যাঁ বলো..।

জ্যোতি বলছে, স্যার, এখানে সকলে জানতে চাইছে আপনি কবে ফিরবেন? নার্সিংহোম জানে আপনি কোথায়?

ডক্টর পল বললেন, তুমি কোথায়?

জ্যোতি বললেন, আমি তো নার্সিংহোমেই স্যার.. মর্নিং ডিউটি শেষ হয়েছে। বাসায় যাব। কোনো চিন্তা নেই। কেউ সন্দেহ করেনি।

শ্বাস ফেললেন ডক্টর। যাক! বললেন, আমি আসছি আজ রাতেই। কাল দেখা হবে নার্সিং হোমে। আর ওই মোবাইল অফ রেখেছ তো?

কাঁপা গলায় জ্যোতি বললেন, হ্যাঁ...।

কাঁপা গলায়। কারণ তাঁর পাশে তখন দাঁড়িয়ে সন্দীপ পাতিল। পুলিশ সুপার। ফোনটা কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন, লেট হিম কাম। এবং পরদিন ধরা পড়ে গেলেন ডক্টর পল। কেন খুন করলেন সুরেখাকে? গয়নার জন্য? ডক্টর পল ঘৃণায় মাথা নাড়ছেন। গয়না? ওসব আপনাদের দরকার হয়! তাহলে? জেরা চলছে। পুলিশ সুপার জানতে চান তাহলে আর কী কারণ? ডক্টর পল বলছেন, আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল কেন? যাঁর স্বামী বাইরে থাকে, সেই লোকটা কত কষ্ট করছে পরিবার থেকে দূরে। তাঁকে এভাবে চিট করবে কেন? মানে? হতবাক পুলিশ সুপার। মানে হল সুরেখা আমাকে প্রেম নিবেদন করেছেন তা জানেন? এই সামান্য কারণে? পুলিশ সুপার বিস্মিত! ডক্টর পল হাসলেন, এটা সামান্য কারণ? সমাজকে এভাবেই আপনারা নষ্ট করছেন।

বনিতাকে কেন খুন করলেন?

ডক্টর পল একটু চুপ। তারপর উদাসীন কণ্ঠে বলছেন, যে মহিলা একা থাকেন। স্বামী নেই। তাঁর এইডস হয় কেন? জানেন না? এসব বন্ধ করতে পারবেন? বাঁচাতে পারছেন এই চরিত্রহীনতাকে? ডক্টর পলকে তারপর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁর কুখ্যাত ফার্ম হাউসে। তাঁর দেখানো স্থানগুলিকে গোলাপ ফুল বা গাঁদা গাছ অথবা দেবদারুর নীচে থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে একের পর এক ডেডবডি। কঙ্কাল। সেগুলি তো খুনের প্রমাণ। কিন্তু তার থেকে ভয়ংকর দৃশ্য কী ছিল? একটি নতুন গর্ত খোঁড়া রয়েছে। অব্যবহৃত। তার মানে আরও একটি খুনের প্ল্যান ছিল? এবার কে ছিল টার্গেট? চমকে গেলেন গোয়েন্দারা। পরবর্তী টার্গেট ছিল একটি মেয়ে। ডক্টরকে গভীরভাবে ভালোবেসে খুনে সাহায্য করেছে সেই মেয়ে...জ্যোতি..! সন্তোষ পল। এক সাইকিক খুনি। যার নাম ডক্টর ডেথ!

১২

ঝগড়া হয়েছে ফয়জল আর তার বাবার মধ্যে। সবেমাত্র ইলেভেন পাশ করা ফয়জল বাবার মুখে মুখে কখনও এভাবে তর্ক করেনি। কিন্তু এবার তার বাবা চাইছেন ফয়জলকে চাচার কাছে পাঠিয়ে দিতে। পুণেতে। টুয়েলভথ পাশ করার পর ওখানে ইলেকট্রনিক্সে ডিপ্লোমা করে নিক ফয়জল। এটাই চাইছেন বাবা। ফয়জল নারাজ। তার আর পড়াশোনা ভালো লাগছে না। আর ওইসব ডিপ্লোমা মানে বিস্তর পরিশ্রম। অত মাথাই নেই। তাই সে যাবে না। সুতরাং তুমুল অশান্তি। কিন্তু যেতে তাকে হলই। প্রথম কারণ টুয়েলভথের রেজাল্ট তেমন ভালো নয়। আর দ্বিতীয় কথা হল আব্বু প্রচণ্ড রাগী। তিনি মানছেন না। এক ভাই রাহিল হার্ডঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সবথেকে ছোট ভাই মুজাম্মেল তো এখনও স্কুলে। তারও পড়াশোনায় বেশ মাথা আছে। দুই ভাই যখন এভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটছে তখন ফয়জল কেন এখনও ঠিক করতে পারছে না যে জীবনে সে কী করবে? আব্বু, চাচা, আম্মু সকলেই চিন্তিত আর ক্রুদ্ধ । সুতরাং প্রচুর তর্কাতর্কির পর অবশেষে ফয়জল পুণে গেল। চাচার বাড়িতে থাকা। এবং প্রথম বছরের পরীক্ষাতে ফেল। সুতরাং এরপর আর পড়াশোনার পিছনে সময় আর টাকা নষ্ট করে লাভ নেই। একটা কিছু কাজ করতে হবে। বহুদিন ধরে শখ একটা রে ব্যান সানগ্লাস কেনা। আর লেদার জ্যাকেট। পুণের মোমিনপুরা এলাকা। মারাত্মক ঘিঞ্জি। কাজ পেয়ে গেল ফয়জল। চিমা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি। এক বছর...দু বছর...। কেটে গেল এভাবেই তিন বছর। ২২ বছরের ফয়জল কাজ চেঞ্জ করেছে। এখন সে গার্মেন্ট বিজনেস করে। মুম্বই থেকে জামাকাপড় নিয়ে এসে পুণের মার্কেটে সাপ্লাই। কয়েকমাসের মধ্যে রে ব্যান সানগ্লাস কেনা সম্ভব হয়েছে। এবং লেদার জ্যাকেট। ফয়জল ভাইয়ের ভক্ত। তাঁর ফ্যানদের কাছে সলমন খান এই নামেই খ্যাত। ভাইজান। মাল আনতে মুম্বই গেলে বান্দ্রা ব্যান্ডস্ট্যান্ডে ফয়জল মাঝেমাঝে যায় ভাইজানের ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের গেটে। একটু পিছনদিকে হেঁটে গেলে মন্নত। শাহরুখ খানের বাংলো। উলটোদিকে সমুদ্র। হু হু করে বাতাস আসে। সবাই কেমন বসে আছে।

এখানে যদি একদিন নুরকে নিয়ে আসা যেত। একটা শ্বাস ফেলল ফয়জল। নুর তার বাগদত্তা।

আমাদের শাদি কবে হবে?

কেন? সময় হলেই হবে। আরে আমাদের কি সময় চলে যাচ্ছে নাকি? বাড়িতে তো এখন থেকেই দেখাশোনা চলছে। ভয় হয় এই বছরেই যদি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেয়!

চিন্তা নেই। আর একটু জমিয়ে নিই বিজনেসটা। একটা দোকান যদি পেতাম ভালো হয়। ক্যাপিটাল চাই বুঝলে তো?

তুমি সেই চেষ্টা করো? আমার তো মনে হয় না!

মানে? আমি চেষ্টা করি না?

না। করো না। তুমি সন্ধ্যার পর যাদের সঙ্গে গল্প করতে যাও তাদের আমার দেখে ভালো লাগে না। ওখানে এত সময় নষ্ট করলে কীভাবে বিজনেস বাড়বে? আরে তুমি ওসব বুঝবে না।

আর বেশি দেরি হলে কিন্তু আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে ফয়জল। এখনও সময় আছে। কিছু করো।

পুণের পেশওয়ে পার্কের বিকেল। ফয়জল আর নুর এই কথোপকথনের পর কিছুক্ষণ হাত ধরে রইল। চুপ করে। পকেট থেকে একটা রেভলন লিপস্টিক বের করে নুরের হাতে দিয়েছে ফয়জল। ঠিক তখন মোটরবাইকের শব্দ। পার্কের গেটে। জোরে হর্ন দিচ্ছে। সেটা শুনেই ফয়জলের মন চঞ্চল। কারণটা জানে নুর। সেই ছেলেগুলো। ওর বন্ধুরা। এবার ফয়জল উঠে যাবে। অপরাধীর মতো মুখ করে সত্যিই ফয়জল বলে উঠল এবার তাহলে...। নুর বলল, হ্যাঁ, চলো উঠি। তুমি আগে বেরিয়ে যাও। আমি ২ নম্বর গেট দিয়ে বেরোচ্ছি।

সূর্যাস্তের পর তখনও আকাশে আলো আছে। পুণের মোমিনপুরার ঘিঞ্জি গলিগুলোর মধ্যে একটিতে ৪০০ স্কোয়ার ফুটের অফিসঘর। একটি এনজিও। সুহেল মেহমুদ শেখ আর রিজওয়ান দিওয়ারি ফয়জলকে বাইকে চাপিয়ে সেই ঘরে ঢুকল। আগে থেকেই বসে আছে এক অচেনা লোক। এখানে মাস ছয়েক ধরে যাতায়াত করছে ফয়জল। মাঝেমধ্যেই একজন করে অচেনা মানুষ আসে। আর দেশজুড়ে বিভিন্ন এলাকার খবর দেয়। ফয়জল জানতেই পারত না, এই দেশের সব জায়গায় তার কওমের উপর এরকম অত্যাচার চলছে। যেসব ছবি দেখানো হয় তা দেখে রক্ত গরম হয়ে যায়। একদিন কথাটা চাচাকে বলেছিল। রাতের খাবার সময়। চাচা রহমত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিলেন ফয়জলের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এসব তোকে কে বলছে? কাদের থেকে জানছিস? তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে গেল ফয়জল। বন্ধুদের হদিশ আর ওই এনজিও অফিসের খবর বলে দিলে চাচা যদি যেতে না দেয় আর? যদি আব্বুকে নালিশ করে! চাচা বলেছিল, শোন ফয়জল, এরকম অনেক লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। তাদের কাজ হল কোথায় কোথায় মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, কোথায় কোথায় দাঙ্গায় কতজন মারা গেছে এসব গল্প শোনায়। আর নানারকম ছবি দেখায়। আমার অফিসের এক কলিগ সাবধান করেছে আমায়। এরা কিন্তু আসলে আমাদের উস্কানি দিতে আসে। এরকম উস্কানি দেওয়ার লোক হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মেই আছে। এদের চক্করে পড়িস না। লাইফ বরবাদ হয়ে যাবে। ফয়জল চুপ করে সবটা শুনল। তারপর খাবার শেষ করে উঠে গেল, জি চাচা বলে। রহমত নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে ফয়জল তাঁর কথা শুনে মেনে নিয়েছে। এবং ভুল ভেবেছিলেন। আরও বেশি করে ওই গ্রুপে যাতায়াত করছে ফয়জল। ওরা বলেছে, তার মধ্যে একজন সাচ্চা মানুষ আছে। সেই পারে মসিহা হতে কওমের। এসব শুনে ফয়জলের মনে স্বপ্ন তৈরি হয়। দুই ভাইয়ের সামনে তাকে অবজ্ঞা করে সবাই। যেন পড়াশোনা আর ভালো চাকরি করলেই সবাই জীবনে কিছু একটা হয়ে যাবে। ফয়জল যে এভাবে জামাকাপড়ের ব্যবসা করে এটা পরিবারের কেউ পছন্দ করে না সে জানে। তাদের প্রেস্টিজে লাগে, তাও জানে। তার পরিবারের সকলেই চাকরি করে।

আব্বু সৌদি আরবে চলে গিয়েছেন। সেখানে পেট্রল পাম্পের মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্টের হেড তিনি। মাঝেমাঝে দেশে ফেরেন। পরিবার থাকে মুম্বইয়ের মীরা রোডে। শুধু মেজ ছেলে ফয়জল পুণেতে। চাচার কাছে। ফয়জল দেখিয়ে দেবে সবাইকে সে মসিহা হতে পারে।

আজ একটা ভিডিও দেখানো হল। কীভাবে যে মানুষগুলোকে মারছে তা চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না। এই ভিডিও নিয়ে যে লোকটি আজ এসেছে তার নাম আবদুল কুম্ভার। দারুণ কেটে কেটে ধীরে ধীরে কথা বলে। একটি করে ছবি আসছে টিভি স্ক্রিনে, সে বলে যাচ্ছে কীভাবে এই ঘটনা শুরু হল। ইসস..এভাবে মেয়েগুলোকে রেপ করা হচ্ছে! ফয়জলের চোখ যেন জ্বলছে। আর তার দিকে আড়চোখে মাঝেমাঝে তাকাচ্ছে আবদুল কুম্ভার। তার কাজ এরকমই আগুন জ্বালানো, চোখে আর মনে। নিরীহ যুবকদের মধ্যে যাতে প্রতিহিংসা তৈরি হয়। যাতে তাদের জীবনযাত্রার মোড় ঘুরে যায় অন্যদিকে। ঠিক ৪০ মিনিটের ভিডিও। শেষ হয়ে যাওয়ার পর দরজা খুলে দেওয়া হল। ঘরে ছিল সব মিলিয়ে আটজন। এবার চা বলতে গেল আবুভাই। চা খাওয়ার পর প্রথম যে শব্দটা আবদুল কুম্ভার উচ্চারণ করেছিল সেটি হল, ইন্তেকাম! বদলা! ফয়জলের দিকে তাকিয়ে আবদুল বলল, মিয়াঁ ইয়ে সব দেখকে ভি তুম কেয়া চুপ রহোগে? কুছ করনে কা মন নেহি করতা? তুমহারে বারে মে বহোত সুন চুকা হুঁ। ফয়জল চমৎকৃত! তাকে নিয়ে কথা হয়! সে এতই ইমপরট্যান্ট? অথচ তাকে তার পরিবার পাত্তা দেয় না। নুর তাকে বলে এদের সঙ্গে না মিশতে। আসলে তাকে এরাই সবথেকে ভালোভাবে চিনেছে। এই কথাটা যদি একবার নুর শুনত...। ফয়জল উত্তর দিল, আমাদের কিছু করা উচিত। হাসি ফুটল আবদুল কুম্ভারের মুখে। ব্যস! এই তো! তার কাজ হাসিল। এই কাজগুলোর জন্যই সে পেমেন্ট পায় অজানা জায়গা থেকে।

কী করতে হবে? জানতে চাইল ফয়জল। কুম্ভার বলল, খুব সোজা। তোমায় কিছুই করতে হবে না। আমরা সব বলে দেব। বুঝিয়ে দেব। প্যাহেলে ইয়ে বাতাও, পাকিস্তান যাওগে? ফয়জল চমকে উঠল। পাকিস্তান? তোমার লাইফ বনে যাবে ফয়জল মিয়াঁ।

আবদুল কুন্তারের কণ্ঠে জাদু আছে। ২৩ জুন ২০০১। মোমিনপুরার এক সাধারণ যুবক ফয়জল আতাউর রহমান শেখকে দেখা গেল দিল্লির চাণক্যপুরী এলাকার পাকিস্তান হাইকমিশনের বিরাট বাংলোর পিছনের দিকের লাইনে দাঁড়িয়ে। ভিসার জন্য। সঙ্গে আবদুল কুন্তার। আবদুলের বোনের নাম শরিফা। তার বাড়িতেই মাঝেমধ্যে যায় আবদুল। তাই তার পক্ষে ভিসা পাওয়া সমস্যা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ফয়জলের। ভিসা দেওয়া হল না তাকে। কুন্তার ভিসা পেল। সে ফয়জলকে জানাল ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এসব হতেই থাকে। আবদুল কুন্তারের কথাই ঠিক। তিন মাস পর ফয়জলের ভিসার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। কে কলকাঠি নাড়ল? মাত্র তিনমাস আগে যাকে ভিসা দেওয়া হয়নি, সেই তিনমাসের মধ্যেই পাকিস্তান যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল কীভাবে? নির্দেশ এসেছিল লাহোর থেকে। ফয়জলকে দেওয়া হয়েছিল একটি ফোন নম্বর। এই নম্বরে ফোন করবে। বলবে আবু হরকতের সঙ্গে দেখা করব। যে ফোন ধরবে সে দেখবে প্রথমে বলছে 'খলিফা', তারপর অপেক্ষা করবে তোমার উত্তরের জন্য। তুমি বলবে 'সুফিয়ানা'। তোমার সিক্রেট কোড ওটাই। ফয়জল পাকিস্তানের প্লেনে ওঠার আগে বারংবার জপ করছে একটাই শব্দ, যাতে ভুলে না যায়। সুফিয়ানা। ওই শব্দই তার নতুন জীবনে প্রবেশের আসল পাসপোর্ট।

কোথায় যাচ্ছ এতদিনের জন্য?

একটা কাজ আছে জরুরি

বম্বে?

না একটু দিল্লি যাওয়ার দরকার। ওদিকে কিছু বিজনেসের সন্ধান পাচ্ছি। এই তো তিনমাস আগেই গিয়েছিলাম মনে নেই? শাদি করলে তো বিজনেস বাড়াতে হবে, তাই না! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেমন যেন টেনশনে? কী হয়েছে ফয়জল! আমাকে বলবে না!

নুরের দুই হাত নিজের হাতে নিয়ে ফয়জল বলল, কোনো টেনশন নেই ইনশাল্লাহ..এসে বলব অনেক গল্প! তোমার কী চাই বলো। করোলবাগে অনেক দোকান আছে। নুর বিষণ্ন

হাসি হেসে বলল, দেরি কোরো না। নয়তো এসে দেখবে আমি আর তোমার নেই। নিকাহ হয়ে গেছে।

ফয়জল কেঁপে উঠল। সে সত্যিই জানে না কবে ফিরবে। তবু হাসিমুখে বলল, ভালো থেকো তুমি...

আবু হরকা?

নেহি! আপকি তারিফ?

ম্যায় ইন্ডিয়াসে।

আচ্ছা আচ্ছা খলিফা?

হাঁ জি, সুফিয়ানা।

এয়ারপোর্টের টেলিফোন বুথ। ফয়জল লোকটির প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কয়েক সেকেন্ড। তারপরই ওপ্রান্তের ফোন থেকে লোকটির কণ্ঠে উল্লাসের আভাস পাওয়া গেল। এসো এসো। তোমার জন্য জন্য ওয়েট করছি আমরা। একটু দাঁড়াও অ্যারাইভাল লাউঞ্জের বাইরে। হাতে মনে করে একটা লাল রিবন বেঁধে রাখবে ভাই। তোমাকে তো আগেই বলা হয়েছিল। ফয়জল জানে। আগে থেকেই বাঁ হাতে বাঁধা আছে লাল রিবন। সিগন্যাল। পাঁচ মিনিট পর একটা পুরোনো ফোর্ড এসে দাঁড়াল। যে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সেটি একতলা বাড়ি। বাংলো বলা যায়। সামনে অনেকটা লন। তারপর বাড়ি। প্রচুর গাছপালা। ধবধবে সাদা কুর্তা পাজামা পরে এসে ফয়জলকে জড়িয়ে ধরে আবু হরকা নামের লোকটি বলল, একদম ঠিক জায়গায় এসেছ। নিজের বাড়ি বলেই ভাবো একে। আজ বিশ্রাম নাও। কাল সকালে কথা হবে। ফয়জলকে যেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেটি আসলে একটি ডরমিটরি। প্রায় আটটি খাট। তবে আপাতত কেউ নেই। একেবারে শেষ প্রান্তে একটি ছেলে ঘুমাচ্ছে। ওপাশ ফিরে। এই অচেনা ছেলেটির সঙ্গে থাকতে হবে তাকে? ফয়জল ভাবছিল। দরজা বন্ধ করার শব্দ হতেই ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠল। মুখে সন্দেহ। তারপরই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কেটে গেল সেই মনোভাব। ছেলেটি

বলল, কি, নতুন নাকি? আজই? ফয়জল মুখে কোনো কথা বলল না। ছেলেটি উর্দুতে কথা বলছে। তার মানে পাকিস্তানী। কিন্তু ছেলেটি বলল আমি খিদমদ। এর বেশি কিছু না। ফয়জল বলল আমি সুফিয়ানা। এর বেশি কিছু না। এটাই নিয়ম। আসলে ছেলেটির নাম ছিল আবদুল রেজ্জাক। যাকে ফয়জল ভেবেছিল পাকিস্তানী, আসলে সে এসেছে হায়দরাবাদ থেকে। ১৫ দিন আগে। এই যে বাড়িটিতে তারা উঠেছে সেটি মার্কাজ উদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ এর অফিস। যে সংগঠনটি নানারকম সমাজসেবার কাজ করে। এই সংগঠনের নাম কিছু বছর পরই চেঞ্জ হয়ে যাবে। নতুন নামটি হবে দুনিয়া কাঁপানো। জামাত উদ দাওয়া! খিদমদ বলল, তোমার ট্রেনিং কবে? ফয়জল এসব জানে না এখনও। তাকে কিছু বলা হয়নি। খিদমদ ওরফে রেজ্জাকও আর বেশি কিছু ভাঙল না। এখানে অলিখিত নিয়ম হল এক্সট্রা কথা না বলা। কেউ কারও বন্ধু না মনে রাখতে হবে। বলে দেওয়া হয়েছে। সকলেই সকলের অচেনা তোমরা একটা মিশনে এসেছো। ভাই বেরাদরির জায়গা না এটা। কতদিন থাকতে হবে এখানে? ফয়জল জানে না। রাতে চিকেন আর রুমালি রোটি দেওয়া হল। আর বলা হল ঘুমিয়ে পড়তে। সবেমাত্র সাড়ে ৮টা। এখনই ঘুম? আবু হরকা হাসল। যা বলা হচ্ছে করো। তোমার লাভ। রাত সাড়ে ১১টা। আচমকা পিঠে ধাক্কা। জোরে জোরে ঝাঁকাচ্ছে তাকে ওই পাশের বেডের খিদমদ। কী ব্যাপার? কুইক! বেরোতে হবে। কোথায়? ফয়জল ঘুমচোখেই জানতে চায়। খিদমত চাপা স্বরে বলল, আমাকে বলেছ ঠিক আছে। কিন্তু এই প্রশ্নটা কখনও করবে না। কে? কী? কেন? কোথায়? কবে? এই পাঁচটি প্রশ্ন কখনও করতে নেই ব্রাদার এখানে। ফয়জল একসেকেন্ডের জন্য ভাবল ভুল করলাম না তো? কোথায় এসে পড়লাম? বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে মিশে একটি কালো ভ্যান এল। আগে থেকেই চারজন ছিল সেটায়। এবার উঠল রেজ্জাক আর ফয়জল। ভ্যান চলছে অজানা কোনো গন্তব্যে।

জায়গাটা করাচি। টিপু সুলতান রোড। সাড়ে ৬ ফুট লম্বা যে লোকটির পরনে কালো পোশাক তার নাম আরিফ কাসমানি। করাচির নামজাদা কোটিপতি বিজনেসম্যান। শহরে একটা ইজ্জত আছে তার। তার আর একটি পরিচয় সে হল কমান্ডার পদমর্যাদার। আর্মির? হ্যাঁ। তবে প্রাইভেট আর্মি। আর্মির নাম লস্কর ই তৈবা! আসমানি আর আবু

হবকা একসঙ্গে ইন্টারভিউ বোর্ডে। কাদের বাছাই করা হবে সেটা তারাই ঠিক করবে। এভাবে জেহাদে যোগ দিতে সবাই আসতে পারে। তার মানে এই নয় যে সকলেই যোগ্য। যতজন আসে তার থেকে বেশি পালায় কিংবা রিজেক্ট করা হয়। কারণ একটাই। ভয়ংকর কঠিন এক ট্রেনিং। সকলে সেই ট্রেনিং নিতে পারবে না। প্রচণ্ড কষ্টকর। পারবে তুমি? জানতে চায় আরিফ। ফয়জল জানাল পারবে। বহোৎ খুব। চিৎকার করে উঠল আরিফ। আবদুল কুম্ভারের রিক্রুট সবসময় জবরদস্ত হয় সেটা জানে এরা। অতএব সিলেক্ট করা হল ফয়জলকে। রিজেক্ট করতে হলে ফিল্ডেই করা হবে। বড়াসাহিব করবেন! কে বড়া সাহিব? আরও পরে জানতে পারব আমরা।

এই বাংলোটা আরও বড়। একসঙ্গে ১০০র বেশি লোক থাকতে পারে আলাদা আলাদা ঘরে। সেরকমই একটি ঘরে রাখা হল ফয়জল আর রেজ্জাককে। পরদিন থেকে ট্রেনিং। শুধুই ভিডিও দেখা। অসম, গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গাল, ইউপি, বিহার, কেরল, সব জায়গায় কীভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে মুসলিমদের উপর। তার নানারকম ডকুমেন্টারি। সেগুলো কী ভাষায় তা জানা যাচ্ছে না। কারণ প্রত্যেকটা ডকুমেন্টারির সাউন্ড বন্ধ। শুধু ছবি দেখা যায়। ফয়জলের এক মুহূর্তের জন্য চাচার কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, এরকম অনেক ভিডিও দেখানো হয় যা নাকি আসলে ইন্ডিয়ারই না। মায়ানমার কিংবা কম্বোডিয়ার। সেগুলোও দেখানো হয় ইন্ডিয়ার নাম করে। মিথ্যা ভিডিও। যাতে উস্কানি দেওয়া যায়। সেই কারণেই কি সাউন্ড বন্ধ? যাতে ভাষা বোঝা না যায়? ভাবল ফয়জল। কিন্তু এতদূর এসে এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই। এগুলো কেন দেখানো হচ্ছে? মাথায় আগুন জ্বালাতে আর সেই আগুনটা পুষে রেখে দেওয়ার জন্য। যাতে আরও বেশি করে সকলে উদ্বুদ্ধ হয় জেহাদে। ঠিক আটদিন পর আটজনের একটি টিম পৌঁছল মুজফফরাবাদ। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী। জায়গাটার নাম আল আকসা ট্রেনিং ক্যাম্প। চারদিকে বিল্ডিং। মাঝখানে একটা বিরাট মাঠ । আর চতুর্দিকে পাহাড় ঘেরা জঙ্গল। আগাগোড়া হয় বম্বে কিংবা পুণেতে থাকা ফয়জল আর হায়দরাবাদের রেজ্জাকের কাছে এই ঠান্ডা সহ্য হওয়ার কথা নয়। হচ্ছিলও না। তারা থরথর করে কাঁপছে প্রথম থেকেই। কারণ ভোর সাড়ে ৪টেয় উঠতে হবে ট্রেনিং-এ। প্রথমে দৌড় দৌড়। এবং

দৌড়। তারপর শারীরিক কসরৎ ৮টায় ব্রেকফাস্ট। স্নান, বিশ্রাম। লেকচার সেশন। দুপুর ১২টায় লাঞ্চ। একটু বিশ্রামের পর ফায়ারিং প্র্যাকটিস। দিনের শেষেও আবার লেকচার। চারজন লোক আছে যাদের লেকচার দেওয়ার ডিউটি। কারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তার জবাব দেওয়া হয়। কোনো সংশয় থাকলেও তা দূর করা হবে। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে ফয়জলের। একই রুটিন। একটা ফোন করা যাবে না বাড়িতে? না। স্পষ্ট নিষেধ আছে। কারণ কোথা থেকে ফোন করা হচ্ছে তা ধরা পড়ে যাবে যদি ইন্ডিয়ান স্পাই বাহিনী ইন্টারসেপ্ট করে ফোনকল। অতএব সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ১০ দিনের ট্রেনিং-এর পর একাদশতম দিনে ফয়জল আর রেজ্জাকসহ আটজন প্রথম হাতে নিয়ে দেখল একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। একে ফর্টি সেভেন। পাশাপাশি টিটি রিভলবার আর পিস্তল চালানো শেখানোও শুরু হয়েছে। ফয়জল দেখা যাচ্ছে এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট। খুব জলদি ধরে ফেলছে গোটা ব্যাপারটা। প্রশিক্ষকরা খুব খুশি। শেষ তিনদিন বোমা বানানোর কৌশল। ১৫ দিন পর ট্রেনিং শেষ। এবার লাহোর। লস্করের একটি ইভেন্ট আছে। খুব বড় ইভেন্ট। যাওয়ার আগে শেষ লেকচার। সেদিন একটি শপথ নেওয়ানো হল। ফিঁদায়ে হওয়ার। আত্মঘাতী বাহিনী। ফিদায়ে হলে শহিদ হওয়া যায়। আর সোজা বেহেস্ত পৌঁছনো সম্ভব। তাই যারাই এই পথে এসেছে তারা সোজা বেহেস্ত গিয়েছে বলে জানানো হল নতুন রিক্রুট আট যুবককে। সকলকে বিদায় জানানো হচ্ছে। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে সাফল্য কামনা আবার এই টিমের দেখা হবে কোথাও একটা নিশ্চয়ই। সেটা কোথায় তা কেউ জানে না।

লাহোরে লস্কর ই তৈবার অনুষ্ঠানের আয়োজন চোখ ধাঁধানো। তবে একেবারে সামনে যে লোকটি বসে আছে তার দিকেই বারংবার চোখ চলে যাচ্ছে ফয়জলের। সাড়ে ৬ ফুটের মতো লম্বা। দুর্দান্ত শারীরিক কাঠামো। এই যে যারা সবেমাত্র ট্রেনিং নিয়ে এসেছে তাদের বসানো হয়েছে একেবারে সামনের সারিতে। সেটাই নিয়ম। গোটা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আটজনকে ডাকা হল একটি পৃথক রুমে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত সেই সাড়ে ৬ ফুটের মানুষটি। কে লোকটি? তার নাম আজিম চিমা! সকলের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। জড়িয়ে ধরছে। ফয়জলের কাঁধে হাত রেখে প্রশংসার ভঙ্গিতে লোকটা তাকাল ফয়জলের ওয়েল বিল্ট বড়ির দিকে। দু হাত দিয়ে কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আজিম চিমা

বলল, আরও বেশি করে তোমাদের মতো যোদ্ধা চাই আমাদের। আরও বেশি করে এরকম ছেলেদের পাঠাও। তোমাদের গর্ব হচ্ছে না? এখন থেকে তোমরা লস্কর বাহিনীর লোক। দুনিয়ার কাউকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ফয়জল আনন্দে আত্মহারা। লাঞ্চের সময় সে জেনে নিয়েছে আজিম চিমা হল লস্করের কমান্ডার ইন চিফ। বড়াসাহিবের খাস লোক। কিন্তু বড়া সাহিবের সঙ্গে দেখা হবে না? ভাবছিল ফয়জল? রেজ্জাককে একবার বলেও ফেলেছে। রেজ্জাক একই কথা ভেবেছে। সেও জানতে চায় কে সেই বড়াসাহিব? যার কথা উঠলেই আরিফ কাসমানি কিংবা আবু হুরক অথবা আজিম চিমা সকলেই সমীহ অথবা ভয়ে চুপ করে যায়। মুখেচোখে ফুটে ওঠে চাপা সম্ভ্রম। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে চাই একথা বলার নিয়মই নেই। তাই কিছুই বলা হচ্ছে না। এদিকে আর মাত্র দুদিন হাতে। এতদিন থাকা হল, কিছুই তো দেখা হল না সেভাবে। কারণ বাইরে যাওয়ার তেমন নিয়ম নেই। তবে আজ আর কাল দুদিন একটু ছুটি পাওয়া যাবে। লাহোরের মার্কেটে যাওয়া যায় না? একবার অন্তত। অনুমতি মিলল। সঙ্গে দেওয়া হল আকবর নামের একটি যুবককে। হাতে সময় মাত্র তিন ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টায় দেখে নেওয়া যেতে পারে। যাওয়া হল লাহোরের বিখ্যাত লিবার্টি মার্কেটে। একদিকে ফুড পয়েন্ট। ভাইজান আপকো লিবার্টি মার্কেটকা মশহুর সামোসা শপমে পহলে লে যাতে হ্যায়। জানাল আকবর। ফয়জল হেসে উঠল। আরে ভাইয়া আপকো পাতা ভি হ্যায় কি মুম্বইকে চেম্বুরমে সামোসা কেয়া চিজ হ্যায়? খায়েঙ্গে তো ইয়ে সব ভুল যায়েঙ্গে। দুজনেই হেসে উঠল। রেজ্জাক শুধু ফয়জলের হাতে জোরে চাপ দিল। কী ব্যাপার? বিস্মিতভাবে তাকাল ফয়জল। কানের কাছে মুখ এনে রেজ্জাক বলছে ভাই, ইন্ডিয়ার কোনো চিজের প্রশংসা এদের কাছে কোরো না। যদি ফিরে গিয়ে বলে দেয় তাহলে আমাদের মুশকিল হয়ে যাবে। ফয়জল সতর্ক হয়ে গেল। তাই তো! সে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে। তার মানে তো সে লাহোরের সামোসার থেকে মুম্বইয়ের সামোসাকে বেশি ভালো বলে ফেলে ভারতপ্রেম দেখাচ্ছে? এটা হতে দেওয়া যাবে না। অবশেষে অনেক দরদাম করে শালওয়ার কামিজ কিনে নিলে নুরের জন্য। গোলাপি। ভালো লাগবে নুরকে এই কালারে।

ফেরার দিন সকলকে বিদায় জানাতে এসেছে আজিম চিমা। ফয়জলের হাতে কিছু বাসন, একটা জামাকাপড় ভর্তি বেডিং আর একতাড়া ইন্ডিয়ান নোট তুলে দিয়ে আরিফ কাসমানি দুটি ভিজিটিং কার্ড দিল। একটি ভিজিটিং কার্ডে দিল্লির চাঁদনি চকের দোকানের নাম ঠিকানা লেখা। আর অন্যটিতে মুম্বইয়ের আন্ধেরির ঠিকানা। নাও। এগুলো নিয়ে সোজা ওয়াঘা বর্ডার পেরোবে। আর অমৃতসর থেকে দিল্লির ট্রেন ধরে দিল্লি নামবে। এই কার্ডে যে ঠিকানা লেখা আছে সেটি সেখানে গিয়ে দেখাবে। সকলের থেকে বিদায় নিয়ে ফয়জল ফিরে গেল ইন্ডিয়া। দরিয়াগঞ্জের হোটেলে উঠে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালেই চাঁদনি চক। সেই দোকান। আর কার্ডটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি তাকে কিছুক্ষণ জরিপ করল। তারপর কোনো কথা না বলে একটা সাদা প্যাকেট দিয়ে দিল ফয়জলের হাতে। মুখে কোনো কথা নেই। শুধু খুদা হাফিজ! বাইরে এসে প্যাকেট খুলে ফয়জল আশ্চর্য! ২০ হাজার টাকার একঝাঁক কড়কড়ে নোট। টাকা রোজগার এত সহজ? শুধু লস্করের খাতায় নাম লেখালেই? কিন্তু অপারেশন কবে করা হবে? এখনও জানে না সে।

এতদিন কোথায় ছিলে?

তোমাকে তো বলেছি নুর! দিল্লিতে কাজ।

তাই বলে এত দিন?

আরে, অনেক কাজ একেবারে মিটিয়ে দিয়ে এলাম। যাতে এর মধ্যে আর যাওয়ার দরকার না হয়।

কী কাজ ওখানে?

কী কাজ আবার কী? আমার যা বিজনেস। কাপড়ের সাপ্লাই। ওটা যে কত বড় একটা মার্কেট তা তোমার জানা নেই নুর। শাদির পর একবার দিল্লিতে বেড়াতে নিয়ে যাব তোমাকে দেখো!

নুরের চোখে জল! সে কাঁদছে। কেন যেন তার মনে হচ্ছে ফয়জল আগের মতো নেই। কেমন যেন বেশি বেশি শান্ত ভাব। কেন? ফয়জল, সত্যিই কি আমাদের শাদি হবে? কবে?

ফয়জল নুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, হবে। একটা বড় অর্ডারের জন্য আমাকে হয়তো বাইরে যেতে হবে। ফিরে এসেই ভাবছি শাদি করে নেব।

সত্যি? নুরের চোখে আলো জ্বলে উঠেছে।

সত্যি। বলে ফয়জল নুরের হাতে হাত রাখল।

দিল্লির চাঁদনি চকের দোকানে যাওয়ার একমাস পর যেতে হবে মুম্বইয়ের সেই আন্ধেরির দোকানে। তাই গেল ফয়জল। এবং আশ্চর্য ম্যাজিক এই ভিজিটিং কার্ড। দেখালেই টাকা পাওয়া যায়। এবার কার্ড দেখিয়েই পাওয়া গেল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তবে এই লাস্ট ইনস্টলমেন্ট। এ বছরের মতো। কিন্তু কাজ হবে কবে? এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। একদিন তাকে জানাল সেই আবদুল কুন্তার। মোমিনপুরার গলিতে সেই এনজিও অফিস। আবার এসেছে লোকটি। ফয়জলকে বুঝিয়ে দেওয়া হল কী করতে হবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের লেকচার সিরিজে যা কিছু শেখানো হয়েছে সেগুলি বিশ্বসযোগ্যভাবে সুন্দরভাবে বোঝানোর কাজ। তাই কখনও ফয়জলকে যেতে হচ্ছে নাসিক, কখনও মালেগাঁও, কখনও রায়গড়, কখনও বারামতী। ছোট ছোট রুমে মিটিং হয়। সেখানেই ভিডিও চালিয়ে বলতে হয় হুবহু সেইসব কথা, যা একদিন সে শুনেছে ক্যাম্পে। আরও নতুন ছেলেদের মনে জ্বলে উঠছে আগুন। চোখে জিহাদের স্বপ্ন। ২০০৫ সাল পর্যন্ত এভাবেই কাটছে। শুধু বছরে দুবার তাকে দেওয়া হয় টাকা। আর নিজের ব্যবসা তো আছেই। ২০০৫ সালের জুন। আবার পাকিস্তান যাওয়ার ডাক এল। এবারও লাহোর। ভিসা পাওয়া কোনো প্রবলেম না। যথারীতি পেয়ে গেল ফয়জল। গোটা দেশের থেকে বাছাই করা ৫০ জন যুবককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আলাপ করানো হবে নতুন কিছু লোকের সঙ্গে। এই লোকগুলো ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন নামের একটা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। দ্বারভাঙা মডিউল তৈরি হবে। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের হুজিকে নিয়ে একটি সামগ্রিক টিমগেম যাতে করা যায় সেটাই হল উদ্দেশ্য। এই নতুন মডিউলে লোক লাগবে। তাই এই ৫০ জন এতদিন যাদের মগজ ধোলাই করেছে তাদের যেন এই মডিউলগুলিতে ঢুকিয়ে দেয়। ওই নতুন ছেলেরা হবে স্লিপার সেল। কাল চলে যাবে আবার ফয়জল ভারতে। দুপুর থেকেই একটা

সাজো সাজো রব চলছে দেখা যাচ্ছে। কী ব্যাপার? কোনো প্রোগ্রাম আছে নাকি? আজিম চিমাও হাজির সকাল থেকেই। সকলেই তটস্থ। বাংলোর মাঝখানে একটা বড় প্রাঙ্গণ। সেখানেই ফরাস, চেয়ার পাতা হয়েছে। কোনো নতুন ইভেন্ট? মাগরিব নমাজের পরই সকলকে ডাকা হল সেই প্রাঙ্গণে। বাইরে যেন এখন কেউ না যায়। কারণ সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। সকলের চোখেমুখে প্রতীক্ষা আর কৌতূহল যে আজ কী এমন বিশেষ প্রোগ্রাম? ঠিক সাড়ে ৬টা নাগাদ একটা মৃদু গুঞ্জন। সাদা পাজামা। সাদা পাঞ্জাবি। কাঁধে একটা চাদর। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। দাড়ি আছে। চুল পাতলা হয়ে আসছে। মাথাতেও সাদা একটা পাগড়ি টাইপ পেঁচানো। আজিম চিমার সামনে লোকটি আসছে। যতক্ষণ না সে নিজের চেয়ারে বসেছে ততক্ষণ কেউ বসছে না। সকলে উঠে দাঁড়িয়েছে আগেই। দেখাদেখি ফয়জলও উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটি বসেই সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলল, ভাইসব আপনারা সকলেই খুব ভালো কাজ করছেন। এভাবেই কাজ করতে হবে। মনে রাখবেন আমাদের একটাই টার্গেট ইন্ডিয়ার বরবাদি! সেটা আমরা করতে পেরেছি অনেকটাই। আরও এগোচ্ছি। মিনিট দশেকের এক ছোট ভাষণ দিল লোকটি। তারপর এগিয়ে এসে সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে হাত জড়িয়ে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাল। ফয়জলকে দেখিয়ে আজিম চিমা বলল, এই যে এর কথা বলেছিলাম। একে দিয়ে হবে ওই কাজটা। থমকে গেল লোকটি। ফয়জলকে বলল আমার সঙ্গে এসো। ঠিক পাশের একটি ছোট ঘর। সেখানে তিনজন। ফয়জল, আজিম চিমা আর সেই লোকটি। লোকটি এক দৃষ্টিতে ফয়জলের দিকে তাকিয়ে বলল, শোনো ভাই এতদিন পর তোমার একটা কাজ করার সময় এসেছে। তোমার জন্য আমরা করেছি একটা বিগ প্ল্যান! ইন্ডিয়ার জন্যও এটা একটা বিগ প্ল্যান। এই কাজ তোমাকে নির্ভুলভাবে করতে হবে। কাজটা মুম্বইতে। তবে তার আগে আর একটা জায়গায় তোমায় যেতে হবে। চিমা বাতা দো উসকো। বলে বেরিয়ে গেল লোকটি। ফয়জল হতচকিত। সে বুঝতে পারছে না। লোকটি কে? কী তার প্ল্যান? চিমা ধীরে সুস্থে বলল, এই হল আমাদের বড়াসাহিব। নাম হাফিজ সইদ!!

এই নাও। এখানে যাবে তুমি। বলে একটা খাম হাতে ধরিয়ে দিয়েছে চিমা। সবাই চলে যাওয়ার পর ফয়জল ডরমিটরিতে এসে খামটা খুলেছে। আশ্চর্য! একটা ট্রেনের টিকিট! মুম্বই সেন্ট্রাল থেকে হাওড়া! সঙ্গে একটা ঠিকানা...জায়গাটার নাম স্বরূপনগর। কলকাতা যেতে হবে? কেন?

কিছু একটা ভুল হচ্ছে। এটা আবার কার নামে টিকিট কাটা? মুম্বই থেকে হাওড়া গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের টিকিটে যাত্রীর নাম লেখা সমীর শর্মা। ফয়জল আগে খেয়াল করেনি। অথচ তাকে যেতে বলা হয়েছে। তার নাম তো ফয়জল আত উর রহমান শেখ। তাহলে এই টিকিট কার? এখন তো চেঞ্জ করতে ফেরাও যাবে না আবার লাহোর! অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে! একটু পরই আটারি স্টেশনে ঢুকবে ট্রেন। তারপর দিল্লি। যে কোনো সময় ইন্টারন্যাশনাল ফোন করাও যাবে না। তাহলে উপায়? এরকম বাজে টাইপের ভুলও এরকম একটা নামজাদা গ্রুপ করে নাকি? চূড়ান্ত ক্যালাস ব্যাপার স্যাপার। ফয়জল বিরক্ত হল মনে মনে। এখন কী করবে সে? সেই বিরক্তি চেপেই পুণেতে ফিরে এল। পরদিন সকাল। তখনও ঘুম ভাঙেনি। মোটরবাইকের হর্ন। বারবার। কেউ ডাকতে এসেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখা গেল রিজওয়ান। কী ব্যাপার? আবদুল ভাই আজ বিকেলে আসবে। তোমাকে যেতে বলেছে। জরুরি। বলেই বাইকে স্টার্ট। বিকেলে মোমিনপুরার সরু গলির অফিসে গিয়ে দেখা গেল আগে থেকেই বসে আছে সেখানে আবদুল কুম্ভার। তাকে দেখেই হাসল। আর বলল আরে আও মেরে শের। এই নাও তোমার আইডি। আইডি? কীসের? আবার অবাক ফয়জল। একটা ফোটো আইডি কার্ড। তার তো আছে। ভোটার কার্ড। এটা আবার কেন? সেই নতুন ভোটার কার্ডে চোখ পড়তে চমকে উঠল ফয়জল। তার ছবি। অথচ নামের জায়গায় লেখা আছে সমীর শর্মা। ঠিকানা বান্দ্রা, মুম্বই। এটা কী ব্যাপার হল? আবদুল কুম্ভার বলল, তোমাকে চিমা ভাই কলকাতার যে টিকিট দিয়েছে সেখানে কী নাম আছে? ফয়জল বলল, সমীর কিন্তু সে তো বুঝলাম। এসবের মানে কী তা বুঝছি না। আবদুল কুম্ভার ফয়জলের কাঁধে হাত রেখে বলল, তোমায় এখান থেকে চলে যেতে হবে। মুম্বই। সেখানেই থাকবে। আর তোমার নতুন নাম হবে সমীর শর্মা। বাকি কাজ মুম্বই গেলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা ভাইজান...ফয়জল উজ্জ্বল মুখে বলল। কারণ তার

মনে হচ্ছে জীবনে এতদিন পর একটা দারুণ কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে চলেছে। মুম্বই..কতদিনের শখ ওই শহরে একা থাকার। তুমি চলে যাবে?

চলে যাব আবার কী? প্রতি সপ্তাহেই তো আসব। ওখানে কাজটা অনেক বড়। তার মানে যখন তখন আর দেখা হবে না, তাই না?

আরে এত চিন্তা করছ কেন? আমাদের আসল চিন্তা কোনটা? যত তাড়াতাড়ি একটা বড় বিজনেস করে ফেলা তাই তো? তারপর শাদি!

নুর মুখ নামিয়ে আছে। এই কথার উত্তর দিল না।

ফয়জল বলছে, এরকম করলে কিন্তু আমি এখানেই থেকে যাব। আর ওরকমই দোকানে দোকানে মাল সাপ্লাইয়ের কাজ। তোমার আব্বু শাদি দেবেই না এরকম ছেলের সঙ্গে। তাই না?

নুর এবার মুখ তুলছে। হ্যাঁ। এটা ঠিক। যাক, যেখানেই হোক যাক ফয়জল। অন্তত আয় করুক ভালোভাবে। তাহলে আর চিন্তা নেই। শাদিতে না করতে পারবে না আব্বু। ভাবছিল নুর। মুখে হাসি এনে বলল, একটা কথা। প্রতি শনিবার কিন্তু আসতে হবে।

ফয়জলের একটা ভার নেমে গেল বুক থেকে। হাসতে হাসতে বলল, তুমি না চাইলেও আসব। এই মুখটা দেখতে হবে না? নুর ভালো লাগা আর লজ্জায় একটু কেঁপে উঠল।

বান্দ্রার কার্টার রোডের কাছাকাছি একটা ছোট ঘর নিয়ে ফয়জল থাকতে শুরু করেছে। জায়গাটার নাম পেরি ক্রস রোড। লাকি ভিলা। এখানে তার নাম ফয়জল নয়। সমীর। সমীর শর্মা। একমাস পর ট্রেন। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। এসি থ্রি টায়ার। বি থ্রি ৩৪। বার্থ নম্বর। ঠিক আগের দিন আবার রিজওয়ান এসেছিল। বলে দিয়েছে হাওড়া স্টেশনে থাকবে একজন লোক। সেই লোকটিকে এটা দিয়ে দিও। সেটি একটা সাদা খাম। ভিতরে লেখা আসলাম, লড়কে কো দেখলে না। আর কিছু না। হাওড়া স্টেশনে নেমে যে কোনো কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে বড় ঘড়িটা কোথায়। সেইমতোই যথারীতি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল ফয়জল। সাড়ে পাঁচ ফুটেরও কম হাইটের একটা লোক দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে হাত

নাড়ছে। দেখা হতেই একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলানোর পরই সাদা খাম তাকে দিল ফয়জল। একটি লাইন অনেকক্ষণ সময় লাগল পড়তে। কিন্তু সেই লাইনটা নয়, খামের একেবারে প্রান্তে একটা স্ট্যাম্প ভালো করে চোখের কাছে এনে পড়ছিল লোকটা। আর তারপরই হাসি ফুটল মুখে। কীসের স্ট্যাম্প? খেয়াল করেনি ফয়জল। তার মানে ওটাই কোড ছিল। লোকটির নাম আসলাম। হাওড়া স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে শিয়ালদহ স্টেশন। সেখান থেকে লোকাল ট্রেন। লোকাল ট্রেন মুম্বইতেই বেশি চলে এরকমই জানা ছিল ফয়জলের। কিন্তু বাংলায়ও যে চলে আর এত ভিড় হয় জানত না। ট্রেনের নাম হাসনাবাদ প্যাসেঞ্জার। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর একটা জায়গায় নামা হল। এখান থেকে যেতে হবে ট্রেকারে। ততক্ষণে সাইনবোর্ডে দেখা হয়ে গিয়েছে জায়গার নাম। তাহলে এটাই স্বরূপনগর? এই ঠিকানাই দেওয়া হয়েছিল। আসলামের বাড়িতে উঠেছে ফয়জল। বাড়িতে অবশ্য একটি কিশোর ছাড়া কেউ নেই। বাড়ির কাজ করে দেয়। আসলামের আসল বাড়ি অন্য জায়গায়। হিঙ্গলগঞ্জ। আজ বিকেলে দুজন আসবে। অতএব অপেক্ষা। ফিটফাট পোশাক। মুখ ক্লিন শেভ। বয়স ৩৫ এর মধ্যেই দুজনের। এরা এসেছে বর্ডার পেরিয়ে। হুজি মেম্বার। একটা ২০ মিনিটের মিটিং হল। এই দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন যাবে মুম্বই। তার আগে ফয়জলের সঙ্গে মোলাকাত হওয়া দরকার। যাতে চিনতে অসুবিধা না হয়। তাকে বলা হল অপারেশনের পর এই পথেই ফয়জলকে বাংলাদেশে ঢুকে যেতে হবে। তাই গোটা যাত্রাপথ আর বর্ডারের চেইনটা তার জেনে নেওয়া দরকার। কী অপারেশন? এখনও সেটা ফয়জলই জানে না। অথচ এরা জানে। ঘোজাডাঙা সীমান্ত থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে একটা ধানকলের সামনে আসা হল। হাতবদল হল একটা ব্যাগ। ওই লোকদুটি সঙ্গে করে এনেছিল। তারপর একটা মোটরবাইক এসে দাঁড়ানোর পর তারা সেই বাইকে চেপে বসে চলে গেল কোথাও একটা। ব্যাগ এখন খোলা যাবে না। আজ রাতের ট্রেন। মুম্বই ফেরার। এবার মুম্বই মেল। ফিরে এল ফয়জল সেই ব্যাগটি হাতে নিয়ে। ব্যাগে ছিল তিনটি প্যাকেট। জিলেটিন স্টিক। দুটি সস্তা মোবাইল ফোন। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। ছোট প্যাকেটে সামান্য আরডিএক্স। আর চারপাতার কাগজ। সেখানে লেখা আছে একটু ডিজেল লাগবে। তাহলে কমপ্লিট। কীভাবে কোন কোন

জিনিস কতটা পরিমাণ মেশাতে হবে সব ওই কাগজে লেখা। তবে এটা ডেমো। আসল জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। পাঠানো হবে যথাসময়ে। বান্দ্রার অভিজাত লোকালিটি পেরি ক্রস রোডের লাকি ভিলায় পুণের মোমিনপুরার এক গলি থেকে আসা একটি ২৪ বছরের ছেলে গভীর নিমগ্নতায় ঢুকে পড়ল বিস্ফোরক তৈরি শিখতে। ফরমুলাটি মুখস্ত করাই তার ডিউটি। আর সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে একটা টেস্ট করতে হবে। তার জন্য যাওয়া হয়েছিল লোনাভালায়। এসব ব্যাপারে ফয়জল ভালো ছাত্র। টেস্ট সফল। কেঁপে উঠেছিল লোনাভালা যাওয়ার পথের থেকে দূরে এক আধা জংলি এলাকা। বিস্ফোরণে। সেটা তো রিহারসাল ছিল! ফাইনাল টার্গেট তাহলে কী?

টাইম আ গয়া। তৈয়ার হো যাও। বলল যে ছেলেটি সেই চোখেমুখে সবথেকে শার্প। নাম আসিফ বশির খান ওরফে জুনেইদ। স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার (সিমি) জলগাঁও ইউনিটের এক্স প্রেসিডেন্ট। প্রাক্তন। কারণ ততদিনে সিমিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আসিফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ৯০ হাজার টাকা মাসের বেতন। তার পাশেই বসা লোকটির নাম ইতজিয়াম সিদ্দিকি। সকলে তার নাম দিয়েছে আরটিআই ম্যান। সরকারের যাবতীয় তথ্য জানার জন্য সিদ্দিকির শখ হল নিরন্তর আরটিআই অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করা। সিদ্দিকির পিছনে তনভির আনসারি। ইউনানি ডাক্তার। এম এইচ সাবু সিদ্দিকি মেটারনিটি অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের ইউনানি বিভাগের হেড। ২০০৪ সালে পাকিস্তানের ট্রেনিং ক্যাম্পে সে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। চতুর্থ লোকটির পরিচয় সুহেল মহম্মদ শেখ। পুণের। যাকে আমরা আগেই দেখেছি ফয়জলের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছে আর মুখচোখে কিছুটা ভয় লেগে। সে হল জামির লতিফুর রহমান শেখ। এসবের মধ্যেই একেবারে পিছনে জড়সড় হয়ে সবথেকে কম বয়সি এক তরুণ। মাঝেমাঝেই যে ফয়জলের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। মুজাম্মেল। ফয়জলের নিজের ছোট ভাই।

বান্দ্রা, ২০০৬, এপ্রিল। ৬ জন বসে আছে ফয়জলের ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরে। জরুরি মিটিং। ওই আসিফ ডেকেছে। বিষয় কী? এখনও কেউ জানে না। আসিফ প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল। টাইম আ গয়া..তৈয়ার হো যাও। আমাদের একটাই টার্গেট। ম্যাক্সিমাম

ড্যামেজ। কীভাবে সেটা সম্ভব সেরকম কোনো টার্গেট খোঁজা হোক। তোমরা সকলেই ভাবতে শুরু করো। আসিফের কথা শুনে সকলেই উত্তেজিত। সকলেই একটি একটি করে নাম বলতে শুরু করল। কেউ বলল সিনেমা হল...কেউ বলল সরকারি ভবন...কেউ বলল শপিং কমপ্লেক্স। তবে কোন এলাকায় করা হবে? স্বাভাবিকভাবেই এই খেলার নিয়ম হল যতটা বেশি সম্ভব অভিঘাত পড়বে আর প্রচার হবে। সেদিক থেকে কোনো গ্রাম কিংবা মফস্বলে হলে অতটা প্রচার হয় না। অতএব নিশ্চিতভাবেই মুম্বই শহরে করতে হবে। ঠিক যেমন ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ হয়েছিল। এবার হবে দ্বিতীয় ব্লাস্ট। নাম উঠল দালাল স্ট্রিটের বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, কাফে প্যারেডে ডব্লু টি সি বিল্ডিং, প্রভাদেবীতে সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির, হাজি আলির কাছে মহালক্ষ্মী টেম্পল। আর এই তালিকা তৈরির পাশাপাশি লেখা হল দুটি সবথেকে বড় শপিং আর্কেডের নাম। লোয়ার প্যারেলের হাই স্ট্রিট ফিনিক্স আর গোরেগাঁওতে ইনঅরবিট মল। এই সব জায়গাগুলো সবথেকে ভালো চিনবে একজনই। জামির। কারণ সে ট্যাক্সি ড্রাইভার। তার সঙ্গে ফয়জল আর সুহেল যাবে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে। তারপর ঠিক হবে কীভাবে এবং কবে অপারেশন। তার আগে প্ল্যান চক আউট করে পাঠাতে হবে লাহোর। সেখান থেকে সবুজ সংকেত এলেই প্রস্তুতি শুরু। মোটামুটি আলোচনা যখন শেষের পথে, আচমকা ফয়জলের ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা পড়ল। একবার...দুবার...তিনবার। কেউ যেন বেশি অধৈর্য। কে এই সময়? এখানে কেউই বিশেষ আসা-যাওয়া করে না। কারণ ফয়জল এখানে সেভাবে মেশে না। সকলেই সতর্ক। এক লাফে আসিফ আর সিদ্দিকি চলে গেল বাথরুম আর কিচেনে। ফয়জল দ্বিধা নিয়ে উঠল। দরজাটা অর্ধেক খুলে মুখ বাড়াল এবং স্বস্তির শ্বাস। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মহম্মদ আলম কুরেশি। মুম্বই আসার পর এই একমাত্র ফয়জলের বেস্ট ফ্রেন্ড। মীরা রোডের জামাকাপড়ের খুচরো ব্যবসা। ফয়জল এর সঙ্গেই জামাকাপড় কিনে নিয়ে যেত পুণে। এখনও যায়। তাদের দুজনের একটাই শখ। চেম্বুরের ডিসকভারি ডান্স বারে মাঝেমাঝে সন্ধ্যার পর যাওয়া। ওখানে তন্দুরি চিকেন ফার্স্ট ক্লাস। আর সোনম নামের এক ডান্সারের নাচ দেখতে খুব ভালো লাগে। সুতরাং কুরেশিকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। জানাল ফয়জল। সকলেই আশ্বস্ত। তবু আসিফ সন্দেহপ্রবণ। বাইরের কাউকে সে বিশ্বাস করে না।

সে তাই গোটা মিটিং-এর পর টেবিলে হাত রেখে সকলকে বলল আল্লাহর নামে হাতে হাত রাখো, আর শপথ নাও আজ এখানে যা আলোচনা হয়েছে তা বাইরের কাউকে কখনও বলব না...আজ যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা জান কবুল করেও শেষ করেই ছাড়ব। সকলেই গোল হয়ে দাঁড়াল। হাত রাখল একে অন্যের হাতে। একজন বাদে। সদ্য আগত কুরেশি। সে জানাল আমি তো জানিই না কী আলোচনা হয়েছে, তোমরা কী করার কথা বলছ.. আমি কেন আল্লাহর নামে শপথ করতে যাব? আমি নেই। আসিফ শীতল চোখে তাকিয়ে রইল কুরেশির দিকে। কুরেশিও।

পরদিন সকাল। প্রথমেই যাওয়া হল দালাল স্ট্রিট। বিএসই। স্টক এক্সচেঞ্জ। অসম্ভব। সেই ১৯৯৩ সালের ব্লাস্টের পর এতদিন পরও গোটা স্টক এক্সচেঞ্জ গিজগিজ করছে সিকিউরিটি। এখানে ট্রাই করা মানে আত্মহত্যা। সুতরাং ক্যান্সেল। এরপর ডব্লিটিসি বিল্ডিং। সপুরজি পালানজির এই বিপুল উচ্চতার ভবনটি একটা সময় পর্যন্ত ছিল গোটা বম্বের সর্বোচ্চ। পরে অবশ্য সেই সম্মান আর থাকেনি। কিন্তু না। এখানেও ভয়ংকর কড়াকড়ি। নিরাপত্তা টপকানো যাবে না। এভাবে একের পর এক টার্গেট বাতিল হচ্ছে। আর ফয়জলদের মধ্যে ঢুকছে হতাশা। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রভাদেবীর সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের ভিড় ছিল সাধারণ। সেভাবে বিপুল ভক্তের চাপে মন্দিরে সর্বক্ষণ ভিড় এমন কিছু ছিল না। গোটা চিত্রটা বদলে গেল এক সুপারস্টার ১৯৮৩ সালে 'কুলি' নামের সিনেমার শুটিং চলাকালীন আশঙ্কাজনকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর। অমিতাভ বচ্চনের দ্রুত আরোগ্য কামনায় সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে নিয়মিত আসতে শুরু করেন জয়া বচ্চন। তিনি আকুল হয়ে প্রার্থনা করতেন। এবং অবশেষে যখন সত্যিই অমিতাভ বচ্চন সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন, তিনি সপরিবারে সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে এসে গণপতির মূর্তিতে একটি আস্ত সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই এই মন্দিরের খ্যাতি আকাশ ছুঁতে শুরু করে। এবং মুম্বইয়ের একটি অলিখিত নিয়মই হয়ে যায় ধনী দরিদ্র যাই হোক, কোনো শুভ কার্যের আগে ও পরে এই মন্দিরে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন সকলেই। এবং পাল্লা দিয়ে বেড়ে গেল জনপ্রিয়তা সিদ্ধি বিনায়ক টেম্পলের। ২০০৫ সালের মধ্যে মন্দিরের ট্রাস্টির পক্ষ থেকে সাড়ে ৫ কোটি টাকা খরচ করে অত্যাধুনিক

ক্লোজ সার্কিট টিভি, ডোর ফ্রেম মেটাল ডিটেক্টর লাগানো হয়। আর তার সঙ্গেই মুম্বই পুলিশের বিশেষ সিকিউরিটি কর্ডন। সুতরাং এখানেও বিস্ফোরক নিয়ে এসে সেটাকে ফিট করার কথা চিন্তা করাই বাতুলতা। তাহলে? হতাশ গোটা টিম। নতুন করে ভাবতে হবে কী করা যায়। সারাদিন ঘোরাঘুরি। সেভাবে খাওয়াই হয়নি উত্তেজনায়। অতএব জামিরকে বলা হল, চলো বান্দ্রা। আগামীকাল আবার বেরব। ভেবে দেখতে হবে নতুন কিছু টার্গেটের কথা। আগে থেকেই কথা হয়ে রয়েছে সন্ধ্যায় বান্দ্রা স্টেশনে সকলে চলে আসবে। মিট করা হবে আজকের রিভিউ নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে চলে এসেছে। বান্দ্রা স্টেশনের ফাঁকা ডাউন প্ল্যাটফর্মে বসে। সিদ্দিকি একটা সিগারেট ধরাল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সতর্ক করল জামির। ভাইজান আজকাল পুলিশ ধরে স্টেশনে সিগারেট খেলে। সিদ্দিকি অগ্রাহ্য করল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে। ধুস! কোথায় পুলিশ এখন? কাউকে দেখতে পাচ্ছো। ছাড়ো তো! সকলে কমবেশি হেসে উঠল। হাসল না আসিফ। তার চোখে আলো জ্বলে উঠল। তাই তো! পাগলের মতো অন্য টার্গেট খুঁজতে হবে কেন? এই তো আসল টার্গেট চোখের সামনে। কোনো সিকিউরিটিই নেই। এখানেই তো পারফেক্টলি কাজ করা যায়! মুম্বই লোকাল ট্রেনের ওয়েস্টার্ন, সেন্ট্রাল আর হারবার রুট! এর থেকে ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ আর কী হবে? আসিফ প্ল্যান বলতেই সকলেই লাফিয়ে উঠল। দুর্দান্ত আইডিয়া! সুতরাং ট্রেন ব্লাস্ট হোক!

ম্যায় আপনে দশ বড়া আদমি অউর আরডিএক্স দোনো ভেজ রাহা হুঁ। এই মেসেজ পেল ফয়জল। পাকিস্তান থেকে। তার মানে এখানে তারা যে ৬ জন আছে তাদের উপর পুরোপুরি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না? পাকিস্তান থেকে লোক আসবে? আর তাদের বলা হচ্ছে বড়া আদমি? মানে এখানে তারা যারা আছে তারা ছোটা? ফয়জলের একটু রাগ হল। কিন্তু চিমা ভাই নিশ্চয়ই বুঝেশুনে ডিসিশন নিয়েছে। পরের নির্দেশের জন্য অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। চারজন আসবে আগে। তারপর বাকিরা। মুম্বই সেন্ট্রাল স্টেশনে সকাল ১১টা। হায়দরাবাদের ট্রেন থেকে যে নেমেই হাত নাড়াল তাকে দেখে চমকে উঠল ফয়জল। এ তো সেই ছেলেটা! যার সঙ্গে ট্রেনিং এ দেখা হয়েছিল। সেই যে কোড নেম খিদমদ! অর্থাৎ সেই রেজ্জাক। লস্করের প্ল্যান তাহলে মারাত্মক ক্যালকুলেটিভ! রেজ্জাকের

সঙ্গে আরও দুজন। সেলিম আর আবু উমেদ। দ্বিতীয় টিমটি এল বাংলাদেশ রুটে। তাদের মধ্যে আবার একটি লোকের নাম কামাল আনসারি। সে পাকিস্তানী নয়। বিহারের মধুবনীর। নেপালে তার নেটওয়ার্ক দুর্দান্ত। তাই তাকে দলে নেওয়া হয়েছে। কারণ আরডিএক্স প্রথমে পাঠানো হয়েছে নেপালে। কাঠমান্ডু থেকে এই কামাল নিয়ে এসেছে আরডিএক্স। হাফ কেজি। এই পাকিস্তানীদের কোথায় রাখা হবে? যোগেশ্বরীর পানের দোকানি সাজিদের বাড়িতে। বাড়ি মীরা রোড। আবাসনের নাম পরভীন অ্যাপার্টমেন্ট। এই পাকিস্তানীরা কোথা থেকে এসেছিল? বাংলাদেশ থেকে। রুট কী? দুজন এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ হয়ে। আর তিনজন বসিরহাট হয়ে। তাদের আনার দায়িত্বে ছিল সেই আসলাম। আর গোটা অপারেশনের নেপথ্যে মধ্য কলকাতার এক জুতোর দোকানের মালিক। মহম্মদ মাজিদ শফি। ভারতের যে কোনো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা বাংলাদেশ বর্ডার পেরিয়ে ওপারে চলে যায়। আর সেই ব্যবস্থা করে দেয় এই শফি। ফয়জল যখন স্বরূপনগরে এসেছিল তখনও আসলামের মাধ্যমে যাবতীয় নেটওয়ার্ক ঠিক করে দিয়েছিল এই ব্যবসায়ী। যাকে বাইরে থেকে দেখে কখনও কেউ বুঝতেই পারেনি। সে ছিল নিছক এক কলকাতার জুতোর দোকানি।

৮ জুলাই। গোবান্দি বাই লেন। মহম্মদ আলির স্টোররুম। আটটি ব্যাগ রাখা আছে। রেক্সিনের। সাতদিন আগে আসিফ ডেলিভারি দিয়েছে। ব্যাগগুলির মধ্যে আছে, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ডিটোনেটর, মোবাইল ফোন, ঘড়ি। সুহেল আর ফয়জল একসঙ্গে বসে আরডিএক্স আর ডিজেল মিক্স করল। সার্কিট আর তার লাগাল সাজিদ। সব কাজ হল না। পরদিনও কেটে গেল। আটটা রেক্সিন ব্যাগ ভর্তি আরডিএক্স এবার রেডি। সব ব্যাগগুলো নিয়ে যাওয়া হল ফয়জলের বাড়িতে। ১১ জুলাই। ঠিক দুপুর আড়াইটের সময় সকলে এসে গেল ফয়জলের ফ্ল্যাটে। সকলকে আগে থেকেই লাহোর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, কেউ নিজেদের মোবাইল ফোন ক্যারি না করে। তাই সকলেই যে যার আস্তানায় রেখে এসেছে। পাকিস্তানীদের কাছে কোনো ফোন ছিল না। পাকিস্তানী যুবক আম্মু জান সবার আগে দুটো ব্যাগ তুলে নিল হাতে। খুদা হাফিজ! বলে বেরিয়ে গেল সে। সাড়ে তিনটে। তার সঙ্গে থাকবে সিদ্দিকি। ট্যাক্সি নেওয়া হল। যাবে চার্চগেট। চার্চগেটে

নেমে সাবওয়ে। প্ল্যাটফর্মে উঠেই সামনে দেখা গেল একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা। তারপর সিদ্দিকি একজন ছুটন্ত যাত্রীকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাইয়া পাঁচ উনিশ কা ভিরার লোকাল? ওই যে..এই প্ল্যাটফর্মে আসবে.. জানাল সেই যাত্রী। ওই যাত্রীও সেই ট্রেনেই উঠবে। সেকথা ভেবে হাসল সিদ্দিকি। দুজনে উঠে পড়ল ট্রেনে। এখনও ভিড় নেই। তবে ব্যাগ দুটো বাংকে ধরানো যাবে না। যদি পড়ে যায়। টাইমার আছে। তাই দুজনে একবার চোখাচোখি করে ঠিক করা হল সিটের নীচে রাখা হবে। রেখেই দুজনে বেরিয়ে এল সামনে। পরের স্টেশনে নামতে হবে। ততক্ষণে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। যে সিটের নীচে রাখা হয়েছে ব্যাগ দুটো সেখানেও যাত্রীরা বসে গিয়েছে। সিদ্দিকির রাখা ব্যাগটির সিটে এসে বসেছে একটি অল্প বয়সি ছেলে। স্কুলে বা কলেজে পড়ে।

ফয়জলও চার্চগেটেই এসেছে। তার সঙ্গে কেউ নেই। একা। ফয়জল উঠেছে বোরিভিলি স্লো ট্রেনে। ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। আসিফ আর সাবির অবশ্য একটা রিস্ক নিয়েছে। ভিরার ফাস্ট ট্রেনে তাদের ডিউটি। কিন্তু ফাঁকা দেখে প্রথমেই কামরার বাংকে তুলে দিয়েছে দুটো ব্যাগ। যখন মনে হল নীচে নামিয়ে রাখা উচিত, ততক্ষণে বাংক ভরে গিয়েছে ঠাসাঠাসি ব্যাগে। আর যাত্রীরাও বসে গিয়েছে। আসিফ টেনশনে। কারণ তার নিজের উপরই রাগ হচ্ছে। চার্চগেট স্টেশনে ট্যাক্সি থেকে নামার পর সে ট্যাক্সি চালককে ৫০০ টাকার নোট দিয়েছে। অথচ চেঞ্জ নেই ট্যাক্সি চালকের কাছে। সে কোনো কথা না বলেই চেঞ্জ না নিয়েই চলে এসেছিল। ১৮০ টাকা ভাড়া হয়েছে। এটা তো আশাতীত, আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। ট্যাক্সিচালক সন্দেহ করতে পারে। এতটা ভুল কেন করল? আগে থেকে পকেটে খুচরো টাকা রাখা উচিত ছিল। কামাল আর সেলিম উঠেছিল পাঁচটা সাতান্নর ভিরার ফাস্ট লোকালে। সঙ্গে হাফিজউদ্দিন আর আসলাম। আসলাম আগেই চলে এসেছে। কারণ পরদিন এই পাকিস্তানীদের নিয়ে যেতে হবে ফের কলকাতা হয়ে বাংলাদেশ বর্ডার। ব্যাগ রেখে তাদের নেমে যাওয়ার কথা। সবই প্ল্যানমাফিক এগোচ্ছে। চার্চ গেট থেকে ট্রেন ছাড়ল। সময়মতো। দাদর স্টেশনে নামতে হবে। টাইমার দেওয়া আছে। কামাল, হাফিজ আর আসলাম দাদর স্টেশন আসতেই জলদি নেমে গেল প্রায় চলন্ত ট্রেন থেকে। কিন্তু দাদর স্টেশন থেকে যে এরকম হুড়মুড় করে যাত্রী উঠতে শুরু করবে, আর নামার সুযোগই

পাওয়া যাবে না পিছনে থাকলে, সেটা কল্পনাই করেনি একজন। সেলিম। সেলিম নামতে পারল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। কামাল সেদিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

বিকেল ৫টা ৩৫। মোটরম্যান শচীনকুমার সিং গার্ডের কেবিনে ঢুকলেন। কেবিনের মধ্যে দুটো হুক আছে। হ্যাঙ্গারও। কোট ঝোলানোর জন্য। সেখানেই ব্লেজারটা ঝুলিয়ে দিলেন শচীনকুমার সিং। ৫টা ৫৭ মিনিটের ভিরার ফাস্ট লোকালের চালক। ৩০ সেকেন্ড বাকি আছে। এখন হর্ন দেওয়া নিয়ম। যাতে যাত্রীরা অ্যালার্ট হয়ে যায়। সময় মতো ট্রেন ছাড়ল। দাদর স্টেশন। ৬ টা ২২ মিনিট। যাক। একেবারে টাইম মেনটেইন করা যাচ্ছে। দাদর স্টেশন থেকেও ট্রেন ছেড়ে দিল। সিং একটু রিলাক্সড। এবার মাতুঙ্গা আসবে। দু মিনিট বাকি। ঠিক তখনই, মোটরম্যান শচীনকুমার সিং এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেলেন কেবিনে। কান ফাটানো কিছু শব্দ । চোখেমুখে অন্ধকার। কী ব্যাপার! ভূমিকম্প নাকি! শচীনকুমার সিং ধাতস্থ হয়ে দরজা খুলে বাইরে তাকালেন। গোটা ট্রেন আর চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। লাইনের উপর ছিটকে আছে মানুষের মাংস। ট্রেনের গায়ে ছিটকে লেগেছে রক্ত। চারদিকে কান্না আর হাহাকারের রোল। শচীনকুমার সিং জানেনই না, এই প্রথম নয়। মাত্র এক মিনিট আগেই মাহিম রেলস্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ হয়েছে বোরিভিলি ফাস্ট ট্রেনে। ভায়েন্দার আর মীরা রোডের মধ্যে আবার একটি ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটল। ছটা পঁচিশে খার সাবওয়ে আসার আগেই একটি ট্রেনে বিস্ফোরণ। সপ্তম বিস্ফোরণটি হল সাড়ে ৬টায়। বোরিভি রেলস্টেশনেই। লস্কর ই তৈবার আজিম চিমা আর হাফিজ সঈদ চেয়েছিল ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ। ফয়জলরা পেরেছে। ১৯০ জনের মৃত্যু, ৯৮০ জন আহত, ৪৫ জন চিরতরে অন্ধ, ১৬৭ জন চিরতরে পঙ্গু।

অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের ইনস্পেক্টর ভীমদেব রাঠোর মুম্বইয়ের সিওন হাসপাতালের মর্গের সামনে দাঁড়ানো। ব্লাস্টের পর চারদিন কেটে গিয়েছে। রাঠোর সিনিয়র পুলিশ ইনস্পেক্টর মুম্বই সেন্ট্রাল রেলওয়ে। মাতুঙ্গা ব্লাস্টের ইনভেস্টিগেশন অফিসার। সিওন হাসপাতালের মর্গে থাকা এই বড়ির কোনো ক্লেইম করার লোক নেই। কে লোকটা? কেন কেউ আসেনি? ডেডবডির পোস্ট মর্টেমের পর গায়ে ট্যাগ লাগানো

আনআইডেন্টিফায়েড। চোয়াল উড়ে গিয়েছে। স্কাল কিছুটা খোলা। চিবুকের হাড়। ভাঙা। কীভাবে চেনা সম্ভব? প্রবল বৃষ্টি পড়ছে। একা একা মর্গ থেকে বেরিয়ে ভীমদেব রাঠোর সিগারেট ধরালেন। কীভাবে এই বড়ির মালিকের পরিচয় পাওয়া সম্ভব? বিদ্যুচ্চমকের মতো মাথায় এল ফেসিয়াল রিকনস্ট্রাকশন করা যায় না? এরকম তো আগেও হয়েছে শোনা গিয়েছে। রাঠোর এক সেকেন্ড সময় নষ্ট করলেন না। প্রায় দৌড়ে গেলেন ডিনের কাছে। এম ই ইয়েলোকার। ডক্টর সাব আমরা একটা ফেসিয়াল রিকনস্ট্রাকশন করতে পারি? ডক্টর ইয়েলোকার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর বললেন, সার্টেনলি। আমাদের সব করতে হবে আপনাদের হেল্প করার জন্য। সিওন হাসপাতালের ফরেনসিক টিম ঝড়ের গতিতে নেমে পড়েছে। দুজন প্লাস্টিক সার্জন, দুজন ডেন্টাল এক্সপার্ট, তিনজন অ্যানাটমি আর্টিস্ট। আর সকলের নেতৃত্বে প্রফেসর ডক্টর হরিশ পাঠক। ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত মুখের রিশেপ করার প্রাণপণ এক চেষ্টা শুরু হল। যতটা নিখুঁত সম্ভব করতে হবে। অবশেষে একটা মুখ পাওয়া গেল। তোলা হল ছবি। ডক্টর পাঠক বললেন, লোকটা খুব পান কিংবা গুটখা খেত বোঝা যাচ্ছে। সেই ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হল গোটা মুম্বইতে। কিন্তু কেউ খোঁজ করতে এল না। কারণ লোকটার নাম ছিল সেলিম। যে নিজেই বোমা রেখেছিল। সেই বিস্ফোরণে নিজেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।

ঠিক পরদিন মুম্বই ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ফোন ইন্টারসেপট করে শুনতে পেল একটি নম্বর থেকে ফোন যাচ্ছে করাচিতে। বলা হচ্ছে, মুবারকা। আপনে তো কামাল কর দিয়া। অপারেশন কে লিয়ে বহোত মুবারক বাত আপকো। ঢাকা থেকে করাচিতে ফোন। ঠিক সেই নম্বরটিই আবার অ্যালার্ট দিল। এবার ফোন যাচ্ছে ইন্ডিয়ার কোনো নম্বরে। ভাইজান সব ঠিক হ্যায় না! ও প্রান্ত থেকে কেউ বলল হাঁ, সব ঠিক, খ্যায়রিয়ৎ। নম্বরটি লিখে রাখা হল। এবং সেদিন বিকেলে আবার অ্যালার্ট। একটি মুম্বই লোকালিটি থেকে ফোন যাচ্ছে ওই আগের নম্বরে। চকিতে সার্ভিস প্রোভাইডারকে ধরা হল। কার ফোন? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাঠোর জানলেন, নভি মুম্বই থেকে ফোন যাচ্ছে। নাম মুমতাজ চৌধুরী। আর যেখানে ফোন যাচ্ছে সেটি বিহার নেপাল বর্ডারে। মুমতাজ সেদিন রাতেই গ্রেপ্তার হয়ে গেল। তাকে জেরা করে জানা গেল জিজাজিকে ফোন করছে সে। জিজার নাম কামাল আনসারি।

রাঠোরের মুখে হাসি। তাহলে কি ঠিক পথেই যাচ্ছি? ২০ জুলাই। রাঠোর তাকে জেরা করে ইনস্পেক্টর সুনীল দেশমুখ আর বসন্ত তাজনেকে বললেন, গেট রেডি। তুমহে পটনা যানা চাহিয়ে। বিহার আর নেপালের সীমান্তের গ্রাম বাসুপতি। বসন্ত আর সুনীল রাত দুটোর সময় সেই গ্রামে নিঃশব্দে হাজির হলেন। বাড়ি জানা হয়ে গিয়েছে। ঠক ঠক ঠক! দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা। এবার আলো জ্বলে উঠল। দরজা খুলেছে একটি মেয়ে। কামাল হ্যায়? একসঙ্গে দুজন অচেনা মানুষকে দেখে মেয়েটি থতমত খেয়েছে। মেয়েটির নাম তবাসুম সুলতানা। কামালের স্ত্রী। তাকে বেশিক্ষণ টেনশন না দিয়ে সুনীল আর বসন্ত সরাসরি জানাল আমরা পুলিশ। কাঠ হয়ে গেল তবাসুম। কাঁপা কণ্ঠে জানাল কামাল নেই। কোথায়? আসবে। রাত সাড়ে তিনটে। ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে। আলো জ্বলছে। আবার ঠক ঠক ঠক শব্দ। দরজার আড়ালে পজিশন নিয়ে রেডি মুম্বই পুলিশের দুই ইনস্পেক্টর। কামাল ঘরে ঢুকতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হল। বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগই পেল না কামাল আনসারি। সেভেন ইলেভেন ব্লাস্টের প্রথম অ্যারেস্ট! ঠিক ৮ দিনের মাথায় সুহেল, জামির, ফয়জল আর মুজাম্মেলকে দেখা গেল মুম্বই অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের লক আপে। নতুন একটা অপারেশন আছে। সব ঝামেলা মিটে গিয়েছে। যেতে হবে লাহোর। এই কথা বলে কামাল আনসারিকে দিয়ে ফোন করে ফাঁদ পাতা হয়েছিল। সেই ফাঁদে পা দিতে পুণে থেকে চলে এসেছিল এই ফয়জল। ব্লাস্টের পরই সে তার মুম্বইয়ের ফ্ল্যাট থেকে চলে যায় বাংলাদেশ। ১০ দিন পর ফিরে আসে। পুণে। এবং সেখানে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে জামাকাপড় সাপ্লাই করছিল দোকানে দোকানে। ধরা পড়ে গেল একে একে সাতজন। প্রমাণ কী যে তারাই করেছে? এই চক্রান্তের প্রধান সাক্ষী কে ছিল? ফয়জলের সেই বন্ধু, যে সেদিন প্ল্যান ফাইনাল হওয়ার দিন আল্লাহের নাম করে গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নিতে রাজি হয়নি। মহম্মদ আলম কুরেশি!

৮ সেপ্টেম্বর। ফয়জল আত উর রহমান শেখকে যখন আদালত আরও ১৪ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে থাকার আবেদন মঞ্জুর করেছে, তখন তাকে তোলা হয়েছিল কালো ভ্যানে। শুধু একটা নেট থেকে সেই ভ্যানের মধ্যে আলো আসে। বাতাস আসে। ফয়জল এতদিন পর্যন্ত আদালতে যাতায়াতের পথে কালো ভ্যানের মধ্যে থেকে একবারও বাইরে

তাকায়নি। আজ কী মনে হল। তাকাল একবার। একটা মুখ যেন জালের খুব কাছে। ফয়জলের চেনা লাগল। কে? উঠে এল জালের কাছে। মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে। কালো একটা চুড়িদার পরা। মাথা ঢাকা ওড়নায়। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। কালো ভ্যান স্টার্ট নিয়েছে। নুরের চোখে জল। সেই শেষবারের মতো ফয়জলের সঙ্গে তার দেখা। কারণ বিচারে দোষী প্রমাণিত ফয়জল। গোটা অপারেশনের মাস্টারমাইন্ড। ফয়জলের কী সাজা হল? মৃত্যুদণ্ড!

১৩

ফরওয়ার্ড সেকশন টুয়েন্টি থ্রি!

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সবথেকে স্ট্র্যাটেজিক টাউন। স্ট্র্যাটেজিক, কারণ ভারতের হাতে থাকা কাশ্মীরের প্রবেশপথ শর্ট রুটে খুব কাছে। কিন্তু বর্ডার থেকে এই জনপদে সোজা পথে আসতে হলে বহু পাহাড়ি এলাকা আর জঙ্গল পেরোতে হবে। ফরওয়ার্ড সেকশন টুয়েন্টি থ্রি হল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সির ব্যক্তিগত টাউনশিপ। সারি দেওয়া একতলা বাড়ি ক্যাম্প। চারটি প্রাসাদোপম বাংলো। ওই একতলা বাড়ি আর ক্যাম্পগুলি জঙ্গি উৎপাদন কেন্দ্র। ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি হতে উৎসুক যুবক আর তরুণের দল প্রথমে লাহোর অথবা করাচি আসবে। তারপর তাদের নিয়ে আসা হয় এই টাউনশিপে। এটাই নিয়ম। ওই একতলা বাড়ি আর ক্যাম্পে তারা থাকে। ট্রেনিংয়ের জন্য। যখন ট্রেনিং শেষে বেরোয় তখন কেউ হয়ে ওঠে আজমল কাসব, আবার কোনো ক্লাস টেনের ছাত্র হয়ে ওঠে ভয়ংকর ফিদাইন। আর ওই বাংলোগুলি যাদের জন্য, তাদের একজনকে মাঝেমধ্যেই করাচির ক্লিফটন এলাকা থেকে সরিয়ে আনতে হয় আত্মগোপনের জন্য। তার নাম দাউদ ইব্রাহিম কাসকর। দ্বিতীয় বাংলোটি হাফিজ সঈদের জন্য বরাদ্দ। তৃতীয় বাংলোয় থাকে আইএসআই চিফ। আর কখনও সখনও পাকিস্তান আর্মির বড় অফিসার এলে ওই চতুর্থ বাংলো। বেশিদিন অবশ্য গোপন থাকেনি। আমেরিকা জেনেই গেল এই গোপন টাউনশিপের কথা। ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আমেরিকা কড়া কণ্ঠে পাকিস্তানকে জানিয়ে দিল ফরওয়ার্ড সেকশন টুয়েন্টি থ্রি বন্ধ করে দিতে হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার দেয় আমেরিকা। পাকিস্তান তাই আমেরিকার কথা অমান্য করতে পারে না। সুতরাং আপাতভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল সেই ট্রেনিং ক্যাম্প। যদিও পরে আবার খোলা হবে। তাহলে কোথায় হবে ভারতবিরোধী প্ল্যান প্রয়োগের কর্মশালা? গোটা নেটওয়ার্ক শিফট করে দেওয়া হল করাচিতে। ২০০২ সালে পাকিস্তান আর্মির সিক্সথ বালুচ ব্যাটেলিয়নের এক দুর্ধর্ষ সেনা অফিসার মেজর আবদুর রহমান হাসিম সেনাবাহিনী

থেকে ইস্তফা দিল। কারণ কয়েকমাস আগে তাকে পাঠানো হয়েছিল তোরা বোরা মাউন্টেন উপত্যকায়। আল কায়েদার বিরুদ্ধে পাকিস্তান আর্মির অপারেশন হবে। সেখানে তাকে যেতে হবে। বেঁকে বসল মেজর আবদুর রহমান হাসিম। আল কায়েদার বিরুদ্ধে সে লড়াই করবে না। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ? নির্দেশের অমান্য? সহ্য করা হবে কেন? তাই মেজর আবদুর রহমানের মেজর পদে কেড়ে নেওয়া হল। তাকে নামিয়ে আনা হল ক্যাপ্টেন পদে। ঠিক তিনমাস পর সে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছিল। এই তিনমাসে কী করেছে? তার সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল এক দীর্ঘদেহী, রোগাটে গড়নের ব্যক্তির। আস্তে আস্তে কথা বলে সে লোক। কিন্তু চোখদুটি স্থির সর্বদাই। মুখে মৃদু হাসি। আল কায়েদার বিরুদ্ধে লড়াই করতে আবদুর রহমান চায়নি বলে ভূয়সী প্রশংসা করে সেই লোকটিই রহমানকে ডেকে পাঠায় নিজের আস্তানায়। গোপন। এবং তারপর রহমানকে দিল নতুন এক কাজের অফার। যা রহমানের পছন্দ হয়েছে। সেনাবাহিনীর কাজে মজা পাওয়া যাচ্ছে না। এটা দারুণ দায়িত্ব। কী সেই নতুন অফার? ওই রোগা লম্বা লোকটি একটি বিশেষ ইউনিটের জন্মদাতা। ভয়ংকর যোদ্ধা ইউনিট। সবটাই প্রযুক্তিনির্ভর। ইউনিটের নাম জুন্দ আল ফিদা! এই জুন্দ আল ফিদার শাখা হিসাবে নতুন একটি প্রকল্প হাতে নিয়ে রহমানকে পাঠানো হবে আইএসআই এর কাছে। সেই লোকটিই সব ব্যবস্থা করে দিল। লোকটির নাম ওসামা বিন লাদেন। আর আইএসআইএর কাছে গিয়ে রহমান যোগ দেওয়ার পর, দু মাসের মধ্যে যে নতুন ইউনিট ও মিশন স্থাপন করা হল, তার নাম করাচি প্রজেক্ট! লক্ষ্য ইন্ডিয়া! রহমান মাস্টারমাইন্ড। তার ডাক নাম পাশা। তাই আইএসআই আদর করে সেই প্রজেক্টকে সম্বোধন করে ‘পাশা প্রজেক্ট'।

সবার আগে দরকার রিক্রুটমেন্ট সেল। এবং সেটা হওয়া দরকার ভারতে। সহ্যাদ্রি পবর্তমালার তিনদিকে ঢেউ খেলানো পর্বতশ্রেণি। পশ্চিমঘাট। আর একদিকে সমুদ্র। আরবসাগর। উত্তর কর্ণাটকের উপকূলবর্তী কোস্টাল টাউনের নাম ভাটকল। অসামান্য সুন্দর দেখতে এক জনপদ। ঘন সবুজ বনভূমি। দিগন্তে পর্বতশ্রেণি। আর শহরের উপকণ্ঠে সমুদ্র। একদিকে ম্যাঙ্গালোর। অন্যদিকে কারওয়ার। এই দুই শহরের মাঝখানে এই ভাটকল। ফাঁকা ফাঁকা। প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে বাগান, লন। ছোট্ট দোতলা, একতলা

বাড়ি। একঝাঁক অট্টালিকাসম প্রাসাদোপম বাড়ি ঘোষণা করছে শহরটির সমৃদ্ধি। ৬০ হাজার মানুষের বাস মাত্র। এখান থেকে সামান্য দূরের কারওয়ার শহরটিও দারুণ সুন্দর। পাহাড় আর সমুদ্র পাশাপাশি। সেখানে মার্কেট কমপ্লেক্সও বেশি। তাই ভাটকলের মানুষ কেনাকাটা করতে ম্যাঙ্গালোর অথবা কারওয়ার যাতায়াত করেন। কারওয়ার আর একটি কারণে বিখ্যাত। আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে এখানে এক আইসিএস অফিসার এসে থাকতেন। বিরাট সুন্দর বাংলো। তিনি ছিলেন বাঙালি জেলা জজ। ব্রিটিশ ভারতে একজন জেলা জজের বিপুল পদমর্যাদা আর মাহাত্ম্য। সাংঘাতিক সম্মান। যদিও তিনি অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর বিশাল বাংলোটিতে বসে প্রকৃতি উপভোগ করার জন্য তাঁর ছোটভাই মাঝেমধ্যেই এসে থাকতেন এই কারওয়ারে। ছোটভাইয়ের লেখালেখির শখ। তাই এই নির্জন শহরে, আইসিএস দাদার বাংলোয় তিনি খুঁজে নিতেন নিজের সাহিত্যচর্চার অবকাশ। সেই আইসিএস অফিসারের নাম ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ভাইয়ের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই কারওয়ার থেকেই একটি পরিবার ষাটের দশকে শিফট হয়ে চলে এসেছিল নিকটবর্তী জনপদ ভাটকলে। প্রথমে ছিল রাবার প্ল্যান্টের ব্যবসা। তারপর অর্ডার সাপ্লাই। জায়গাটির নাম অনুযায়ী এই পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে নামের পাশে অন্তর্ভুক্ত করা হতে থাকে স্থানের নাম। ভাটকল। আরবসাগরের তীরে ২০০২ সালের মে মাসে চারজন যুবক একজোট হয়ে একটি মিটিংয়ে মিলিত হল। ২ ঘণ্টা প্রচুর আলাপ আলোচনার পর তাদের বৈঠক সমাপ্ত হয়। এবং ঠিক হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য হবে জিহাদ। তার জন্য দরকার এমন কিছু করা যাতে গোটা দেশ কেঁপে যায়। আগে একটা গ্রুপ তৈরি করা যাক।

সেদিন ওই চারজনের দলই ঠিক করল নতুন গ্রুপের নাম কী হবে। যার নেতা হবে দুই ভাই। ইয়াসিন ভাটকল, রিয়াজ ভাটকল। সেই কারওয়ার থেকে ভাটকল শহরে চলে আসা পরিবারটির দুই ছেলে। আর গ্রুপের নাম? ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন! যারা এরপরের বছরগুলিতে গোটা দেশে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব মিলিয়ে ৫৩৪ জনের

মৃত্যুর কারণ হবে। আমেদাবাদ থেকে বোধগয়া। দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু। হায়দরাবাদ থেকে জয়পুর। তাদের ফ্রেন্ড, ফিলজফার এবং গাইড কে ছিল? করাচি প্রজেক্ট! কীভাবে সম্পন্ন হল এই নিপুণ বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রটি?

প্রথমে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষায় ৯৩ শতাংশ পেয়েছে মনসুর পীরভয়। এরপর ক্লাস টুয়েলভথের বোর্ড পরীক্ষায় আরও ভালো। ৯৮ শতাংশ নম্বর। সুতরাং। অল ইন্ডিয়া জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স পাওয়া মোটেই শক্ত হয়নি। সহজেই তাই বিশ্বকর্মা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং। পুণের পশ এলাকায় বাড়ি। উজ্জ্বল, খুব নম্র স্বরে কথা বলা। যাকে বলা হয় সফট স্পোকেন। বড় দাদার নাম শাহিদ। লন্ডনের ডাক্তার। আর এক দাদার নাম আদিল। তিনি আবার আর্কিটেক্ট। বেলজিয়াম থেকে ডাক এসেছে। আর কয়েকমাসের মধ্যেই বেলজিয়াম চলে যাবেন। একদম ছোট ভাই আলিম এখনও পড়ছে। মনসুর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কলেজের মধ্যে টপ করেছে। তাই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে ভালো একটি চাকরি পেয়ে গেল। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তার বেতন হয়ে গেল বার্ষিক ১৯ লক্ষ টাকা। কোম্পানির নাম জিহ্বা টেকনোলজিস। ঠিক ৮ মাস। সংস্থাটি কিনে নিয়েছে বহুজাতিক সংস্থা ইয়াহু। ডিলের মূল্য ৩০০ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং মনসুর এবার থেকে পৃথিবীখ্যাত ইয়াহুর কর্মী। এবার বিয়ে করার সময় এসেছে। মহারাষ্ট্রেরই আকোলার বাসিন্দা এক রাজ্য সরকারি কর্মীর কন্যার সঙ্গে বিয়ে হল মনসুরের। মেয়েটি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। সুখী দম্পতি। আধুনিক প্রজন্মের পারফেক্ট রোলমডেল।

ঠিক এরকমই কাউকে দরকার ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের। যাকে দেখে মোটেই বোঝা যাবে না তার ভিতরটা কেমন। ইয়াসিন ভাটকল আর রিয়াজ ভাটকল তাদের পুণে ইউনিটে যুবক রিক্রুটমেন্টের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে দুজনকে। আসিফ বশিরুদ্দিন শেখ আর আনিক শফিক সঈদ। পুণের আজম ক্যাম্পাসের কোরান ফাউন্ডেশনে আরবি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল মনসুর। কেন? কারণ তার প্রিয় শখ হল ভাষাশিক্ষা। এর আগে সে স্প্যানিশ শিখেছে। ফ্রেঞ্চ শেখার ইচ্ছা আছে। কিন্তু তার আগে বরং আরবি ভাষা শিখে নেওয়া

যাক। প্রকৃত ভাষায় লিটারেচার পড়ার অনেক মূল্য। সেই লক্ষ্যেই এই আরবি ক্লাসে ভর্তি হওয়া। প্রত্যেকটি ক্লাসের পর দুটি লোক এসে উপযাচক হয়ে কথা বলে। তাদের লক্ষ্যটা অবশ্য বেশ ভালো। ক্লাসের পর আমরা নিজেদের মধ্যে আরবি ভাষা চর্চা করব। কিছুক্ষণ। যাতে এই ক্লাসের পর চর্চাটা রয়ে যায়। আর একসঙ্গে যদি অনুশীলন করা যায় তাহলে আনন্দও হয়। বোরিং লাগে না। ঠিক একমাস পর ওই দুটি লোক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল কয়েকটি ফোটোগ্রাফ। অত্যাচার করা হচ্ছে মুসলিমদের উপর। গুজরাতে, অসমে, উত্তরপ্রদেশে। এমনকী বেঙ্গালুরুতেও। আমরা এত পড়াশোনা শিখে কি চুপ করে বসে থাকব? বাড়ি ফিরে গম্ভীর মনসুর। এরকম সচরাচর সে থাকে না। কী হল? স্ত্রী জানতে চায়। মনসুরের ভিতরে ততক্ষণে বীজ রোপিত হচ্ছে। কিছু করার। দুদিন পর শনিবারের ক্লাসে যখন যে পৌঁছল তখন ওই দুটি লোক আসিফ আর আনিক মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল। কারণ টোপ গিলেছে এই ছেলেটি। সে রাজি জিহাদে। মাত্র তিনদিনের মধ্যে পুণে হাজির হয়েছে রিয়াজ ভাটকল। আসিফের বাড়িতে। নতুন মেম্বারকে স্বাগত জানাতে। জড়িয়ে ধরে বলল তুমি শুধু এই গ্রুপের নয়। গোটা কমিউনিটির কাছে একজন রোলমডেল। কারণ এরকম টেকনিক্যাল জ্ঞান আর কজনের আছে? তুমি হবে আমাদের নতুন টেকনোলজি গুরু। তোমার দেখানো পথেই চলবে নতুন শিক্ষিত আধুনিক এক গ্রুপ। শুরু করো। ঠিক এভাবে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন চালু করল তাদের প্রথম মিডিয়া সেল। দুদিন ক্লাস। পুণেতে। নতুন রিক্রুট জঙ্গিরা আসছে। টিচারের নাম মনসুর। প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যে বিষয়গুলিতে তা হল ১) ডিলিটেড ডেটা রিকভারি ২) সিকিওরিং এনক্রিপটিং কমিউনিকেশন। ভারতের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, এমনকী কোস্ট গার্ড অথবা তদন্তকারী সংস্থাগুলি বাইরে থেকে অনেক সময়ই হায়ার করে সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ। কত বেশি ডিলিটেড ডেটা রিকভারি করা সম্ভব সেটা জানার জন্য একটি বিশেষ ট্রেনিং হল। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং, কীভাবে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ গোপন রাখা সম্ভব প্রক্সি সার্ভারের মাধ্যমে। কারণ যে কোনো কমিউনিকেশনের ডেটা রিকভারির মাধ্যমেই তদন্তকারী সংস্থাগুলির পক্ষে কোনো একটি ঘটনার প্রাথমিক সূত্র বা লিড পাওয়া সম্ভব। সেটা আটকাতে পারলেই হল। শুধু এটুকু

জ্ঞানে কি এত বড় এক কর্মযজ্ঞে নামা সম্ভব? একেবারেই নয়। দরকার আরও বিশেষ কোনো টেকনিক্যাল জ্ঞান।

২০০৭ সালের মে মাসে হায়দরাবাদের 'ই টু' ল্যাব নামক একটি সাইবার ল্যাবরেটরিতে শুরু হয়েছিল একটি বিশেষ কোর্স। তার নাম 'এক্সপার্ট হ্যাকিং কোর্স।' কর্পোরেট প্রফেশনালসদের জন্য। ওই কোর্স করার ফি কত লাগবে? ১ লক্ষ টাকা। এত বেশি কেন? কারণ 'ই টু' ল্যাব চাইছিল কোনো ছাত্র কিংবা চাকরিপ্রার্থী যুবক যেন অ্যাপ্লাই না করে। এই কোর্স শুধুমাত্র প্রফেশনালদের জন্য। যাদের কোম্পানি পে করবে। আর সর্বোপরি কোর্সের ট্রেনিং হাবিজাবি লোক তো দেবে না। দিতে আসছে বিশ্বখ্যাত সব সংস্থার প্রধান সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আসছেন আয়াল দোতান। বিখ্যাত অ্যান্টি ভাইরাস বিশেষজ্ঞ সংস্থা ট্রাস্টঅয়্যারের সহ প্রতিষ্ঠাতা দোতান। যিনি সর্বপ্রথম সেইসব মারাত্মক ভাইরাসকে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেছেন, যেগুলির নাম, আই লাভ ইউ, মেলিসা, ক্লেজ, ব্লাস্টার, সাসার ওয়ার্ম। শুধু কর্পোরেট নয়। এই কোর্সে আসতে আহ্বান করা হচ্ছে মিলিটারি ডিপার্টমেন্টকেও। ই টু ল্যাব নিজেদের নাম দিয়েছে এশিয়ার প্রথম অ্যান্টি হ্যাকিং অ্যাকাডেমি। ১৪ মে থেকে ১৯ মে ২০০৭। কোর্স। শেখানো হবে অ্যান্টি হ্যাকিং, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি এবং অ্যান্টি অয়্যারলেস হ্যাকিং। মনসুর ভাবল এই কোর্সটা করতেই হবে। কিন্তু কোম্পানি তাকে সেই সুযোগ দেবে না। নিজের পকেটের টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু মাত্র পাঁচদিনের জন্য ১ লক্ষ টাকা! অবশ্যই অনেক বেশি। তাই মনসুর ই টু ল্যাবের সঙ্গে অনলাইনে দরদাম শুরু করল। নিজের পরিচয় আর জব স্ট্যাটাস জানিয়ে এটাও টোপ দিল সে মাঝেমধ্যেই আমেরিকা যায়। ফলে ই টু ল্যাবের সফটঅয়্যার টেকনোলজি প্রোগ্রামিং-এ সে সহায়তা করবে। মনসুরের এই কথায় রাজি হয়ে গেল ই টু ল্যাব। ডিসকাউন্ট হল ৩৫ হাজার টাকা। মনসুরকে দিতে হবে বাকিটা। কিন্তু চারদিনের ছুটি নিতে হবে তো? অফিসে কী বলা হবে? বাড়িতে কী বলা হবে? অফিসে মনসুর জানাল কিছু পার্সোনাল কাজ আছে। একটু সময় লাগবে মেটাতে। মনসুর কখনও ছুটি নেয় না। সুতরাং তার সেই ছুটির আবেদন সহজেই মঞ্জুর হল। আর স্ত্রীকে বলল ঠিক উলটোটা। অফিসের কাজেই তাকে যেতে হচ্ছে হায়দরাবাদ। ট্রেনের

টিকিট এখন আর পাওয়া যাবে না। ওয়েটিং লিস্ট। তাই মনসুর বাসে যাওয়া স্থির করেছে। পুণে বাসস্ট্যান্ড থেকে হায়দরাবাদ। বাসে পাশের ছেলেটি একটু বেশি গায়ে পড়া। কোথায় যাচ্ছেন ভাই?

মনসুর সংক্ষেপে বলল হায়দরাবাদ।

আমিও তো হায়দরাবাদ। আপনি কি চেনেন ওখানে কোনো হোটেল টোটেল?

মনসুর ঘাড় নাড়ল। বোঝানোর চেষ্টা, সে পছন্দ করছে না এত বাক্যালাপ। ছেলেটি অবশ্য নাছোড় আসলে কি জানেন দাদা, আমি ওখানে একটা কোর্স করতে যাচ্ছি। চার পাঁচদিনের ব্যাপার। তবু সস্তার হোটেল হলে একটু ভালো হয়। কোর্স ফি এখনও পুরো জোগাড় হয়নি জানেন?

মনসুর এবার একটু নড়েচড়ে বসল। কোর্স? কীসের কোর্স?

ছেলেটি বলল একটা অ্যান্টি হ্যাকিং কোর্স! 'ই টু' ল্যাব!

মনসুর স্তম্ভিত! এটা কেমন হল? সেও যাচ্ছে ওই কোর্সে। আর এই ছেলেটিও যাচ্ছে। তাও আবার ঠিক পাশের সিট! এটা কীভাবে সম্ভব? ছেলেটির নাম মুবিন কাদের শেখ। কিছু ঘণ্টার মধ্যেই মনসুর বুঝে নিল ছেলেটি সরল টাইপ। চাকরিবাকরির খোঁজে আছে। তাই এই কোর্সে যাচ্ছে। ভালোই হল। একসঙ্গে বরং থাকলে সস্তায় হয়ে যাবে। সেইমতো বেগমপেট রেলস্টেশনের লাগোয়া একটি হোটেল নেওয়া হল। একসঙ্গে থাকছে দুজন। প্রথম দুদিনেরই কোর্স ট্রেনাররা বুঝে গেল এই গ্রুপে এমন একটি ছেলে এসেছে যার মাথা চূড়ান্ত শার্প। যে কোনো হ্যাকিং প্রসিডিওর আর সফটঅয়্যার হ্যান্ডলিং এই ছেলেটি নিমেষে বুঝে যায়। মনসুর তার নাম। এদিকে মুবিন খুব মনমরা। কারণ সে শেষ পর্যন্ত টাকাটা জোগাড় করতে পারল না। কোর্সটা করা হল না তার। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। তবে মনসুরের সঙ্গে ল্যাবে যায়। সেখান থেকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে। প্রত্যেকদিন ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর বাইরে এসেই মনসুর দেখে মুবিন কিন্তু ঠিক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। খুব ভালো ছেলে।

আর মাত্র একদিন বাকি কোর্স শেষ হতে। সেদিন ১৮ মে। শুক্রবার। ই টু ল্যাব থেকে বেরিয়ে মনসুর মক্কা মসজিদের দিকে যাবে নমাজ পড়তে। চারমিনারে। রিকশায় যাওয়ার পথে আচমকা একটা বিকট শব্দ। প্রবল হট্টগোল। মানুষ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। মক্কা মসজিদে ব্লাস্ট হয়েছে! ব্লাস্টে ৯ জনের মৃত্যু। এভাবে ঠিক বেছে বেছে কারা মক্কা মসজিদে শুক্রবারই ব্লাস্ট করাল? তারা কি মুসলিম টেররিস্ট হতে পারে? অঙ্ক মিলছে না। তাহলে? ভাবতে ভাবতে হাসপাতালে গিয়ে মনসুর দেখতে পেল চরম এক নারকীয় দৃশ্য। শয়ে শয়ে মানুষ কাতরাচ্ছে। রক্তাপ্লুত। এ নিশ্চয়ই অন্য কোনো বড় চক্রান্ত! মনসুর রাত সাড়ে ১০ টায় হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল তার কানে বাজছে রিয়াজ ভাটকলের একটাই কথা, যা এখানে আসার আ রিয়াজ বহুবার বলেছে—জিহাদই একমাত্র উত্তর মনসুর ভাই...। পাশে দাঁড়ানো মুবিন জানতে চাইছে, কী ভাবছেন দাদা? মনসুর হোটেলের ঘরে ফিরে বলল, আমাদের উপরই এত অত্যাচার কেন হচ্ছে? এর কোনো বদলা হবে না? মুবিন পাশে বসে বলল, ঠিক বলছেন দাদা। আমিও তাই ভাবি..। মনসুর খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। মুবিনের সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। সে যাবে স্টেশনের পাশের দোকানে। সিগারেট আনতে। গিয়ে টেলিফোন বুথে ঢুকে মুবিন অন্য প্রান্তে থাকা কাউকে বলল, রিয়াজ ভাই...লেড়কা সহি হ্যায়...ইসকে অন্দর ঘুস গয়ি জিহাদ...কাম হাসিল হো যায়েগা..আপ বেফিকর রহো...।

মুবিন আসলে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের স্পাই। মনসুরের উপর গোপন নজরদারির জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে।

হায়দরাবাদ থেকে ফিরেই আচমকা এক কাণ্ড। ইয়াহু কোম্পানি থেকে মনসুরকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হল আমেরিকায়। একটা প্রজেক্টে। কিছুদিনের জন্য। এই খবরটি ছড়িয়ে যেতেই খুশির হাওয়া ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের গ্রুপে। ইয়াসিন ভাটকল বলল সেলিব্রেশন হবে। আমরা আসছি। সকলে আবার মিলিত হল পুণের আসিফের ফ্ল্যাটে। কিন্তু আমেরিকায় কিছুদিনের জন্য যাওয়া। তার আবার সেলিব্রেশন কী? কেন? মনসুর অবাক। আসল কারণটা জানা গেল সন্ধ্যায় আসরে। ইয়াসিন বলছে, শোনো মনসুর, তিনটে

জিনিস আনতে হবে আমেরিকা থেকে। একটা স্পাই ক্যামেরা ডিটেক্টর, ভয়েস চেঞ্জার সফটঅয্যার আর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর। কী কাজে লাগবে? শেষেরটি কাজে লাগে গোপন বাগ ভয়েস রেকর্ডার আর লুকানো মাইক্রোফোনের সন্ধান পেতে। ঠিক চারমাস পর মনসুর এই সবকটি যন্ত্র নিয়ে ফিরে এল ভারতে। শুরু হল নতুন এক জঙ্গি বাহিনীর পথ চলা। মনসুরকে প্রথম যে কাজটি দেওয়া হল তা খুবই সিম্পল। মুম্বইয়ে আনসিকিওরড ওয়াই ফাই কানেকশন খোঁজ করতে হবে। কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে। এ তো সোজা কাজ! মনসুর কয়েকদিন ঘোরাফেরা করল মুম্বই শহরে। তার সঙ্গে ইকবাল। রিয়াজ ভাটকল ফোন করে জানতে চাইছে, কী খবর মনসুর?

রিয়াজ ভাই সব ঠিকঠাক। যা বলেছিলেন তা করেছি। নো প্রবলেম।

রিয়াজের প্রশ্ন, নো প্রবেলম মানে কী? কটা পেয়েছ?

অন্তত ১০ টা তো পেয়েছি।

কানেক্ট করেছ?

হ্যাঁ ভাইয়া। কানেক্ট করে দেখে নিয়েছি। টেস্ট মেল করেছি। সব ও কে। কানেক্ট করলে কীভাবে?

কেন? ইকবালের ল্যাপটপে। আমার ল্যাপটপে তো অফিসের পাসওয়ার্ড। ওপেন হয় না সব কানেকশনে।

তুম বিলকুল গাধা হো মনসুর.. মুঝে নেহি পাতা থা তুম ইতনি লাপরওয়া হো সকতে হো।

মনসুর ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। মানে? হঠাৎ করে এত খেপে যাওয়ার কারণ কী? রিয়াজ বলল, মনসুর আমরা কি কোনো ভিডিও গেম ডাউনলোড করার খেলা খেলছি? আমরা কি কলেজ স্টুডেন্ট? যারা ফ্রি ওয়াই ফাই খুঁজে বেড়ায়? তুমহে সমঝনা হোগা হামারা কাম..রাগে গরগর করছে রিয়াজ।

মনসুর ভাবছে কিছু. একটা ভুল হচ্ছে। সে কোনোমতে বলল, হুয়া কেয়া হ্যায়?

রিয়াজ বলল, একদম নতুন ল্যাপটপ ইউজ করো। যেখানে কোনো আরো ডেটা নেই। এভাবে তো আমরা ধরা পড়ে যাব।

মনসুর পরদিনই মুম্বইয়ের ল্যামিংটন রোডে ২০ হাজার টাকা দিয়ে একটি একরের ল্যাপটপ কিনে নিয়ে এসে আবার সেই এলাকাগুলিতে ঘুরে কানেক্ট করে দেখে নিতে শুরু করল। কোথায় কোথায় পাওয়া গেল আনসিকিওরিড ওয়াই ফাই? কোলাবা, সিএসটি এলাকা, মাতুঙ্গা, খালসা কলেজ, চেম্বুর, আর নভি মুম্বইয়ের সানপাদা।

২০০৮ সালের ২১ লাই। ইকবালের ফ্ল্যাট অশোকা মিউজে একজোট হয়েছে চারজন ইকবাল, মনসুর, আসিফ এবং কী আশ্চর্য সেই বাসে থাকা ছেলেটা। নাম মুবিন। মনসুরের মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। কী ব্যাপার? তুমি এখানে? মুবিনও সম্পূর্ণ নিখুঁত অভিনয় করতে পারছে। সে চোখ কপালে তুলে বলল আরে মনসুর ভাইয়া! তুমি? মনসুরকে বলা হল এই মুবিন নামের ছেলেটি মাত্র কয়েকমাস হয়েছে গ্রুপে যোগ দিয়েছে। পুণেতে বাড়ি। মনসুরের সামান্য সন্দেহ হয়নি। সে বলল আরে আমাদের আগেরই পরিচয় আছে। হায়দরাবাদে তো...। একে অন্যকে তারা জড়িয়ে ধরল। এবার কাজ। খোলা হল নতুন ল্যাপটপ। লিখতে শুরু করল আসিফ। ড্রাফট মেইল। এক লাইন দু লাইন তিন লাইন চার লাইন করে করে প্রায় ১০ লাইন। এত বড় একটা মেল পাঠানোর দরকার আছে? আরও ছোট করা যায় না? আলোচনা করে ঠিক হল আর একটু ছোট করাই ভালো। তবে আসিফের বানানে প্রচুর ভুল । গ্রামারে ভুল। সেগুলো ঠিক করার দায়িত্ব মনসুরের। তার ইংলিশ সবথেকে তুখড়। সে ধরে ধরে বানান ও গ্রামারের ভুল সংশোধন করে ফাইনাল করল। তবে এটা ফাইনাল নয়। ফাইনাল করবে রিয়াজ। কাল ভোরে সে আসছে। শুধু এই মেল পড়তে। ফোনে শোনালেই তো হয়। মাথা খারাপ নাকি? ফোন ইন্টারসেপ্ট হয়ে গেলে? এখনই যে হচ্ছে না কে বলতে পারে? কিন্তু কেন এই মেল লেখা হচ্ছে? মনসুর তখনও জানে না। তবে মেলের যা ভাষা তা দেখে সে প্রবল উত্তেজিত। এই কাজ যদি হয় তাহলে এতদিনে একটা জবরদস্ত ব্যাপার হতে চলেছে। আর সে যুক্ত থাকছে পরোক্ষভাবে এই অপারেশনে। সাংঘাতিক ভালো লাগছে। পরদিন রিয়াজ

ভাটকল এসে জানিয়ে দিয়ে গেল মেল ঠিক আছে। পিডিএফ ফরম্যাট করে সেভ করা হোক। ঠিক যখন সে গ্রিন সিগন্যাল দেবে তখনই যেন এই ই মেল বাছাই করা কিছু ঠিকানায় পাঠানো হয়। অতএব আপাতত অপেক্ষা। কবে আসবে সেই গ্রিন সিগন্যাল? অপারেশনটাই বা কী?

২৬ জুলাই মুম্বই চলে যাও। মেসেজ এল মনসুরের মোবাইলে। ভোরে যেতে হবে। তিনজন পুণে বাসস্ট্যান্ডে মিট করল। সেখানে একটি মারুতি এস্টিমে আগে থেকে ওই যে বসে আছে মুবিন। কিন্তু চালকের সঙ্গে মনসুরের পরিচয় নেই। কে? লোকটার নাম মহসিন চৌধুরি। তিনজন সেই মারুতি এস্টিমে চেপে পুণে থেকে রওনা হয়ে মুম্বই গেল। যেতে বলা হয়েছে নভি মুম্বই। সেদিন যে ই.মেল লেখা হয়েছে আজ সেটি সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে সেন্ট করতে হবে তিন চারটি ঠিকানায়। সেরকমই প্ল্যান। নভি মুম্বই পৌঁছে আগে দেখে নেওয়া হল সেই ওয়াই ফাই কানেকশন ঠিক আছে তো! হ্যাঁ...ঠিক আছে। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এবার শুধু অপেক্ষা। আর একবার ই মেল খুলে দেখে নেওয়া হচ্ছে ঠিকঠাক আছে কিনা। কী লেখা আছে সেই ইমেলে?

“so wait ..await now.wait only for five minutes from now...wait for mujahidin and fidayeen and stop them if you can who will make you feel the terror of jihad....await for 5 minutes to feel the fear of death...” (অপেক্ষা করো..আর একটু অপেক্ষা...পাঁচ মিনিটের জন্য অপেক্ষা.. মুজাহিদিন আর ফিদাইনদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকো সামান্য। আর পারলে তাদের ঠেকাও! যারা জিহাদের সন্ত্রাস কাকে বলে বুঝিয়ে দেবে..আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো মৃত্যুভয়ের অনুভূতির জন্য...)

আর একটি ইমেলে লেখা হয়েছে,

yes! we the terrorists of india THE INDIAN MUJAHIDIN..the militia whose each and every mujahid belongs to this very soil of india..have returned..."

মারুতি এস্টিম পার্ক করা হল গিনি টাওয়ারের কাছে। সন্ধ্যা ৬টা ৪০। এখনই পাঠাতে হবে। পাঠানো হল। ঠিক পাঁচ মিনিট। ৬টা ৪৫-এ আমেদাবাদের মণিনগরে মার্কেটের মধ্যে

ধুম...ধুম...ধুম...তিনবার প্রবল শব্দের বিস্ফোরণ। তিন মিনিট পর আমেদাবাদের সারকেজ এলাকায় স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাসে পরপর আবার দুটি বিস্ফোরণ। তৃতীয়বার বিস্ফোরণ ঘটল ১০ মিনিটের মধ্যে সঙ্গম থিয়েটারে। মণিনগর, ইশানপুর, নরোল সার্কল, বাপুনগর, হাটকেশ্বর, সারংপুর ব্রিজ, সারকেজ এবং ওদাও। ৭০ মিনিটের মধ্যে ২১টি বিস্ফোরণ। গোটা আমেদাবাদ জুড়ে ৫৬ জনের মৃত্যু। ২১০ জন আহত। কতটা নিখুঁত প্ল্যান ছিল? কতটা ভয়ংকর? একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। প্রথম বিস্ফোরণগুলিতে আহতদের যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে, তখন দুটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেই হাসপাতালের মধ্যেই। ভাবা যায়! আবার ইমেল পাঠানো হল খালসা কলেজের ওয়াই ফাই চুরি করে। বলা হল, দেখলে তো! পারলে আটকাতে! এরকম আরও হবে!

কয়েকটি সংবাদপত্র আর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের একটি মেলে পাঠানো হয়েছিল সেই দুটি মেল। আইপি অ্যাড্রেস খোঁজা শুরু। কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে? নভি মুম্বইয়ের এক ওয়াই ফাই থেকে। কার নামে? কেন হেউড। এক আমেরিকান বৃদ্ধ। একাই থাকেন। গিনি টাওয়ারে থাকছিলেন। তার ডেটা কার্ডের ওয়াই ফাই। গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। তিনি হতভম্ব। কিছুই জানেন না। কীভাবে তাঁর ওয়াই ফাই অন্য কেউ কানেক্ট করেছে তাও জানেন না। আর এরকম ভয়াবহ এক সন্ত্রাসের চক্রে তিনি জড়িয়ে গেলেন এটাও এক চরম ধাক্কা ভারতে এসে। কিন্তু পুলিশ মানবে কেন? কেন হেউড কি সত্যি বলছেন? তাঁকে বসানো হল নারকো অ্যানালিসিন আর পলিগ্রাফ টেস্টের সামনে। সোজা কথা লাই ডিটেক্টর। দেখা গেল তাঁর আচরণ মোটেই অপরাধীদের মতো নয়। তাহলে কে পাঠাল?

যারা পাঠাল তারা ততক্ষণে আবার পুণে ফিরে গিয়েছে। মনসুর যথারীতি অফিসে। অন্যরাও। এখনও বলা হয়নি বাকিদের পূর্ণ পরিচয়। আসিফ বশিরুদ্দিন শেখ। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। মুবিন কাদের শেখ কম্পিউটার সায়েন্স গ্রাজুয়েট এবং সফটঅয়্যার ডেভলপার। সকলেই পুণের সফটঅয়্যার জগতের পরিচিত ব্রাইট কেরিয়ারের যুবক। এরা যে করতে পারে ভাবাই যায় না। সুতরাং কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু

গুজরাত পুলিশ তুখড় পালটা চাল দিল। যাকে বলা যায় মাস্টারস্ট্রোক। বিস্ফোরণের দু সপ্তাহ পর গ্রেপ্তার করা হল এক ব্যক্তিকে। নাম আবু বাশার। তাকে জেরা করে আরও এক যুবককে। এবং প্রকাশ্যে গুজরাত পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হল আমেদাবাদ ব্লাস্টের প্রাথমিক তদন্তেই সাফল্য এসেছে। আবু বাশার ঘটিয়েছে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ। এতদিনের নিখুঁত প্ল্যান, রীতিমতো আগেভাগে ঘোষণা করে ঘটনা ঘটানোর পরও এভাবে অন্য কেউ কৃতিত্ব নিয়ে যাবে? কে এই বাশার? এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। ছটফট করছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের গোটা টিম। অবশেষে প্ল্যান হল আবার দাবি করা হবে। অতএব ২৩ আগস্ট মনসুরের নিজের গাড়িতে চেপে ফের যাওয়া হল মুম্বই। মনসুরের ইমেল অ্যাকাউন্ট হল alarbi.alhindigmail.com। সেই মেল থেকে আবার পাঠানো হল সংশোধনী। আবু বাশার নামে কেউ আমেদাবাদের বিস্ফোরণ ঘটায়নি। ওই বিস্ফোরণের কৃতিত্ব একমাত্র ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের। এবার ব্যবহার করা হচ্ছে খালসা কলেজের ওয়াই ফাই কানেকশন। সন্ধ্যায়। এবং ততক্ষণে মুম্বই পুলিশের সাইবার সেল আগেভাগেই ফাঁদ পেতে রেখেছে। বিশেষ সাইবার ডিটেকশন ব্যবস্থা। এবং দেখা গেল লোকেশনও। চারদিনের মধ্যে ইকবাল ধরা পড়ে গেল। আর মাত্র চার ঘণ্টার জেরায় সে সব কবুল করে দিল সঙ্গে কে কে আছে। ধরা পড়ল মনসুর। ভারতীয় সন্ত্রাসের মানচিত্রে সফটঅয়্যার স্পেশালিস্ট জঙ্গি যুবক। যার কেরিয়ার হওয়া উচিত ছিল অনেক উজ্জ্বল। অথচ পথ বেঁকে গেল অন্যদিকে। তার গ্রেপ্তার হওয়া ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের কাছে বিরাট এক লোকসান। এরকম তুখড় সাইবার অ্যানালিস্ট আর কোথায় পাওয়া যাবে? এই শূন্যতা কি পূর্ণ হবে?

এই ভাবনার আড়ালে কিন্তু বেড়ে উঠছিল আর একটি রহস্যময় চরিত্র। কয়েক বছরের মধ্যে সন্ত্রাস সাম্রাজ্যে আচমকা এক প্রযুক্তি স্পেশালিষ্ট অন্ধকার ধ্রুবতারা ফুটে উঠল। সিরিয়া, লিবিয়া, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, লেবানন, ইরাক, তুরস্ক, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান...একের পর এক দেশের অসংখ্য হাজার হাজার জঙ্গি মনোভাবাপন্ন যুবক যাকে পথপ্রদর্শক হিসাবে মান্য করেছে। যার টুইটার অ্যাকাউন্টকে ফলো করে চলেছে অসংখ্য জঙ্গি হতে জিহাদে যোগ দিতে চাওয়া যুবক যুবতীর দল। কে

এই লোকটি? ব্রিটেনের জিহাদি মনোভাবাপন্ন যুবকরা ইন্টারনেটে বসে ভাবতো এই লোকটি লিবিয়ার বাসিন্দা। লিবিয়ার জঙ্গিরা জেনেছিল তাদের এই গাইড আসলে ইয়েমেনের মানুষ। লেবাননের যুবকরা এই লোকটিকে ফলো করতে করতে ধরে নিয়েছিল ইরাকে থাকে এই বিশেষ টেকনোলজি এক্সপার্ট...। কিন্তু আসলে ছিল সে কোথাকার মানুষ? কারও কল্পনাতেও যা ছিল না। সে ছিল কলকাতার...। কে সে? এবার শুনব!

১৪

অ্যাকাউন্টের নাম shami witness !

দিনে ৮০ থেকে ১০০ টা ট্যুইট করা হত এই অ্যাকাউন্ট থেকে। এতই খুঁটিনাটি পোস্ট থাকত যে মনে হয়েছিল অ্যাকাউন্ট হোল্ডার একেবারে সিরিয়া কিংবা ইরাকের যুদ্ধকেন্দ্রেই বসে আছে। এবং পাঠাচ্ছে একপ্রকার লাইভ টেলিকাস্টই। ২০০৯ থেকে ২০১৪, পাঁচ বছরের অনলাইন জীবনে এই অ্যাকাউন্টের ফলোয়ার হাজার হাজার। ব্রিটেন, লেবানন, বেলজিয়াম, আমেরিকা, প্যারিস, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, তুরস্ক...। সিরিয়ার আইএসআইএসের যত ইংরাজি জানা ফাইটার ছিল তাদের সিংহভাগ, বলা যেতে পারে দুই তৃতীয়াংশ এই অ্যাকাউন্টের ফলোয়ার। সোজা কথায় এই অ্যাকাউন্ট যার, সেই ব্যক্তিটি একটা সময় হয়ে উঠেছিল আইএসআইএসের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী প্রচারক, ইসলামিক স্টেট প্রতিষ্ঠার সবথেকে সরব ও উদ্দীপনাপূর্ণ স্লোগান লেখক। তাকে সাদরে আইএসআইএসে যোগ দিতে ইচ্ছুক যুবক যুবতীরা নিজেদের প্রথম দীক্ষাগুরুর আসনে বসিয়েছিল। প্রতিদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ হত অন্তত ৫০ থেকে ৬০ জন আইএসআইএস এর ইংলিশ স্পিকিং সদস্যের। আর ঠিক এই কারণেই গোটা বিশ্বের সন্ত্রাসবিরোধী দুর্ধর্ষ গুপ্তচর সংস্থাগুলির মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কে এই লোক! খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ এই লোকটির একটি করে ট্যুইটের জবাবে হাজার হাজার নতুন নতুন জিহাদির জন্ম হচ্ছে। অনলাইন জেহাদি কমিউনিটির মধ্যে এই ব্যক্তিই বেস্ট গোটা বিশ্বে। ২০১৪ সালে যখন বিশ্বজুড়ে প্রবল সমালোচনা হচ্ছে আইএসআইএসের বিদেশি বন্দিদের ধরে ধরে শিরশ্ছেদ কর্মসূচির বিরুদ্ধে, তখন এই অ্যাকাউন্ট থেকে ৯ ডিসেম্বর ট্যুইট করা হল, আবু ঘ্রাইবের জেলে আমেরিকা আর সিআইএ যেভাবে অত্যাচার করছে তার থেকে ১০০ গুণ বেশি পবিত্র হল এই শিরশ্ছেদ কর্মসূচি। এই কুখ্যাত ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট গোটা বিশ্বের গোয়েন্দা আর গুপ্তচরদের ঘুম কেড়ে দিল। ব্রিটেনের এমআই সিক্স প্রথম তদন্তে নামল। এম আই সিক্স আধুনিক ইতিহাসের এক প্রসিদ্ধ গুপ্তচর সংস্থা। সাংঘাতিক শার্প, চূড়ান্ত প্রফেশনাল আর ঠান্ডা মাথার চারজন

গুপ্তচরকে দায়িত্ব দেওয়া হল এই লোকটিকে খুঁজে বের করতে। কে এই shami witness এর মালিক! একটি মাত্র ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট স্রেফ ইন্টারনেটে আইএসআইএসের জিহাদি কার্যসূচিকে বিখ্যাত করে দিচ্ছে, তার দেখানো পথে আক্রমণের প্ল্যান করা হচ্ছে, তার নির্দেশিত প্রতিশোধবার্তা অনুসৃত হচ্ছে সিরিয়া থেকে লেবানন সর্বত্র। এত শক্তিশালী এই অ্যাকাউন্ট।

২০০৯ সালের জুলাই মাসে প্রথম খোলা হয়েছিল এই ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট। নাম ছিল-'elsaltador' প্রাথমিকভাবে যে ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে এই অ্যাকাউন্ট খোলা হল সেটি ছিল elsaltador@gmail.com। ২০১০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে আচমকা গোটা পৃথিবীকে চমকে দিয়ে শুরু হল এক নতুন কূটনৈতিক বিস্ফোরণ। উইকিলিকস। একের পর এক রাষ্ট্রের নানাবিধ গোপন কালো অন্ধকার পদক্ষেপ আর দুর্নীতির পর্দাফাঁস শুরু হল। আর সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে এই ElSaltador নামক ট্যুইটার থেকে লাগাতার সেইসব শেয়ার করা হচ্ছিল। কারণ আমেরিকা ও প্রথম বিশ্বের দেশগুলির ভণ্ডামি আর দুর্নীতি ধরা পড়ছে। কিন্তু তার মধ্যেও সবথেকে বেশি যে বিষয়গুলিকে হাইলাইট করে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচার করা হত, সেগুলি ছিল আমেরিকার আফগানিস্তান ও ইরাকের উপরে হামলা সংক্রান্ত। যেখানেই বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সূত্রপাত অথবা প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ সেই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে জনমত গঠন করে আরও বেশি বেশি অনলাইন গ্রুপ যাতে একজোট হতে শুরু করে সেই চেষ্টাই এই ট্যুইটার মালিক করতে থাকে লাগাতার। যেমন ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে পোস্ট হতে লাগল মিশরের অভ্যুত্থান। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে চলল। প্রচার লিবিয়ার অভ্যুত্থানের পক্ষে প্রচার। আমেরিকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী যিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া ও ইরাকে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য জীবনকে বাজি রেখে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর ও জনপদে গিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছিলেন বহু নিরপরাধের, সেই পিটার কিসিং একদিন আইএসআইএসের জঙ্গিদের হাতে ধরা পড়লেন। আর তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের ভিডিও আইএসআইএস আপলোড করার কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটি ডাউনলোড করে নেয় ওই রহস্যময় ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট। তারপর সারাদিন ধরে একবার নয়, দু বার নয়, তিনবার

নয়...অজস্রবার দফায় দফায় সেই শিরশ্ছেদের ভিডিও শেয়ার করতে থাকে লোকটি। এই লোকটি নিজে বহু যুবককে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু নিজে কী করে? সে কী নিজেও এক ফাইটার? জানা যাচ্ছে না। শুধু এটুকু বোঝা যায় ব্যক্তিটি ব্রিটেনে থাকে এবং আদতে একজন লিবিয়ান। তার অ্যাকাউন্ট থেকেই সেটা স্পষ্ট। তার প্রধান লক্ষ্য হল ইওরোপের ইংরাজি জানা যুবক। তাদের সে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত নিয়েছে। আর সেই লক্ষ্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে সে দিনের পর দিন আরবি থেকে ইংরাজিতে জিহাদ সংক্রান্ত পোস্টগুলিকে যত্ন করে অনুবাদ করে আবার সেগুলিই পোস্ট করে যেত বৃহত্তর অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছনোর জন্য।

এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে এই ব্যক্তি এবার নিজেকে আরও ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে ২০১১ সাল থেকে। মনে রাখতে হবে ২০১৩ সালের আগে পর্যন্ত আইএসআইএস নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাত না। কারণ এই বিপুল ধ্বংসাত্মক চেহারা নিয়ে আইসিস আসেইনি তখনও। তাই ততদিন পর্যন্ত লোকটি প্রধানত সিরিয়ার শাসক আসাদের রাজত্বের বিনাশে যে বিদ্রোহী গোষ্ঠীরা জিহাদে নেমেছে, তাদের সমর্থনে পোস্ট লিখতে শুরু করে। যেমন জাবাহাত আল নুসরা। তাদের সমর্থক ছিল এই ব্যক্তি। কিন্তু ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সন্ত্রাস মানচিত্রে হাজির হয়েছিল নতুন এক নাম। আইসিস। এবং ক্রমেই দেখা গেল আসাদ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমী বিদ্রোহীতে দ্রুত পরিণত হচ্ছে আইসিস। যখন আসাদ সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র নিক্ষেপ করে নিরীহ শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, নাগরিকদের হত্যা করল, তখন এই ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট এতটাই গর্জে উঠল এবং এমনই গবেষণালব্ধ রিপোর্ট তৈরি করে অনর্গল পোস্ট করতে লাগল, যে মনে হল এই লোকটি সাংঘাতিক শিক্ষিত এবং গবেষক। থাকে ব্রিটেনে। একজন লিবিয়ান। এমনকী আসাদের ওই রাসায়নিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তার লেখা ট্যুইটকে রীতিমতো কোট করে ব্রিটেনের বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফও উল্লেখ করল ২০১৩ সালের ১১ অক্টোবরের এক আর্টিকলে। ফলে আরও বিখ্যাত হল এই shamiwitness |

ততদিনে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে একাধিক আইসিস এবং আইসিস নয় এরকম বিদ্রোহী ফাইটারদের। টুইটারের মাধ্যমে আলাপচারিতা চলে। যার নাম ডাইরেক্ট মেসেজিং। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আবু ফুলহান, আবু দুজানা এবং আবু সুমায়া। সব ধরনের জিহাদি তার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ কোন পথে যেতে হবে, কোন গ্রুপের কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ, কেন আল কায়েদার সঙ্গে আইসিসের নীতিগত দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নিখুঁত এবং পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ একমাত্র এই লোকটি দিতে পারে। আর তাই তার ফ্যান ফলোয়ার বাড়ছে। ঠিক তখন ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে আইসিস এবং অন্য গ্রুপের বিদ্রোহীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রবল অন্তর্কলহ। আর তখন কোনো দ্বিধা না করে এই টুইটার অ্যাকাউন্টের মালিক সম্পূর্ণভাবে পক্ষ নিয়ে নিল আইসিসের। প্রকৃত আদর্শ ইসলামিক স্টেট আনতে পারবে আইসিস। সে ঘোষণা করল। আর তার ফলোয়ার তখন ১৩ হাজার ক্রস করেছে। সুতরাং তার মতামতের প্রভূত মূল্য। আরও বেশি করে সে এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারল। কারণ এই লোকটি এতদিন যেখানে থাকতো সেটি ছিল শেয়ার করা ঘর। একার জন্য কোনো ঘর ছিল না। এখন হল। সে সম্পূর্ণ নিজের ঘর পেল। কোথায়? ভারতের বেঙ্গালুরুর জালাহালি ওয়েস্ট, আয়াপ্পা নগর। সে কী? এই দুনিয়া কাঁপানো লোকটি ব্রিটেনে থাকে না? লিবিয়ার মানুষ নয়? না। লোকটি আসলে মধ্যবয়স্ক কিংবা ম্যাচিওরড কোনো গম্ভীর লোকও নয়। এক ঝকঝকে যুবক। নাম মেহদি মসরুর বিশ্বাস। থাকে বেঙ্গালুরুর আয়াপ্পা নগর। ভাড়ায় নেওয়া ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাট। নিজের বাড়ি কোথায়? কলকাতার কৈখালি! সে লিবিয়ান নয়। বাঙালি!

সোদপুরের গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাশ করা ছাত্র মসরুর মেহদি বিশ্বাস ২০১২ সালেই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে একটি চাকরি পেয়ে গেল। আইটিসি লিমিটেডের ফুড ডিভিশনের ইন প্ল্যান্ট ট্রেনি। আদতে তার কাজ করার কথা ছিল এফসিপিএল বিস্কিট প্ল্যান্টে। কিন্তু হঠাৎ একটা প্রজেক্ট চলে আসায় আইটিসি লাইফ সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টারের স্ন্যাকস ডিভিশনে জয়েন করতে হয়েছে। ২০১২ সালের জুন মাসে। তার মানে ২০০৯ সালে যখন সে ধীরে ধীরে তার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে এবং প্রাথমিক অ্যাকাউন্ট খুলে পা রাখছে এক নতুন

দুনিয়ায় তখনও সে ফার্স্ট ইয়ারের এক টিন এজার। প্রথম দু বছর ডেজিগনেশান ছিল জুনিয়র ট্রেনি। আর তারপর কনফার্ম হওয়ার পর এক্সিকিউটিভ। সামান্যরকম কোনো কাজে ফাঁকি দিতে দেখা যায়নি মেহদিকে। বরং অন্যদের থেকে অনেক বেশি পরিশ্রমী। সিরিয়াস। ঠিক সকাল সাড়ে ৮ টায় প্ল্যান্টে চলে এসে রাত আটটা পর্যন্তও কাজ করতে দেখা গিয়েছে তাকে। আর তার কাজে সকলেই খুশি। কনফার্মড হওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের কোনো একক ফ্ল্যাট ছিল না। কিন্তু একবার কনফার্মড হয়ে রেগুলার পে রোলে চলে আসার পরই মেহদি সবার আগে যে কাজটি করল সেটি হল বাড়ি পরিবর্তন। আয়াপ্পা নগরের এস এম রোডে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। আর এই বাড়িতে এসে প্রথমে সে নিয়েছিল এয়ারটেল অয়্যারলাইন ব্রডব্যান্ড কানেকশন। ২০১২ সালে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টের সময়ই সে কিনেছিল একটি ল্যাপটপ কলকাতা থেকে। আর তারপরই ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট ElSaltador থেকে লাগাতার ট্যুইট শুরু হল। তারপরই সে বদলে দিল তার অ্যাকাউন্ট। কারণ তখন সন্ত্রাসের আকাশে এসেছে নতুন এক বাজপাখি। আইসিস। নতুন অ্যাকাউন্ট হল shami witness। ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত তার অ্যাকাউন্টের জনপ্রিয়তা।

সোস্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় সারাক্ষণ আমরা বসবাস করলেও আমাদের অজান্তে ইন্টারনেটে ক্রমাগত ঘটে চলেছে এক মহাযুদ্ধ। বিস্ময়কর এই নতুন মহাজগতের সবথেকে সিক্রেট যুদ্ধের নাম ডক্সিং (doxing)। স্পাই, চোর, সন্ত্রাসবাদী, পারস্পরিক শত্রু রাষ্ট্র, হ্যাকার...। এরকম হাজারো চরিত্র এই ডক্সিং মহারণের যোদ্ধা। যখনই কোনো প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য বিশেষ প্রযুক্তি আর হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিয়ে প্রকাশ্যে ফাঁস করে তাকে বিপদে ফেলা হয় অথবা প্রকৃত পরিচয় কিংবা গোপন কাজকর্ম ফাঁস করে দিয়ে চরম বেইজ্জতি করার কাজে সাফল্য পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় ডক্সিং। সাইবার দুনিয়া জুড়ে দেখা যাবে ছদ্মনাম, ছদ্ম পরিচয়, ছদ্ম অ্যাকাউন্ট, জাল অ্যাকাউন্ট, ইমপার্সোর্সেশন ইত্যাদি। ডক্সিং হল বিশ্বের ত্রাস সন্ত্রাসবাদী সংস্থা আইসিএসের সবথেকে আধুনিক অস্ত্র। শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য। আইএসআইএসের হ্যাকার ডিভিশন সারাক্ষণ আমেরিকা অথবা অন্য শত্রু দেশের সামরিক জওয়ানদের ব্যক্তিগত নথিপত্র অনলাইনে

সংগ্রহ করে সেগুলি ফাঁস করে আমেরিকায় থাকা আইসিস অনুগামীদের প্ররোচনা দেয় এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। আবার পালটা 'ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ফ্রেন্ড' জাতীয় কিছু গ্রুপ অনবরত এই সন্ত্রাসের কারবারিদের গোপন মুখোশ খুলে দেয়। এই প্রক্সি ওয়ার সাংঘাতিক নির্মম অনলাইনের ময়দানে। কোড ল্যাংগুয়েজে দেওয়া হয় হত্যার নির্দেশ। জানিয়ে দেওয়া হয় টার্গেটের সম্ভাব্য লোকেশন। তাই কখনও দেখা গিয়েছে একটি মানুষ পার্কিং লটে গাড়িতে ঢুকতে গিয়ে আচমকা গুলি খেয়ে নিহত হয়েছে। কে মারল তাকে? কেন? কেউ জানতে পারে না। সিঁড়ি থেকে রহস্যময়ভাবে পড়ে যায় কোনো ব্যক্তি। কেউ কি ধাক্কা মারল? রহস্যই রয়ে যায়। কে পাঠাল ক্যুরিয়ারে বোমা? যা নিয়ে র‍্যাপার খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ! জানা গেল না। এসবই হয় গোপন অনলাইন প্রক্সি ওয়ারে। এমনকী পাসওয়ার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের ইউজার আইডি জানার প্রবল লড়াই চলে যাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করা যায় শত্রুপক্ষকে। তাই সোস্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যে কোনো ফাঁদে পা দিতে হয়। যে কোনো অজানা আধাচেনা গ্রুপের ফাঁদে পা দিয়ে অনেকেই প্রবল মতান্তর আর ঝগড়ার মধ্যে ঢুকে পড়েন না জেনে। অজান্তেই শত্রুপক্ষ বানিয়ে ফেলা হয়। আর তারপর শুরু হয় ডক্সিং। একদিকে ডক্সিং এবং অন্যদিকে আবার অসংখ্য ঘোস্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জিহাদের প্রচার। আইসিসকে কিছুতেই প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। ঠিক সেই সময় আচমকা হাজির হল অনলাইন দুনিয়ায় এক রহস্যময় গ্রুপ। নামটিও সেরকমই মানানসই। অ্যাননিমাস (anonymous)। এই গ্রুপ গোপনে ইন্টারনেটে রিসার্চ শুরু করে এবং খুঁজে বের করে ফেলল দাহেশের (আইএসআইএস) একের পর এক গোপন মুখোশ পরা অ্যাকাউন্ট। এভাবে তারা তৈরি করে ফেলল এক ক্যাম্পেন-daeshbags। প্রায় ৫ হাজারের বেশি ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে অ্যাননিমাস ফাঁস করে দিল তাদের আসল রূপ। সবই আসলে আইএসআইএসের গোপন মুখ। এভাবে অ্যাননিমাসের আগ্রাসী আক্রমণে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল আইসিসের অনলাইন ক্যাম্পেন। কারণ একটির পর একটি অ্যাকাউন্টকে ফাঁস করে দিচ্ছে তারা। আর ট্যুইটার সংস্থা সেইসব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে নিমেষে। সুতরাং সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ছে ক্যাম্পেনে।

অনলাইনই হল আইএসআইএসের মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির কাছে সবথেকে জোরাল রিক্রুটমেন্ট সেল। সেটাই যদি ধাক্কা খায় তাহলে তা হবে সর্বনাশ। একদিকে কয়েকটি এরকম গোপন অ্যান্টি টেররিস্ট ডক্সিং ফোর্স, আবার পাশাপাশি আমেরিকার সিআইএ, ইজরায়েলের মোসাদ, ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানাসিসিস উইং এবং ব্রিটিশ এম আই সিক্সের মতো তুখড় গুপ্তচর সংস্থাগুলির অনবরত নজরদারি, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অনলাইন চেজিং। এর মধ্যেই ব্রিটেনের বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ফোর নামল এক গোপন অপারেশনে। এই যে প্রবল জনপ্রিয় ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট shami witness এই লোকটি কে? জানতে হবে। প্রথম তাদের তদন্ত শুরু হল ElSaltador অ্যাকাউন্টকে টার্গেট করে। এটা কার ছিল? এই অ্যাকাউন্টের পিছনের জি মেইল অ্যাকাউন্ট কী? মাত্র আটদিনের মধ্যে জানা হয়ে গেল ওই জি মেইল অ্যাকাউন্টের আই পি অ্যাড্রেস ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরুর। চ্যানেল ফোরের পক্ষ থেকে নিজেদের আইএসআইএস সমর্থক আখ্যা দিয়ে এবং সেভাবেই পরিচয় দিয়ে ওই মেইল আইডিতে একের পর এক মেইল পাঠানো শুরু হল। আসলে ফাঁদ!

২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে। মেহদি বেঙ্গালুরুর আয়াপ্পা নগরে বসে চমকে উঠল। কারণ এই জি মেইল আই ডি সে কখনওই তার বর্তমান ট্যুইটার অ্যাকাউন্টে দেয়নি। এখন সে শামি উইটনেস। শামি উইটনেসের সঙ্গে এল স্যালটাডোরকে মিশিয়ে ফেলছে কে? কারা? কেন? এই প্রথম ভয় পাচ্ছে মেহেদি। কেউ কি ফলো করছে তাকে? সে দুদিন অপেক্ষা করে তৃতীয় দিন চ্যানেল ফোরের ট্র্যাপ মেলের জবাবে পালটা মেল করে জানিয়ে দিল আপনারা ভুল নামে ভুল লোককে মেল পাঠিয়েছেন। কিন্তু একটাই ভুল করে রেখেছে মেহদি। সে এই একই জি মেইল অ্যাকাউন্ট দিয়েই নিজের আসল ফেসবুক অ্যাকাউন্টও খুলেছিল। elsaltador@gmail.com। আর ততদিনে চ্যানেল ফোর দেখে নিয়েছে এই জি মেইল দিয়ে কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা আছে। সেটি মেহদির। তাই চ্যানেল ফোর এবার অন্য রাস্তা নিয়েছে। তারা একটি জাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেলল। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম দেওয়া হল আমির হাসান। জাল নাম। এবং পরিচয়লিপিতে লেখা হয়েছিল গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, সোদপুর।

অর্থাৎ মেহদির নিজেরই কলেজে। আমাদের যে কেউ নিজেদের স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী দেখলে অচেনা ফেসবুক ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে ফেলি। কারণ একটা দুর্বলতা থাকেই যে আমার স্কুল, আমার কলেজের পড়ুয়া। আচ্ছা অ্যাকসেপ্ট করেই ফেলি। আমির হাসানকে চিনতে পারেনি মেহদি। কিন্তু ভেবেছে নিশ্চয়ই জুনিয়র কেউ। তাই বিনা দ্বিধায় অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। আর চ্যানেল ফোর উল্লসিত। কারণ ফাঁদে পা দিয়েছে মেহদি। এই ঘটনা ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের। যেইমাত্র চ্যানেল ফোর নিশ্চিত হয়ে গেল শামি উইটনেস, এল স্যালটাডর, এল স্যালটাডরঅ্যাটজিমেইল ডট কম এরা সবাই আসলে যে ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি লন্ডন, লিবিয়া, লেবানন কিংবা তুরস্কের কেউ নয়। ভারতের বেঙ্গালুরুর। মাত্র ২০ দিনের মধ্যেই চ্যানেল ফোরের ডক্সিং কার্যকলাপ সম্পূর্ণ সফল। ঠিক ১১ ডিসেম্বর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মেহদি একটি মেসেজ পেল। যেখানে লেখা, আমরা তোমার সব জেনে ফেলেছি। আজ সন্ধ্যায় আমাদের নিউজ বুলেটিনে তোমার সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস করা হবে। উই আর গোয়িং টু এক্সপোজ ইউ বয়..। আমরা জানি তোমারই অ্যাকাউন্ট হ্যাশট্যাগ শামি উইটনেস!

মেহদি আতঙ্কিত। সে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। প্লিজ। আমি আজই ওই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছি।

চ্যানেল ফোর থেকে বলা হল একটা শর্তে তোমার গোপনীয়তা আমরা রক্ষা করতে পারি। আমাদের একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে। তোমার মুখ দেখাব না। পরিচয় গোপন রাখব। আশ্বস্ত মেহদি। সে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল আমি রাজি। কিন্তু সম্পূর্ণ কথা রাখল না চ্যানেল ফোর। সেই ইন্টারভিউর সময় ফেসবুকে থাকা মেহদির ছবি ধূসর করে আবছাভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু নাম দেখানো হল আসল। মেহদি। এবং আরও বড় সর্বনাশ হল সেখানে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল বিশ্বত্রাস ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাশট্যাগ শামি উইটনেস আর কেউ নয়, ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরুর এক টেকি ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ। ব্যস! গোটা ইন্টারভিউ দেখানো হল সিরিয়াল করে করে। অর্থাৎ একাধিক এপিসোডে। ব্যস! অনলাইন জুড়ে ঝড় উঠল। কারণ ততদিনে শামি উইটনেসের যেমন পক্ষে

ফলোয়ার ছিল হাজার হাজার..তেমনই আবার হাজার হাজার তার বিপক্ষেও ছিল। যাদের বলা যেতে পারে হেটার। এই প্রচারকে ঘৃণা করে তারা পালটা লাগাতার এই অ্যাকাউন্টের বিপক্ষে পালটা ট্যুইট করে গিয়েছে। এবার যেই মেহদি নাম এবং বেঙ্গালুরুর এক্সিকিউটিভ নামটা প্রচারিত হয়ে গেল তখন আর দেরি হল না আসল মানুষকে খুঁজে বের করতে। আর সোস্যাল মিডিয়া জুড়ে শুরু হল চরম বিরুদ্ধ প্রচার। আতঙ্কগ্রস্ত কলকাতার শহরতলিতে বড় হয়ে ওঠা এক তরুণ দিশাহারা হয়ে গেল গোটা বিশ্বের থেকে এই আক্রমণের সামনে। পরদিন ১২ ডিসেম্বর সে বাধ্য হয়ে ভয়ে ডি অ্যাক্টিভেট করে দিল ফেসবুক। সেদিন রাত ১২টা ৩২ মিনিটে নিজের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট (shami witness) বন্ধ করে দেওয়ার আগে শেষবারের মতো একটি অ্যাকাউন্টে সে মেসেজ পাঠাল। এবার অবশ্য ট্যুইটার ডাইরেক্ট মেসেজের মাধ্যমে। ওই আবু সাদকে জানিয়ে দিল আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। ওরা এটাও জেনে গিয়েছে যে আমি ইন্ডিয়ান। একথা বলার পর মেহদিও আকাশ থেকে পড়েছিল। কারণ আবু সাদ পালটা মেসেজে জানাল, তোমাকে বলা হয়নি আমিও ইন্ডিয়ান। তাদের তিনজনের একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছিল আর একজন ছিল তালাব আল হক। মেহদির ধারণা ছিল বাকি দুজনই প্রত্যক্ষ ফাইটার। এবং ইন্ডিয়ান সে একা। এই দুজন এত দুর্ধর্ষ আরবি বলত যে কারও সামান্যতম সন্দেহ হবে না এরা ইন্ডিয়ান। মেহদি বুঝে গেল তাদের খেলা শেষ। গোটা অনলাইন জগৎ আসলে ভারচুয়াল এক মিথ্যার দুনিয়া। কাকে বিশ্বাস করেছিল সে?

ক্লু বলতে শুধুমাত্র এটাই যে সন্দেহভাজনের নাম মেহদি। সে বেঙ্গালুরুতে থাকে। আর একটি কোম্পানির এক্সিকিউটিভ। এটুকু সম্বল বেঙ্গালুরু পুলিশের কাছে। শুধু এই ইনফরমেশন নিয়ে বেঙ্গালুরুর মতো কসমোপলিটন শহরে কোনো মানুষকে খুঁজে বের করা কি সম্ভব? এই শহর তো লক্ষ লক্ষ বহিরাগতদের ঠাঁই দিয়েছে। অজস্র কর্পোরেট অফিস। অজস্র মেহদিও আছে। বেঙ্গালুরু পুলিশ সাইবার সেল প্রথমেই স্থির করল একটা স্পেশাল সফটওয়্যার ব্যবহার করার। সেটির মাধ্যমে ফেসবুকে একটা সার্চ চালানো হল কারা কারা সুপারম্যানের টি শার্ট পরে প্রোফাইল পিকচার করেছে। কারণ চ্যানেল ফোরের ইন্টারভিউতে দেখা গিয়েছে মেহদি নামক লোকটির প্রোফাইল পিকচারে সুপারম্যানের টি

শার্ট। সুপারম্যান এমন একটি চরিত্র যে দুটি পৃথক জীবন যাপন করে। ঠিক মেহদিও তাই করে এসেছে। দিনে সে সাংঘাতিক মনোযোগী এক পরিশ্রমী এক্সিকিউটিভ। কম কথা বলা, নিরীহ দর্শন। আর রাতে সেই হয়ে যেত বিশ্বের এক কুখ্যাত সন্ত্রাস প্রচারক। কারণ মেহদির মোবাইল নম্বর বা লোকেশন সার্চ করা যাচ্ছে না। দেখাচ্ছে না কোনো আইপি অ্যাড্রেস। তাহলে? আর কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব? সোর্স একটাই। চ্যানেল ফোরের ইন্টারভিউ বারংবার দেখা। যদি কিছু আন্দাজ করা যায়। আরও স্পেসিফিক! একবার... ...দুবার...ি ..তিনবার....চারবার....। বারংবার দেখে আচমকা তিনটি বাক্য শুনে ভয়েস অ্যানালিসিসে পাঠানো হল। দেখা গেল কণ্ঠস্বরটি ২৩ থেকে ২৬ বছরের কোনো যুবকের। বাহ! তাহলে ফেসবুক সার্চে যত সিনিয়র পজিশনের কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ বেঙ্গালুরুতে আছে যাদের নাম মেহদি, তাদের বাদ দেওয়া যেতে পারে। শুধু এই বয়সের রেঞ্জের মেহদিদের রাখা হল সন্দেহের তালিকায়। তা সত্ত্বেও অনেকই হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখনই মোক্ষম এক ক্লু এল নজরে। মেহদি চ্যানেল ফোরে যে চ্যানেল ইন্টারভিউ দিয়েছে সেটির অংশবিশেষ হল এরকম—চ্যানেল : ফোর তোমার ভয় করল না এসব করতে? তোমার মনে হয় তুমি কিছু ভুল করেছ?

মেহদি : না। আমি কোনো ভুল করিনি। আমি কাউকে নিজে কোনো ক্ষতি করিনি। আমি আমার দেশের কোনো আইন ভঙ্গ করিনি। আমি নিজের দেশের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধও ঘোষণা করিনি। তাহলে আমার কেন অপরাধী মনে হবে নিজেকে?

চ্যানেল ফোর : কিন্তু তোমাকে নিয়ে গোটা বিশ্ব উত্তাল—সকলে তোমার সমালোচনা করছে!

মেহদি : সেটা একসময় থেমে যাবে। আসলে এই প্রথম আমার মতো এক মুসলিম যুবককে দেখা যাচ্ছে এরকম ইংরাজিতে কমিউনিকেট করতে । সেটা সহ্য হচ্ছে না আমাদের শত্রুদের। তাই এই আক্রমণ। আমি নিজের দেশ বা এই দেশের বন্ধুদের বিরুদ্ধে একটাও কথা উচ্চারণ করিনি তো! তবু পুলিশ আসবে আমার কাছে।

চ্যানেল ফোর : কেন একথা মনে হচ্ছে তোমার?

মেহদি : কারণ আমি শুনছি আমাকে খোঁজা হচ্ছে। হয়তো ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে শোনা হচ্ছে ইন্টারভিউ। চেনা যাচ্ছে না মেহদিকে। কারণ ইন্টারভিউ দেওয়ার শর্তই দিয়েছিল সে তাকে যেন আড়াল করা। তাই তার মুখ আবছা ব্লার করে দেওয়া হয়েছিল। কথা স্পষ্ট। মুখ আবছা। কিন্তু মেহদি চ্যানেল ফোরে যে সাক্ষাৎকার সাইমন ইজরায়েলকে দিয়েছে সেই প্রশ্নোত্তর পর্বে তার প্রতিটি উত্তরের মধ্যে স্পষ্ট একটি বিশেষ উচ্চারণের ধাঁচ। কী হতে পারে? ভ্রু কুঁচকে যাচ্ছে বেঙ্গালুরু গোয়েন্দাদের। আচমকা এক ঝলকে মনে হল। ইয়েস!! ...মেহদির মধ্যে রয়েছে বাঙালি উচ্চারণ! বড় অংশের বাঙালির মধ্যেই প্রাথমিকভাবে হিন্দি ও ইংরাজিতে কখনও সখনও অবশ্যই টিপিক্যাল বাঙালি উচ্চারণ বেরিয়ে আসে। বেঙ্গালুরুতে প্রচুর বাঙালির বাস। তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগও প্রচুর পুলিশের। মেহদির উচ্চারণ যে বাঙালি সেটি মনোযোগ দিয়ে বোঝা সম্ভব হল। সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুক সার্চ আবার। পেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হল হ্যাঁ। এই ছেলেটি বাঙালি। মেহদি মসরুর বিশ্বাস। কলকাতায় বাড়ি। তারপরই সোদপুরের গুরুনানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে খোঁজ মিলে গেল তাও। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪, আয়াপ্পা নগরের ওয়ান রুম স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে বেঙ্গালুরু পুলিশ হানা দিল। ৬ মাস জেরা আর তদন্তের পর মেহদির বিরুদ্ধে কত বড় চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল?

৩৭ হাজার পৃষ্ঠার!

১৫

ডেডবডিটা একটু আগে দেখা গেল। কয়েক ঘণ্টা আগে কিন্তু ছিল না। ভাবছিল লছমন। অসম্ভব ঠান্ডা পড়েছে। আর তেমন কুয়াশা। ইন্দোরের ট্রেনটা একটু আগেই চলে গেল। তবে লেট। আপাতত এরকমই চলবে। অন্তত এই দেড় মাস তো টাইমের কোনো ঠিক থাকবে না জানা কথা। প্রায় সব ট্রেনই তিন চার পাঁচ ঘণ্টা মিনিমাম লেট। কী করা যাবে? এত কুয়াশা। প্রায় জিরো ভিজিবিলিটি। এক হাত দূরের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে না। সেই কুয়াশা ভেদ করে গ্যাংম্যান লছমন ভাঙ্গি ছুটছে। ছুটতে ছুটতে আসছে মাকসি স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের দিকে। পড়িমড়ি করে। একটু পর আবার একটা ট্রেন আসবে আপ লাইনে। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে। প্রাণপণ দৌড়নোর ফলে লছমনের কপালে, মুখে ঘাম জমছে। শ্বাস দ্রুত। রেললাইন ধরেই ছুটছে লছমন। উজ্জয়িনীর কাছে এই মাকসি স্টেশনের স্টেশনমাস্টার সবেমাত্র চা নিয়ে বসেছেন। শীতকালে সমস্যা হল এত তাড়াতাড়ি পেপার আসবে না। ৯ টার প্যাসেঞ্জারে পেপার পাওয়া যেতে পারে। ততক্ষণ অপেক্ষা। একটু আগেই খবর এসেছে আপ ট্রেনটা আরও ৫০ মিনিট লেট। হাতে টাইম আছে। সকালের দিকটাই যা একটু চাপ বেশি। দিল্লি, জম্মু, ভোপাল থেকে ট্রেন রাতের দিকে ছেড়ে আসে, সেগুলো এই ভোর ভোর এখান থেকে পাস করে। বেশিরভাগ অবশ্য স্টপেজ নেই। তবে সিগন্যালিংটা ইমপরট্যান্ট। বিশেষ করে এই শীতকালে। ৭ জানুয়ারি ২০১২। লছমন ভাঙ্গিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘুরে ঢুকে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল স্টেশনমাস্টারের। আবার কী হল? লছমন জানাল, সাব, বডি পড়ি হ্যায়..ট্র্যাককে বাহার। লেড়কি! স্টেশনমাস্টার চা শেষ করছেন। আবার বডি? এই এক জ্বালাতন। সবাই হয় সুইসাইড করতে ট্রেনকেই বেছে নেয়, আর নয়তো মার্ডার করে ট্রেনের লাইনে ফেলে রেখে যায়। যত ঝামেলা রেলের। এখন হ্যাপা সামলাতে হবে। বডি তোলা, জিআরপি ডাকা, হসপিটালে পাঠানো। সবথেকে বড় কথা মেমো তৈরি করে পাঠাতে হবে এখনই। কতক্ষণ লাইন বন্ধ রাখতে হবে কে জানে! যন্ত্রণার একশেষ! লছমন জানাল, বেশি বয়স না সাব। জওয়ান লেড়কি! কিছুক্ষণের মধ্যে জিআরপির সাব

ইনস্পেক্টর, স্টেশনমাস্টার, গ্যাংম্যান লছমনরা এসে ভালো করে লক্ষ করল। মেয়েটির পরনে লাল কুর্তা। তার উপর ভায়োলেট আর গ্রে রঙের একটা পিউমা জ্যাকেট। দেখে তো মনে হচ্ছে আত্মহত্যাই। তবে জায়গায় জায়গায় জামা কাপড় ছেঁড়া। ঝাঁপ দিয়েছে? নাকি মার্ডার? রেপও হতে পারে। আজকাল তো এসবই হচ্ছে। কিন্তু লাইনের এতটা বাইরে কেন? ছিটকে গিয়েছে? তাই হবে! ইসস! এত বাচ্চা বয়সে এসব যে কেন করে আজকালকার মেয়েগুলো? ভাবছিলেন স্টেশনমাস্টার। বডি পাঠানো হল মর্গে। দুদিন পর পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট জানাল ফিমেল, ২১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বয়স। নাকের নীচে শুকনো ব্লাড জমা। জিভ চোয়ালের মাঝখানে বেঁকে আছে। উপরের দিকে দুটো দাঁত মিসিং। ঠোঁট আড়াআড়ি ফাটা। মুখে কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাচ্ছে। পোস্ট মর্টেমের শেষ বাক্য, ইন আওয়ার ওপিনিয়ন, মৃত্যু হয়েছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। কোনোভাবে সাংঘাতিক দমবন্ধ করে রাখা হয়েছিল মৃতকে। সুতরাং আইনের পরিভাষায় একে বলা হয় হোমিসাইড। হত্যা। অর্থাৎ মেয়েটি আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু কে এই মেয়ে? এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ ধরে আন আইডেন্টিফায়েড। নামপরিচয়হীন। কেউ আসছে না খোঁজ করতে। আর কতদিন রাখা সম্ভব মর্গে? বেওয়ারিশ হয়েই থাকবে? ঠিক ২৩ দিনের মাথায় মেহতাব সিং দামোর নামের এক অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক এলেন উজ্জয়িনী হাসপাতালের মর্গে। দেখলেন সেই বড়ি। এবং কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ওই মৃতদেহ তাঁর কন্যার। ১৯ বছরের নম্রতা। ইন্দোরের কলেজ থেকে সে ছিল নিখোঁজ। কলেজ থেকেই বাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছিল যে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্দোরের মহাত্মা গান্ধী মেডিকেল কলেজের ডাক্তারির ছাত্রী নম্রতা জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় দিনে একদিন আচমকা উধাও হয়ে যায়। মেহতাব দামোর মেয়ের বড়ি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। এবং এক সপ্তাহ পর আবার পুলিশের কাছে এসে বললেন, আমার মেয়ের হত্যাকারী কে? তদন্ত করছেন না কেন? আমি এফআইআর করতে চাই। পুলিশ জানাল একটা কেস তো হয়েই আছে। আমরা দেখছি। ১০ দিন পর তাঁকে ডেকে পাঠানো হল। এবং পুলিশ জানাল, আগের পোস্টমর্টেম ভুল। খুনটুন কিছু না। দেখা যাচ্ছে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। মেহতাব দামোর বিস্মিত। বললেন, খামোখা আত্মহত্যা করবে কেন? প্রবলেম তো কিছু

থাকলে জানতে পারতাম আমরা। আমাদের জানায়নি কিছু। এমনকী খ্রিস্টমাসে এসে বাড়িতে আনন্দ করলাম সবাই মিলে। হঠাৎ কী হবে? পুলিশ অফিসার হেসে জানালেন, সব কিছু কী আর বাবা মাকে জানায় ছেলেমেয়ে? কতরকম ব্যাপার থাকে। অযথা আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কী? যান বাড়ি যান। মেহতাব দামোর মাথা নীচু করে ফিরলেন। কেস ক্লোজ হয়ে গেল।

তিন বছর পর। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ মধ্যপ্রদেশের মফসসল এলাকার মেহনগরে এসে হাজির ৩৮ বছরের এক যুবক। নাম অক্ষয় সিং। এসেছে দিল্লি থেকে। আজ তক টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক। পরিচিত মুখ। এনার্জেটিক। তিনি হলেন আজ তকের ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্য। যে কোনো রহস্যময় ঘটনার তদন্তমূলক রিপোর্ট করতে সিদ্ধহস্ত। সেই তিনি মেহতাব দামোরের বাড়ির ঠিকানা জানতে চান। দেখা হল। নম্রতার মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে চান অক্ষয়। কীভাবে মৃত্যু হল মেয়ের? নম্রতা কবে এবং কীভাবে মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছিল? মেহতাব দামোর ভেবেছিলেন এবার বোধহয় মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে কোনো সুরাহা হবে। তিনি যা জানেন সব বললেন। সমস্ত কাগজপত্র দিতে চাইলেন অক্ষয় সিংকে। মেহতাব সিং দামোর বসেছিলেন একটি আর্মচেয়ারে। সামনে বেতের সোফায় বসলেন অক্ষয়। সামনে টিভি চলছে। চলছে ইন্টারভিউ। কাগজগুলো ফোটোকপি করাতে হবে। স্থানীয় দোকান থেকে ফোটোকপি করে আনাও হল। ইন্টারভিউ শেষ। এবার চা আসছে। একটি ট্রেতে করে এল চা। কয়েক চুমুকেই প্রায় চা শেষ করলেন অক্ষয় সিং। এবার যেতে হবে গোয়ালিয়র। সেখানে একটি যুবকের অস্বাভাবিক অন্তর্ধান হয়েছে। এই একই তদন্তের অঙ্গ সেটিও। তাই চলে যাওয়ার জন্য রেডি অক্ষয় সিং। শেষ প্রশ্ন করতে যাবেন। হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে ফেনা বেরোতে শুরু করল। চোখ বিস্ফারিত।বুক চেপে বসে পড়লেন। দামোর হতভম্ব। এ কি হল! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই অক্ষয় সিং মারা গেলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন আগের মুহূর্তেও। অক্ষয় সিং কীসের তদন্ত করছিলেন? মধ্যপ্রদেশ ব্যবসায়িক পরীক্ষা মণ্ডলের অধীনে যত চাকরি ও উচ্চশিক্ষায় ভর্তির পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহ দুর্নীতি আর অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত করতে চাইছিলেন অক্ষয় সিং। তিন বছর আগে

উজ্জয়িনীর কাছে রেললাইনে পড়ে থাকা মৃত নম্রতা দামোরের সঙ্গে সম্পর্ক কী এই তদন্তের? তাঁর বাড়িতে কেন এলেন তিনি? কারণ হিসাবে জানা গেল বিস্ফোরক তথ্য। নম্রতা নাকি ঘুরপথে দুর্নীতির মাধ্যমে কীভাবে মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়া যায় তা জানত। যখন জেনেছিল যে তাঁকে পুলিশ জেরাও করতে পারে, তারপরই কি সে উধাও হয়ে গেল? কিন্তু ১৯ বছরের মেয়েটির মৃত্যু হল কীভাবে? কে হত্যা করল? আত্মহত্যা কি সম্ভব? এসব প্রশ্ন সঙ্গে করে সেই মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করতে এসেছিলেন অক্ষয়। আর একইভাবে রহস্যময়ভাবে মারা গেলেন সেই সাংবাদিক। বিচ্ছিন্ন ঘটনা? কাকতালীয়? একেবারেই নয়। কারণ ২০১০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ এই নিয়োগ পরীক্ষার অনিয়ম আর দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত হয়েছে অভিযুক্ত হিসাবে, সন্দেহভাজন হিসাবে, অপরাধী হিসাবে, মিডলম্যান হিসাবে, এজেন্ট হিসাবে...তাঁদের মধ্যে একের পর এক ছাত্র, পুলিশ, কলেজের ডিন, অধ্যাপক, রাজ্যপালের সচিবের পুত্র, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের ঘনিষ্ঠ আমলা, ডাক্তারের রহস্যময় মৃত্যু হয়েছে। কতজন? অন্তত ৪৮! সেই তদন্তে নেমেছিলেন অক্ষয় সিংও। নম্রতা সিং দামোরের মৃত্যুকে প্রথমে হত্যা বলা হয়েছিল। পরে সেটি আত্মহত্যা হয়ে গেল কীভাবে? তদন্তে জানা গেল মধ্যপ্রদেশ পুলিশ নম্রতা দামোরের দ্বিতীয় পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট তৈরি করেছিল। বাবা মেহতাব দামোর মেয়ের বডি নিয়ে এসে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার কীভাবে সম্ভব পোস্টমর্টেম? এখানেই শেষ নয় রহস্য। গোটা বিশ্বের অপরাধের ইতিহাসে সম্ভবত এটাই একমাত্র ঘটনা যেখানে কোনো পোস্টমর্টেমে লেখা হয়েছে বিস্ময়কর কজ অফ ডেথ! কজ অফ ডেথ মানে মৃত্যুর কারণ কী। পোস্টমর্টেমের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তো ওটাই! নম্রতার দ্বিতীয় পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে লেখা ছিল, মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা...প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছে এই মেয়েটি! পোস্টমর্টেমে কখনও জানা সম্ভব কেউ আত্মহত্যা করেছে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে?

একটি চাকরি আর হায়ার স্টাডিজের পরীক্ষা কেলেঙ্কারি এরপরই ঘুরে গেল এক ভয়ংকর ক্রাইম থ্রিলারের দিকে! স্বাধীন ভারতের অপরাধ ইতিহাসে ভয়াবহ এই সিরিয়াল ক্রাইম থ্রিলারেরই নাম ব্যাপম মিস্ট্রি!!

সিস্টেমটার নাম ইঞ্জিন-বগি সিস্টেম! জানা গেল ২০১৩ সালে। সকাল সাড়ে ৮টা। ইন্দোর শহরের বাইরেই হোটেল পথিক। রুম নম্বর ১৩। স্নান করে রেডি হচ্ছে এক যুবক। দ্রুত বেরোতে হবে তাকে। বেরনোর মুখেই আচমকা তিনজন পুলিশ অফিসার দোতলায় উঠে এসে দরজা আগলে দাঁড়ালেন। কী ব্যাপার স্যার?

রুমে চলো বলছি। বললেন, শীতল কণ্ঠের পুলিশ অফিসার।

তোমার নাম কী?

ঋষিকেশ ত্যাগী স্যার।

আইডি দেখি!

এই যে স্যার। আইডি দেখা গেল। নাম ঠিকই আছে। কোথায় যাচ্ছ?

স্যার পরীক্ষা আছে।

কীসের?

ডাক্তারি এন্ট্রান্স স্যার।

বাবার নাম কী? ডেট অফ বার্থ?

ঋষিকেশ আমতা আমতা করছে। পুলিশ অফিসার ধমকে বললেন, কী হল? বলো! স্যার মনে পড়ছে না।

মনে পড়ছে না? বাবার নাম, জন্মতারিখ মনে পড়ছে না? চলো থানায়। মনে পড়বে। গ্রেপ্তার করা হল তাকে। ঋষিকেশ ত্যাগী নয়। ঠিক দু ঘণ্টা লাগল তাকে ভাঙতে। বাচ্চা ছেলে। কতক্ষণ পারবে পুলিশের জেরা সামলাতে! অতএব ভেঙে পড়ল। জানা গেল তার আসল নাম রমাশংকর। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে সে ডাক্তারির ছাত্র। ইন্দোরে এসেছে কোনো এক ঋষিকেশ ত্যাগীর হয়ে পরীক্ষা দিতে। সে একা নয়। হোটেল পথিকে আরও ১৮ জন তরুণ এসে উঠেছিল। প্রত্যেকেই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারের কোনো না কোনো মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া কিংবা ইনস্টিটিউটে পড়ে। তাদের কাজ কী? কিছুই

না। স্রেফ ডাক্তারির কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষার হলে গিয়ে বসে যতটা ভালো সম্ভব পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া। আই কার্ড নিয়ে ভাবনা নেই। সেসব হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই যাঁরা ডাক্তারির ভালো ছাত্র তাঁদের কাছে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া কোনো সমস্যাই নয়। এসব কী নতুন কথা নাকি? আমরা তো দেখেছি মুন্নাভাই এমবিবিএসে? মুন্নাভাইয়ের হয়ে দিনের পর দিন পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন ডক্টর রুস্তম। এবং তিনি ছিলেন দুর্দান্ত ছাত্র। সুতরাং রুস্তম যা লিখেছেন, তাতেই ফার্স্ট হয় মুন্না।

মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম পরীক্ষায় এরকম অসংখ্য ডক্টর রুস্তমের সাপ্লাই ছিল। কেউ আসে বিহার থেকে। কেউ আসে কানপুর থেকে। কেউ আসে লখনউ থেকে। ৫০ হাজার টাকা পায় একটি করে পরীক্ষার জন্য। এই অল্পবয়সি ছাত্রদের কাছে সেটা অনেক টাকা। কাজ কিছুই নেই। পরীক্ষার আগের দিন রাতে নিজেদের এলাকা থেকে ট্রেনে চলে আসে। যেখানে পরীক্ষার সেন্টার পড়ে সেই শহরে। স্টেশনে থাকে রিসিভ করার লোক। তারা নিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দেয় হোটেলে। অন্তত থ্রি থেকে ফোর স্টার হোটেল। কোনো কষ্ট নেই। নিয়মটা কী? কাকে টার্গেট করা হবে? ভারতবর্ষের প্রায় সব শহরেই সরকারি চাকরি আর ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারের কোর্সে ভর্তির পরীক্ষায় চান্স পেতে টিউটরিয়াল ইনস্টিটিউট আছে। সমস্ত মফসসল শহরেও আছে। আর বড় জেলা সদরে তো আছেই। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন এসব ইনস্টিটিউটের একটি কমন বৈশিষ্ট্য আছে? সেটি হল মাঝেমধ্যেই ইনস্টিটিউটের বাইরে বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে নাম, ঠিকানা, ছবি দেওয়া থাকে কিছু ছাত্রছাত্রীর। উপরে লেখা থাকে এ মাসের ক্লাস টেস্ট কিংবা ইউনিট টেস্টে এই ছাত্রছাত্রীরা সব কোশ্চেনের আন্সার দিতে পেরেছে। এরাই টপার। আর যেসব ছাত্রছাত্রী ডাক্তারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা সরকারি চাকরির পরীক্ষায় চান্স পেয়ে গিয়েছে তাদের নাম, ছবি বোর্ডে বড়বড় করে টাঙানো কিংবা সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দেওয়া তো একেবারেই সাধারণ প্রবণতা। সর্বত্রই এটা দেখা যায়। কিন্তু এসবের আসল কারণ কী? একটা কারণ ওইসব টিউটোরিয়ালে যাতে নতুন নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে আসে সেই লক্ষ্যে এই সাফল্যের বিজ্ঞাপন। সেটা তো হতেই পারে। কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কানপুর, লখনউ, রক্সৌল, পাটনা, ভোপালের এরকম বেশ কিছু ইনস্টিটিউট আছে যাদের

এই ভালো সফল ছাত্রছাত্রীদের নাম ছবি টাঙিয়ে দেওয়ার জন্য রয়েছে বিশেষ গোপন এক ডিল। এসব ইনস্টিটিউটের বাইরে নিয়ম করে ঘোরাফেরা করে দালাল। তারাই আইডেন্টিফাই করে এই সফল ছাত্রদের। এবং তারপর খোঁজ করে কাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা তেমন জোরালো নয়। সোজা কথায় টাকার দরকার কাদের বেশি। সেইসব ছেলেদের টার্গেট করা হয়।

আর দ্বিতীয় টার্গেট মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে থাকা তুলনামূলক দরিদ্র ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র। যারা চায় ঘর ছেড়ে থেকে একটু টাকার মুখ দেখতে। বড়লোক বন্ধুদের হাতে দামি ফোন। দামি পোশাক। তারা কুঁকড়ে থাকে। আর বাড়িতেও পাঠানো যেতে পারে টাকা। বলবে এখানে টিউশন করে আদায় করা টাকা। এই দুটি টার্গেটকে দেওয়া হয় বিপুল টাকার অফার। পরীক্ষা প্রতি ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। যাতায়াত সব খরচ দালালদের। তারা শুধু একটি শহরে যাবে। তিন ঘণ্টা চার ঘণ্টার পরীক্ষা দেবে। ফিরে আসবে। টাকা অ্যাডভান্স। যাবতীয় পরীক্ষা দিতে হবে অন্য কোনো ছাত্রছাত্রীর হয়ে। সেই নামে আই কার্ড হয়ে যাবে। এই হল সোজাসাপটা ব্যবস্থা। পাশাপাশি ছিল আর একটি সিস্টেম। যেকথা বলেছি আগেই। ইঞ্জিন বগি সিস্টেম। পরীক্ষার হলে প্রকৃত পরীক্ষার্থী থাকবে। তার পাশে অথবা আগের বেঞ্চে সিট ফেলা হবে জাল পরীক্ষার্থীর। প্রশ্নপত্র পাওয়া মাত্র জাল পরীক্ষার্থী লিখতে শুরু করবে। এবং পরীক্ষা শেষে তার খাতাই জমা পড়বে অন্যের নামে। পাশে বা পিছনে থাকা প্রকৃত পরীক্ষার্থীর খাতা জমা পড়বে বটে। কিন্তু উধাও করে দেওয়া হবে খাতা তালিকাভুক্ত করে বান্ডিল হওয়ার আগেই। জাল পরীক্ষার্থীর খাতাই হয়ে যাবে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর নামাঙ্কিত আসল খাতা। এবং জাল পরীক্ষার্থী নিজে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র। তার কাছে এসব এন্ট্রান্স পরীক্ষা কিছুই না। তাই তার উত্তরপত্র হান্ড্রেড পার্সেন্ট ত্রুটিহীন হবেই। এরই নাম ইঞ্জিন বগি সিস্টেম। ইঞ্জিন টেনে এগিয়ে নিয়ে যাবে বগিকে। তার জন্য বগিকে দাম দিতে হবে অন্তত ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করে। কখনও তারও বেশি। পরীক্ষার পরই ইঞ্জিন উধাও হয়ে যাবে। বগির নাম জ্বলজ্বল পরীক্ষা পাশের লিস্টে। ধরা যাক সেই নামটি র‍্যাঞ্চো শামলালদাস চাঞ্চের।!! থ্রি ইডিয়টসের প্লট!

মধ্যপ্রদেশ পুলিশের টাস্ক ফোর্স ধীরে ধীরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন নয়... ...দুজন নয়...তিন জন নয়....। নাম জড়িয়ে যাচ্ছে অসংখ্য। একজনকে জেরা করা হলেই নাম বেরোচ্ছে আরও চারজনের। সেই চারজনকে জেরা করে আরও আটজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। কেউ মিডলম্যান। কেউ দালাল। কেউ প্রক্সি পরীক্ষাদাতা। কেউ ডাক্তারি পড়ুয়া কিন্তু জাল পরীক্ষা চক্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে কমিশন নিয়েছে। টাকা দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে। নাম বাড়ছে। অভিযুক্ত বাড়ছে। গ্রেপ্তারি বাড়ছে। কিন্তু জামিনও পাচ্ছে একে একে অনেকেই। কারণ সাংঘাতিক কোনো অপরাধ নয় যে জামিন আটকে যাবে। তাই জামিন হয়েই যায়। সকলের বিরুদ্ধে মামলা চলবে। কিন্তু আপাতত জামিনে মুক্তি। নতুন করে তদন্তে নেমে এদের সকলকেই আবার দরকার পড়বে। তাই সকলের খোঁজ করা হচ্ছে। এবং ঠিক তখন থেকে কেঁচো খুঁড়তে বেরোতে শুরু করল একের পর এক কেউটে।

ঝাঁসির আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি কলেজ থেকে পাশ করা নরেন্দ্র রাজপুতের নাম জড়িয়েছে। সে ছিল মিডলম্যান। বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মাহোবা জেলার পারপতার গ্রামে। নিজের ক্লিনিক খুলেছে সে। মাঝেমধ্যেই সে যায় ঝাঁসি আর বীণায়। সেখানে কীসের জন্য যাচ্ছে তা বাড়িতে জানায়নি কখনও। ২০১৪ সালের ১৩ এপ্রিল সকাল ৭টায় নরেন্দ্র রাজপুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝাঁসি যাওয়ার সময় আচমকা বাস আসার আগেই বুকে ব্যথা অনুভব করল। ঠিক সাত মিনিটের মধ্যে মৃত্যু। তিন মাস পর পুলিশ তার খোঁজে এসেছিল গ্রামে। তার বিরুদ্ধে ব্যাপম পরীক্ষায় প্রশ্নপ্রত্র সাপ্লাই এর অভিযোগ। তাকে জেরা করতে চায় পুলিশ। কিন্তু পুলিশ আসার তিন মাস আগেই নরেন্দ্র মারা গেল। আচমকা! তার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। বারংবার চেয়েও।

সাগর মেডিকেল কলেজের ছাত্র অনুজ উইকে, বাবাকে বলেছে গাড়িটা লাগবে। দুজন বন্ধুকে নিয়ে একটু মেলায় যাবে। সপ্তাহান্তিক ছুটি ছিল। তাই ডাক্তারি পড়ার প্রবল পরিশ্রম থেকে একটু রিলাক্স করতে মেলায় ঘুরতে যাওয়া। অনুজ নিজেই চালাচ্ছিল গাড়ি। ২০১০ সালের ১৪ জুন। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটি

বিখ্যাত নদী। তার নাম বেতোয়া। এই নদী খুব জনপ্রিয়। তাই লক্ষ করবেন মধ্যপ্রদেশের চম্বল এলাকার অসংখ্য হোটেলের নাম হয় বেতোয়া হোটেল। ধাবার নাম বেতোয়া ধাবা সেন্টার। মেলার নাম বেতোয়া ফেয়ার। বেতোয়া মেডিকেল স্টোর। হোশঙ্গাবাদ রোডে এরকম এক 'বেতোয়া ধাবা' থেকে কিছু খেয়ে বেরনোর পরই আচমকা উলটোদিক থেকে আসা একটা ট্রাক ধাক্কা মারল সেই গাড়িকে। অনুজ তো বটেই। তার বন্ধুরাও স্পট ডেড। অনুজ উইকে কী সম্পূর্ণ নিরীহ এক ডাক্তারি ছাত্র? না। তার নামে ততদিনে অভিযোগ ছিল ডাক্তারির পরীক্ষায় জাল পরীক্ষার্থী সাপ্লাই দেওয়ার সঙ্গে সে ছিল সহায়ক। অর্থাৎ দালাল চক্র তাকে পাকড়াও করে বলেছিল দুজন অন্তত মেডিকেল স্টুডেন্ট যোগাড় করে দিতে। যারা অন্য পরীক্ষার্থীদের হয়ে একটা এক্সাম দিয়ে দেবে। পুলিশ সবেমাত্র প্রস্তুতি নিচ্ছিল অনুজকে জিজ্ঞাসাবাদের। ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই দুর্ঘটনা।

১৯ বছরের তরুণ মাচ্ছন ভোপালে প্রি মেডিকেল টেস্ট দিয়েছিল। এবং চান্স পেয়েছিল ডাক্তারি পরীক্ষায়। কিন্তু তদন্তে জানা গেল তার হয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল অন্য কেউ। কে সে? কীভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ হল? পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছিল তাকে। জেরা করা হয়। লাগাতার। কিন্তু তরুণ স্বীকার করেনি। ভোপালের গান্ধী মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ২০১৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত। ভোপালের কোলার রোডে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল তরুণ। পিছনে তার এক বন্ধু। পরদিন তরুণের যাওয়ার কথা পুলিশের কাছে হাজিরা দেওয়ার জন্য। সকালে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল রাস্তার পাশে। বন্ধুটি জানাল একটি গাড়ি পিছন থেকে এমনভাবে এসেছিল যে তরুণ ভারসাম্য হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং ছিটকে পড়ে। তরুণের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

মেডিকেল স্টুডেন্ট জ্ঞান সিং জাটবের বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে আটটি মামলা রয়েছে। সে ছিল জাল পরীক্ষার্থী সংগ্রহ করে দেওয়া আর মেডিকেল কোর্সে চান্স পাওয়ার জন্য ব্যাকুল দরকার হলে টাকা দিয়ে ভর্তি হতে প্রস্তুত ছেলেমেয়েদের খোঁজ রাখার গোপন এজেন্ট। ভিন্দ জেলার লাহার গ্রামের জ্ঞান সিং জাটব মেডিকেল কোর্স পড়তে পড়তেই বাড়ির অমতে একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসেছিল। তাই সে গ্রামে থাকতে পারেনি।

আলাদা থাকতে হয়েছে। গোয়ালিয়রে। হঠাৎ একদিন জ্ঞান বমি করতে শুরু করে। যা খাচ্ছে তাই বমি হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় ডাক্তার জানালেন জন্ডিস। কিংবা কোনো ইনফেকশন। সারল না সেই অসুখ। জ্ঞানের মৃতদেহ আচমকা গ্রামে ফিরে এল। কীভাবে মারা গেল? সামান্য এক ইনফেকশনে? ভোপালের পুলিশ গ্রামে এসে খোঁজ করার পর জানা গেল জ্ঞানের প্রধান উপার্জন ছিল প্রি মেডিকেল টেস্টে চিটিং করার জন্য। তার নাম যখনই পুলিশের টাস্ক ফোর্সের সন্দেহের তালিকায় ঢুকে গেল তার চার সপ্তাহের মধ্যে জ্ঞান সিং জাটবের ইনফেকশনে মৃত্যু।

বিজয় ছোটেলাল সিং সাজাপুর জেলে অর্ডার সাপ্লাই করতেন। মূলত জেল হাসপাতালে মেডিসিন। নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্র বিজয় প্রি মেডিকেল টেস্টে ভর্তি হতে চেষ্টা করেছিলেন দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার পর। পারেননি। শেষ পর্যন্ত ফার্মেসি ডিগ্রি পেয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। এরপর বাড়ি থেকে কিছু টাকা নিয়ে রেওয়া জেলার সিহড়ে চালু করেন মেডিসিন শপ। ২০১৫ সালে তাকে হঠাৎ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ডেকে পাঠাল থানায়। আর গ্রেপ্তার করা হল। কারণ তিনি নাকি যুক্ত ছিলেন কোন কারাগারে নতুন নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে সেই খবর আগাম বের করে আনতে। সেই নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞাপন তারপরই কোনো এক সময় প্রকাশিত হত সরকারিভাবে। ততদিনে স্থির করা হয়ে যেত কতজন জাল পরীক্ষার্থী কোন কোন পোস্টের জন্য কোন কোন সেন্টারে পাঠানো হবে। ঠিক সেই অনুযায়ী প্ল্যান করা হত। তিন মাস পর জেল থেকে জামিন পেলেন ৩৫ বছরের বিজয় ছোটেলাল সিং। পরের বছর আবার ডেকে পাঠানো হল । এবার কয়েকজন অভিযুক্তকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ধরা হয়েছে তাদের। শুধু চিহ্নিত করা দরকার। তাই বিজয়কে সেই কাজটি করতে হবে। ২৮ এপ্রিল ২০১৬। ছত্তিশগড়ের কাংকের জনপদের একটি লজে পাওয়া গেল বিজয় ছোটেলাল সিং এর মৃতদেহ। স্থানীয় ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। কাংকেরের কাছে একটি সরকারি স্কুলে বিজয় সিং এর স্ত্রী শিক্ষিকা ছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য তাঁর স্ত্রী অথবা রেওয়ায় পরিবারের বাকি সদস্যরা এবং নিজের মেডিকেল শপের কর্মচারীরাও কেউ জানে না কেন তিনি কাংকেরে এসেছিলেন। কবে এসেছিলেন? কেনই বা কাউকে না জানিয়ে

এরকমভাবে একা একা একটি লজে উঠলেন? স্ত্রীর কোয়ার্টারেই তো উঠতে পারতেন! কেন তিনি ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে থানায় যাননি? এই প্রশ্ন নিয়ে ক্রুদ্ধ পুলিশবাহিনী যখন রেওয়ায় তাঁর বাড়িতে হানা দেয় তখন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় যে হাজিরা দেওয়ার কয়েকদিন আগেই সম্পূর্ণ অন্য রাজ্য ছত্তিশগড়ের এক লজে বিজয়ের রহস্যময় মৃত্যু হয়েছে। হার্ট অ্যাটাক। যার কোনোদিনই হার্টের অসুখ ছিল না।

দীপক গোলারিয়ার কাছে ভাইয়ের ফোন এল। ভাইয়ের নাম ললিত। ভাইয়া......আমার এখনই ৩ হাজার টাকা চাই...ভাইয়া বহোৎ আর্জেন্ট হ্যায়..ভাইয়া প্লিজ...যিতনে জলদি হো সকে। দীপক ফোনে চিৎকার করছেন, তুম হো অভি...ললিত...ললিত...ললিত!! চিন্তা মাত করো...পয়সা ভেজ রহে হ্যায়...ললিত...ললিত......!

ওপ্রান্ত থেকে হঠাৎ সব স্তব্ধ। ফোন কানেকটেড। বোঝা যাচ্ছে। শুধু শোঁ শোঁ শোঁ একটা শব্দ। কিন্তু ললিতের সাড়া নেই। কী হল? ঠিক বিকেলে দীপক গোলারিয়াকে পুলিশ ফোন করে জানাল আপনার ভাই ললিত গোলারিয়ার বডি পাওয়া গিয়েছে স্যাংক রিভারের ব্রিজের নীচে। এখনই চলে আসুন। হতভম্ব দীপক মোরিনা জেলার নুরাবাদে ছুটে এলেন। পুলিশের হাতে একটা ভেজা কাগজের টুকরো। সেখানে লেখা। ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। প্রি মেডিকেল টেস্টের স্ক্যামের বোঝা আমি আর নিতে পারছি না।' দীপক বিস্মিত। তিনি পুলিশকে বললেন, আমি তো বুঝতে পারছি না পিএমটি স্ক্যামের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? এবার পুলিশের হাসার পালা। তাঁরা বললেন, দীপকজি আপনি কী ঠাট্টা করছেন? আপনি জানেন না আপনার ভাই তো একবার অ্যারেস্ট হয়েছিল! দীপক স্তম্ভিত। সত্যিই তিনি জানেন না। ২০১৪ সালের ১৯ জুন ললিতকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। কারণ ব্যাপমের মেডিকেল পরীক্ষায় ওই দুই বন্ধুকে দিয়ে অন্য দুই ছাত্রের নামে পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে। আর ও পেয়েছে কমিশন। দীপক এসব কিছুই জানেন না। তিনি শুধু জানতে চাইলেন, কিন্তু স্যার, আজ সকালে যে ভাই আমাকে ফোন করে ৩ হাজার টাকা চাইছে। আমি বললাম কীভাবে পাঠাব বলে দে... পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই কথা

বলতে বলতে ফোন থেমে গেল। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেন সুইসাইড করবে? কেন আচমকা ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দেবে? পুলিশ গম্ভীর হয়ে যায়। কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

এরকম অসংখ্য রহস্যমৃত্যুর খবর আরও শুনব আমরা ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করুন। মধ্যপ্রদেশের ২০ লক্ষ যুবকযুবতী সরকারি নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে থাকে বছরের পর বছর ধরে। সেই পরীক্ষাটি আয়োজন ও মনিটর করে ব্যাপম। ২৭ রকম পরীক্ষা আছে। ২০১৩ সালে ৪১ হাজার পরীক্ষার্থী বসেছিল প্রি মেডিকেল টেস্টে ডাক্তারিতে চান্স পাওয়ার জন্য। সিটের সংখ্যা ১৬৫৯। ড্রাগ ইন্সপেক্টরের পদে নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রায় ১০ হাজার পরীক্ষার্থী। ৭২২৬ পুলিশ কনস্টেবলের পদে চাকরি পাওয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষা দেয় সাধারণত সাড়ে ৪ লক্ষ যুবকযুবতী। ২ হাজার রাজ্য বন দপ্তরের কর্মীর শূন্যপদের জন্য ২০১৩ সালে চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিল ২ লক্ষ ৯০ হাজার পরীক্ষার্থী।

আর এই সব পরীক্ষায় সাধারণ, নিরীহ, প্রকৃত পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি চলেছে এক গোপন খেলা। ঝাঁকে ঝাঁকে জাল পরীক্ষার্থী এসে পরীক্ষা দিয়েছে অন্যদের হয়ে। শুধু সেটাই? না। নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা জমা দিলে পরীক্ষার হলে বসে দুটি সেটের খাতা পাওয়া গিয়েছে। একটি সেটে যা ইচ্ছে লিখে সময় কাটিয়ে দাও। অন্য সেট ওই সেটের মধ্যেই রেখে জমা দিয়ে দাও। সেটি নির্দিষ্ট সময় অন্য কেউ সলভ করে দেবে। আর ফাইনাল ট্যাবুলেশনের আগে কম্পিউটারে ঢুকে যাবে ওই আনসার শিট। পুরো নম্বর পাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। কীভাবে সম্ভব? সম্ভব। যদি ওই পরীক্ষার আয়োজক সরকারি দপ্তরের খোদ অন্যতম কর্তা নিজেই এই অবৈধ চাকরি ও ভর্তি নাটকের প্রধান পরিচালক হন। সেই পদের নাম প্রিন্সিপ্যাল সিস্টেম অ্যানালিস্ট। সরকারি দপ্তরে চূড়ান্ত সুরক্ষার আবরণে থাকা মাদার সার্ভার কম্পিউটারে পরীক্ষার আগে ও পরে রোল নম্বর বদলে দেওয়া হত। কতটা গভীরে এই ব্যাপক দুর্নীতির কালো করিডর? মধ্যপ্রদেশ সরকারের এক মন্ত্রীকে জেলে যেতে হয়েছে। আর এক মন্ত্রী স্রেফ উধাও হয়ে গিয়েছেন। সরকারের

প্রথম সারিতে থাকা মন্ত্রী ও তাঁদের স্ত্রীদের নাম জড়িয়েছে। কীভাবে পাওয়া গেল তাঁদের নামের সন্ধান?

একটি রহস্যময় পেন ড্রাইভে। তারপর?

পঙ্কজ ত্রিবেদী : স্যার একটা কথা ছিল। মিনিস্টার সাব, সেক্রেটারিরা, বারবার করে ফোন করছে। সবাই চায় নিজেদের ক্যান্ডিডেট ঢোকাতে। এত নাম কীভাবে হ্যান্ডল করব? আর কয়েকজন চাইছে পরীক্ষায় না বসেও যেন ক্লিয়ার করা যায় এক্সাম। এটা কি পসিবল স্যার?

নীতীন মহিন্দৰ : এভরিথিং ইজ পসিবল। ডোন্ট বি সিলি। তার জন্য আলাদা আলাদা দাম আছে। তবে মিনিস্টার, সেক্রেটারিদের জন্য তো আলাদা কোনো রেট নেওয়া যায় না। সেসব ম্যানেজ হয়ে যাবে অন্যভাবে। তুমি একটা লিস্ট বানাও। নর্মাল একটা লিস্ট। সেখানে ডক্টরসাবের ক্যান্ডিডেট। আর এইসব ভিআইপিদের ক্যান্ডিডেটের আলাদা লিস্ট হবে। একটায় রেড অ্যালার্ট দেবে। আর একটায় গ্রিন। করে টাইপ করে রাখো। আমাকে এক কপি দেবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ত্রিবেদী?

পঙ্কজ ত্রিবেদী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাড় নাড়লেন। ইন্দোরের একটি কলেজের লেকচারার ছিলেন। হয়েছেন কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন। ব্যাপমের। মধ্যপ্রদেশের পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ব্যাপম। সব পরীক্ষার রেজাল্ট শিট তাঁর মাধ্যমেই যাবে ট্যাবুলেশনে। আর কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন তিনি?

এই যে নীতীন মহিন্দৰ । হাইট কম। ভুঁড়িও আছে। মোটা একটা গোঁফ। মাথার চুল অনেকটা কমে এসেছে। মধ্যপ্রদেশের সরকারি কর্মচারী। খুবই সাধারণ চেহারা। তেমন কেষ্টবিষ্টুর মতো দেখতেও না। চুপচাপ থাকেন। একটাই শখ। নিত্যনতুন জামা চেঞ্জ। আর একটু ব্র্যান্ডেড। তবে ২০১০ সালের পর সহকর্মীরা অন্যরকম পরিবর্তন দেখলেন । প্রথমে হন্ডা সিটি। তারপর আবার রেনল্ট ডাস্টার। পরপর দুটি গাড়ি কেনা হয়ে গেল। নীতীন মধ্যপ্রদেশের সরকারি নিয়োগ ও উচ্চশিক্ষার ভর্তি পরীক্ষা বিভাগ ব্যাপম দপ্তরে ১৯৮৬ সালে চাকরিতে প্রথম ঢুকেছিলেন। পদের নাম ছিল ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। আজ ২০১৮

সালে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর শুনলে তেমন প্রতিক্রিয়া না হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে কম্পিউটারের সেই আদিযুগে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর মানে কিন্তু ওই লোকটা সাধারণ সরকারি কর্মচারীর থেকে অনেক আলাদা। সোজা কথায় সেই শুরুতে দু রকম সরকারি কর্মচারীর জ হল। কম্পিউটার জানে আর কম্পিউটার জানে না। মন্ত্রী থেকে আমলা সকলেই এই কম্পিউটার জানাদের বিশেষ খাতির করতেন। তাই নীতীন মহিন্দ্রের উত্থান হল দ্রুত। ক্রমে তিনিই হয়ে উঠলেন ব্যাপম পরীক্ষার সবথেকে শক্তিশালী ভরকেন্দ্র। প্রাইম সিস্টেম অ্যানালিস্ট। গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থা, ফলাফল, ট্যাবুলেশন শিট এবং রোল নম্বর সব বস্তুত তাঁর অধীনে। অনিয়ম আগেও হয়েছে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা আরও আধুনিক, আরও টেকনিক্যালি স্ট্রং হয়ে গেল ২০১১ সাল থেকে। নীতীন জানেন ইন্দোরের সরকারি কলেজের এক লেকচারারকে নিয়োগ করা হয়েছে কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন হিসাবে। তারও কারণ আছে। দুজন মন্ত্রীকে ওই লেকচারার সম্পর্কেই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল যে, সে আমাদের লোক হয়ে যাবে। তাই ওঁকেই করা হোক। এরপর একমাসের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তিনি জানেন কার সঙ্গে সবার আগে দেখা করতে হবে তাই এসেছেন সোজা ভোপাল। নীতীশের চেম্বারে। এবং তারপরই জানালেন তাঁর প্রথম সমস্যার কথা। একের পর এক ভিআইপি তাঁর কাছে পরীক্ষার্থীদের লিস্ট পাঠিয়েছেন। তাঁদের কথা না রাখলে চাকরিটাই রাখা মুশকিল। আর তাছাড়া পেমেন্টও খুব মোটা এসবের জন্য। তবে এইমাত্র ত্রিবেদী শুনলেন একটা নাম। ডক্টর সাব। নীতীন বললেন, ডক্টর সাবের লিস্ট আলাদা রাখতে। আর ভিআইপি লিস্ট অন্যরকম হবে। কে এই ডক্টর সাব? ভয়ে অবশ্য সেকথা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না ত্রিবেদী। আপাতত জানা দরকার তাঁকে কী করতে হবে।

নীতীন জানিয়ে দিলেন ফরমুলাটি। খুব সোজা। টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া কিংবা ডাক্তারি কোর্সে চান্স। যারাই টাকা দিয়েছে তাদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। একটি অংশ হল ইঞ্জিন বগি সিস্টেম। অর্থাৎ যে চাকরিপ্রার্থী বা ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা সামান্য পড়াশোনাও করেনি তাদের জন্য ব্যবস্থা হল ওই ইঞ্জিন বগি। অর্থাৎ তারা নিজেরা পরীক্ষার হলে যাবে না। তাদের হয়ে অন্য কেউ হলে গিয়ে পরীক্ষা দেবে। মুন্নাভাই স্টাইল

অথবা তারা পরীক্ষার হলে যাবে। কিন্তু তাদের আগের বেঞ্চে অথবা পিছনের বেঞ্চে থাকবে যে কোনো প্রশ্নপত্রের সব কোশ্চেন দারুণভাবে আনসার দেওয়ার মতো ছাত্ররা। এই তালিকার পরীক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় যা ইচ্ছে করতে পারে। অনেক সময় ধরে। ছবি আঁকো। উত্তর লেখার অভিনয় করো। লেখার অভিনয়টা যেন ভালো হয়। ধরা না পড়লেই হল। অন্যদিকে আর একদল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ফরমুলা অন্য। সেইসব ছাত্রছাত্রীদের বলে দেওয়া হয় পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েই কোনো টেনশন না করতে। সবার আগে দেখে নাও কোন কোন প্রশ্নের উত্তর জানা আছে। সেইসব প্রশ্ন অ্যাটেম্পট করো। বাকি প্রশ্ন নিয়ে সামান্য সংশয় থাকলে কোনো চান্স নেওয়ার দরকার নেই। ফাঁকা রেখে দাও। ফাঁকা রেখে দাও মানে কী? তারপর কী হবে? ব্যাপম পরীক্ষার যত কম্পিউটার আছে তার একটি কমন অফিস নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে নীতীন মহাজন সমস্ত আনসার শিটের নাগাল পাবেন। সুতরাং মাল্টিপল চয়েস পরীক্ষার আনসার শিট যখনই স্ক্যানড করে কম্পিউটারে ঢুকে গেল, তখন সেখানে রেজাল্ট এবং আনসার শিট ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা কোনো সমস্যাই নয়। ঠিক তাই করা হয়েছিল। বেছে বেছে সেই তালিকা অনুযায়ী নামগুলির আনসার শিটের উত্তরপত্র পরিমার্জিত করার সুযোগ এসে গেল। সেটাই সবথেকে বড় অস্ত্র। যে প্রশ্নের আনসার একজন লেখেনি সে ওই অংশ ফাঁকা রেখেছে। কিন্তু তারপর ওই কম্পিউটার অ্যাকসেস করে সব শূন্যস্থানই সঠিক উত্তর লিখে ভরাট করে আবার স্ক্যান করে আপলোড করে দেওয়ার প্ল্যান কার্যকর করা হল। নিখুঁত ব্যবস্থা। কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু অরিজিন্যাল আনসার শিটে যে সেইসব শূন্য স্থানগুলি রয়েই গেল? যদি কোনো ঝামেলা হয় কিংবা কেউ চ্যালেঞ্জ করে যে সব আনসার শিট প্রকাশ করতে হবে? তাহলে তো বিরাট সংকট! এই সম্ভাবনা আগে থেকেই মাথায় রাখা আছে। তাই যেই রেজাল্ট প্রকাশ হল সেদিনই পরীক্ষা অবসারভারের কাছে অরিজিন্যাল আনসার শিট চেয়ে পাঠানো হবে। সব আনসার শিট নয়। বাছাই করা। বলা হবে রাইট টু ইনফরমেশন আইনের মাধ্যমে পরীক্ষার্থী তাদের খাতা দেখতে চেয়েছে। সেটাই দেখানো হবে। এটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে। তাই কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই। প্রতিটি চাকরি ও কোর্সের পরীক্ষার পরই

এরকম হাজার হাজার পরীক্ষার্থী আশাব্যঞ্জক ফলাফল না হলে খাতা রিভিউ করতে চায়। সেইসব আসল পরীক্ষার খাতা একবার হাতে চলে এলে কোনো একটি গোপন জায়গায় বসে কম্পিউটারে ঠিক যেভাবে সঠিক আনসার ঢোকানো হয়েছিল, অবিকল সেই একইভাবে একই হাতের লেখায় অরিজিন্যাল আনসার শিটেও বসে যাবে সেইসব উত্তর। আর তারপর কম্পিউটারের স্ক্যানড কপির সঙ্গে এই অরিজিন্যাল হাতে লেখা কপির কোনো ফারাক খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই হল হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিখুঁত অপারেশন। ত্রিবেদি চমৎকৃত। কী দারুণ প্ল্যান। সেই ২০১১ সাল থেকে সুতরাং এই হাই প্রোফাইল টেকনিক্যাল সিস্টেমে শুরু হয়ে গেল নতুন ধরনের চিটিং। টাকা দাও। পরীক্ষা দাও। কী লিখলে কতটা ঠিক লিখলে ওসব ভুলে যাও। টেনশনের কিছুই নেই। কারণ পাশ করানোর দায় নেওয়ার লোক আছে। তাই হত। কিন্তু সব প্ল্যান কী আজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর? তা হয়? হয় না। ভুলভ্রান্তি এবং তা থেকে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এক্ষেত্রেও যে হয়নি তা নয়। তবে তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। পরীক্ষার্থীর নাম ছিল অনিতা প্রসাদ। বাবার নাম প্রেমচাঁদ প্রসাদ। সেই অনিতা ২০১২ সালে ঠিক এই পদ্ধতিতেই ব্যাপম পরীক্ষায় পাশ করে ডাক্তারি কোর্সে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু নীতীন এবং ত্রিবেদীর নির্দেশ সে পুরোপুরি মনে রেখে ফলো করতে ভুল করেছিল। সেই নির্দেশ হল যে প্রশ্নের উত্তর পারবে না, সেই প্রশ্নের পোর্শন ফাঁকা রাখো। ব্ল্যাংক ছেড়ে দাও। ওটা পরে ঠিক করে নেওয়া যাবে। শুধু যেসব প্রশ্নের উত্তর জানো সেগুলিই লিখতে ট্রাই নাও। এটাই হল মন্ত্রগুপ্তি। কিন্তু এই নিরীহ মন্ত্র মনে রাখতে পারেনি অনিতা প্রসাদ। সে ভুল করে সমস্ত প্রশ্ন ট্রাই করেছে। এবং বেশিরভাগই ভুল উত্তর ছিল। মহা বিপদ। যখন মধ্যপ্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তদন্ত করছে তখন এই অনিতা প্রসাদের উত্তরপত্র তাদের হাতে এসেছিল। সেই উত্তরপত্রে কী ছিল? বেশিরভাগ উত্তর কারেকশনাল ফ্লুইড দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছিল। তার উপর পেনসিল দিয়ে সঠিক উত্তর লেখা। অর্থাৎ খাতায় আগাগোড়া ভুল উত্তর লিখেও কোনো সমস্যায় পড়েনি সংশোধনের ক্ষেত্রে। শুধু যাঁরা ওই সংশোধনীর দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের একটু অসুবিধা হয়েছিল। সাদা ফ্লুইড শোকাতে হবে খাতায়, তারপর আবার লেখা পেনসিল

দিয়ে। তারপর সেটাকে পুনরায় স্ক্যান করা। তাতে অনিতা প্রসাদের আটকায়নি ডাক্তারির কোর্সে চান্স পাওয়া।

পরবর্তী দু বছরে ঠিক এই ফরমুলায় ১৩ রকমের পরীক্ষায় বহু পরীক্ষার্থী চাকরি পেয়ে গিয়েছে। বহু ছাত্রছাত্রী ডাক্তারিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষাগুলি ছিল ডাক্তারি কোর্স, ফুড ইনস্পেক্টর, ট্রান্সপোর্ট কনস্টেবল, পুলিশ কনস্টেবল, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, স্কুল শিক্ষক, ডেয়ারি সাপ্লাই অফিসার এবং ফরেস্ট গার্ড।

বলতে ভুলে গেলাম। অনিতা প্রসাদের পরিচয়। আগেই অবশ্য বলেছি তার বাবার নাম। প্রেমচাঁদ প্রসাদ। তিনি কে ছিলেন? অন্যতম পার্সোনাল সেক্রেটারি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর। শিবরাজ সিং চৌহানের।

বা প্রশ্ন হল সেই যে বারবার নীতীশ মহাজন যাঁর নাম বলছিলেন ডক্টর সাব, তিনিই তাঁর লিস্ট নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? আর কীসের লিস্ট? তিনি কেন লিস্ট পাঠাতেন? এবার বলার সময় এসেছে। তিনিই হলেন ব্যাপম দুর্নীতির সবথেকে বৃহৎ কিংপিন। যাকে বলা হয়েছে মাস্টারমাইন্ড। ইন্দোরের এক বিখ্যাত ডাক্তার। জগদীশ সাগর।

তিনিই তৈরি করেছিলেন এক বিরাট চক্র। সেই চক্র ছড়ানো ছিল মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি...। কারও কাজ মিডলম্যান ঠিক করা। কারও কাজ ডাক্তারি কলেজের হোস্টেলে গিয়ে গিয়ে লোভী ও দরিদ্র ডাক্তারি ছাত্রদের চিহ্নিত করা। কারও দায়িত্ব বিভিন্ন টিউটোরিয়াল ইনস্টিটিউশনে গিয়ে বাইরে টাঙানো হোর্ডিং দেখে কোন কোন ছাত্রছাত্রী ভালো রেজাল্ট করছে এমনকী নিছক ক্লাস টেস্টে তা খুঁজে বের করে ডায়েরিতে লিখে রাখা। এরপর সেই ইনস্টিটিউশনের মালিকের সঙ্গে দেখা করে ডিল করা। সেইসব ভালো ছাত্রদের/ছাত্রীদের সাধারণত বাদ দেওয়া হয়। কারণ তারা এই অনিয়মটি নিখুঁতভাবে করতে পারবে কিনা সেই আত্মবিশ্বাস থাকত না। এবং হঠাৎ করে দু'একদিন হোস্টেল বা কলেজ থেকে উধাও হয়ে অন্য শহরে গিয়ে ছদ্মনামে ভুয়ো আই কার্ড নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার মতো মনের জোর বেশি মেয়ের নেই। এর পাশাপাশি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার জন্য দরকার অন্তত এমন এক বিরাট সোর্স যার হাতের

কাছেই থাকবে ‘আনসার কি’। কাকে বলে ‘কি’ (answer key)। প্রতিটি প্রশ্নপত্রের সেটের জন্য থাকে একটি করে ‘আনসার কি'। সেটি সাধারণত রাখা হয় একটি সীলবন্ধ খামের মধ্যে। একমাত্র ট্যাবুলেশনের সময়ই সেটা খোলা হবে। অবসার্ভারদের উপস্থিতিতে তাঁদের সাক্ষী রেখে ত্রিবেদী সেইসব খাম সীলবন্ধ করতেন। কিন্তু তারপর সকলে চলে গেলে সেই খাম আবার খুলে আনসার কির ফোটোকপি করে আবার সেই অরিজিন্যাল নথিটি নতুন একটি খামে ঢোকানো হত। এভাবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর হস্তগত হয়ে যেত পরীক্ষার অনেক আগেই। এবং এই ত্রিবেদীকে ব্যাপম পরীক্ষার কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন করার পিছনে রয়েছে একজনের ইনপুট। ডক্টর জগদীশ সাগর। যিনি নিজে ইন্দোরের ডাক্তার। আর ওই ত্রিবেদীও ইন্দোরেরই কলেজের লেকচারার। আর এসবের অনেক আগেই জগদীশ সাগর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলতে পারলেন। বেশ কয়েক বছর আগেই। তার নাম নীতীশ মহাজন। সুতরাং এগিয়ে চলল ব্যাপম স্ক্যান্ডাল। নীতীশ মহাজনের কাছে ব্যাপম নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাদার সার্ভার ও কম্পিউটার। ইঞ্জিন বগি সিস্টেমের চাবিকাঠি কী? রোল নম্বর। অর্থাৎ কোন ছাত্র কোথায় বসবে সেটি ঠিক করা হয় রোল নম্বর অনুযায়ী। নীতীশ মহাজনের গবেষণা এতটাই নিখুঁত থাকত যে তিনি লিস্ট ধরে ধরে রোল নম্বর এমনভাবে চেঞ্জ করতেন যাতে মূল পরীক্ষার্থী আর জাল পরীক্ষার্থীর সিট হয় পাশাপাশি অথবা সামনে পিছনে থাকত। এবং তার থেকেও মারাত্মক প্ল্যান হল যাতে যে কোনো পরীক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষা হলের একেবারে পিছনের দুটি বেঞ্চেই এই সিটগুলো পড়ে। যাতে ইনভিজিলেটরের চোখ বেশি না পড়ে পিছনের দিকে। আর এই গোটা প্রক্রিয়ার আর একটি ফরমুলা ছিল। সেটি সর্বদা গ্রহণ করা হয় না। কারণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সেটি হল আগেই প্রি মেডিকেল টেস্টের প্রশ্ন বের করে এনে সলভারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সলভার মানে হল যে ডাক্তারি পাঠরত ছাত্ররা ওইসব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকেই লিখে রেখে দেবে। সেইমতো ডাক্তারি পরীক্ষার আগে প্রশ্ন প্লাস উত্তর বিক্রি করা হবে মোটা দামে। পরীক্ষার হলে যাওয়ার তিনদিন আগেই ঘরে বসে যদি আসল প্রশ্নপত্র পাওয়া যায় তাহলে আর চিন্তা কী। কারণ দাম বেশি নয়। ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা!

কোথাও তো কোনো খুঁত নেই। তাহলে কীভাবে সন্দেহ দানা বাঁধল? কে এই ব্যাপম কেলেঙ্কারির প্রথম গন্ধ পাওয়া ব্যক্তি? লোকটির নাম ডক্টর আনন্দ রাই। ১৯৯৪ সালে এই যুবক ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রি মেডিকেল টেস্টে। যাকে বলা হয় পিএমটি। তিনি লক্ষ করলেন হঠাৎ সেই বছর জুলজি পেপার গোয়ালিয়র থেকে ফাঁস হয়ে গেল। সেই বছরগুলিতে প্রি মেডিকেল টেস্টে প্রতিটি পেপার পৃথকভাবে নেওয়া হত। অর্থা আজকাল যেমন সিঙ্গল পেপার টেস্ট হয় তেমন নয়। ডক্টর আনন্দ রাই এবং তাঁর বন্ধুরা দল বেঁছে প্রতিবাদ করলেন। কারণ তাঁরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। অথচ প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আবার পরীক্ষা হবে। যে পরীক্ষা হয়েছে সেটি ক্যান্সেল। এটা কী অত্যন্ত মানসিক চাপ দেওয়া নয় ছাত্রছাত্রীদের ওপর? সারা বছর এত কষ্ট করে যারা প্রস্তুতি নিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছিল। দেখা গেল সেই প্রশ্ন ফাঁসের প্রধান অভিযুক্তের নাম ডক্টর গৌড় গোয়ালিয়র কলেজেরই অধ্যাপক। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা গেল না। কারণ তাঁর নাম যখন সামনে এল তার ঠিক আগেই ১৯৯৫ সাল। ডক্টর গৌড়কে কে অথবা কারা খুন করে গেল হঠাৎ। সেই শুরু প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে হত্যা আর অস্বাভাবিক মৃত্যুর। কিন্তু সেভাবে হইচই হল না। ডক্টর আনন্দ রাই এমবিবিএস পাশ করে ডাক্তারি শুরু করেছিলেন। কিছুদিন কাজ করার পর তাঁর মনে হল এবার পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে নেওয়া উচিত। ২০০৫ সালে তিনি ডাক্তারিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন দিলেন। এবং লক্ষ করলেন সেই পরীক্ষায় টপ টেনে যে ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের অন্তত ডাক্তারির এই কঠিনতম পরীক্ষায় শীর্ষস্থান পাওয়ার কথাই নয়। কারণ তার আগের যাবতীয় পরীক্ষায় তারা সকলেই অ্যাভারেজ গড় নম্বর পেয়েই উতরে গিয়েছে। এটা জানা অস্বাভাবিক নয়। ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে আগেপরের ব্যাচের কারা কেমন ছাত্রছাত্রী, কে কেমন রেজাল্ট করেছে, কাদের মেধা বেশিকম সেটা জানা অত্যন্ত স্বাভাবিক । এবং আশ্চর্যের বিষয় হল যে ১০ জন সেই ডাক্তারির পোস্ট গ্রাজুয়েশনের শীর্ষস্থান পেয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সরকারি উচ্চপদস্থ আমলার পুত্রকন্যা। ডক্টর আনন্দ রাই পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য একটি ডিপ্লোমা কোর্সের সঙ্গে যুক্ত হলেন ইন্দোরের মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজে। যাঁরা ডাক্তারিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন তাঁদের

মধ্যপ্রদেশে একটি বৃহৎ সংগঠন আছে। বলা হয় জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। ডক্টর রাই সেই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কারণে ভোপালে নিয়ম করে এই সংগঠনের সম্মেলন ও বৈঠক হত। ঠিক এরকমই বৈঠকের মধ্যে দীপক যাদবের সঙ্গে পরিচয় হল আনন্দের। ওই দীপক যাদবের সম্পর্কে কানাঘুঁষো শোনা যেত সে নাম ভাঁড়ানোর ব্যবসায় যুক্ত। দীপক যাদবের প্রিয় বন্ধুর নাম জগদীশ সাগর। তিনিও ডাক্তার। ইন্দোরের। মেডিসিন ডাক্তার। জগদীশ সাগরের সঙ্গে ইন্দোরে এসে আলাপ হয়েছিল। সেই আলাপ বেড়েছে ঘনিষ্ঠতায়। কারণ ডক্টর আনন্দ রাই আরএসএস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। আবার জগদীশ সাগর বিজেপির মন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। এভাবেই এই চেনাশোনার পরিধি এগিয়ে চললো। স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু জগদীশ সাগরের সবথেকে বেশি যে বিষয়টি সকলের চোখে পড়তে শুরু করল সেটি হল তাঁর চূড়ান্ত শখ শৌখিনতা। তিনটি গাড়ি, সোনার চেন, সোনার বালা, সোনার আংটি আগেই ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে হীরে। ভোপালে এক নেতার মেয়ের বিয়ে। নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ইন্দোরের ডাক্তারদেরও।

নিমন্ত্রিত ডক্টর সাগর এবং ডক্টর আনন্দ দুজনেই। জগদীশ সাগর ডক্টর আনন্দ রাইকে বললেন, আমার গাড়িতে চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক। রাজি আনন্দ রাই। ভোপালে একটি হোটেলে রাখা হল তাঁদের। একটি রুম। দুজনে রুমমেট। সেখানে চেক ইন করার পরত দুপুরে ডক্টর জগদীশ সাগর বললেন, আমাকে একটা কাজে যেতে হবে। আপনি থাকুন। আমি বিকেলের আগেই ফিরছি। তারপর প্রোগ্রামে যাব। কোনো অসুবিধা নেই। জগদীশ সাগর বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আনন্দ রাই আপাতভাবে অবশ্যই একটি নীতিহীন কাজ করলেন। তিনি তার আগেই শুনেছেন জগদীশ সাগরের আয় সিধে পথে নয়। এবং তার বিশেষ কিছু গোপন কম্মো আছে। যে কারণে ইন্দোরের মতো এরকম একটি মফসসল শহরেও ওই বিরাট মাপের লাইফস্টাইল যাপন সম্ভব হচ্ছে সামান্য একটা দুটো চেম্বার চালিয়ে। তাঁর থেকে অনেক ভালো ডাক্তার আছেন। কই, তাঁদের তো এত রমরমা নয়? ব্যাপার কী? আনন্দ রাই জানতে চান ব্যাপার কী? অতএব ঘরেই হোটেলের রুমে আলমারিতে রেখে যাওয়া জগদীশ সাগরের ব্রিফকেসের দিকে নজর গেল আনন্দ রাইয়ের। কী আছে ওটায়? খুলবেন? নিয়ে এলেন ব্রিফকেস। রাখলেন টেবিলে। হাত কাঁপছে। কিন্তু

খুলছে না। কারণ লক করা। এখন উপায়? লক খুলতে তো একটা পাসওয়ার্ড চাই। কী হতে পারে? ওয়ান ওয়ান ওয়ান?...... ওয়ান টু থ্রি?....না হচ্ছে না...। তাহলে?

হঠাৎ বিস্ময়করভাবে একটি নম্বর কীভাবে যেন ভেসে উঠল ডক্টর আনন্দ রাইয়ের মাথায়। যা আপাতভাবে শুনলে মনে হবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। সিনেমার সস্তা চিত্রনাট্যের মতো। কিন্তু কে না জানে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন! অতএব মিরাকল ঘটে গেল! ডক্টর আনন্দ রাইয়ের মাথায় এসেছিল একটি নম্বর-৭৮৬। সাতশো ছিয়াশি! এটা যে শুভ নম্বর মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তা জানা ছিল। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও নাকি নম্বর যথেষ্ট শুভ হিসাবেই দেখা হয় অনেক স্থানে। সেটা জানা ছিল আনন্দ রাইয়ের। তিনি নিজের পরিবারের মধ্যেও দেখেছেন এরকম উদাহরণ। অতএব তিনি লাস্ট চেষ্টা করলেন। ব্রিফকেসে ওপেন পাসওয়ার্ড দিলেন সেভেন এইট সিক্স! আশ্চর্য! খুলে গেল! শুধু ব্রিফকেস খোলেনি। খুলে গেল আর স্বাধীন ভারতের এক অত্যাশ্চর্য দুর্নীতি আর ক্রাইম স্টোরির প্রথম পৃষ্ঠা।

ব্রিফকেস খুলে স্তম্ভিত ডক্টর আনন্দ রাই। ভেতরে অসংখ্য পিএমটি ফর্ম। অর্থাৎ ডাক্তারিতে ভর্তি পরীক্ষার ফাঁকা এবং পূরণ করা আবেদনপত্র। আর একটি এনভেলাপের মধ্যে প্রচুর ছেলেমেয়ের পাসপোর্ট সাইজের ছবি। তখনই ক্লিয়ার হল অনেকটা। তার মানে জগদীশ সাগর নাম রোল নম্বর, ছবি সব অলটার করে দেয়। অন্য কারও ছবি পেস্ট করে দেয় আসল পরীক্ষার্থীর ফর্মে! কিন্তু এতে করে কোনো কিছুই প্রমাণ করা যায় না। অতএব সেদিন সবটা জেনেও ব্রিফকেস আবার বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিলেন আনন্দ রাই। ইন্দোরে ফিরে এসে শুধু নজর রাখা শুরু করলেন ডক্টর সাগরের উপর। ঠিক দেড় বছর পর ইন্দোরের ইনডেক্স মেডিকেল কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের চাকরিতে ঢুকলেন জগদীশ সাগর। তখনও আনন্দ রাই যুক্ত মহাত্মা গান্ধী মেডিকেল কলেজে। গোপন সূত্রে জানা গেল কয়েকজন বিহারী ছাত্র তাদের বন্ধুদের থেকে ফোন পেয়েছে। সেইসব বন্ধুরাও বিহারের কয়েকটি আলাদা কলেজে কেউ ভেটেরিনারি কেউ ডেন্টিস্ট্রি পড়াশোনা করে। তারা ফোন করে বলেছে আমাদের কাছে প্রি মেডিকেল টেস্টের কোশ্চেন পেপার আছে।

যদি কোনো ক্যান্ডিডেট চায় কিনতে পারে। তোমরা ক্যান্ডিডেট জোগাড় করো কমিশন পাবে। খবরটি আনন্দ রাই গোপনে জানিয়ে দিলেন পুলিশের ডেপুটি সুপারের (ক্রাইম) কাছে সঙ্গে কয়েকটি ফোন নম্বর। সেই সূত্র ধরেই হল একটি হোটেলে রেইড। এবং ধরা পড়ে গেল ৪০ জন অভিভাবক ও ছাত্র। যারা এসেছিল পরীক্ষা দিতে এবং তাদের হেফাজতেই পাওয়া গেল। পরদিন সকালে হতে যাওয়া মেডিকেল পরীক্ষা হওয়ার আগের রাতেই তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল প্রশ্নপত্র। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা হল এই ৪০ জনের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত ছিল এফআইআর। অর্থাৎ এরা টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনেছে। সেই অপরাধে গ্রেপ্তার করে জেরা করার দরকার ছিল। কিন্তু এদের করে দেওয়া হল অভিযোগকারী। যেন এরা কিছুই জানে না! থামলেন না আনন্দ রাই। তিনি সরাসরি সমস্ত লিংক জানিয়ে সোজা শিক্ষাদপ্তরের কাছে জমা দিলেন লিখিত অভিযোগ। নথিপত্র সহ। আর শিক্ষা দপ্তর এরপরই বাধ্য হয়ে চার সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি সরকারি স্তরে গঠন করা হল। শুরু হল ব্যাপম কেলেঙ্কারির প্রথম তদন্ত।

সেই তদন্তের সূত্র ধরেই জবলপুর মেডিকেল কলেজের ডিন ডক্টর এস কে সাকাল্লে পাঁচজন ছাত্রকে চিহ্নিত করলেন। যারা জবলপুর মেডিকেল কলেজে অবৈধ উপায়ে ভর্তি হয়েছিল। সেই পাঁচজনকে কলেজ থেকে শুধু যে চলে যেতে হল তাই নয়, তারা কীভাবে এই দুর্নীতির সন্ধান পেল তা নিশ্চিত জানতে পুলিশ গ্রেপ্তারও করল। আর তারপরই ডক্টর এস কে সাকাল্লেকে তাঁর নিজের বাড়ির লনে একদিন পাওয়া গেল মৃত। তিনি লনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পুলিশ এসে তদন্ত করে কী জানাল? এই অধ্যাপক তথা ডিন নাকি নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আত্মহত্যা।. আশ্চর্য! একজন ডাক্তার যদি আত্মহত্যা করতে চান তাহলে তাঁর পক্ষে কি বিষাক্ত কোনো উপাদান পাওয়া ও ব্যবহার করা শক্ত? তাহলে অযথা তিনি নিজেকে তীব্র কষ্ট দিয়ে গায়ে আগুন দেবেন কেন? উত্তর পাওয়া গেল না। উত্তর খোঁজার চেষ্টাও হল না
।

ভুল বললাম। উত্তর খোঁজার চেষ্টা শুরু হল ঠিক এক বছর পর। কারণ তিনি গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার পর জবলপুর মেডিকেল কলেজের ডিন হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ডক্টর অরুণ শর্মা। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ডক্টর অরুণ শর্মার যাওয়ার কথা আগরতলায়। একটি মেডিকেল কলেজে ইনস্পেকশন আছে। জবলপুর থেকে ডক্টর শর্মা দিল্লিতে এসেছিলেন। আগরতলার ফ্লাইট পরদিন সকালে। দিল্লির দোয়ারকা এলাকার একটি হোটেলে উঠলেন তিনি। কেন? জানা নেই। কারণ তাঁর ওঠার কথা ছিল এয়ারপোর্টের কাছের কোনো হোটেলে। দোয়ারকার সেই হোটেলের কর্মচারী সকালে অরুণ শর্মার ঘরের দরজা নক করে কোনো সাড়া পায়নি। কয়েক ঘণ্টা পর আবার নক করা হল। এবারও কোনো সাড়া নেই। রিসেপশন থেকে ইন্টারকম রুমে ফোন করা হয়। কেউ রেসপন্স করেনি। কী হল? অবশেষে ঠিক হল ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঢোকা হবে। কারণ সেদিন সকালেই তো তাঁর ঘর ছেড়ে দিয়ে আগরতলা যাওয়ার কথা। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে রুমে ঢুকে দেখা যায় ডক্টর অরুণ শর্মার মৃতদেহ পড়ে আছে। কার্পেটে। পাশে হুইস্কির বোতল খোলা। অর্ধেক গ্লাসে জল। মুখের পাশে রক্ত। একই কলেজের দুজন ডিন এক বছরের মধ্যে মারা গেলেন। যাঁরা ছিলেন ব্যাপম তদন্তের সঙ্গে যুক্ত। এই মৃত্যুটির পরই আবার নতুন করে দাবি উঠেছিল তাহলে আগের ডিন ডক্টর সাকাল্লের মৃত্যুর তদন্তও করতে হবে নতুনভাবে। কারণ ওটাও যে হত্যা নয় কে বলতে পারে?

২৯ বছরের দেবেন্দ্র নাগর ছিলেন মিডলম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি পরীক্ষার জন্য জাল ক্যান্ডিডেট ধরে আনতেন। আর বিনিময়ে কমিশন। পুলিশ তাঁকে ডেকে পাঠাল। তিনদিন পর ২০১৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর মোটরবাইক দুর্ঘটনার তাঁর মৃত্যু হয়।

২৯ বছরের রামেন্দ্র সিং ভাদোরিয়া চারবার চেষ্টা করেছিলেন ডাক্তারি কোর্সে চান্স পাওয়ার। কিছুতেই হচ্ছে না। পঞ্চমবার কী আশ্চর্য! তাঁর এতদিনের ইচ্ছে পূর্ণ হল। এবং চান্স পাওয়া গেল। এবং নিশ্চিন্তে এমবিবিএস পাশ করে ডাক্তার হওয়ার পর তিনি চাকরি পেলেন ঝাঁংসির বিড়লা হাসপাতালে। সঙ্গে শুরু করলেন পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়াশোনা। পরীক্ষা সামনে। কিন্তু একটা সমস্যা। তার যাবতীয় স্কুলের সার্টিফিকেটগুলো সেই

মেডিকেল কলেজেই রয়ে গিয়েছে। দিচ্ছে না। কেন? গোয়ালিয়রের সেই কলেজে গিয়ে অবশেষে রামেন্দ্র জানতে পারলেন তাঁকে খুঁজতে পুলিশ আসছে। আগেও একবার তদন্ত চালিয়েছে তাঁর অজ্ঞাতে। আর পুলিশের বারণ আছে। তাই তাঁর স্কুলের নথিপত্র আটকে রাখা আছে। কিন্তু সে কী করেছে? পুলিশ জানাল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ আছে অবৈধভাবে ডাক্তারি কোর্সে যারা পরীক্ষা দেয় তাদের। রামেন্দ্র নিজেই একজন প্রক্সি পরীক্ষার্থী। ঠিক দুমাস পর রামেন্দ্রকে আবার কে পাঠিয়ে বলা হল তোমার বিরুদ্ধে সেকেন্ড কেস করা হচ্ছে। তুমি নিজেও টাকা দিয়ে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছ। চারবার যে চান্স পেল না। সে পঞ্চমবার এত ভালো নম্বর পেয়ে কীভাবে পেতে পারে চান্স। রামেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হলেও জামিনও হয়ে যায়। তিনমাস পর রামেন্দ্র পুলিশকে জানায় সে যতটা জানে সব বলতে রাজি। কিন্তু তার কেরিয়ার যেন নষ্ট না হয়। পুলিশ রাজি হয়। তবে একটাই শর্ত। সমস্ত নেটওয়ার্ক জানাতে হবে। কারা যুক্ত? কাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়? কে তাঁকে চিহ্নিত করে? আর অন্য কোন কোন ডাক্তার জড়িত? রামেন্দ্র রাজি। ঠিক দুদিন পর পুলিশ এসেছিল । তবে অন্য খবর পেয়ে। রামেন্দ্র ভাদোরিয়াকে সিলিং ফ্যানে ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। মুখ ঢাকা বালিশের কভারে। আর গলায় পেঁচানো টিভির কেবল লাইনের মোটা তার। আত্মহত্যা? হত্যা? জানা যাচ্ছে না। ঠিক পাঁচদিন পর রামেন্দ্র ভাদোরিয়ার মা কুসমা দেবী অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। পুত্র হারানোর যন্ত্রণায়।

বান্টি সিকরেওয়ার, অরবিন্দ শাক্য, নরেন্দ্র তোমর, অনন্তরাম ঠাকুর, আশুতোষ তিওয়ারি...ব্যাপমে রহস্যময় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। আপাতত ৪৮। লখনউতে মৃত্যু হল শৈলেশ যাদবের। রাজ্যপালের পুত্র। যার নাম ব্যাপমে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। কী হয়েছিল? বলা হচ্ছে ব্রেন হেমারেজ! মাত্র ৫০ বছর বয়স।

প্রশান্ত পান্ডের সাইবার কাফের নাম টেকনো সেভেন। একঝাঁক পুলিশ এসেছে তাঁর কাফেতে। একটা হার্ড ড্রাইভ আছে। পুলিশ স্টেশনে ডেটা কেবল নেই এরকম। তাই কানেক্ট করা যাচ্ছে না। একজন গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তের থেকে পাওয়া গিয়েছে এই হার্ড ড্রাইভ। প্রশান্ত যেন সেটি কানেক্ট করে জানায় কী আছে। সেই হার্ড ড্রাইভেই আবিষ্কার হল

সেটি কার? নীতীন মহিন্দ্রের। খোদ ব্যাপমের প্রিন্সিপাল সিস্টেম অ্যানালিস্ট। মানে সর্ষের মধ্যেই ভূত? চোখ কপালে ওঠার তখনও বাকি আছে। কারণ নীতীনকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর চেম্বারে হানা দিয়ে যে পেন ড্রাইভ পাওয়া গেল সেখানে একটি রহস্যময় লিস্ট। নামের তালিকা। যেখানে অনেকবার লেখা একটি এন্ট্রি। সিএম। সিএম মানে? চিফ মিনিস্টার? মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় বিরোধীরা প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তাঁর কোনো কিছুই রাখঢাক করার নেই। পুরোদমে তদন্ত চলুক। সিবিআই হাতে নিল ব্যাপম তদন্তের। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ মেলেনি। তবে গ্রেপ্তার হলেন আসল মাথা। ডক্টর জগদীশ সাগর। তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। বেডরুমে ঢোকা হয়েছিল তল্লাশির জন্য। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়। পাওয়া গেল।

জগদীশ সাগরের বিছানার গদিটি অদ্ভুত শক্ত। নরম নয়। কারণ তোষকের ওপর অন্যরকম একটি তোশক বিছিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর নাকি ভালো সুখের ঘুম হত ওরকম গদিতে শুলে। কেন? কারণ সেটি ছিল টাকা দিয়ে তৈরি গদি। ১৫ লক্ষ টাকা তোশকের উপরে সাজিয়ে রেখে রাতে ঘুমাতে যাওয়া অভ্যাস ছিল তাঁর! ওপরে শুধু হালকা একটা চাদর।

১৬

চন্দ্র ভান দুয়া সই করতে পারেন না। টিপছাপ দিয়ে ব্যাংকে টাকা জমা করেন। যদিও ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সবেমাত্র কয়েকমাস খোলা হয়েছে। কী হবে অ্যাকাউন্ট দিয়ে? ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখার মতো টাকা কোথায়? প্রায় দিন আনা দিন খাওয়া। পুরোনো দিল্লির দরিয়াগঞ্জে ফলের রসের দোকান। সবথেকে বেশি ভিড় হয় শুক্রবার। জামা মসজিদে নমাজে আসা মানুষরা নমাজ সেরে দরিয়াগঞ্জের এই দোকানে ভিড় জমায়। মিক্সড ফ্রুট জুস দেড় টাকা। বেশি চলে মসুম্বি জুস। কিন্তু আজকাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দরকার পড়ছে। কারণ ছেলে গুলশন সারাদিন দোকান চালানোর পর সন্ধ্যা হলেই আবার বেরিয়ে পড়ে। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে। সবথেকে ভালো দিক হল দারুণ মধুরভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে ছেলেটা। আর সরলতা আছে স্বভাবে। অন্তত মুখেচোখে একটা নিরীহ ছাপ স্পষ্ট। আর কেউ জানে না যে এই ছাপের আড়ালে আসলে রয়েছে একটা প্রচণ্ড জোরালো জেদ। দোকানের উলটোদিকেই ফিরোজ শাহ কোটলা গ্রাউন্ড। রবি শাস্ত্রী, কপিলদেবরা খেলে যায় এখানে। কিন্তু দেখার পয়সা নেই। গুলশন সেই দুঃখ চেপে রাখে। সে ভাবে একদিন আমি এইসব করতে পারব। কীভাবে যে এত বেশি বড় করে ভাবে কে জানে! চন্দ্র ভান মনে মনে ভয় পান। এত উচ্চাশা ছেলেটাকে খারাপ পথে না নিয়ে যায়। কী দরকার! আমরা যেমন থাকি, তেমনই তো ভালো আছি। কিন্তু এসব কথা ওর সামনে বলা যায় না। শুনলে বলে, পিতাজি আপনি একটু সময় দিন আমাকে। দেখুন আমি কী করতে পারি! হাসেন চন্দ্র ভান। এই পুরানি দিল্লিতে কত এরকম স্বপ্নের সওদাগর ঘুরছে। সবাই ভাবে তারা একদিন বেতাজ বাদশা হবে। কিন্তু কিছু বছর পর দেখা যায় কেউ বাল্লি মারানের গলিতে মির্জা গালিবের হাভেলির পাশে চপ্পলের দোকান খুলেছে। আবার কাউকে দেখা যায় টাউন হলের সামনে দিনের বেলা ঘুরছে সস্তা শাড়ি নিয়ে দোকানে দোকানে। তবে দিল্লির চাঁদনি চক এক মজার জায়গা। এখানে হেন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ডুপ্লিকেট। গুলশন আজকাল ওই চাঁদনিতেই বেশি ঘোরাঘুরি করে। আপাতত অর্ডার সাপ্লাই করছে। কোথা থেকে যে সস্তার সব জিনিস নিয়ে আসে কে

জানে। ডিটারজেন্ট, বোতল ভরা জুস, পুরোনো সিলিং ফ্যান। যেমন ধরা যাক আসল ড্রিংকসের কোম্পানির নাম রসনা। কিন্তু ও কোথা থেকে যেন এমন এক প্যাকেট জোগাড় করে যার গায়ে লেখা ‘রসন’। এক ঝলকে দেখে যে কেউ ভাববে রসনা। খুব ভালো করে প্যাকেট পড়লে বোঝা যাবে চালাকিটা। কিন্তু আপাতভাবে কোনো দোষ নেই। যে কেউ কোম্পানির নাম ‘রসন’ দিতেই পারে। এসব যেখানে তৈরি হয় তার কোনোটা গ্রেটার নয়ডা, কোনোটা সুরযপুর, কোনোটা অর্জুনপুর, অথবা হয়তো হরিদ্বারের আগের স্টেশন জোয়ালামুখিতে। অসম্ভব পরিশ্রম আর কষ্ট করছে গুলশন। আর হ্যাঁ। সত্যি বলতে কী টাকাও রোজগার করছে। তাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। কিন্তু ব্যবসা করে ও। অ্যাকাউন্ট বাবার নামে।

নয়ডা সেক্টর সিক্সটি টু থেকে সোজা গিয়ে একটা মন্দির। তার পিছনে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে ২১ বছরের গুলশন। সেখানে একটা অদ্ভুত পরীক্ষা করছে সে। ওল্ড দিল্লির বিভিন্ন ছোটখাটো গানের স্কুলে যারা গান শেখে কিংবা সাঁইবাবা আর মাতা বৈষ্ণোদেবীর জাগরণ অনুষ্ঠানে টাকা নিয়ে গান গায় যে ভাড়াটে শিল্পীরা, তাঁদের নিজের একটা স্কুটারে চাপিয়ে নিয়ে আসে এখানে। ঘরে ঢুকে দেখা যাবে সেখানে একটাই দরজা। আর কোনো জানালা নেই। শুধু একটা ফলস সিলিং আছে। একটিও আসবাব না থাকায় জোরে কথা বললে সামান্য প্রতিধ্বনি হয়। বেশ গমগম করে ঘরের আওয়াজ। ফিলিপসের একটা টেপ রেকর্ডার রাখা একটা চেয়ারে। সিঙ্গল ক্যাসেট। তার সামনে উবু হয়ে বসে রেকর্ডিং এর সুইচ টিপে দিতে হবে। আর হাতে রাখা কাগজ নিয়ে গান গাইতে হবে ওভাবেই উবু হয়ে বসে। যতটা সম্ভব ওই বেসিক টেপ রেকর্ডারের প্রান্তে থাকা দুটি ছোট ফুটোর কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গাইতে হবে। ওটাই রেকর্ডার। খোলা গলায়। বেশিটাই ভজন। টেপে থাকবে ব্ল্যাংক ক্যাসেট। সেটাই যা দামি। বাকি সব সস্তা। গুলশন সস্তার পূজারি। সে জানে বেঁচে থাকতে হলে আর ব্যবসা করতে হলে একটা জিনিসের বন্দনা করতে হবে। সস্তা। মানুষ, সে যত বড়লোকই হোক আর যত গরিবই হোক, জিনিসের দাম কমাতে চায়। যে যার নিজের মতো করে। তাই সে বেশি খরচ করছে না এসব পরীক্ষায়। ওই শিল্পীদের ২৫ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। ক্যাসেটের দুই পিঠে ৬টা ভজন থাকবে। একজনের কাজ শুধু টেপ

রেকর্ডারের অনেকটা দূরে বসে হারমোনিয়াম বাজানো। যাতে গানকে ছাপিয়ে না যায় হারমোনিয়াম। তাই দূরে বসে বাজানো। রেকর্ডিংটা বেশ গমগমে হয় এই ফাঁকা ঘরে। এত গোপনীয়তা কীসের? কারণ এই কনসেপ্ট সম্পূর্ণ নতুন। কেউ ভাবেনি এভাবে যে গান বিক্রি করা যায়। আসলে এই ক্যাসেট সস্তায় বিক্রি করা হবে। পাড়ার মন্দিরে মন্দিরে। বিভিন্ন সংগঠনের দপ্তরে। গিয়ে বলা হবে শুনে ভালো লাগলে কিনতে পারেন। সস্তায় পাবেন ১০ টাকা। কোনো নামীদামি শিল্পী নেই। খরচও নেই। আর ব্র্যান্ড শিল্পী নয়। ভক্ত পুণ্যার্থীরা চাইবেন ভগবানের নামগান। সে যে কোনো গায়ক গায়িকাই করুক। কভারও আছে। শিব, দুর্গা, সরস্বতী, বৈষ্ণোদেবীর কালার ছবি। সেসব তো করোলবাগের ফুটপাথে পাওয়া যায় একসঙ্গে। অতএব মন্দির, সভা, জমায়েত, সংগঠনের অনুষ্ঠানে সারাদিন বাজবে ভজন গান। নামজাদা কোম্পানির দামি ক্যাসেট কেনার দরকারই নেই। কনসেপ্ট জনপ্রিয় হতে দেরি হল না। যাকে বলা হয় ভিনি ভিডি ভিসি! এলেন দেখলেন জয় করলেন। গুলশনের এই ব্যবসা বুদ্ধি মারাত্মক হিট করল। এভাবে হাতে গরম ভজনসংগীত পেয়ে গিয়ে এই আনপ্রফেশনালভাবে ঘরে রেকর্ড করা ক্যাসেট মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হতে লাগল। কারণ গিয়ে কিনতে হয় না। একটি সাইকেল করে এসে একটি ছেলেই দিয়ে যায় ক্যাসেট। মাত্র ১০ টাকা। এটা শুরু। তার সঙ্গে চাঁদনি চকের সেইসব অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসাও চলছে পুরোদমে। সুতরাং ঘরে টাকা আসছে। কিন্তু আচারব্যবহার আর জীবনযাপনে মাথা ঘোরেনি গুলশনের। সে জানে এসব স্রেফ শুরু। এখনও আসল কাজ বাকি। বহু পথ বাকি। তাঁর লক্ষ্য বহু নামজাদা ব্র্যান্ডকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া। অর্ডার আসছে হরিয়ানা থেকে। অর্ডার আসছে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে। অর্ডার আসছে আগ্রা থেকেও। অর্ডার আসছে গাজিয়াবাদ থেকে। দরিয়াগঞ্জের ফলের রসের দোকানের একটি ছেলে কাউকে জানায়নি এলাকায় যে কীভাবে সে এসব করছে। কারণ তাহলে কনসেপ্ট চুরি হবে। সে সকলকে বলে মুম্বই গিয়ে রেকর্ডিং করিয়ে আনতে হয়। যারা মুম্বইয়ে সিনেমায় কোরাসে গান করে, রেডিও আর্টিস্ট তাঁদের দিয়ে গাওয়ানো হয়। কিন্তু আসলে যে এইসব শিল্পীরা দিল্লির মধ্যেই হেঁটে চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা বোঝা যাবে না। তাঁদের আপত্তি নেই। টাকা তো আসছে।

বেদ চানানা গুলশনের বন্ধু। সে জানে গুলশনের কাজটি কী। একদিন পুরোনো দিল্লিতে সন্ধ্যা হচ্ছে। লালকেল্লার উলটোদিকের মন্দিরের সামনের পাঁচিলে বসে দুজনের আড্ডার মধ্যেই বেদ চানানা বলল, এক কাম করতে হ্যায়..কিউ না হাম খুদ শুরু কর দেতে হ্যায় আপনে কোম্পানি! গুলশন চমকে উঠল। তারই মনের কথা এটা। কীভাবে জানল বেদ? অতএব লালকেল্লার সামনের মার্কেটে চা খেতে খেতে এক সন্ধ্যায় জন্ম নিল একটি স্বপ্ন। যা ছিল আসলে ভারতের মিউজিক বিজনেসের একটি ইতিহাসের নাম। সুপার ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রিজ। যে ইতিহাস সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দেবে গোটা দেশের সংগীত জগৎকে। ঠিক দু বছরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল একটি ঝড়! ঝড়ের নাম টি সিরিজ! কোম্পানি নয়ডার ঠিকানায়। উত্তরপ্রদেশ। আর ক্যাসেট তৈরির কারখানা গ্রেটার নয়ডার সুরযপুরে। স্টুডিও ভাড়া করা হয় মুম্বইয়ে। দরিয়াগঞ্জের এক ফলের রসের দোকানে বসে থাকা গুলশনের নাম গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে এরপর। নতুন ব্র্যান্ডের জন্ম হবে। নাম গুলশন কুমার! বাবা ভেবেছিলেন কী হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে? টাকা কোথায় বাড়তি যে ব্যাংকে রাখতে হবে! আর সেই বাবার বড় পুত্রটি মাত্র ১০ বছরের মধ্যে দেশের এক নম্বর ট্যাক্স দাতা হয়েছিলেন। সম্পত্তির পরিমাণ ছিল সরকারিভাবে ৩৫০ কোটি টাকা!

আজ যাকে বলে কভার ভার্সন, তার প্রকৃত আবিষ্কর্তার নাম গুলশন কুমার। ভারতীয় কপিরাইট আইনের সেকশন ৫২ (১) (জে) অনুযায়ী যে কোনো গানের আবার নতুন রূপে রেকর্ড করতে হলে একটা অনুমতি সম্বলিত চিঠি চাই প্রকৃত গায়ক গায়িকা আর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডিং সংস্থার। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোনো নিয়ম পালিত হল না। তবে চিঠি দেওয়া হল শিল্পীদের। সে তো হাজার হাজার ফ্যান দেয়। কজন খুলে পড়েন? সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। মূলত দুজন নতুন গায়ক ও গায়িকার সন্ধান পেলেন সংগীতের অসাধারণ কানসম্পন্ন গুলশন কুমার। ওই দুই শিল্পীর একজনকে দিয়ে তিনি গাওয়াতে শুরু করলেন লতা মঙ্গেশকরের পুরোনো গানগুলি। আর অন্যজন গাইলেন কিশোর কুমারের সমস্ত হিট গান। দুই শিল্পীরই সত্যিকারের অত্যন্ত ভালো কণ্ঠ। এবং এতদিন তাঁদের কেউ সেভাবে কেন গুরুত্ব দেয়নি এটা এক রহস্য। তাঁরা দুজনেই রীতিমতো বছরের পর বছর ধরে স্ট্রাগল করছেন তখন। অথচ ব্রেক পাচ্ছেন না। একটি মাত্র লোক তাঁদের

মধ্যে থাকা গুণের গন্ধ পেয়েছিলেন। এবং তিনিই সুযোগ দিলেন। কিশোর কুমারের সুপারহিট গানগুলি গাইলেন কুমার শানু নামের এক নতুন অজানা গায়ক। আর লতা মঙ্গেশকরের গান নিয়ে অ্যালবাম তৈরি হল, যেগুলির গায়িকা একটি ফ্রেশ কুণ্ঠ, অনুরাধা পাড়ওয়াল। এবারও ভুল করেননি গুলশন কুমার। মার্কেটে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব গান সুপারহিট। নতুন এক শব্দ এল ভারতীয় সংগীতজগতে। রিমেক! কেন জনপ্রিয় হল? কারণ ততদিনে এইচএম.ভি, মিউজিক

ইন্ডিয়ার মতো ব্র্যান্ডেড সংস্থাগুলির ক্যাসেটের দাম সাধারণ গরিব আর মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের নাগালের বাইরে রয়ে যাচ্ছিল। গান শোনার প্রবল ইচ্ছা। অথচ ক্যাসেট কিনতে পারছি না। এই অবস্থায় মনখারাপের দিন কাটাতেন কোটি কোটি ভারতবাসী। বিশেষ করে কিশোর, তরুণ ও বেকার যুবকযুবতীর দল। ঠিক এই অংশকে টার্গেট করেছিল টি সিরিজ। প্রধান মন্ত্রই হল সস্তায় গান পৌঁছে দিতে হবে। কতটা পাবলিক রিলেশন করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন গুলশন কুমার? একটি ছোট উদাহরণ। অনুপ জালোটাকে দিয়ে তিনি নিজের কোম্পানির হয়ে আবার একই ভজন গানগুলি গাওয়াতে রাজি করিয়ে ফেলেন যেগুলি ততদিনে সুপারহিট হয়ে গিয়েছে মিউজিক ইন্ডিয়ার ব্যানারে। সেটা বড় কথা নয়। তার থেকে অবিশ্বাস্য হল সেই একই গানের রি-রেকর্ডিং সম্বলিত নতুন অ্যালবামের নাম পর্যন্ত হয়েছিল একই। 'ভজনসন্ধ্যা'। যা নিয়ে তীব্র আতঙ্কিত হয়ে পড় মিউজিক ইন্ডিয়া। কারণ স্বাভাবিক। টি সিরিজের অ্যালবামের দাম অর্ধেকের কম। সুতরাং শুধু যে ক্যাসেট বিক্রি হল মুড়িমুড়কির মতো তাই নয়, অনুপ জালোটার ফাংশনের কন্ট্রাক্ট একটা সময় গোটা দেশে সবথেকে শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেল। উদ্বিগ্ন মিউজিক ইন্ডিয়া দিনের পর দিন একটি বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হয়েছিল। যার বয়ান ছিল 'ডুপ্লিকেট থেকে সাবধান।' 'একই রকম দেখতে ক্যাসেট কিনবেন না।' 'আসল মিউজিক ইন্ডিয়া কিনুন।' 'মিউজিক বাঁচান।' কে বাঁচাবে? বরং তাঁর ভক্তকুল বললেন, অসলে গানকে জনপ্রিয় করলেন গুলশন কুমার। তিনি মিউজিককে ড্রইংরুম থেকে বের করে ফুটপাথের দোকানে নিয়ে এলেন। কজন ইয়ং ছেলেমেয়ে পুরোনো গান শুনত এতদিন? এই রিমেকের জন্যই তো শুনছে? সেই বিতর্ক আজও চলছে। আজও আমাদের বাংলায় রিমেক ভক্তরা বলেন, রিমেক না

হলে কজন মনে রেখেছিলেন সুবীর সেনের ‘পাগল হাওয়া, কী আমার মতো তুমিও হারিয়ে গেলে’! বিশুদ্ধপন্থীরা বললেন, প্রকৃত গানকে ভুলিয়ে দিচ্ছে এই বিপজ্জনক রিমেক প্রবণতা। নতুন প্রজন্ম জানবেই না আসল গানটি কে গেয়েছিলেন! এই তর্ক থামার নয়। আমরা সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। বরং গুলশন গাথায় ঢুকে পড়া যাক।

গুলশন কুমারের ফরমুলা হয়ে দাঁড়াল এক মার্কেট গুরুর ম্যানেজমেন্ট কোর্স। লো প্রাইস হাই ভলিউম। সস্তায় বিক্রি করো, প্রচুর বিক্রি করো। মুনাফা সাংঘাতিক। যে কোনো ফুটপাথেও পাওয়া যেতে লাগল টি সিরিজ। কেন? কারণ কোম্পানি থেকে ক্যাসেট কিনতে কোনো পেপার ওয়ার্ক নেই। কোনো ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে হবে না। যে কেউ বিক্রি করতে পারবে।

আর পুরোনো সুপারহিট গানের রিমেক বিক্রি সর্বকালের সব রেকর্ডকে ছাড়াতে শুরু করল। সেলুনে, পানের দোকানে, সবজি বাজারে এবং সর্বোপরি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাথার কাছে সারাদিন ধরে বাজতে লাগল রিমেকের শিল্পীদের কণ্ঠে খিলতে হ্যায় গুল ইয়াহাঁ...দো ঘুঁট মুঝে ভি পিলা দে শরাবি....তেরে বিনা জিন্দেগী সে কোই..... জিন্দেগী কা সফর.....মানা জনাব নে পুকারা নেহি.....না কোই উমঙ্গ হ্যায়.....মেরে ন্যায়না শাওন ভাদো...।

বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সংস্পর্শে একবার যে এসেছে তার পক্ষে আর সেই মোহময়ী আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। এখানে বহু স্বপ্নের জাহাজডুবি হয়েছে। আবার বহু দিন আনা দিন খাওয়া স্ট্রাগলার দেশের রোলমডেল হয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রেও পরিণত হয়েছে।

ড্রিমটাউন। স্বপ্ননগরী। অসম্ভব শীতল মাথার হলেও গুলশন কুমারও ভাবলেন এই গ্ল্যামার জগতের অঙ্গ হতে হলে নক্ষত্রদের হর্তাকর্তাবিধাতা হতে হবে। অর্থাৎ প্রোডিউসার। ‘লাল দুপাট্টা মলমল’ নামের একটি বি গ্রেড ফিল্ম প্রযোজনা করলেন। তাঁর বৃহস্পতি তুঙ্গে। সেটাও হিট। বিশেষ করে উত্তর ভারতের মফসসল টাউনগুলিতে চলল রমরম করে। এবং তারপর নতুন দুই নায়ক নায়িকা আর তাঁর প্রিয় গায়ক গায়িকাকে দিয়ে

লো বাজেটের একটি সিনেমা প্রযোজনা করবেন ভাবলেন। পরিচালনার জন্য অবশ্য একজন পরিচিত মানুষকেই ডাকা হল। নতুনদের নিয়ে কাজ করতে একমাত্র তিনিই রাজি হলেন। বাকিরা কেউ রিস্ক নেবেন না। সেই লোকটির নাম মহেশ ভাট। আর সিনেমার নাম 'আশিকি'। গুলশন কুমার আর পিছনে ফিরে তাকাননি তারপর। পিছনে তাকাতে হয়নি সেই নতুন গায়ক গায়িকাকেও। তাঁদের নাম আগেও বলেছি। কুমার শানু ও অনুরাধা পাড়ওয়াল। এবং গুলশন কুমার যেমন রাজা মিডাসের স্পর্শের মতো যা ছুঁয়েছেন তাই সোনা হয়েছে, তেমনই তিনি এই সিনেমাটির মাধ্যমে জন্ম দিলেন একটি নতুন সংগীত পরিচালক জুটির। যাঁরা গোটা নব্বই দশকের সেরা জুটি হিসাবে পরিচিত। একের পর এক হিট গান। তাঁদের নাম নাদিম-শ্রাবণ। নাদিম ধীরে ধীরে গুলশন কুমারের সবথেকে প্রিয় বন্ধু। দুজনেই হরিহর আত্মা হয়ে উঠলেন অল্পদিনের মধ্যেই।

টি সিরিজের ক্যাসেট সস্তায় হাতের কাছে চলে আসায় বেড়ে গেল এক ধাক্কায় টেপ রেকর্ডারের কোম্পানির ব্যবসাও। সস্তার টেপ রেকর্ড চলে এল বাজারে। সস্তার টেপ, সস্তার ক্যাসেট, সস্তার অ্যালবাম, এসে গেল নতুন এক ভার্সান। তার নাম টু ইন ওয়ান। আর ডাবল অ্যালবাম। এসবের যোগফলে সস্তাই হয়ে গেল গান। গান আর অধরা রইল না। অসংখ্য নতুন নতুন শিল্পীর আত্মপ্রকাশ হতে শুরু করল। যাঁদের কোনো রেডিও অডিশন চান্স দেয়নি। সব বড় বড় ক্যাসেট সংস্থা পাত্তাই দেয়নি। তাঁরা ডাক পেলেন। আর এই অসামান্য এক লাভজনক বিজনেস মডেল দেখে সংগীতজগতে হাজির হল টি সিরিজের উত্তরসূরি একের পর এক কোম্পানি। গণেশ জৈন নিয়ে এলেন নিজের সংস্থা। তার নাম ভেনাস। থোরানি গ্রুপ নিয়ে এল টিপস কোম্পানি। কেবল ভিডিও ব্যবসায় তুখড় মুনাফা করে ধনী হয়ে যাওয়া গুজরাতি ব্যবসায়ী ধীরুভাই শাহ শুরু করলেন তাঁর সংস্থা টাইম ভিডিও। আর এই প্রবল সস্তার বন্যায় এবং একাধিক বিকল্প সংগীত উৎপাদন সংস্থার আগমনের ফলে ব্র্যান্ডেড সংস্থাগুলির অস্তিত্ব সংকটে পড়ল। নিজেদের ভাসিয়ে রাখতে, গুরুত্ব বজায় রাখতে, বিক্রি ঠিক রাখতে সেইসব একদা উন্নাসিক সংস্থাগুলি হু হু করে নিজেদের দামি ক্যাসেট ও ডাবল অ্যালবামের দামও কমিয়ে দিতে শুরু করল বাধ্য হয়ে।

কয়েকশ কোটি টাকার টার্নওভার হয়ে যাওয়ার ঠিক পরই বিজনেস মডেল চেঞ্জ করতে শুরু করলেন গুলশন কুমার। কারণ প্রতিযোগীরা চলে এসেছে মার্কেটে। সুতরাং তাঁকে এবার অন্যদিকে নজর দিতে হবে। সুপার ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রিজের টেপ কোটিং শাখাকে তিনি আলাদা করে দিলেন। নাম দেওয়া হল টোনি ইলেকট্রনিক্স। এই কোম্পানির দায়িত্ব দিলেন ভাই দর্শন কুমারকে। ততদিনে টি সিরিজের ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড বাজারে এসেছে। এবং সেই একই ফরমুলা। সস্তায় সারা মাস চলার ডিটারজেন্ট। সেই সংস্থাকে আলাদা করে নতুন নাম দেওয়া হল। গোপাল সোপ ইন্ডাস্ট্রিজ। আর এক ভাই গোপাল কৃষ্ণ এই সংস্থার ভার নিলেন। এবং নতুন একটি সংস্থা চালু হল। তার নাম রজনী ইন্ডাস্ট্রিজ। যা তৈরি করবে আগরবাতি। গুলশন কুমার অনেক আগে থেকেই টের পেয়ে যেতেন বিজনেসের নতুন পালস কিছু হওয়া উচিত। সুপার ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রিজের অনেক প্রতিযোগী এসে গিয়েছে। তাই এখন সেই একই কোম্পানি ক্যাসেটের পাশাপাশি নিয়ে এল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি সেট। কেন? কারণ সমাজের যে অংশটির পক্ষে দামি ব্র্যান্ডের কালার টিভি কিংবা নিদেনপক্ষে ছোট পোর্টেবল টিভি কেনাও সম্ভব হচ্ছিল না তাঁদের কাছে গুলশন কুমার টিভি পৌঁছে দিলেন। বস্তিতে, কলোনিতে, ভাঙা টিনের চালের ঘরে। ক্যাসেট ব্যবসা ধীরে ধীরে মুনাফা কম দেওয়ার আগেই যাতে নিজের ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে আরও বেশি করে নতুন ভেঞ্চার করা যায় সেটাই হল গুলশন কুমারের প্রধান টার্গেট। আর এই কাজে তিনি সফল। একদিকে ভিডিও শুরু করলেন বৈষ্ণোদেবী যাত্রা আর ভজনের প্যাকেজ। আবার অন্যদিকে সুরযপুরে শুরু করলেন হাউজিং প্রজেক্ট। আর হৃষীকেশে মিনারেল ওয়াটার প্রকল্প। শুদ্ধ গঙ্গার জল দিয়েই পানীয় জল নির্মাণ করা হচ্ছে এর থেকে বড় মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আর কী হতে পারে? কিন্তু এত সব বড় বড় সংস্থা থাকতে উত্তরপ্রদেশের এই সব জায়গায় এত একরের পর একর জমি কীভাবে পেয়ে যাচ্ছেন গুলশন কুমার? তার ছোট উত্তর পাওয়া যাবে একটি প্রজেক্টের কথা শুনলে। গুলশন কুমার একটি তথ্যচিত্র প্রযোজনা করলেন। সেই তথ্যচিত্রের নাম দলিত সিংহিনী। এক ঘণ্টার। পরিচালক উদয়শংকর পাণি। তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু কী? এক দলিত সিংহিনীর জীবনকথা। তাঁর নাম মায়াবতী। যিনি তখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী!

আর রাজ্যের সর্বত্র একটি সামাজিক প্রকল্প চালানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন গুলশন কুমার। যার নাম আম্বেদকর গ্রাম বিকাশ যোজনা। মায়াবতী জানিয়ে দিয়েছিলেন গুলশন কুমারকে যেন তাঁর প্রয়োজনমতো সবরকম সাহায্য করা হয়। অতএব গুলশন কুমার নামক ম্যাজিকের এগিয়ে যাওয়া থামল না।

৩৫০ কোটি টাকার টার্নওভার! খাতায় কলমে। তার বাইরে কত? জানা যায় না। ঠিক এরকম একটি সময়ে গুলশন কুমার সম্পূর্ণ ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসারে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ১২টি শিবমন্দিরকে অধিগ্রহণ করে সেগুলির ভোল পালটে দিলেন। একটি তাঁর নিজের বাড়ির পিছনে। বম্বের লোখান্ডওয়ালায়। যেখানে সেলিব্রেটি জগতের অনেকেই থাকেন। গুলশন কুমার এই ১২টি মন্দিরে ঘুরে ঘুরে পুজো করেন। নিয়ম করে। সেই মন্দিরে প্রতিদিন পুজো দিয়ে তাঁর অফিসের কাজ শুরু করতেন। এটাই নিয়ম। মন্দিরের পিছনের জায়গাটা আসলে একটি বস্তি। বম্বের যে কোনো সরু, ঘিঞ্জি, নোংরা আর সন্দেহভাজনদের আনাগোনা। ১২ আগস্ট ১৯৯৭ ! আজ যাওয়ার কথা আন্ধেরির জিতেশ্বর মহাদেব মন্দিরে। মন্দিরে যাওয়ার আগে বাধা পড়ল। একটি ফোন এসেছে। কে ? রহস্যময় কণ্ঠটি ওপার থেকে জানাল দুবাই থেকে বলছি?

গুলশন কুমার : হাঁ বোলিয়ে

কণ্ঠ : ১০ খোকা দিতে বললাম যে! কী হল?

গুলশন কুমার : আমি কেন দেব? যথেষ্ট দিয়েছি! এর থেকে মাতা বৈষ্ণোদেবীকে দেব, তাও ভালো। তোমাদের দেব কেন?

কণ্ঠ : এটাই ফাইনাল?

গুলশন : হ্যাঁ, এটাই ফাইনাল।

কণ্ঠ : তুমি জানো আমি কে?

গুলশন কুমার : না জানি না। আর জেনে কী করব?

কণ্ঠ : পুলিশকে বলতে হবে তো! বলে দিও। মেরা নাম সালেম। আবু সালেম! ইয়াদ রাখনা!

মেরুন মারুতি এস্টিম বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। সকাল ১০ টা ৩৫। গুলশন কুমার মারুতি এস্টিম থেকে নামলেন পুজোর সামগ্রী হাতে নিয়ে। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের এক সিকিউরিটি গার্ড দেহরক্ষী। তাকে কিছুদিন আগেই রাখা হয়েছে। কিন্তু গত দুদিন ধরে সে অসুস্থ। আসছে না। তাই আজ গুলশন কুমার একা! সঙ্গে কেউ নেই। পুজো শেষ হতে বেশি সময় লাগেনি। কারণ পুরোহিত জানেন আজ তিনি আসছেন। সব ব্যবস্থা তৈরিই থাকে। প্রথমে ভজন। তারপর আরতি। এবং সামান্য ধ্যান। পুজো শেষ। সিঁড়ি দিয়ে নামছেন গুলশন কুমার। আর দুটি সিঁড়ি বাকি। একটু দূরেই মেরুন রঙের মারুতি এস্টিম দাঁড়িয়ে। চালক বাইরে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো সেটাও দেখা যাচ্ছে। আচমকা তিনটি যুবক এগিয়ে এল। ঠিক কানের পাশে রিভলভারটা রেখে একটি ছেলে বলল, বহোৎ পুজা করলি..আব উপর যাকে করনা...। গুলশন কুমার তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না এটা হতে পারে। তিনি শুধু বললেন, ইয়ে কেয়া কর রহে হো?...কিঁউ...! ছেলেটি বলল, ভাই কো ইনকার করা থা না? আব ভুগতো! নাইন এম এম পিস্তল হাতে আর একজন গুলি চালাল সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক গুলশন কুমারেরই কোনো ছবির দৃশ্য যেন। পুজোর সামগ্রীসহ রূপোর থালা ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। গুলি খেয়েই ছুটতে শুরু করলেন গুলশন কুমার। কিন্তু পিছন থেকে আবার গুলি? কটা? ১৬ বার। ততক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গোটা দৃশ্যটা দেখছিলেন গুলশন কুমারের গাড়ির চালক। নাম রূপলাল সুরয! এবার সম্বিৎ ফিরল। তিনি দেখছেন সাহেব মারা যাচ্ছেন। এটা কী হতে দেওয়া যায়! তাই নিথর ভাবটা কাটিয়ে সক্রিয় হলেন রূপলাল। সাহেবের হাত থেকে পড়ে যাওয়া পুজোর সামগ্রীতেই থাকা একটা কলসী নিয়ে ছুড়ে মারলেন তিনি হত্যাকারীদের লক্ষ্য করে। সেটা গায়ে লাগল লম্বা চুল আর ব্লু জিনস পরা ছেলেটির গায়ে। সেও তৎক্ষণাৎ গুলি চালাল। গুলি লাগল রূপলাল সুরযের পায়ে। তাও তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আবার তাড়া করে জাপটে ধরলেন একজনকে। আবার গুলি। এবারও পায়ে। দুটি পায়েই গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছেন রূপলাল। আর সেই মুহূর্তে গুলশন কুমার জিতনগর বস্তির প্রথম ঘরের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করলেন। মুখের উপর

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এবার দ্বিতীয় ঘর। পাশেই। একজন মহিলা ছিলেন। তিনিও বন্ধ করলেন ভয়ে দরজা। কোথায় যাবেন গুলশন কুমার? এই বস্তির একটি কমন বাথরুম আছে। আজ পর্যন্ত জীবনে একবারই এই বস্তিতে এসেছিলেন গুলশন কুমার। মাতা বৈষ্ণোদেবীর ভাণ্ডারা দিতে। সেই বাথরুমে ঢুকে দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেওয়ালে মাতা অম্বাদেবীর ছবি আঁকা। ইউরিনালের প্রবেশপথের বাইরেই। রাস্তার দেওয়ালে। পিছনে এসে গেল মৃত্যু। তাড়া করে আসা তিন হত্যাকারী আবার গুলি চালাল। গুলশন কুমার মাতা অম্বাদেবীর সেই ছবির ঠিক নীচে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। কিন্তু কনফার্ম করতে হবে তো? যদি সত্যিই না মারা যায়? তাই আবার গুলি চালানো হল! একটি ছেলে এক হাতে গুলি চালাচ্ছে আর বাঁ হাতটা উঁচু করে ধরা। সেই হাতে মোবাইল। মোবাইল অন করা। কারণ? কারণ হল ওপ্রান্তে আবু সালেম। সে পুরো হত্যাকাণ্ড লাইভ ব্রডকাস্ট শুনতে চায়। তাই এই ব্যবস্থা। গুলশন কুমার নিথর হয়ে যাওয়ার পর ছেলেটি ফোন কানের কাছে এনে বলেছিল, ভাই..ইসকা তো কাম হো গয়া..। আর সবথেকে রুদ্ধশ্বাস ঘটনা হল এরপর। ওই তিনজনকে দেখা গেল দৌড়ে মন্দিরের পিছনদিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিকে পিস্তল দেখিয়ে দরজা খুলে উঠে পড়ল। চালক পালাতে চাইল। কিন্তু তার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বলা হল ঘোড়া দাবাউ কেয়া! অর্থাৎ এই তিনজন বম্বের মাফিয়া গ্যাংয়ের সদস্যই নয়। কারণ তাদের নিয়ম হল নিজেদের গাড়ি অথবা স্কুটার নিয়ে আসা। এরা এতটাই নভিস যে হেঁটে হেঁটে এসেছে। কোনো গাড়িতে পালানোর বন্দোবস্ত আগে থেকে ছিল না। ট্যাক্সি পেয়ে সেটাতেই উঠে পালাল। রক্তাক্ত গুলশন কুমারকে এরপর রাস্তায় থাকা মানুষ নিয়ে গেল ২ কিলোমিটার দূরের কুপার হাসপাতালে। তিন সেকেন্ড পরীক্ষা হল। ইমার্জেন্সিতে থাকা ডাক্তার মাথা নাড়লেন..ডেড়।

আবু সালেমের টার্গেট লিস্টে প্রথমে গুলশন কুমার ছিলেন না। তার আসল লক্ষ্য ছিল দুজন। সুভাষ ঘাই এবং রাজীব রাই। সেই সময়ের সবথেকে গ্ল্যামারাস দুই প্রযোজক পরিচালক। দুজনকেই টার্গেট করা হয়েছিল। কিন্তু দুবারই দুষ্কৃতীরা ব্যর্থ হয় এবং ধরা পড়ে যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দুর্ধর্ষ এক ক্রাইম রিপোর্টার এবং খ্যাতনামা থ্রিলার লেখক ওই দুই অ্যাটাকের পরই আবু সালেমকে ফোন কে লন। সালেম তাঁকে ঠান্ডা কণ্ঠে বলে, আমি

ওই দুই অ্যাটাকের পিছনে নেই। আমার টার্গেট অন্য কেউ। নেক্সট উইকে দ্যাখো কী হতে যাচ্ছে! সেই সাংবাদিক ফোন রেখেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটেছিলেন বম্বের ক্র্যাফোর্ড মার্কেটে। সেখানেই বম্বে পুলিশের হেডকোয়ার্টার। ক্রাইম ব্রাঞ্চ চিফ রনজিৎ সিং শর্মাকে গোটা ঘটনাটা বলে সেই সাংবাদিক অ্যালার্ট করে দেন। ওই সাংবাদিকের ক্রাইম নেটওয়ার্ক যে অত্যন্ত অথেনটিক তা নিয়ে পুলিশের কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক, সেই সাংবাদিকের কথা শুনেই বম্বে পুলিশ তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিলেন। বম্বের প্রথম সারির সমস্ত প্রযোজক, পরিচালক আর স্টারকে বিশেষ পুলিশ সিকিউরিটি দেওয়া হল। বাদ গেলেন একমাত্র গুলশন কুমার। কারণ তাঁর কথা কারও মাথাতেই এল না। তিনি এতই নির্বিরোধী আর ধর্মীয় কাজকর্মে নিবেদিত যে তাঁকে হত্যা করার প্ল্যান হতে পারে এরকম ভাবাই যায়নি। আর তিনিই ছিলেন মূল টার্গেট। গুলশন কুমার হত্যার পর আবার আবু সালেমকে ফোন করলেন সেই সাংবাদিক। এবার সালেম অনেক নার্ভাস। আগের মতো আগ্রাসী মনোভাব নেই। কোনোমতে আমতা আমতা করে সে যা বলল তা শুনে চমকে গেলেন সেই সাংবাদিক। কে সুপারি দিয়েছিল গুলশন কুমারের খুনে? আবু সালেম বলল, লালকৃষ্ণ আদবানি। তৎক্ষণাৎ বোঝা গেল সালেম মিথ্যা বলছে। আসলে সালেম টেনশনে পড়ে গিয়েছে এত হইচই শুরু হওয়ায়। তাই এভাবে অবিশ্বাস্য কথা বলে দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছে। কারণ ততদিনে ব্যাপক ধরপাকড় চলছে বম্বে জুড়ে। রাজ্য সরকার তো বটেই, কেন্দ্রীয় সরকারও প্রবল চাপ দিচ্ছে এই কেসের ব্রেক-থ্রু করতেই হবে এই দাবিতে। ঠিক তখন ক্রাইম ব্রাঞ্চ চিফ রণজিৎ সিং শর্মার কাছে একটি ফোন এল দুবাই থেকে। একটি রহস্যময় কণ্ঠ তাঁকে বলে আবু সালেম দুবাইতে কিছুদিন আগে একটি ফাংশনের আয়োজন করেছিল। তারপর ছিল একটা পার্টি। সেখানে বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তাবড় তাবড় স্টার হাজির হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি ছিল নাদিম শ্রাবণ নাইট! পার্টিও তাঁদেরই। কাদের হাজির থাকার কথা ছিল? শাহরুখ খান, সলমন খান, আদিত্য পাঞ্চোলি আর জ্যাকি শ্রফ। এবং তারপর জানা গেল ভয়ংকর তথ্যটি। ওই ফাংশনেই প্ল্যান করা হয়েছিল গুলশন কুমার হত্যার।

তার মানে তো এই প্রত্যেক স্টারকে জেরা করা ছাড়া উপায় নেই? কিন্তু তারপর? যদি কেউ জড়িত না থাকে? তাহলে বম্বে পুলিশের উপর প্রবল চাপ আসবে। উপায় নেই। সেই ঝুঁকি নিতেই হবে। শাহরুখ খানকে প্রথম ডেকে পাঠানো হল বম্বে পুলিশের হেডকোয়ার্টারে।

"আমি জানতাম দুবাইয়ের কিছু ব্যবসায়ী একটা ফাংশন করছেন। আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না আনিস ইব্রাহিম আর আবু সালেম এসবের পিছনে। কিন্তু যখনই আমি জানতে পেরেছি তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি হোটেলে পা স্লিপ করে পড়ে গিয়েছি। তাই নাদিম শ্রাবণের পার্টিতে যেতে পারছি না। একথা জানিয়ে সেদিনই আমি ইভনিং ফ্লাইটে চলে আসি বম্বে।"..এই হল পুলিশের কাছে দেওয়া দু পৃষ্ঠায় শাহরুখ খানের স্টেটমেন্ট। সলমন খান, আদিত্য পাঞ্চোলিরাও জানালেন তাঁরা জানতেনই না ওই ফাংশন আর পার্টির আসল আয়োজক কে? তাঁরা তো ফাংশনে পারফর্ম করার জন্য গিয়েছিলেন। সুতরাং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিছুই টের পাওয়া গেল না প্ল্যানটা কে করেছিল! চক্রান্তটা ঠিক কেন হল? ঠিক দু সপ্তাহ পর বম্বে পুলিশ একটি প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। জয়েন্ট কমিশনার রণজিৎ শর্মা কিছু বলবেন। গোটা বম্বে প্রেস ক্র্যাফোর্ড মার্কেটের পুলিশের সদর দপ্তরে ভিড় জমাল। ছোট ঘর। ঠাসাঠাসি। গমগম করছে। কী ব্যাপার? এত ভিড় কেন? কেন সমস্ত স্তরের রিপোর্টারকেই ডাকা হয়েছে? আর কেনই বা এত বেশি কড়াকড়ি? গোটা ঘরে নীরবতা নেমে এসেছিল যখন জয়েন্ট কমিশনার জানালেন বিখ্যাত সুরকার নাদিম সাইফি এই হত্যাকাণ্ডের সুপারি দিয়েছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে? নাকি হয়েছে? জানা গেল ততদিনে নাদিম লন্ডনে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যে ফিরবেন এবং পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আজও নাদিম সাইফি ফেরেননি। যে গুলশন কুমার তাঁকে ব্রেক দিয়েছিলেন, যাঁর কারণে তিনি এত বিখ্যাত হলেন, সেই গুলশন কুমারকে হত্যা করার সুপারি দিয়েছিলেন নাদিম? কেন? এর পিছনে আরও কোনো বড় চক্র কাজ করছে না তো?

কীভাবে গোটা প্ল্যান প্রয়োগ করা হল? এটা জানতে চান আর এক দুর্ধর্ষ রিপোর্টার। মুম্বই এর। তিনি ক্রাইম কভার করেন। নাম জ্যোতির্ময় দে। তিনি জানেন কোন গ্রুপের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে এবং কোথা থেকে প্ল্যানের খুঁটিনাটি হয়েছে পেতে হলে একটা লোককে ফোন করতে হবে। কে সে? ছোটা রাজন। সুতরাং রাজনকে ফোন করেছিলেন জ্যোতির্ময় দে। রাজন তখন ইন্দোনেশিয়ায়। ফোনে রাজন তাঁকে বললেন, আবু সালেম করেছে গোটা কাজটা। কোথাকার ছেলেদের কাজে লাগানো হয়েছে তাও জানা আছে রাজনের। শুধু সেদিন জানা ছিল না যে ওই কথোপকথনের ঠিক ১৪ বছর পর এই ছোটা রাজনই হত্যা করবে এই ক্রাইম রিপোর্টার জ্যোতির্ময় দে-কে। কীভাবে? কেন?

১৭

নাসিক জেলে ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে। দুই দল ক্রিমিন্যালের মধ্যে। এখন আপাতত দুটি আলাদা টিম খেলছে বটে। কিন্তু আদতে এই সব প্লেয়ারই বাইরে থাকাকালীন একই আন্ডারওয়ার্ল্ড টিমের সদস্য। টিমের মাথা ছোটা রাজন। সুতরাং এই গোটা ম্যাচের সব কুশীলবই আসলে টিম রাজন। অর্থাৎ এটা নিছকই একটি প্রীতিম্যাচ। কারণ কয়েকজন ওয়ার্ডেন, সিকিউরিটি গার্ড আর কারারক্ষীও আছে ম্যাচে। ম্যাচের ১০ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল ক্যাচ ধরা নিয়ে গোলমাল। ও পি সিং ক্যাচ ধরেছে। কিন্তু ডি কে রাও আর তার দলবল বলছে ক্যাচ মাটিতে পড়ে গিয়েছে। চিটিং করছে ও পি সিং। ও পি সিং সেটা মানতে নারাজ। প্রথমে ঝগড়া। তারপর হাতাহাতি। এবং ও পি সিং যখন পিছন ফিরে এক নামজাদা আন্ডারওয়ার্ল্ডের শার্প শুটার সরফিরা নেপালিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, ঠিক তখন ডি কে রাও ব্যাট দিয়ে ও পি সিং এর মাথার পিছনের অংশে মারলো। ছিটকে পড়ে গেল ও পি সিং। তখনও ফাটেনি মাথা। তার দরকার নেই। এবার অন্য ব্যবস্থা। উইকেটের পিছনে রাখা ছিল আগে থেকেই প্লাস্টিকের দড়ি। সেটি নিয়ে এসে হাতে দেওয়া হল রাওয়ের। পিছন থেকে গলায় পেঁচিয়ে ধরা হল। হাত দিয়ে দড়ির ফাঁস ছাড়ানোর নির্জীব চেষ্টা করছে ও পি সিং। দুর্বল সেই প্রয়াস। কারণ মাথায় ওরকম ভারী ব্যাটের আঘাতে এমনিতেই তার আর ওঠার শক্তি ছিল না। তবু গলায় ফাঁস বসছে। ডি কে রাও ছাড়ছে না। কারণ তার একটা নাম আছে অপরাধী ও পুলিশ মহলে। নামটি হল ব্ল্যাক মাম্বা। ব্ল্যাক মাম্বার সিস্টেম হল একবার যখন শিকারকে ধরে, তখন যতক্ষণ না শিকার সম্পূর্ণ নড়াচড়া বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিটি পেশি শিথিল হয়ে পড়ে, ততক্ষণ সে ছাড়বে না। সমস্ত বিষ ঢেলে শিকারকে নির্জীব নিথর করেই সে নিশ্চিত হতে চায়। ছোটা রাজনের ভয়ংকর শার্প শুটার ডি কে রাও এরকমই। অতএব ও পি সিং এর পক্ষে আর মাথা তোলার প্রশ্নই নেই। নাসিক জেলেই তার মৃত্যু হল। নিজের গ্যাংয়ের সবথেকে দামি এক সদস্য এভাবে দলের অন্যদের হাতে খুন হয়ে গেল দেখে রাজনের তো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কথা। কই! তা তো হল না! বরং সেই সময় ব্যাংককে থাকা রাজন খবরটা এক

পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে পেয়ে অট্টহাসি হেসেছিল। কারণ গোটাটাই তার প্ল্যান। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। আর এমনভাবে যাতে কারও সন্দেহই না হয়। কী সেই প্ল্যান?

একই টিমের হওয়া সত্ত্বেও ও পি সিং বাকিদের খুব পাত্তা দিত না। কারণ সে এইসব পেটি ক্রিমিনালদের মতো নয়। মুম্বই ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির পোস্ট গ্রাজুয়েট। মাজেগাঁও ডকের কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার ছিল ও পি সিং। দাদার নাম অরুণ সিং। ঝুনঝুনওয়ালা কলেজের প্রফেসর। দাদাকে প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবেসেছে ও পি সিং। দাদাই ছিল তার কাছে ফ্রেন্ড ফিলজফার গাইড। দাদা একটি কলেজের অধ্যাপক। ভাই সরকারি ডকইয়ার্ডের উচ্চপদস্থ অফিসার। সুখী সংসার। এহেন এক পরিবারের গোটা যাত্রাপথ ঘুরে গেল। কারণ দাদা অরুণ সিংকে একদিন মুম্বইয়ের সবথেকে ভয়ংকর গ্যাংস্টার অশ্বিনী নায়েক এবং অমর নায়েকের হিটম্যানরা গুলি করে খুন করে ফেলল। সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে গেল ও পি সিং। বদলা নিতে হবে। দাদা নেই? আন্ধেরির একটা বারে মাঝেমধ্যেই যেত ও পি সিং। সেখানে তিনটি ছেলের সঙ্গে আলাপ। তাদের সঙ্গে চার পেগ খাওয়ার পর ও পি সিং ঝাঁপি খুলেছিল। কীভাবে দাদাকে খুন করেছে অশ্বিনী নায়েক আর মর নায়েক সেকথা বলেছিল তাদের। আর সে ছিল সেই খুনের মামলারও অন্যতম সাক্ষী। আর এফ আই আরে অমর অশ্বিনীদের নাম বলেছিল সে। ১৯৯৫ সালে তাই তাকেও টার্গেট করা হয়। দুবার গুলি থেকে বেঁচে গেল ও পি সিং। এবং সেই তিনটি ছেলে জানাল এই বদলা নিতে পারবে একজনই। ছোটা রাজন। এই তিন যুবক রাজনেরই লোক। তারা ও পি সিংকে বলেছিল, চলে এসো আমাদের গ্রুপে। সব পাবে। বদলা, পাওয়ার আর টাকা। আসলে মুম্বই আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়া গ্যাংয়ে এরকম একজন করে শিক্ষিত ঠান্ডা মাথার স্ট্র্যাটেজিস্ট খোঁজে সর্বদাই সব মাফিয়া ডন। কারণ শুধু গরম মাথার স্বল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত হিটম্যান, গ্যাংস্টার দিয়ে দল চালানো যায় না। প্ল্যানার চাই। রাজনের দলে এরকম কেউ নেই। তাই ও পি সিংকে দেখেই ওই তিনজন সোজা ব্যাংককে ফোন করেছিল। রাজন তাদের বলেছিল ছেলেটিকে দলে নিতে। ও পি সিং এর নতুন কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ডাকাতি দিয়ে। গোরেগাঁও এলাকায়। কিন্তু তার সবথেকে যে কৌশলটি রাজনকে খুশি করেছে, সেটি হল রাজনৈতিক নেতাদের

সঙ্গে সম্পর্ক রচনার মুনশিয়ানা। কংগ্রেস, বিজেপি, শিবসেনা সকলের সঙ্গে ও পি সিং এর প্যারালাল একটি সম্পর্ক গড়ে উঠলো। ক্রিমিন্যাল আর রাজনীতিবিদদের মধ্যে সংযোগ না থাকলে আন্ডারওয়ার্ল্ডের বিপুল অর্থনীতির সাম্রাজ্যটি চলবে কীভাবে? অতএব ১৯৯৭ সালে সে হয়ে উঠল রাজনের সঙ্গে পলিটিশিয়ানদের একমাত্র যোগসূত্র। কিছুদিন পরই প্রমোশন হল। তাকে ডেকে নেওয়া হল কুয়ালালামপুরে। কারণ ততদিনে মালয়েশিয়ায় একটি ব্যবসা খুলেছে রাজন। ড্রাগস তৈরির ব্যবসা। ম্যানড্রাক্স। যা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মায়ানমারে সাংঘাতিক জনপ্রিয়। অনেক আগেই দুবাই থেকে পালিয়ে এসেছে রাজন। উপায় নেই। দাউদের ডান হাত ছোটা শাকিল উন্মত্তের মতো তাকে খুঁজছে। হত্যার জন্য। তাই পালিয়ে বেড়ায় রাজন। কখনও ব্যাংকক। কখনও মালয়েশিয়া। কখনও ম্যানিলা। মালয়েশিয়ায় এসেই ও পি সিং ধরে ফেলল রাজনের ব্যবসার হাল। ক্রমেই সে হয়ে গেল দু নম্বর। কারণ রাজন বেশিটাই থাকে ব্যাংকক। তাই কুয়ালালামপুর বাণিজ্য সিংয়ের হাতে।

ঠিক পাঁচ বছর পর গোটা সাম্রাজ্যের প্রায় প্রধান ম্যানেজার হয়ে গেল সে। যার প্রধান কারণ হল ব্যাংককে দাউদের হিটম্যানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া রাজন স্মিতভেজ হাসপাতাল থেকে পালাতে পেরেছিল এই ও পি সিংয়ের রিমোট কন্ট্রোলের কারণেই। কারণ থাইল্যান্ডের মিডিয়ার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই টাকা লেনদেনের স্থায়ী ব্যবস্থা করে ফেলেছিল সিং। আর তাদের সাহায্যে থাইল্যান্ডের সামরিক বিভাগের মধ্যে সোর্স ছিল রাজন বাহিনীর। রাজন হাসপাতাল থেকে যখন পালিয়েছিল এবং গোপনে কম্বোডিয়া চলে যায়, সেই সময় তাকে এসকর্ট করে খোদ থাই মিলিটারি সিকিউরিটি। সুতরাং ও পি সিং রাজনের কাছে দেবদূত। সবই ঠিক চলছে। কিন্তু ঠিক কয়েকবছর পর ও পি সিংয়ের আচরণে বদল এল। লক্ষ করল রাজন। তখন সে কখনও পর্তুগাল, কখনও অস্ট্রেলিয়া। এদিকে মালয়েশিয়া থেকে দিল্লি চলে আসতে চায় ও পি সিং। কেন যেন আজকাল ড্রাগ বিজনেসের মুনাফা কমছে। কী হল হঠাৎ? বোঝা যাচ্ছে না। তবে ও পি সিং এতই বিশ্বস্ত যে রাজনের কোনো ক্ষতি হতে সে দেবে না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। হয়তো একান্ত ব্যক্তিগত। তবু সেটা জানতে পারলে সুবিধা হয়। রাজনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ

সে থাকে অনেক দূরে। অস্ট্রেলিয়া। ও পি সিং কখনওই মালয়েশিয়া, ব্যাংকক আর ভারত ছাড়া অন্যত্র কোথাও যায় না। তবে একটা ব্যাপারে খটকা। আজকাল বারংবার ড্রাগ সাপ্লাই ধরা পড়ে যাচ্ছে। একের পর এক কনসাইনমেন্ট আগে থেকে কীভাবে যেন খবর ফাঁস হচ্ছে আজকাল। আগে এরকম ছিল না। তাই ও পি সিংকে রাজন বলেছে সাবধানে এবার থেকে অর্ডার পাঠাতে। আর গ্রুপে কোনো গদ্দার আছে কিনা তাও না কে জানে! ছোটা রাজনের দুঃস্বপ্নেও নেই এসবের পিছনে কে। আসল ঘরশত্রু বিভীষণ ও পি সিং। কারণ সে ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে ডাবল এজেন্ট। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের এনকাউন্টার ইনস্পেক্টর প্রদীপ শর্মার গোপন চরের নাম ও পি সিং! যাকে ছোটা রাজন সবথেকে বিশ্বস্ত সঙ্গী ভেবে এসেছে। একটি অচেনা ফোন রাজনকে গোপনে একদিন জানিয়ে দিল এই চরম সত্যটা! কারণ তার ঠিক দু সপ্তাহ আগে পরপর তিনটি ড্রাগ সাপ্লাই ধরা পড়েছে। ও পি সিং ডাবল এজেন্ট? রাজনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। শিক্ষা দিতে হবে। কীভাবে?

ও পি সিং দল ছাড়তে চায়। মুম্বই থেকে ফোনে জানাচ্ছে বালু ডিকরে। রাজনের এক বিশ্বস্ত হিটম্যান। কেন? বালু জানাচ্ছে তার কোনো ক্লিয়ার আইডিয়া নেই। তবে হয়তো নতুন করে নিজের কোনো গ্যাং বানাবে সিং। অথবা অন্য কোনো ধান্দা আছে। তার মানে এত বছর ধরে সিং আসলে রাজনের নেটওয়ার্ক নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে আসার কাজটাই করছিল। এবার আর সহ্য করা নয়। সরাতে হবে সিংকে। মুম্বই পুলিশ এবং দিল্লি পুলিশের মধ্যে একটা ফারাক আছে। যেহেতু ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণের পিছনে দাউদ রয়েছে এবং ছোটা রাজনকে ওই অপারেশনে একেবারেই সরিয়ে রাখা হয়েছিল, আর রাজন ওই ঘটনার পরই দাউদের গ্যাং ছেড়ে দেয়, তাই দিল্লি পুলিশ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কিংবা দিল্লির পাওয়ার করিডরে রাজন সম্পর্কে একটি নরমপন্থা কাজ করে এসেছে। রাজন নিজেকে দেশপ্রেমী দেশপ্রেমী একটা মোড়ক দেওয়ার চেষ্টা করেছে ওই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে। তার বার্তা হল আমি যাই করি না কেন, পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের দেশের মানুষের তো আর গণহত্যা করি না। অতএব আমি দেশভক্ত। এর পাশাপাশি সে যেহেতু এত বছর ধরে দাউদের সঙ্গে ঘর করেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই দাউদের যাবতীয় নেটওয়ার্ক, বাণিজ্য

সংক্রান্ত ঠিকুজি কোষ্ঠী, তাবত কন্টাক্ট এবং দাউদের দলের সদস্যদের সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান আছে। সেই তথ্য দিয়ে সে মাঝেমধ্যেই সাহায্য করে দিল্লির আইবি এবং RAW কে। কিন্তু এসব কথায় মুম্বই পুলিশের কাছে চিঁড়ে ভেজানো যাবে না। তারা মনে করে রাজন একজন মাফিয়া লিডার। মুম্বইয়ে তার রমরমা দাদাগিরি আর খুনের ব্যবসা। সুতরাং কোনোভাবেই তাকে রেয়াৎ করা হবে না। দাউদ যেমন দোষী, সেও তেমন। তাই রাজনের গ্রুপে চর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্ল্যান কষতে লাগল রাজন। কীভাবে পথের কাঁটা ও পি সিংকে সরানো হবে। এটা একটা শিক্ষাও হবে অন্যদের কাছে। সামান্য বেচাল দেখলেই হত্যা। এই ফিয়ার সাইকোসিস না থাকলে গ্যাং চালানো যায় না। অতএব প্ল্যান করে রাজন ও পি সিংকে বলল তুমি যখন আর মালয়েশিয়ায় থাকতে চাইছ না তাহলে ফিরে যাও ভারত। আর কাউকে মালয়েশিয়ার ব্যবসা বুঝিয়ে তুমি তাহলে ইন্ডিয়া নেটওয়ার্ক সামলাও। তোমাকে ছাড়া আমার তো চলবে না জানোই। ও পি সিং রাজি। সে তৎক্ষণ রাজনের গ্রুপে যে কয়েকজন তার অনুগামী তাদের কয়েকজনের মধ্যে দুজনকে বাছাই করল মালয়েশিয়ার ব্যবসা দেখভালের জন্য। এতে ডাবল সুবিধা। রাজন ভাববে ও পি সিংয়ের দায়িত্ব আছে। ভালো দুজনকে দিয়েছে কাজ সামলাতে। আবার নিজের লোক থাকায় রাজনের প্রতিটি মুভমেন্ট সে জানতে পারবে। ও পি সিং ভারতে ফিরে এসে মুম্বই নয়, থাকতে শুরু করল দিল্লি। কারণ আগেই বলা হয়েছিল যে দিল্লির রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে অবাধে সে ঘোরাফেরা করে। তাই সেই কাজটি করার জন্য দিল্লিই বেস্ট জায়গা। ঠিক এই অপেক্ষাতেই ছিল রাজন। তার চেনা আর বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার আছে দিল্লিতে। তাঁদের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে রাজন দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের দুই দুর্ধর্ষ অফিসার এ সি পি রাজবীর সিং এবং ইনস্পেক্টর মোহনচাঁদ শর্মাকে ফোন করল। তাদের জানিয়ে দিল আপনাদের জন্য একটি দারুণ খবর আছে। একটা মাফিয়া লিডার লুকিয়ে আছে দিল্লির গ্রেটার কৈলাশ টু এলাকার গেস্ট হাউসে। তাকে ধরতে পারলে দুবাই আর করাচি নেটওয়ার্কের অনেক গোপন তথ্য জানা যাবে। এই হল ঠিকানা...। দিল্লি পুলিশ কুইক কাজ করতে ভালোবাসে। তৎক্ষণাৎ হানা এবং সেদিন রাতেই গ্রেপ্তার। কিন্তু দিল্লি পুলিশের কাছে কোনো কেস নেই ও পি সিং-এর নামে। তাকে পাঠানো হবে মুম্বই। দুদিনের

জেরার পর। তার বিরুদ্ধে যত কেস সবই মুম্বইতে। সবই প্ল্যানমাফিক এগোল। ও পি সিংকে গ্রেপ্তার করে মুম্বই পাঠানো হল। এবং জানা কথা তাকে নাসিক জেলেই রাখা হবে। সেইমতো আগে থেকেই ছোটা রাজনের টিমমেম্বাররা তৈরি। যেই ও পি সিং নাসিক জেলে এল প্রত্যেকেই তাকে স্বাগত জানাল। সিং আশ্বস্ত। কারণ এটা বেশ ভালো হয়েছে। নিজেদের সঙ্গে থাকা। এভাবে কয়েকমাস। তারপরই ক্রিকেট ম্যাচ। ও পি সিং এর শেষ ক্রিকেট ম্যাচ। ম্যাচের মধ্যেই ও পি সিং মার্ডার হয়ে গেল। সে তো আগেই বললাম। রাজনের প্ল্যান সাকসেসেফুল। নিশ্চিন্ত সে।

ততদিনে ছোটা রাজনের জানা হয়ে গিয়েছে ও পি সিং এর সঙ্গে কার যোগাযোগ। কোন সোর্সে ও পি সিং সমস্ত তথ্য পাচার করেছে মুম্বই পুলিশের কাছে। লোকটির নাম আমজাদ খান। আমজাদ খান অবিকল আর এক আমজাদ খানের মতোই কথা বলে। যাকে লোকে চেনে গব্বর সিং নামে। মধ্য মুম্বইয়ের এই আমজাদ খান আগাপাশতলা নকল করে ওই আমজাদ খানকে। সে এক সাংঘাতিক ফ্যান। নব্বইয়ের দশকে মুম্বইয়ের সবথেকে নটোরিয়াস ড্রাগ মাফিয়া ছিল ইকবাল মিরচি। আমজাদ খান সেই গ্রুপে কাজ করত সাধারণ পেডলার হিসাবে। একদিন আমজাদ খান ধরা পড়ে গেল ভাহিন্দারের কাছে সমুদ্রের খাঁড়ি থেকে। সঙ্গে হেরোইন। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর অফিসাররা একটা ভালো বিকল্প দিয়েছিলেন আমজাদকে। হয় বছরের পর বছর জেলে থাকো অথবা বাইরে বেরিয়ে আমাদের ইনফরমার হয়ে যাও। তাহলে আর ভয় নেই। আমজাদ দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়েছিল। সে ড্রাগের সামান্য পেডলার ছিল এমন নয়। সে ছিল মারাত্মক এক রিসার্চার। কোন ড্রাগ কোন দেশ থেকে আসে। কোন ড্রাগ আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে বেশি প্রিয় এসব নিয়েই তার বলা যেতে পারে নিজস্ব গবেষণা। কারণ সে এইসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ড্রাগ পার্টিতে যেত। আর জেনে নিত এদের মনস্তত্ত্ব। সুতরাং এরকম এক ইনফরমার নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর কাছে প্রাইজ ক্যাচ। আমজাদ খান ময়দানে নামার পর আচমকা দেখা গেল ড্রাগ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব। একের পর এক কনসাইনমেন্ট ধরা পড়ছে। একের পর এক সাপ্লাই চেইন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমজাদ খানের প্রতিটি ইনপুট ছিল মোক্ষম। মুম্বই পুলিশের নারকোটিক্স কন্ট্রোল টিম তখন হিরো। রোজ শহরের যেখানে

হানা দিচ্ছে সেখানেই সাফল্য। তাই সমস্ত ড্রাগ মাফিয়ারা একদিন বিকেলে কল্যাণ এলাকার একটি গেস্ট হাউসে একজোট হয়ে মিটিংয়ে বসল। সেই মিটিং-এ ফোন গেল আসল পাণ্ডা মিরচির কাছে। ইকবাল মিরচি। আফগানিস্তানে তখন সাংঘাতিক ড্রাগের সাপ্লাই বাড়ছে। আসছে পাকিস্তান থেকেও। এমনকী কানাডা আর মেক্সিকোর অর্ডারও আসছে। সুতরাং এরকম সময়ে সামান্য লোকসান কিংবা একের পর এক কনসাইনমেন্ট ধরা পড়লে বিরাট ক্ষতি। অতএব একটাই পথ। আমজাদকে খুন। ও একাই শেষ করে দিচ্ছে বিজনেস। কিন্তু কে করবে? মাত্র ৫ হাজার টাকায় মুম্বইয়ে পাওয়া যায় শার্প শুটার। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পেয়েই যাকে তাকে খুন করবে বহু পেটি ক্রিমিনাল। কিন্তু তাও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেন? কারণ একটাই। আমজাদ খানের পিছনে কার বরাভয় আছে সেটা সকলেই জানে। এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট মুম্বই পুলিশের অফিসার প্রদীপ শর্মা। প্রদীপ শর্মার মেইন সোর্স আমজাদ। কোন অপরাধী চাইবে প্রদীপ শর্মার লোককে খুন করতে? কেউ না। শর্মা ধরে না, মারে। যে কোনো ক্রিমিন্যালকে পাকড়াও করে আর শহর থেকে দূরের নিরালায় নিয়ে গিয়ে এনকাউন্টার করতে সিদ্ধহস্ত প্রদীপ শৰ্মা। তাই তাকে যমের মতো ভয় করে সাধারণ ক্রিমিন্যালরা। অতএব কেউ রাজি নয়। ৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু হয়েছিল সুপারি দেওয়া। সেটি বাড়তে বাড়তে যখন ৫ কোটিতে পৌঁছল, তখনই কাজটা করতে রাজি হল একজন। তার নাম ছোটা রাজন।

২০০৬ সালের ১৬ অক্টোবর। প্রায় ৬ বছরের পুরোনো একটি ড্রাগ কেসের মামলায় শুনানিতে যাচ্ছিল আমজাদ খান আর দুই সঙ্গী। মুম্বই শহর। ঠিক সেশন কোর্টের উলটোদিকে আর পুলিশ সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে আমজাদ খান আর তার সঙ্গী দুজনকেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়ে পালাল দুই মোটরসাইকেল আরোহী। প্রকাশ্য দিনের বেলায়। যা গোটা মুম্বই পুলিশের কাছে চরম লজ্জা আর বেইজ্জতি। নিজেদের ইনফরমারকে যারা রক্ষা করতে পারে না তাদের হয়ে আগামীদিনে কেউ সোর্স হবে কেন? এই বার্তা পেল অপরাধী সমাজ। সবথেকে ক্রুদ্ধ হলেন একজন। প্রদীপ শর্মা। প্রথমে ও পি সিং এবং তারপর আবার এই আমজাদ খান। পরপর তাঁর সোর্সকে রাজন খুন করছে এভাবে! এর অর্থ হল রাজন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছে। এত সাহস! প্রদীপ শর্মা ময়দানে

নামলেন। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু হল মুম্বইয়ে ক্রিমিন্যালদের এক অন্ধকার সময়। প্রদীপ শর্মার নেতৃত্বে অন্তহীন এনকাউন্টার। রোজ...সকালে...বিকেলে...রাতে...। একটা সময় এল যখন দলে দলে ক্রিমিন্যালরা মুম্বই শহর থেকে পালাতে শুরু করল। কিন্তু বাঁচবে কীভাবে? ঠিক খবর পেয়ে যায় প্রদীপ শর্মার দুরন্ত সোর্স। আর ফলো করে তাদেরও কখনও ধানখেতে, কখনও সরকারি ডকের নির্জনে, কখনও সমুদ্রের খাঁড়িতে এনকাউন্টার। ত্রাহি ত্রাহি রবের মধ্যে সবথেকে ক্ষতি হল ছোটা রাজনের। তার গোটা মুম্বই নেটওয়ার্ক তছনছ করে দিলেন একা প্রদীপ শর্মা আর মুম্বই পুলিশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট স্পেশাল টিম।

এই গোটা ঘটনাপরম্পরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ করছিলেন একজন ক্রাইম রিপোর্টার। আমজাদ খানের হত্যার পর থেকেই তিনি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ ছোটা রাজনের প্রতি। কারণ আমজাদ খান পুলিশ আর ক্রাইম রিপোর্টারদের কাছে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান সোর্স। সে মহারাষ্ট্রকে ড্রাগ মুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করছিল। তাকে যখন রাজন সরিয়ে দিল পাঁচ কোটির বিনিময়ে তখন বোঝাই গেল রাজন আজও মনেপ্রাণে বাইকুল্লার এক সাধারণ পাতি ক্রিমিন্যাল হয়ে রয়েছে। রাজনের গায়ে যে দেশপ্রেমের মেকি পোশাকটা পরা আছে এবার সময় এসেছে সেটিকে একটানে খুলে ফেলার। ঠিক সেই কাজটি করার দিকেই এগোলেন সেই ক্রাইম রিপোর্টার। মুম্বইয়ের সংবাদমাধ্যমে যে মানুষটিকে সকলে সমীহ আর শ্রদ্ধা করে। তার অসাধারণ ক্রাইম স্টোরি আর নেটওয়ার্কের জন্য। লোকটির নাম জ্যোতির্ময় দে। মিড ডে পত্রিকার ক্রাইম ব্যুরোর চিফ। তিনি বই লিখবেন একটি। তার নাম 'চিন্ডিস-র‍্যাগস টু রিচেস'। সেই বই লেখার ভাবনাই তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ের জন্য দায়ী হয়ে রইল। কী ছিল সেই বইতে? যে কারণে খুন হতে হল দুর্ধর্ষ সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দে-কে?

মুম্বইয়ের পুলিশ, সাংবাদমাধ্যম আর অপরাধজগতের কোডনেমে চিন্ডি কথাটা বলা হয় সেই সব অপরাধীদের, যাদের সেরকম ব্যক্তিত্বের ওজন নেই। পেটি ক্রাইম করে যারা উপরে উঠেছে। হয়তো মাফিয়া ডন হয়েছে। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, ক্রিমিন্যাল

হিসাবে জীবনযাপন আর অ্যাটিটিউড সবই রয়ে গিয়েছে সেই সাধারণ ছোট ক্রিমিন্যালদের মতোই। যাদের কোনো প্রফেশনাল এথিক্সও নেই। এদের মধ্যে থেকে ২০ জন ক্রিমিন্যালকে বাছাই করে তাদের নিয়ে বই লিখছেন জ্যোতির্ময় দে। এদের মুখোশ খুলে দিতে চান তিনি। এই বইয়ের ক্রিমিন্যাল তালিকায় স্থান পেয়েছে ছোটা রাজন। অর্থাৎ এর থেকেই প্রমাণিত জে দে (এটাই তাঁর পরিচিত নাম ছিল) ছোটা রাজনকেও চিন্ডি মনে করেন। দাউদের থেকে অনেক অনেক নিম্নমানের মাফিয়া। এই বইয়ের পাশাপাশি আর একটি বইয়ের ভাবনা আছে। সেটির প্ল্যানও চলছে। সেই বইয়ের উপজীব্য হল আদি অকৃত্রিম একটি চরিত্র। দাউদ ইব্রাহিম। আর সেখানে দেখানো হবে কীভাবে একজন ছোটখাটো স্মাগলার থেকে দেশের তথা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ডনে পরিণত হয়েছে দাউদ। সবটাই সে প্ল্যান করেছে। এক্সিকিউট করেছে অন্যকে দিয়ে। নিজে অপারেশন করেছে হাতে গোনা। ভারতে থাকাকালীন। দাদার হত্যার বদলা নিতে। কিন্তু ভাবনা, প্ল্যান, প্রয়োগ আর কোম্পানিকে ছড়িয়ে দিতে দাউদের মাথার ধারেকাছে ছোটা রাজন আসে না। জে দে এর আগে দুটি বই লিখেছেন। 'খাল্লাস' আর 'ডায়াল ১০০'। তিনি ঠিক করেছিলেন চাকরি ছেড়ে দেবেন। তার আগে এই ক্রাইম সিরিজের শেষ বই দুটো সমাপ্ত করা দরকার। রাজনের সঙ্গে বহুদিনের আলাপ। তাই রাজনের সঙ্গে কথা বলবেন জে দে। সেইমতো ফোনে কথাও হল। প্রথমে ম্যানিলা এবং তারপর লন্ডন। দুবার রাজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন জে দে। ইন্টারভিউ। সেই আলোচনার মধ্যেই রাজন বুঝতে পারল তাকে আর পাঁচটা সাধারণ ক্রিমিন্যালের মতোই ভাবছে জে দে। কিন্তু এভাবে তা আন্দাজের উপর নির্ভর করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। সেই সংশয় দূর হল যখন দেখা গেল জে দে তাঁর পত্রিকায় মাঝেমধ্যেই ছোটা রাজনের সম্পর্কে লিখছেন, রাজনের কেরিয়ার শেষ। রাজনের গ্রুপও ভেঙে গিয়েছে। এবং তার শারীরিক অবস্থা এমন, যে নতুন করে আর ভারতের আন্ডারওয়ার্ল্ড কন্ট্রোল করার মতো ক্ষমতাই নেই। অর্থাৎ ছোটা রাজনের জমানা শেষ। এটাই রাজনের মাথা খারাপ করে দিল। কারণ সে জানে জে দে যেটা লিখছেন সেটা ১০০ শতাংশ সত্যি। সত্যিই রাজনের টিম ভেঙে যাচ্ছে। তার টিমের বহু মেম্বার এখন ধরা পড়েছে। মারা গিয়েছে এনকাউন্টারে। পাশাপাশি

দাউদ এবং ছোটা শাকিলের থেকে বাঁচার জন্য রাজন রীতিমতো চোরপুলিশের মতো লুকোচুরি খেলতে খেলতে ক্লান্ত।। দাউদের যেমন বাইপাস সার্জারি হয়েছে, দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ঠিক তেমনই রাজনের চূড়ান্ত ডায়াবেটিস। শুধুমাত্র ডায়াবেটিসের জন্যই তাকে দুবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। একদা মিঠুন চক্রবর্তীর ভক্ত ঝাঁকড়া চুলের রাজনের এখন চুল পাতলা। মুখের চামড়া শ্লথ। একটি হেরে যাওয়া সিংহ। রাজন এই সত্যটা মেনে নিতে পারছে না। তার উপর সেটাই আরও বেশি করে গায়ে লাগছে যখন প্রতিটি সত্য কথা জ্যোতির্ময় দে লিখছেন। জে দে বইয়ের জন্য আর কাদের সঙ্গে কথা বলছেন? অবশেষে চেম্বুরের এক প্রপার্টি ডিলার রাজনকে জানিয়ে দিল জে দে একটি বই লিখছেন। যার মধ্যে রাজনও আছে। কিন্তু সেই তালিকায় সবই মুম্বইয়ের চিন্ডিরা আছে। বড় কেউ নেই। কীভাবে জানতে পারল সেই প্রপার্টি ডিলার? জে দের নিজস্ব ক্যাবিনেটের চাবি খোওয়া গিয়েছিল। চুরি গিয়েছে তার কয়েকটি ডায়েরি আর নোট। সেটি কে করল? রাজন আর ঝুঁকি লেবে না। একবার ওই বই বেরোলে তার প্রেস্টিজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। আর তখন থেকে সে যে টার্গেট নিয়েছে সেটি পূরণ হবে না। কী সেই টার্গেট? সেটি হল ভারত সরকারকে রাজি করানো আত্মসমর্পণের শর্তাবলি রাজন আর পালিয়ে বেড়াতে পারছে না। সে আত্মসমর্পণ করতে চায়। কিন্তু একটা মিনিমাম শর্ত আছে। তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো চলবে না। আর মুম্বইয়ের কোনো জেলে রাখা যাবে না। পাশাপাশি বেশ কিছু অপারেশন আছে যেগুলি থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। এসব শর্তের বিনিময়ে সে দাউদ আর লস্কর নেটওয়ার্কের গোপন তথ্য দেবে ভারত সরকারকে। এই ডিলের খুব কাছে রাজন। এরকম সময়ে জে দের ওই বই প্রকাশিত হলে রাজনের গুরুত্ব কমে যাবে। অতএব শেষবারের মতো রাজন চেষ্টা করল। জে দে-কে ফোন।

রাজন : দে! তুমি বেইমানি করছ।

জে দে : বেইমানি কীসের?

রাজন : তুমি এই বইটা লিখো না

জে দে : মানে ? কেন?

রাজন : আমি জানি ওখানে কী থাকবে। আমি চাই না।

জে দে : তুমি কীভাবে জানলে? আর আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যা যা বলেছ সবই আমি রাখছি বইতে।

রাজন : তাহলে তুমি শুনবে না?

জে দে : প্রশ্নই নেই! আমার বই লেখা নিয়ে তুমি হুমকি দিচ্ছ কেন? কে তুমি বাধা দেওয়ার?

রাজন : তুম বেইমান হো...

ফোন কেটে গেল।

২৩ মে রাজন ফোন করল রোহিত যোসেফকে। যার ডাক নাম সতীশ কালিয়া।

রাজন : একজনকে সরাতে হবে কালিয়া!

কালিয়া : কাকে ভাই?

রাজন : আছে একজন। ছবি পাঠাচ্ছি। মোটরবাইক নম্বর পাঠাবো। ঠিক দেড়টায় রোজ একটা জায়গায় ওই বাইক পার্ক করে ঢোকে।

কালিয়া : ভাই লোকটা কে?

রাজন : আরে সেরকম কেউ না। প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করে।

কালিয়া : বড় ঝঞ্ঝাট হবে না তো!

রাজন : কোনো চিন্তা নেই। কেউ চেনে না ওকে। কাজটা করে দাও। টাকা নিতে নৈনিতাল চলে যাও।

কালিয়া : নৈনিতাল? কেন? এখানেই একটা ডিল করে দাও ভাই।

রাজন : না তা হবে না। প্রথমে চেম্বুর যাও। বলে, দিচ্ছি কোথায়! তারপর নৈনিতাল। মালও ওখান থেকে নিতে হবে।

কালিয়া : ও কে ভাই।

সতীশ কালিয়া চেম্বুর থেকে ২ লক্ষ টাকা প্রথমে পেল। এরপর নৈনিতাল। কাঠগোদাম স্টেশন। একটি গাড়ি আগে থেকে রাখা ছিল। লাল মারুতি ভ্যান। নৈনিতাল লেকের পাশে জু রোডে একটি হোটেলের লবিতে দেখা। ব্লু শার্ট পরা এক যুবক। হাতে ছোট ব্যাগ। আরও ২ লক্ষ টাকা। আর পয়েন্ট থার্টি টু বোরের রিভলভার এবং ২৫টি চেকোস্লোভাকিয়ান বুলেট। মুম্বই ফিরে এল সতীশ কালিয়া। এসেই ফোন করল বন্ধু অনিলকে। অনিল ওয়াগমোড়ে। অনেকদিনের পুরোনো সাথী। একসঙ্গে এর আগে তারা অপারেশন করেছে একাধিক অনিলের কাজ হল টিম মেম্বার বাছাই করা। কাদের নেওয়া হল এই অপারেশনে? ৩৪ বছরের নীলেশ সেংজে ওরফে বাবলু। মঙ্গেশ আগভানে। এরপর দলে এল অরুণ ডাকে, অভিজিৎ শিন্ডে। এখনও সবথেকে ভালো শার্প শুটারকে পাওয়া যায়নি। সবশেষে সে যোগ দিল টিমে। তার নাম শচীন গাওকোয়া।

৬ জুন। প্ল্যান রেডি। ঠিক দুপুর একটায় ফোন এল ছোটা রাজনের। ফাইনাল কল। এবার দেওয়া হল মোটরবাইক নম্বর। বলে দেওয়া হল দুটি জায়গায় পাওয়া যাবে টার্গেটকে। হয় মিড ডে অফিস প্যারেলের পেনিনসুলা সেন্টারে। অথবা জে দের বাড়ি পওয়াইয়ে হীরানন্দানি এস্টেট। অনিলকে সতীশ কালিয়া বলে দিল পরদিন একটা রেকি করতে। অর্থাৎ অপারেশনের আগে জায়গাটা ঘুরে টার্গেটকে দেখে ফাইনাল প্ল্যান করে নিতে। সেইমতো অনিল পরদিন ৭ জুন দুপুরে চলে গেল পেনিনসুলা সেন্টারের সামনে। অপেক্ষা করছে সে। হাতে ছবি। আর মোটরবাইকের ডিটেলস তথা রেজিস্ট্রেশন নম্বর। ঠিক দুটোর সময় সত্যিই জে দে বাইক পার্ক করছিলেন অফিসের সামনে। একদিনে তো হবে না। আবার আসতে হবে। পরপর দুদিন। তাই ৮ জুন আবার। একইভাবে দুটো নাগাদ এলেন জে দে। এবার কনফার্মড হল। তাহলে এই সময়ই আসে লোকটা। কোথায় যায়? সেটা রাজন বলেনি।

কিন্তু সতীশ কালিয়া আশপাশে দেখে নিয়ে বুঝল মুম্বইয়ের কেন্দ্রস্থল এরকম একটি লোকেশনে ব্রড ডে লাইটে কাউকে মারা সম্ভব নয়। তার থেকে পওয়াইতে টার্গেটের

বাড়ির কাছে ট্রাই করা ভালো। ওই জায়গাটা একটু কম ভিড়। আর পালানো সহজ। কিন্তু সমস্যা হল পওয়াইতে নিজের বাড়ি আসার আর যাওয়ার কোনো টাইমই নেই জে দের। পরপর দুদিন হীরানন্দানি এস্টেটের সামনে থেকে ঘুরে এসেও সতীশ আর অনিল জে দে-কে দেখতে পেল না। তাহলে? ঠিক সেরকম সময় একটি ফোন এল। রাজনের। বলা হল ১১ জুন টার্গেট ঘাটকোপার থেকে ফিরবে।

১১ জুন। পরদিন। ঘাটকোপারে মা বীণা দে-র সঙ্গে দেখা করে ফিরছেন জ্যোতির্ময় দে। আরসিটি মলের পাশে দেড়টা নাগাদ দেখা গেল মোটরবাইকে চলেছেন তিনি। এটাই সুযোগ। তাঁকে ফলো করা শুরু হল। অন্য দুটো বাইকে। পিছনে। জে দে প্রথমে হীরানন্দানি হাসপাতালের কাছে একটি বেসমেন্টে গেলেন। একটি ফোটোকপি সেন্টারে। হাতে থাকা কিছু কাগজ। ফোটোকপি করলেন। বেরোচ্ছেন। মোটরবাইকে হেলমেট ঝোলানো। কিন্তু সামনে অসংখ্য মানুষ। সকলেই বাইক পার্ক করছে। ঘুরছে। বেরোচ্ছে। সতীশ কালিয়া ঠিক করল এখানে নয়। দাঁতে দাঁত চেপে তারা আবার ফলো করতে শুরু করল। আবার থামলেন তিনি। এবার পওয়াইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। একটি ক্যারিয়ার কোম্পানি। এবারই? আর তো সুযোগ নাও মিলতে পারে! অনিল রিভলভার বের করতে গেল। কিন্তু সেই সময়ই একটি পুলিশ ভ্যান। আর পেট্রলিং কার এসে দাঁড়াল। দ্রুত মুখ আড়াল করে সরে এল হত্যাকারীদের বাইক। প্রায় ১৫ মিনিট। তারপর বেরোলেন জ্যোতির্ময়। বাইক স্টার্ট করেই তিনি একটু এগিয়ে আচমকা বাঁদিকে টার্ন করলেন। সেই রাস্তা ফাঁকা। জায়গাটা ক্রিসিল হাউসের পাশে। হীরানন্দানির স্পেকট্রা বিল্ডিং এর সামনে। আর দেরি হলে জে দে হারিয়ে যাবেন। সতীশ কালিয়া অনিলকে বলল, স্পিড!! স্পিড বাড়িয়ে দিল অনিল! একদম জে দের পিছনে চলে এল। সামনে পিছনে দুটি বাইক। একবার মুখ ঘোরালেন জ্যোতির্ময় দে। এত কাছে পিছনে কেন বাইকটা এসেছে? তিনি সাইড দিতে চাইলেন। কিন্তু পিছন থেকে সতীশ কালিয়ার হাতে ততক্ষণে উঠে এসেছে রিভলভার। পাঁচটা বুলেট বিদ্ধ হল জে দের শরীরে। চতুর্থ বুলেট সোজা হার্ট ফুটো করে দিল। বাইক স্কিড করে আকাশের দিকে হাতটা বাড়িয়ে পড়ে গেলেন জে দে। চতুর্দিকে চলা গাড়ি থেমে গেল। ছুটে এলেন পথচারীরা। সেই ভিড়কে নস্যাৎ করে আরও

স্পিড তুলে পালাল হত্যাকারীরা। আর জে দেকে দেখেই হীরানন্দানি হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, হি ইজ ডেড!!

অনিল আর সতীশ বাইক নিয়ে সোজা ততক্ষণে যোগীশ্বরীতে মঙ্গেশের বাড়িতে। মঙ্গেশরা পিছনেই ছিল। ব্যাকআপ হিসাবে। সতীশ ঘরে ঢুকেই বলল টিভি চালা! নিউজ চ্যানেল। এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সতীশ অনিল মঙ্গেশরা স্তব্ধ। তাদের মুখে নেমে এল চরম আতঙ্ক। কারণ কাকে খুন করেছে তারা? এই কারণেই রাজন ভাই কিছুতেই টার্গেটের নাম বলেনি? এ তো পত্রকার! মিডিয়ার লোক! যাদের থেকে দূরে থাকতে হয়। তাও আবার মিড ডে পত্রিকার গতিময় দে। যে নাকি বিরাট ফেমাস! কালিয়া তৎক্ষণাৎ ফোন করল রাজনকে। বলল ভাই এটা কী হল! তুমি আমাদের ফাঁসিয়ে দিলে! রাজন বলল, কেন? কালিয়া উত্তরে বলল আমাকে একবারও বললে না লোকটা কে? রাজন আরও ঠান্ডা মাথায়

বলল, বলে দিলে কাজটা করতিস না তুই। চিন্তা নেই। আরও বেশি পেমেন্ট দেব। তোরা মুম্বই ছেড়ে দে। অন্য জায়গায় চলে যা। কোথায়?

পাওয়াগ, শিরডি, আকালকোট, ইয়াদগিরি....পালাচ্ছে সতীশ কালিয়ারা। শোলাপুরে বাবলু রয়ে গেল। আর বাকিরা পালাতে পালাতে গিয়ে হাজির হল রামেশ্বরমে। কিন্তু ততদিনে গোটা ইন্ডিয়া তোলপাড়। মুম্বই পুলিশের উপর প্রবল চাপ। যেভাবেই হোক ধরতেই হবে। গোটা মিডিয়া, পলিটিশিয়ান, মহারাষ্ট্র সরকার, নেতা, মন্ত্রী সকলেই চাপ দিচ্ছে। কারণ এত বড় ঘটনা ঘটেনি আজ পর্যন্ত মুম্বইতে। পুলিশ কমিশনার অরূপ বললেন, আমাদের এক মাস সময় দিন। কেস ক্র্যাক করা হবেই। প্রাথমিক লিড এসে গিয়েছে।

ঠিক ১৬ দিনের মাথায় রামেশ্বরমে হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হল। সোর্স মারফত খবর পেয়ে গিয়েছিল মুম্বই পুলিশ। জেরা শুরু হল। ধীরে ধীরে জেরায় একের পর এক তথ্য সামনে এল। বিশেষ করে ছোটা রাজনের ভূমিকা। কিন্তু সবথেকে বড় বিস্ফোরণ হল কিছুদিন পর। যখন জানা গেল, ছোটা রাজনকে কে দিয়েছিল জ্যোতির্ময় দের

মোটরবাইকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর আর আরও বেশ কিছু তথ্য। বিশেষ করে বলা হয়েছিল কীভাবে রাজনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য জে দে সাহায্য নিয়েছিল রাজনের চিরশত্রু ছোটা শাকিলের। সেসব বলে বলেজে দে সম্পর্কে রাজনের মন বিষিয়ে দিয়েছিল একজন। কে সে? ওই রোমহর্ষক হত্যা মামলায় একাদশতম অভিযুক্ত হিসাবে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনিই ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডে অন্যতম প্ররোচকের ভূমিকায়। তাঁর নাম জিগনা ভোরা! এশিয়ান এজ সংবাদপত্রের ক্রাইম রিপোর্টার! সিঙ্গল পেরেন্ট ৩৭ বছরের এক মহিলা সাংবাদিক।

সত্যিই কি তাই? জিগনা ভোরার সঙ্গে প্রফেশনালি শত্রুতা ছিল জ্যোতির্ময় দের? নাকি অন্য কোনো গোপন প্রতিযোগিতা? আসল কারণ কী? কিন্তু মামলার রায় বেরনোর পর দেখা গেল প্রমাণ নেই কোনো। জিগনা ভোরা যে এই হত্যাকাণ্ডে যুক্ত তা পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি নথিপত্র তথ্য দিয়ে। তাই জিগনা ভোরা বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছেন। প্রধান অভিযুক্ত ছোটা রাজন এবং তার সুপারি পাওয়া সাতজনকে সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজন আগে থেকেই তিহার জেলে বন্দি। সেখান থেকেই ভিডিও কনফারেন্সে তাকে হাজির করানো হয়েছিল আদালতে। কেন? কারণ দাউদের গ্যাং তাকে এখনও যে কোনো সময় পেলেই হত্যা করবে! তাই তাকে বাইরে আনা যাবে না। কিন্তু জ্যোতির্ময় দেকে হত্যা করার পিছনে আর কে কে আছে? জানা যাবে কি কখনও?

১৮

মেইয়াপ্পন : কারেন্ট রেট কী চলছে?

বিন্দু দারা সিং : রাজস্থান রয়্যাল ৭৯ পয়সা। চেন্নাই ৮১ পয়সা। চেন্নাই আজ ফেভারিট না। কিন্তু ওরাই জিতবে।

মেইয়াপ্পন : রাজস্থান রয়্যালের হয়ে আমার বিশ লাখ লাগাও। আমি বলছি ওরাই জিতবে। ফোন কেটে গেল..।

কিছুক্ষণ পর..

মেইয়াপ্পন : শোনো, সিএসকে (চেন্নাই সুপার কিংস) ১৩০ থেকে ১৪০ রান করবে আজ।

দারা সিং : তা হোক। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি বলছি আজ সিএসকে জিতবে। আরআর (রাজস্থান রয়্যালস) হারছেই।

মেইয়াপ্পান : তাহলে বলো কী করব? বেরিয়ে যাব?

দারা সিং : সিএসকেতে লাগাও।

মেইয়াপ্পন : আর ইউ সিওর!

দারা সিং : ইয়েস..হান্ড্রেড পার্সেন্ট

মেইয়াপ্পন : দেন টেল মি, হোয়াটস দ্য রেট?

দারা সিং : আরআর ৮৩ পয়সা।

মেইয়াপ্পন : ওকে! তাহলে সিএসকেতে ৩০ লাখ লাগাও আমার।

দারা সিং : ওকে বস!

ফোন কেটে গেল। ঠিক ১০ মিনিট পর। বিন্দু দারা সিং পবন জয়পুরকে ফোন করলেন। পবন জয়পুর হল নামকরা বুকি। ভিআইপি বেটিং সে হ্যান্ডেল করে।

দারা সিং : কেয়া রেট হ্যায়।

পবন জয়পুর : ৮০-৮৩

দারা সিং : ঠিক হ্যায়! তিস পেটি উসকে লিয়ে লাগাও।

পবন জয়পুর : (কোড ল্যাংগুয়েজে) ম্যায়নে আসসিপে তিস খা লিয়া।

দারা সিং : ওকে ডান।

১০ মিনিট পর। আবার ফোন।

মেইয়াপ্পন : কী চলছে?

দারা সিং : তুমি এখন ৬৪ লাখ হারছ।

মেইয়াপ্পন : কটু থমকে গিয়ে, চিন্তিত কণ্ঠে) কত যাচ্ছে রেট?

দারা সিং : আরআর ৪৩ পয়সা।

মেইয়াপ্পন : ঠিক আছে তাহলে আরআরে আরও ৩০ লাখ।

ফোন কেটে দারা সিং পবনকে ফোন করলেন।

দারা সিং : ইয়ে আজ মরেগা।

পবন জয়পুর : কেন কী হয়েছে?

দারা সিং : আগেই এত লস। তার উপর বলছে আরও ৩০ লাখ। ৪৪ এর উপর। পবন জয়পুর হাসল শুধু। এবং বেট লাগাল।

খেলা শেষ হওয়ার সামান্য আগে। ফোন বাজছে। মেইয়াপ্পন : কী ব্যাপার?

দারা সিং : খুব খারাপ। আমার তো কাঁপুনি আসছে। জেতা ফেতা ভুলে যাও। আপাতত ব্যালান্স করো যেভাবে হোক। নয়তো ডুববে।

মেইয়াপ্পন : আরে টোটাল কী যাচ্ছে আমাদের? তাই বলো।

দারা সিং : সিএস-কের উপর ১ কোটি ২৪ লক্ষ আর রাজস্থান রয়্যালস ৫৫ লাখ। ২০১৩ সালের আইপিএলের সেই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত রাজস্থান রয়্যাল জিতে গেল। মেইয়াপ্পন সব মিলিয়ে ৬৮ লক্ষ টাকা লোকসান করল। কিন্তু তার মুনাফার ব্যালান্স অন্য ভাবে হয়ে গিয়েছে। কারণ কী? কারণ হল অন্য বুকিকে তিনি ততক্ষণে পিচ রিপোর্ট, চেন্নাইয়ের রান আগাম বলে দিয়ে অনেক টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। মনে করে দেখুন দারা সিং কে মেইয়াপ্পন কিন্তু আগেই বলেছিলেন চেন্নাই সুপার কিং সেদিন ১৩০ থেকে ১৪০ রান করবে। চেন্নাই সেদিন করেছিল ১৪১ রান। প্রায় হুবহু মিলে গিয়েছে। কে এই গুরুনাথ মেইয়াপ্পন? চেন্নাই সুপার কিংসের অন্যতম কর্তা ছিলেন। তবে তার থেকেও বড় পরিচয় স্বয়ং বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান এন শ্রীনিবাসনের জামাই। এই শ্রীনিবাসন? ইন্ডিয়া সিমেন্টের মালিক। ইন্ডিয়া সিমেন্ট কোম্পানির বৈশিষ্ট্য কী? চেন্নাই সুপার কিংস এর অন্যতম স্পনসর। চেন্নাই সুপার কিংসের অফিসিয়াল কে ছিলেন? মেইয়াপ্পন। শ্রীনিবাসনের জামাই। বিন্দু দারা সিং কে? বিখ্যাত সিনেমা স্টার প্রয়াত দারা সিং এর পুত্র। তাঁর আর একটি পরিচয় কী? তিনি মেইয়াপ্পনের বন্ধু। তাঁর পেশা কী ছিল? ক্রিকেট বেটিং। আয় হত কীভাবে? প্রতিটি বেটে এক পয়সা করে কমিশন। কীভাবে? পার্টি যখন বেট লাগাত তখন সে আসল রেটের থেকে এক পয়সা কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে বলত। যখন আসল রেট চলছে কোনো একটি টিমের হয়ে ৮০ পয়সা, তখন তিনি হয়তো ৮১ কিংবা ৭৯ বলতেন। ওই মাঝখানের এক পয়সা তাঁর পকেটে। আইপিএল সিক্সের মাধ্যমেই আসলে জানাজানি হয়ে গেল গোটা ক্রিকেট সমাজ কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে ম্যাচ ফিক্সিং, স্পট ফিক্সিং আর বেটিং-এ। মুম্বই এবং দিল্লি পুলিশের চার্জশিটে দেখানো হয়েছে কীভাবে একের পর এক ম্যাচে আদতে কী ফলাফল হতে চলেছে তা আগাম বলে দেওয়া হয়েছিল বুকিদের। মেইয়াপ্পন একা চারটি ম্যাচে বেটিং-এ যুক্ত ছিলেন। ১২ মে থেকে ১৫ মে তাঁর ফোনকল ইন্টারসেপশন থেকে জানা গেল সেই যেদিন রাজস্থান রয়্যালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচে তাঁর লোকসান হল ৬৮ লক্ষ টাকা, সেদিনই তিনি বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচের পিচ রিপোর্ট শেয়ার করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে নেন। তিনি বুকিকে

জানিয়ে দিয়েছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ওই ম্যাচ হারছে। তাই হয়েছিল। ঠিক পরদিন মেইয়াপ্পন বুকি সিন্ডিকেটকে আগাম জানিয়ে রেখেছিলেন সানরাইজ হায়দরাবাদ বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ানসের ম্যাচে হায়দরাবাদ জিতবে। সেইমতো নিজেই টাকা লাগান দারা সিং এর মাধ্যমে। আর ১৪ মে এম এ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিল্লি ডেয়ারডেভিল বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ নিয়ে তাঁর গোপন বার্তা ছিল, চেন্নাইয়ের অথরিটির কাছে স্টেবিলিটি সার্টিফিকেট আসেনি। তাই ওই ম্যাচ হচ্ছেই না। এই রিপোর্টও বেটিং সিন্ডিকেট কাজে লাগিয়ে প্রভূত লাভ করে।

কিন্তু পিচের কাছে না গিয়ে, উইকেট না দেখে, কতটা ময়েশ্চার আছে মাঠে তার কোনো প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ না করে কীভাবে সম্ভব সেইসব বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া? তার জন্য দরকার এমন কারও সহায়তা যে প্রথম থেকে একেবারে মাঠের মধ্যেই উপস্থিত। সেক্ষেত্রে তো তার মানে প্লেয়ার? হ্যাঁ। প্লেয়ার তো থাকেই। শ্রীশান্ত থেকে অজিত চান্ডেলার কাণ্ড তো আমরা জানি। কিন্তু তারা কাজটা করবে খেলতে নেমে। অর্থাৎ বুকি ও সিন্ডিকেটের নির্দেশ মেনে পারফরম্যান্স দিয়ে খেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। হয় ভালো খেলবে। অথবা খারাপ। হয় রান করবে। অথবা ইচ্ছে করে আউট হবে। কিন্তু আগাম পিচ রিপোর্ট আর ওয়েদার কন্ডিশনের জন্য কী কী হতে পারে তা জানার জন্য অন্য কোনো সোর্স চাই। তাহলেই বেটিং ও ম্যাচ ফিক্সিং সিন্ডিকেটের কাজটা নিখুঁত হবে। সেই লোকটিকেও পাওয়া গিয়েছিল। ফলে ম্যাচ ফিক্সিং আর বেটিং-এর ষোলোকলা পূর্ণ।

লোকটির নাম আশাদ রউফ। আইপিএল ম্যাচগুলির অন্যতম এক আম্পায়ার! পাকিস্তানের এই আম্পায়ার যাবতীয় পিচ রিপোর্ট দিতেন। আর ম্যাচের আগে পরের হাল হকিকত। প্লটটা ভাবুন। একাধিক প্লেয়ার আছে। একাধিক অফিসিয়াল আছে। একটি টিমের মালিকের ঘনিষ্ঠ স্বজন আছে। আম্পায়ার আছে। দেশজোড়া বেটিং সিন্ডিকেট আর বুকিদের কাছে আর কী চাই একের পর এক ম্যাচে স্পট ফিক্সিং এর জন্য? মোবাইল ফোন ইন্টারসেপশন থেকে জানা গেল ২০১৩ সালের ১৫ মে মুম্বই ইন্ডিয়ান বনাম রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচের আগে বিন্দু দারা সিংকে ফোনে উৎফুল্ল আম্পায়ার আশাদ রউফ

বলেছিলেন, আজ জিন্দেগি কী হার জিত কর লেনা। রউফ নিজেই ছিলেন আম্পায়ার ওই ম্যাচের। বিন্দু দারা সিং অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি অন্যদেরও জানিয়ে দিলেন আজ ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা আসবে। কারণ নানাভাবে আর বেট করা হচ্ছে।

সেই প্রথম নয়। ১২ মে আশাদ রউফ জয়পুরের পিচ সম্পর্কে আগাম খবর দিলেন। একটি রহস্যময় ফোন আসে মাঝে মাঝে পবন জয়পুরের কাছে। সেই ফোন এল। তাকে বলা হল শাম কো ওহি চিজ করনা হ্যায়, যো রউফ বাতায়া..ঠিক হ্যায়? এই নম্বর থেকে ফোন এলে শুধু হাঁ অথবা না বলা নিয়ম। নম্বরটি হল ৯২৩৩৩২064। সেটি শুনে বিন্দু দারা সিংকে ফোন করে জানিয়ে দিল পবন। বিন্দু আনন্দে বলে উঠেছিলেন, রউফকে যা যা গিফট দেওয়া হয়েছে তার সব আজ উসুল হয়ে যাবে একটা ম্যাচে। কিন্তু সকলের অলক্ষে সেই ফোনের বার্তালাপ ততক্ষণে মুম্বই পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে শুনেছে। কারণ বিশেষ কিছু বুকি লাগাতার লক্ষ করেছে যে এই বিশেষ সিন্ডিকেটটি সবরকম খবর আগে পাচ্ছে।

আর এরাই কোটি কোটি কামাই করছে। সুতরাং এদের খবর পুলিশকে দিয়ে রাখা হয়েছিল। তাই মুম্বই পুলিশ জাল পেতে প্রত্যেক ফোন ট্যাপিংয়ের ব্যবস্থা করে। এবং পরদিন সাত সকালে খবরটা আবার পেয়ে গেল সেই পবন জয়পুর। অর্থাৎ পুলিশ যে পিছনে লেগেছে তা জানা হয়ে গেল। পবন জয়পুর পাগলের মতো ফোন করছে বিন্দুকে। ১৫ মে। কিন্তু বিন্দু দেরি করে ঘুমান রাতে। আর সকালে ঘুম থেকে ওঠেনও দেরিতে। কে না জানে তাঁর কাজ শুরু হয় দুপুরের পর। কারণ আইপিএল তো বিকেলের আগে শুরুই হয় না। অবশেষে পাঁচ বারের পর কোনোমতে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বিন্দু দারা সিং ফোন তুললেন, পবন জয়পুর উত্তেজিত...গলায় আতঙ্ক।

পবন : লাফড়া হো গয়া হ্যায় বিন্দু ভাই... যো সিম রউফকো দিয়া থা উও অভি কে অভি ডেসট্রয় করনে কে লিয়ে বোল দো ইয়ার।

বিন্দু : কেন কী হল?

পবন : আরে পুলিশ ওই নম্বর ট্যাপ করছে।

বিন্দু : সেকি? তাহলে তো আমাদেরও....

পবন : হ্যাঁ, তাই তো বলছি। কাল তো অনেকবার কথা হয়েছে।

বিন্দু : আরে আমার তো প্রায় ৮০ বার কল হয়েছে রউফের সঙ্গে। এখন কী করব? পবন : উসে ভাগনে কো বোলো..

বিন্দু লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে ফোন করলেন আশাদ রউফকে। জানিয়ে দিলেন, মুম্বই পুলিশ আপনার পিছনে। আশাদ রউফ আর কোনো দ্বিতীয়বার চিন্তা করলেন না কিছু। পালালেন ভারত ছেড়ে।

কোটি কোটি জনতা যখন কাজকর্ম ফেলে, ক্রিকেট ও নিজেদের পছন্দের টিমকে সমর্থন করতে পাগলের মতো টিভির সামনে হাজির হয়ে চলেছে তখন আদতে ওইসব ম্যাচেরই ভিভিআইপি কর্পোরেট বক্সের সোফায় বসে একঝাঁক উপরতলার মানুষ সেইসব ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে চলেন। কিন্তু আদতে কি তারাই এসব ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করেন? তারা তো পুতুল। আসল প্ল্যান আর স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে অন্যত্র। সেখান থেকে নির্দেশ আসে দিল্লিতে। দিল্লির বেটিং কিংপিনের মাধ্যমে গোটা প্ল্যান কার্যকর করা হয়। সেই কিংপিনের নাম কেউ জানে না। শুধু পরিচয় জানে। ডক্টর সাব! কে এই ডক্টর সাব! ।

এত টাকা কোথা থেকে আসছে? ২০১০ সালে আইপিএলের শুরুর দিনগুলিতেই সবথেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের আইটি দপ্তর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করল। ২০১০ সালের ১৯ এপ্রিল সেই সময়ের ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী খুব সকালে অফিসে এসেই প্রথম যে কাজটি করলেন সেটি হল ইকনমিক অফেন্ডারস উইং আর ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। নর্থ ব্লকে অফিস অর্থমন্ত্রকের। তিনি ওই অফিসারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন এবং কড়াভাবে বুঝিয়ে দিলেন আইপিএল নিয়ে প্রচুর অভিযোগ আসছে। সরকার চুপ করে থাকতে পারে না। অর্থমন্ত্রী জানতে চান ম্যাচ ফিক্সিং, বিডিং প্রক্রিয়ার সময় অনিয়ম, বেটিং, টাকা বিদেশে পাচার সমস্ত কিছু নিয়েই তদন্ত করতে হবে। তিনি একটা কথা উচ্চারণ করলেন, নো ওয়ান শুড বি স্পেয়ারড! ঠিক পরের বছর ২০১১ সালে ভারতে আয়োজিত হবে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ।

সুতরাং তার আগে ক্রিকেট নিয়ে ঘনিয়ে ওঠা অত্যন্ত ঘোরালো ধোঁয়াশা যেন পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থমন্ত্রীর টেবিলে একঝাঁক ফাইল। তিনি এমন এক রাজনীতিবিদ যিনি ফাইল তৈরি, ফাইল পড়া আর অনুপুঙ্খ নোট দেওয়া, খসড়া রিপোর্ট গঠন ইত্যাদি কাজে কিংবদন্তির পর্যায়ে গিয়েছেন। সে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত তাদের যে কোনো নির্বাচনী ইস্তাহার বরাবর তিনি তৈরি করতেন অথবা তাঁর সীলমোহর ছাড়া সেগুলি প্রকাশিত হয় না। আজ পর্যন্ত কোনো ফাইল তাঁর হাত থেকে বেরোয়নি যাতে সামান্য খুঁত বা অনিয়ম অথবা ভুল আছে। এত সময় পান কীভাবে? কারণ ভদ্রলোক রাত দেড়টা পর্যন্ত নিজের বাসভবনে কাজ করেন। এবং রাত দেড়টার পরও তাঁর কাছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শনপ্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন। দেখাও করেন। তাঁর সরকারি বাংলোর ভিজিটর্স রুমের শেষতম আগত মানুষটির সঙ্গেও দেখা না করে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠবেন না। অন্যদিকে আবার ঠিক ভোরেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। কারণ স্নান করে তাঁর এক ঘণ্টা চণ্ডীপাঠ করা অভ্যাস। এবং তারপর তাবত ইংরাজি সংবাদপত্র একপ্রকার মুখস্থই করেন। তারপর অফিসে এসে আবার ফাইলে ডুবে যান। তার মধ্যে নিয়ম করে বই পড়া। এরকম এক অবিশ্বাস্য রুটিন বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া মানুষকে স্বাভাবিকভাবে কোনো সরকারি দপ্তরের অফিসার ফাঁকি দিতে পারেন না। সাহসও পান না। সেই অর্থমন্ত্রীর নাম ছিল প্রণব মুখোপাধ্যায়।

তিনি একটি ফাইল তুলে নিয়ে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন আইপিএলের চেয়ারম্যান সহ তাবত পরিচালক গোষ্ঠীর আর্থিক লেনদেন যেন খুঁটিয়ে তদন্ত করা হয়। অর্থমন্ত্রকের আয়কর বিভাগের এক অফিসার বলেছিলেন, স্যার একটা কথা ছিল। তিনজন বিগ শটকে বাদ দিয়ে তদন্ত শুরু করা যাবে না। অর্থমন্ত্রী জানতে চাইলেন কারা তাঁরা? অফিসার বললেন, রাজস্থান রয়্যালসের চেয়ারম্যান মনোজ বাদালে, ভেনু নায়ার, ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস গ্রুপের সি ই ও এবং আইপিএলের চিফ অপারেটিং অফিসার সুন্দর রামন। এঁদের প্রশ্ন করা উচিত। তাহলে হয়তো অনেক কিছু জানা যাবে। অর্থমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত করলেন তদন্ত হবে নিরপেক্ষ। কাউকে ছাড়া হবে না। তবে তিনি তার আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম

এবং কৃষি মন্ত্রী (যিনি কৃষির থেকেও ক্রিকেট প্রশাসনকে অনেক অনেক বেশি বোঝেন) শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করলেন। সিদ্ধান্ত হল তদন্ত হবে পক্ষপাতহীন ও সার্বিক

আইপিএল কমিশনারের নাম ললিত মোদি। তিনি তখন লন্ডনে। তাই তাঁকে জেরা করার উপায় কী? টেলি কনফারেন্স। তাঁকে প্রাথমিক জেরার পর বলা হল আপনি ফিরে আসুন তাড়াতাড়ি। সরকার থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ললিত মোদি বলে দিলেন ক্রিকেট মাফিয়ারা আমাকে পেলে খুন করবে। আমি আপাতত যাচ্ছি না। রাজস্থান রয়্যালসের চেয়ারম্যান মনোজ বাদালেকে জেরা করা হল। তাঁর কাছে যেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে সেটি হল সত্যিই রাজস্থান রয়্যালসের গোপন শেয়ারের মালিক স্বয়ং ললিত মোদি কিনা। আর ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস গ্রুপের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ভেনু নায়ার সন্দেহের তালিকায়। কারণ আইপিএল নিয়ে একটি ধোঁয়াশাপূর্ণ গোপন ডিলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল। সেই ডিলে সিঙ্গাপুরে থাকা এক মিডলম্যান কমিশন হিসাবে ৪০০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। কীভাবে করা হয়েছিল সেই ডিল? জানা দরকার। তাই ভেনু নায়ারকে জেরা।

ইতিমধ্যে বিসিসিআই এর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি পৃথক তদন্ত করছে। এবং সেই কমিটি এক বিস্ফোরক রিপোর্ট জমা দিল। তদন্তের শীর্ষে ছিলেন বিসিসিআই ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাঁর নাম অরুণ জেটলি। সদস্য হিসাবে ছিলেন আর এক পরিচিত নাম। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এই কমিটির রিপোর্টে জানা গেল আইপিএল টিম তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়ায়। অনিয়ম ঘটানো হয়েছে বিশেষ কিছু টিমকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। ললিত মোদি বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে চেয়েছেন দুই কর্পোরেট গ্রুপকে। আবার তাদের পালটা আরও দুটি গ্রুপও টিম চাইছিল। ভারতের বিখ্যাত দুই কর্পোরেট। তাদের মধ্যে একটির উত্থান বিস্ময়কর। তাদের সাহায্য করার জন্যই ললিত মোদি আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে কিছু না জানিয়ে এমনকী কোনো পারমিশন ছাড়াই দুটি বিশেষ শর্ত টেন্ডার প্রসেসের আবেদনপত্রে ঢুকিয়ে দেন। সেটা জানাজানি হলে সর্বাগ্রে আপত্তি জানায় বাকিরা। তদন্ত করার পর ললিত মোদির অতি সক্রিয়তার কারণে অনিয়ম খুঁজে পাওয়া গেল। আর তাই

বিসিসিআই গোটা টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয়। ফলে আদানির আর টিম ফ্র্যাঞ্চাইজি পাওয়া হল না। ললিত মোদি সেই সময় যখন দেখছেন তাঁকে ঘিরে আইনের ফাঁস ক্রমেই শক্ত হচ্ছে এবং ক্রিকেট প্রশাসন, হাত থেকে চলে যেতে বসেছে, পালটা একটি বিস্ফোরণ ঘটালেন একটি ট্যুইট করে। ট্যুইটের বিষয়বস্তু ছিল—সুনন্দা পুষ্কর রঁদেভু স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডের ৪.৯ শতাংশ সোয়েট ইক্যুইটি কিনেছেন। রঁদেভু স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কারা? কোচি আইপিএল টিমের মালিক। কোচি টিমের মেন্টর কে? শশী থারুর। তিনি তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সুতরাং সুনন্দা পুষ্কর কেউ না। আসল টার্গেট তাঁর প্রিয় মানুষটি। শশী থারুর। বিরোধী দল স্বাভাবিকভাবেই ঝড় তুলল। তিনি সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এই অভিযোগে ইস্তফার দাবি তোলা হল। তিনি ইস্তফা দিতে বাধ্যও হলেন। যদিও সুনন্দা পুষ্কর সেই শেয়ার কিনেছিলেন মাত্র ১৮ হাজার টাকা দিয়ে। আর সেই ৪.৯ শতাংশ শেয়ারের মধ্যে তাঁর নিজের ছিল মাত্র ০.৫ শতাংশ শেয়ার। বাকিটা? দুই নামজাদা ক্রিকেটারের নামে। এরকমই তিনি বলেছিলেন। যদিও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি কখনও ফাঁস করেননি কারা সেই দুই ক্রিকেটার। কিন্তু সুনন্দা পুষ্কর আইপিএল দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তাঁর যোগাযোগের নেটওয়ার্ক এতটাই স্ট্রং ছিল যে কোনো মহলের গোপন ডিল কানে আসা অসম্ভব নয়। অন্যদিকে কোচি টিমের মেন্টর হিসাবে শশী থারুরও যে কোনো গোপন বা ঘুরপথে ডিল করেছেন এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্তত আইপিএল বিডিং প্রক্রিয়ার তদন্তে সেরকম কোনো নথিপত্রই উদ্ঘাটিত হয়নি। বস্তুত তাঁর বিরুদ্ধে ললিত মোদির প্রধান রাগ একটাই। কোচি টিমের বিডিং প্রসেস মোদির অনেক গোপন অ্যাজেন্ডাকে আটকে দিয়েছিল। তিনি কয়েকটি গ্রুপকে কথা দিয়েছিলেন তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাইয়ে দেবেন। সেটি হল না। ঠিক চার বছর পর ২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি দিল্লির চাণক্যপুরী এলাকার একটি সাততারা হোটেলের একটি বিলাসবহুল স্যুইটে একজন গেস্টের মৃতদেহ পাওয়া গেল। প্রাথমিক তদন্তে মনে হল মৃত্যুর কারণ ড্রাগ ওভারডোজ! অর্থাৎ কোনো একটি ওষুধ বেশিমাত্রায় খেয়ে ফেলেছিলেন। সেটা আত্মহত্যার লক্ষ্যে? নাকি ভুল করে? কেন আত্মহত্যা করবেন তিনি? সেসব প্রশ্নের উত্তর

পাওয়া যায়নি। কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা? শেষ যে গ্লাসে জল খেয়েছিলেন তিনি সেখানে কোনো ড্রাগের রং বা গন্ধ ছিল না।

ওই হাই প্রোফাইল গেস্টের নাম সুনন্দা পুষ্কর! কীভাবে হল তাঁর মৃত্যু? আমরা বরং পরে একসময় সেই বিবরণটি শুনব!

ডক্টরসাব আয়ুর্বেদের চিকিৎসক। যখনই তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেন অথবা নতুন আলাপ হয়, তখনই তিনি তাঁদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়ুর্বেদের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন। শান্ত সৌম্য ডক্টর সাব সকলের প্রিয়। দিল্লিতে থাকেন। লোকটা আসলে কে? জাভেদ চুটানি। দাউদ ইব্রাহিমের অন্যতম কাছের লোক। দাউদের কাছের লোক, কথাটা শুনতে খুব সাধারণ। কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আন্ডারওয়ার্ল্ড জগতে। কারণ দাউদের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলতে পারে অথবা পেরেছে এরকম লোকের সংখ্যা কম। দাউদ নিজের বৃত্তে খুব কম লোককে এন্ট্রি দেয়। এমনকী বহু বছর ধরে তার হয়ে কাজ করছে এরকম সদস্যও সরাসরি দাউদকে ফোন করতে পারে না। ছোটা শাকিল, আনিস ইব্রাহিমদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জাভেদ চুটানি সেরকমই মুষ্টিমেয় এক ব্যক্তি যার সঙ্গে সরাসরি দাউদ কথা বলে। এই জাভেদই হল আইপিএলের অন্যতম প্রধান বুকি এবং ম্যাচ ফিক্সার। দাউদ, ছোটা শাকিল, আনিস ইব্রাহিম সকলকে চেনা যায়। তাদের ছবি আছে। কিন্তু ওই টিমের একমাত্র মেম্বার জাভেদ চুটানির কোনো ছবিই নেই ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে। দিল্লি বা মুম্বই পুলিশ বহু চেষ্টা করেও তার ছবি জোগাড় করতে পারেনি। একবার ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক স্পাই দুবাইতে দাউদের অনুগামী ফারুখ টাকলার গ্রুপে মিশে গিয়ে জাভেদ চাটুনির ছবি তুলতে গিয়েছিল মোবাইলে। তাকে চারতলার ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়। অবশ্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি। জাভেদের আজ চুল লাল। পরের সপ্তাহে হাইলাইট করা। আবার কিছুদিন পর সম্পূর্ণ ন্যাড়া। কখনও গালভর্তি দাড়ি। আবার কখনও ক্লিন শেভড। জাভেদ চুটানি গোটা আইপিএল ম্যাচ ফিক্সিংয়ের সবথেকে বড় হোতা। অথচ সে নিজে কখনও কোনো মাঠে যায় না। আর একবার দুবার যদিও যায়ও তাকে দেখা গিয়েছে সবথেকে কম দামি আসনে। কলেজ

স্টুডেন্টরা যেখানে বসে সেরকম কোনো সস্তার স্ট্যান্ডে। প্রবল ভিড়ে তাকে খুঁজে বের করা অথবা আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করা অসম্ভব। চুটানি কী করে? যে কোনো ম্যাচ অথবা স্পট ফিক্সিংয়ের শুরুর রেট সে ঠিক করে। যাকে বলা হয় ওপেনিং বিড। এই প্রাথমিক রেটিং যায় চারটি দেশে। ভারত, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান আর মালয়েশিয়া। কারণ এ পর্যন্ত যখন। বেটিং আর ফিক্সিং হয়েছে আইপিএল নিয়ে তার সবই এই চারটি দেশের কয়েকটি শহর থেকেই। চুটানি সিন্ডিকেটে সবথেকে বেশি টাকা লগ্নি করা হয়েছে। কারণ কী? আরও তো অনেক বেটিং সিন্ডিকেট আছে! কারণ হল একমাত্র জাভেদের সিন্ডিকেটের পূর্বাভাস হুবহু মিলে যাওয়ার চান্স। কোনো ম্যাচের ভবিষ্যৎ কী তা সবথেকে বেশি নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী করার কৃতিত্ব এই সিন্ডিকেটের। তবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ এই সিন্ডিকেটের পিছনে যে লোকটা আছে, সে কোনো হাফ হার্টেড কাজ করে না। সবই নিখুঁত প্রফেশনালিজমে। তার নাম ডি কোম্পানি। জাভেদ চুটানির পাশাপাশি আর যে নামটি সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই গোটা প্রক্রিয়ায় সেটি হল টিটু নাগপুরী। নাগপুরে এমন কোনো বড় ব্যবসা নেই যার সঙ্গে তার সংযোগ নেই। নাগপুরের এমন কোনো রাজনীতিবিদ নেই যার সঙ্গে তার ওঠাবসা নেই। এবং সবথেকে বড় কানেকশন হল বিসিসিআই। এই মহাশক্তিমান আর বিশ্বের ধনীতম ক্রিকেট বোর্ডের প্রথম সারির তাবত কর্তাদের সঙ্গে তার পরিচিতি ছিল। এই পাহাড়প্রমাণ চাপ নিয়ে মুদগল কমিটি তদন্ত করেছিল। এবং বিস্তারিত তদন্তের পর ১৩টি নাম সম্বলিত একটি রিপোর্ট জমা দেয়। সেখানেই শেষ নয়। পাশাপাশি জাস্টিস লোধা কমিটি তদন্ত করে। এবং সবথেকে বড় যে ধাক্কাটি দেওয়া হল সেটি হল ইন্ডিয়া সিমেন্ট এবং জয়পুর আইপিএলকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় ২ বছরের জন্য। গুরুনাথ মেইয়াপ্পন আর রাজস্থান রয়্যালসের মালিক রাজ কুন্দ্রাকে যে কোনো রকম ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

টিম মালিক এবং টিমের অফিসিয়ালদের ম্যাচ ফিক্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা সবথেকে সুবিধা। আর ঠিক সেই কারণেই এঁদের যেভাবে হোক সিন্ডিকেটে টানার প্রবল চেষ্টা করা হয়। কেন? কারণ টিম অফিসিয়ালস সরাসরি টিমের প্র্যাকটিস সেশনে উপস্থিত থাকে। কারা খেলতে পারে কারা খেলবে না সেই শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় প্রায় তাঁদের

চোখের সামনে। আইপিএল মালিকদের নিয়ে যে ওয়ার্কশপ হয় সেখানে মালিকদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় অফিসিয়ালরা। সুতরাং আগামীদিনের যে কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং নতুন রীতিনীতি কী আসছে তাও সবার আগে তাঁরা জানতে পারে। এরকম সোনার হাঁস যদি সিন্ডিকেটে থাকে তাহলে কোনো বেটিং লোকসানের মুখ দেখবে না। এখানেই কি শেষ? তা তো হতে পারে না? তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। বিশেষ করে দিল্লি ও মুম্বই পুলিশ পৃথকভাবে যে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে সেখানে বিস্ফোরক তথ্য আসছে।

১১ মে ২০১৩। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল যাবে মুম্বই। একঝাঁক নতুন তথ্য এসেছে হাতে। মুম্বই পুলিশের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করা দরকার। কারণ রেইড করতে হবে। কয়েকটা অ্যারেস্টও হয়ে যেতে পারে। এবং রাঘববোয়াল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম গো অ্যাহেড দিয়েছেন। চিন্তা নেই। স্পেশাল সেল দুপুরেই বেরিয়ে যাবে। ফ্লাইটের টিকিট কাটা। চারজন যাওয়ার কথা। কিন্তু ইনস্পেক্টর দত্ত কোথায়? বারংবার ফোন করা হচ্ছে। ফোন তুলছেন না বদ্রীশ দত্ত। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের তুখড়। এক ইনস্পেক্টর। গোয়েন্দাগিরিতে মোটামুটি সেরাই বলা যায়। ২০০৩ এবং ২০০৬ দুই বছরেই তিনি রাষ্ট্রপতির থেকে সাহসিকতার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। অন্তত ২০ জন সন্ত্রাসবাদীকে একা পাকড়াও কিংবা এনকাউন্টার করেন। একের পর এক কেস ক্র্যাক করেছেন। এহেন এক অফিসার বদ্রীশ কোথায়? কোথায় বদ্রী? জানতে চাইছেন খোদ পুলিশ কমিশনার নীরজ কুমার ফোন তুলছে না কেন? তাঁর সহকর্মীরা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন। কারণ এরকম কখনও বদ্রী করে না। বাড়িতে ফোন করা হল। বদ্রী দত্তের স্ত্রী বললেন, উনি তো নেই। অন্য ফ্ল্যাটে একটা কাজে গিয়েছিলেন। গতকাল রাতে। ফেরেননি। আর অপেক্ষা করা যায় না। তাই বদ্রী দত্তের এক সহকর্মী সোজা জিপ নিয়ে গুড়গাঁও। সেখানেই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন বদ্রীশ। তাঁর নিজের অন্য ফ্ল্যাট ফরিদাবাদ। সেক্টর ফিফটি টুতে সেকেন্ড ফ্লোর ফ্ল্যাট। ভেতর থেকে বন্ধ। ডোরবেল বাজানো হল। সাড়া নেই। অবশেষে দরজা ভাঙা হল। ভিতরে অদ্ভুত দৃশ্য। বদ্রীশ দত্ত এবং আর এক মহিলা মেঝেতে পড়ে আছেন। দুজনেই গুলিবিদ্ধ। এবং মৃত। বদ্রীশের পেটে ও বুকে গুলি। মহিলার মাথায়। মহিলার নাম গীতা শর্মা। বদ্রীশ দত্তের

পরিচিতা। শোনা যাচ্ছিল গার্ল ফ্রেন্ড। গীতা শর্মার পরিচয় কী? তিনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্রাথমিক তদন্তে ধরে নেওয়া হল দুজনের মধ্যে কোনো কারণে ঝগড়া হয়েছিল। রাগের বশে প্রথমে বদ্রীশকে গুলি করে হত্যা করে গীতা শর্মা আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আলমারি ভাঙা কেন? বদ্রীশ দত্ত দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলে সেই সময় ঠিক কী নিয়ে তদন্ত করছিলেন? আইপিএল!

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রধান ইনভেস্টিগেশন অফিসার ছিলেন বদ্রীশ। আর এ ব্যাপারে নিজের সোর্সকে কাজে লাগিয়েছিলেন। সাফল্যও পেয়েছেন। অন্যতম সোর্স সম্ভবত এই গীতা শর্মা। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। সেদিনই দুপুরে বদ্রীশ দত্তের নেতৃত্বে মুম্বই যাওয়ার কথা দিল্লি পুলিশের। ছিল একটি গোপন অভিযান। তার আগেই কেন খুন হতে হল বদ্রীশ দত্তকে? আজও ওই হত্যাকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা গেল না। তাহলে কি আইপিএল ফিক্সিংয়ের বিস্ফোরক কিছু জেনে ফেলেছিলেন? তাই সরে যেতে হল? বদ্রীশ দত্ত আজ নেই। আইপিএল অবশ্য আজও আছে। আমরাও আছি। মাঠে ভিড় জমাতে।

১৯

জামশেদজি টাটা এবং তাঁর পরিবারের পছন্দের বেড়ানোর জায়গা হল হার্ডেলট। ফ্রান্সের এক অপরূপ সি বিচ টাউন। ঘটনাচক্রে সেখানে ছিল লুই ব্রেরিওটের বাড়ি। ব্রেরিওট হলেন প্রথম পাইলট যিনি ১৯০৯ সালে ইংলিশ চ্যানেলের উপর থেকে ফ্লাই করেছিলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন সেই সময়ের এক সুপারহিরো। একটানা বহু বছর তাঁকেই রোলমডেল করেছে বিশ্বের যুবকবৃন্দ। একটা সময় সেই বন্দনায় ভাগ বসান চার্লস লিন্ডবার্গ। যিনি ১৯২৭ সালে আটলান্টিকের উপর দিয়ে প্লেন চালিয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবং তারপর থেকে লিন্ডবার্গ পরিণত হন নতুন এক আকাশনায়কে। তাঁকে ঘিরে মিথের জন্ম হয় একঝাঁক। লুই ব্রেরিওটের ছোট্ট বিমান মাঝেমধ্যেই যেখানে ল্যান্ড করত সেটি ছিল ফ্রান্সের হার্ডেলটে। যেখানে তাঁর নিজের বাড়ি ছিল। আর যেখানে ল্যান্ডিংটা হত সেটির অনতিদূরেই ছিল জামশেদজি টাটাদের বাড়ি। প্যারিস থেকে মাঝেমধ্যেই যেখানে টাটা পরিবার চলে আসতেন ছুটি কাটাতে। সুতরাং যখনই লুই ব্রেরিওট তাঁর প্লেন ল্যান্ড করাতেন, তখনই ওই ছোট্ট সমুদ্রতীরবর্তী শহরের শিশুকিশোরযুবকের দল ভিড় করেছে। তাঁকে ঘিরে থাকত সম্ভ্রমের চোখ। সেই তালিকায় ছিলেন জামশেদজি টাটা। জামশেদজি সেই থেকে স্বপ্ন দেখতেন তিনি একদিন পাইলট হবেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি প্রথমবারের জন্য বিমানে চাপলেন। সেটি ছিল কদ্রোঁ ব্যাগেট নামক একটি ফ্রেঞ্চ বিমান। ওই অল্প বয়সেই প্লেনে চাপা একটা প্যাশনে পরিণত হল তাঁর। এবং বম্বেতে ফিরে এসে তিনি প্রথম যে কাজটি করেছিলেন সেটি হল ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হওয়া। এবং নিয়মিত প্র্যাকটিসের পর ১৯২৯ সালে তিনি সেই বম্বে ফ্লাইং ক্লাব থেকে স্বীকৃতি পেলেন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত পাইলটের। তবে শুরুতে দুজনের সঙ্গে ফ্লাই করতে হবে। একা নয়। একা ফ্লাইংয়ের অনুমতি পাওয়া খুব কঠিন। একদিন এল সেই বহু প্রতীক্ষার দিন। সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি ডুয়েল ফ্লাইং পরীক্ষার পর একদিন জামশেদজি টাটা পেলেন একা ফ্লাই করার অনুমোদন। ১৯২৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ফেডারেশন এরোনেটিক ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে এরোক্লাব অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বার্মা তাঁকে দিল এ

গ্রেড লাইসেন্স। গোটা ভারতের মধ্যে সেই প্রথম কোনো ভারতীয় এ গ্রেড পাইলটের স্বীকৃতি পেলেন আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইলট হওয়ার পর সাধারণত সকলেই ভাববে একটা কোনো পাইলটের চাকরি পাওয়ার কথা। সেটাই স্বাভাবিক। অন্তত প্রাথমিকভাবে। আর তখন এরকম একটা সার্টিফিকেট থাকা মানে ভারতে নয়, বিদেশেও যে কোনো সংস্থায় পাইলটের অথবা কো পাইলটের কাজ পাওয়া অসম্ভব নয়। বরং সহজ। কিন্তু জামশেদজি টাটা অন্য গোত্রের। ওই সার্টিফিকেট পাওয়ার মাত্র ৬ সপ্তাহের মধ্যে ভাবলেন এক অদ্ভুত স্বপ্নের কথা। নিজের বিমান সংস্থা হবে।

নেভিল ভিনসেন্ট টাটার বন্ধু। তিনি ছিলেন আরব দুনিয়ার রয়্যাল এয়ার ফোর্সের হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ টাটা গোষ্ঠী ব্রিটিশ সরকারকে চিঠি লিখে জানাল তারা করাচি আর বম্বের মধ্যে মেল সার্ভিস (চিঠি, পার্সেল) বিমান চালু করতে আগ্রহী। সরকারের থেকে টাটা গোষ্ঠী ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার একটা সাবসিডি চাইল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উচ্চবাচ্যই নেই। অথচ টাটার ওই চিঠি পাওয়ার পরই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সরকার ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ মেল সার্ভিস চালু করে দিল দিল্লি ও করাচির মধ্যে। টাটাকে কিন্তু পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না। জামশেদজি হতাশ হলেন না। অপেক্ষা করছেন। এবং বারংবার লন্ডনে গিয়ে তিনি চেষ্টা করলেন ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করার। ফল মিলল। অনুমতি পাওয়া গেল। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের এক ভোরে করাচি থেকে একটি ‘পজ মথ’ বিমান অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কয়েক বস্তা চিঠি আর পার্সেল নিয়ে টেক অফফ করেছিল। ভারতবর্ষের নিজস্ব কোম্পানির একান্ত ভারতীয় এক বিমান সংস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল কিছু চিঠি নিয়ে। টাটার সঙ্গী সেই বন্ধু। নেভিল ভিনসেন্ট। সংস্থার নাম টাটা এভিয়েশন সার্ভিস। তাঁর আত্মজীবনীতে জামশেদজি বলেছেন, মাঝ আকাশে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় বসেছিলাম সাফল্য কামনায়। ঘণ্টায় ১০০ মাইল ছিল স্পিড। তিনি নিজেই ছিলেন সেই প্রথম বিমানে। এবং প্রথম ডেলিভারি ছিল আমেদাবাদ। তাই ল্যান্ড করা হল। এবং রিফুয়েলিংয়ের জন্য বলা হয়। বিমান থেকে কয়েক বস্তা চিঠি ও পার্সেল নামানো হয় রানওয়েতে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল একটি গোরুর গাড়ি। সেই গোরুর গাড়িতে তোলা

হল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বেসরকারি চিঠি আর পার্সেল। সেসব নিয়ে সেই গোরুর গাড়ি রওনা হল। কী অদ্ভুত একটি ভারতের আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরুর দৃশ্য। ভারতীয় সংস্থার প্রথম বিমান থেকে নামা চিঠি টিপিক্যাল ভারতীয় পরিবহণ গোরুর গাড়িতে চেপে যাচ্ছে হাজারো গন্তব্যে! নতুন ও পুরোনোর মেলবন্ধন। আর বিমানের ট্যাংক রিফুয়েলিংয়ের জন্য চার গ্যালন পেট্রল ঢালা হয়েছিল আমেদাবাদ এয়ারপোর্টে। সেই প্রথম ফ্লাইট ৫৫ পাউন্ড ওজনের চিঠির বস্তা নিয়ে 'পজ মথ' স্বচ্ছন্দে ল্যান্ড করেছিল বম্বে এয়ারপোর্টে।

এরপর থেকে নিয়মটি হয়ে গেল ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ (যা পরবর্তীকালে হবে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ) বিদেশ থেকে প্রতি শুক্রবার করাচিতে নামবে। আর সেই বিমানে আসা যাবতীয় চিঠি আর পার্সেল নিয়ে পরদিন সকালে টাটাদের পজ মথ বিমান উড়বে বম্বের উদ্দেশে। এরপর করাচি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবে সেই ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ। অপেক্ষা করবে টাটাদের বিমানের। কখন আসবে ফিরতি বিমান। যতদিন না ভারতে সেইসব চিঠি আর পার্সেল ডেলিভারি করে আবার বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য চিঠি পার্সেল নিয়ে টাটাদের বিমান করাচি ফিরছে বম্বে থেকে ততদিন রানওয়েতে অপেক্ষা করেছে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ। সেটা সাধারণত হত ঠিক পরের বুধবার পর্যন্ত। ১৯৩৯ সালে এই রুটিন ভেঙে গেল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ সরকার সমস্ত এভিয়েশন সেক্টরই নিজেদের হাতে নিয়ে নিল। ফলে টাটা এভিয়েশন সার্ভিসও সরকারের হাতে গেল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সুযোগটি নিতে ছাড়লেন না জামশেদজি। তিনি একটি এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি গড়ার দিকে এগোলেন। এবারও তাঁর প্রিয় বন্ধু সেই ভিনসেন্টই প্রধান পরামর্শদাতা এবং সঙ্গী। যিনি রয়্যাল এয়ারফোর্সের পাইলট ছিলেন। ততদিনে যাবতীয় যুদ্ধবিমান ছিল ভারী মেটালের তৈরি। টাটার কোম্পানি অফার করল হালকা বিমান তৈরির। সেইমতো যে বিমান তৈরি হল তার নাম দেওয়া হল মসকুইটো। দেখতে ছোট। সাংঘাতিক কার্যকরী। হু হু করে গিয়ে বোমা ফেলে চলে আসবে! সেটাই ছিল কনসেপ্ট। শুধু ইঞ্জিন আমদানি করা হবে। আর বডি তৈরি হবে ভারতে। গোটা প্ল্যান ছিল বার্লিনে বোমা ফেলার। এই প্রস্তাবে রাজি ব্রিটিশ সরকার। তারা ইয়েস বলল প্রথমে। আর জামশেদজি সেই বিমান তৈরির কারখানা বানালেন পুণের কাছে আগা খান প্যালেসে।

আশ্চর্য! অর্ডার দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর ব্রিটিশ সরকার সেই অর্ডার ক্যান্সেল করে দেয়। সম্ভবত ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে এই ভারতীয় সংস্থা যদি প্রতিযোগিতা করে জিতে যায়! এই ভয়ে! তাহলে? প্রজেক্ট হবে না? এবার দায়িত্ব নিলেন নেভিল ভিনসেন্ট। তিনি জামশেদজিকে বললেন, ডোন্ট ওরি জেআরডি (এই নামেই টাটা পরিচিত)! তুমি ভেবো না। আমার অনেক বন্ধু ব্রিটিশ সরকারে আছে। দেখছি কী করা যায়। ভিনসেন্ট ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে ডিল সম্পূর্ণ করলেন এবং ফিরছেন ভারত। চুক্তি সফল। ভারতে যাচ্ছিল একটি আমেরিকান ফাইটার বিমান। ব্রিটেন হয়ে। ভিনসেন্ট সেই বিমানেই বসে পড়লেন। তাঁকে সবাই চেনে। আপত্তির প্রশ্ন নেই। তিনি নিজেই পাইলট। সুতরাং পাইলটের পাশেই বসে গেলেন আড্ডা মারতে। সেই বিমানের নাম ছিল হাডসন বম্বার। ফ্রান্সের সীমারেখা ক্রস করার পরই একটি তীব্র শব্দ, আগুন। হিটলারের শিবির গুলি করে নামিয়ে দিল সেই হাডসন বিমানকে। আটলান্টিকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন নেভিল ভিনসেন্ট। ভারতের নিজস্ব বিমান সংস্থা নির্মাণে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য! যাঁকে ছাড়া সম্ভবত জামশেদজি পারতেনই না বিমান সংস্থা গঠন করতে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার চার মাস পর জামশেদজি টাটা স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারকে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি সরকারের সঙ্গে যৌথ ভেঞ্চারে একটি বিমান পরিবহণ সংস্থা গঠন করতে চান। তখন দেশ গঠনের কাজে উৎসাহিত নয়া সরকার। অতএব এই প্রস্তাবের মাত্র আট সপ্তাহের মধ্যেই অনুমতি পাওয়া গেল। ১৯৪৮ সালের ৮ জুন একটি জয়েন্ট ভেঞ্চারের বিমান সংস্থা প্রথম ফ্লাইট নিয়ে রওনা দিল লন্ডন। বম্বে থেকে। কোম্পানির নাম এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের ডাকোটা বিমানগুলি আর ফিরিয়ে নিয়ে যায়নি আমেরিকা। সেগুলি ভারতের এয়ারবেসেই রয়ে গেল। সেগুলির স্ট্যান্ডার্ড ছিল অনেক উন্নত। সেগুলি জোগাড় করলেন টাটা। সংস্কার করার পর সেগুলি নিয়ে যাত্রা শুরু হল। এবং দ্রুত এয়ারইন্ডিয়া হয়ে উঠল দেশে নয়, বিদেশেও এক বহু আলোচিত নাম। এরকম দুর্দান্ত প্রফেশনাল সার্ভিস একটি ভারতীয় সংস্থা আয়ত্ত করল কীভাবে? ঠিক চার বছর কাটল। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার স্থির করল কোনো বেসরকারি হাতে আর নয়। ভারতীয় বিমান

সংস্থাকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হবে। কিন্তু যাঁর হাত ধরে এই সংস্থার জন্ম, উত্থান এবং সাফল্যের উড়ান তাঁকে ছাড়া যাবে না। অতএব সেই ১৯৫২ সাল থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হলেন জামশেদজি টাটা। কতদিন পর্যন্ত? ১৯৭৮! গোটা বিশ্বে এরকম নজির নেই। এতদিন ধরে চেয়ারম্যান। আর সেই সময়সীমায় এয়ার ইন্ডিয়ার খ্যাতি কেমন ছিল? জনপ্রিয়তা আর আভিজাত্যের তুঙ্গে। ১৯৬৮ সালে লন্ডনের ডেইলি মেলের সাংবাদিক জুলিয়েন হল্যান্ড এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবাকে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়ে একটি আর্টিকল লিখেছিলেন। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, এয়ার ইন্ডিয়া বিশ্বের প্রথম সারির বিমান সংস্থাগুলির মধ্যে শীর্ষস্তরের তালিকায়। জুলিয়েন লিখেছিলেন, একবার রোমে কয়েকঘণ্টা হপিং ফ্লাইটে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দাঁড়িয়ে ছিল। আমি যাত্রী। একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম। সিটে রেখে গিয়েছিলাম কিছু চকোলেট। বেশ কয়েক ঘণ্টা পর যখন ফিরে এলাম, তখন দেখি সেগুলি সরানো হয়নি। তবে আমার সিটের পাশের জানালার ব্লাইন্ড নামানো। যাতে রোদ এসে চকোলেটগুলিকে গলিয়ে না দেয়! এয়ারহোস্টেস এই কাজটি করেছিলেন আমি কিছু না বললেও! এটাই হল সার্ভিস! আর ওই ঘটনার ঠিক ৪০ বছর পর কোন কোন বিমান সংস্থা কেমন তার একটি বিশ্বজোড়া সমীক্ষক সংস্থা জেট এয়ারলাইনার ক্র্যাশ ডেটা ইভ্যালুয়েশন সেন্টারের পক্ষ থেকে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হল। যেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রথম তিনটি বিপজ্জনক বিমান পরিষেবা সংস্থার মধ্যে এয়ারইন্ডিয়া অন্যতম! সুরক্ষা আর পরিষেবা দুটি নিরিখেই এই সংস্থার রেটিং সর্বকালীন নিম্নে। কীভাবে হল এই অবনতি? কাদের জন্য? সবটাই হয়তো এক গভীর চক্রান্ত।

সংস্থার লাভ যখন কমছে, যখন বেসরকারি সংস্থাগুলি হু হু করে এগোচ্ছে, তখন প্রফুল্ল প্যাটেল ইউপিএ সরকারের অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রী হঠাৎ ৬৮টি নতুন এয়ারক্র্যাফটের অর্ডার দিলেন কেন? কেন এয়ার ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের মার্জার হল? কাদের স্বার্থে? ঠিক এই দুটি সিদ্ধান্তের পরই দেখা গেল যে সংস্থার আয় ৭ হাজার কোটি টাকা বছরে, তাকে বলা হল নতুন এয়ারক্র্যাফট কেনার জন্য ৫০ হাজার

কোটি টাকা লোন নিতে। ১৫ বছর আগে যে এয়ার ইন্ডিয়া ছিল গোটা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির ৪২ শতাংশের মালিক একা। তাকে এখন বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার এফডিআই-এর একটি নীতি ঘোষণা করেছিল। সেই নীতিটি ছিল ভারতীয় বিমান সংস্থার ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার নিতে পারবে যে কোনো বিদেশি কোম্পানি। এক বছরের মধ্যে সৌদি আরবের বিখ্যাত বিমান সংস্থা এতিহাদ ভারতের জেট এয়ারলাইন্সের ২৪ শতাংশ শেয়ার কিনে নিল। আর ঠিক তারপরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সৌদি সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন। সেটি হল ভারত ও গালফ দেশগুলির মধ্যে চলা ফ্লাইটের সাপ্তাহিক বিমান আসনের সীমা ১৩৩০০ থেকে বাড়িয়ে করা হল ৫০ হাজার! এতে সবথেকে লাভবান হল কারা? জেট ও এতিহাদের যৌথ কোম্পানি। সংসদে ঝড় উঠেছিল। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু সেই বিরোধীরা যখন নিজেরা ক্ষমতায় ছিলেন তারা কী করেছেন? অথবা এখনও বা কী করছেন? অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারের একটি বিখ্যাত দপ্তর ছিল। তার নাম ডিসইনভেস্ট মিনিস্ট্রি। সরকারের সংস্থাগুলিকে বিক্রি করার কাজ। সেই সংস্থা একটি কমিশন গঠন করেছিল এয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে। ডিসইনভেস্টমেন্ট কমিশন। তাদের সুপারিশ হয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া পরিচালিত দুটি খ্যাতনামা হোটেল দিল্লি ও মুম্বইয়ের সেন্টুর বিক্রি করা হবে। পরবর্তীকালে সেটি কত টাকায় বিক্রি হয়েছিল? মাত্র ৮৩ কোটি টাকায়! কে কিনেছিল? বটরা হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড। কে তারা? খুব কম লোকই জানে কে তারা? কেন তাদেরই বাছাই করা হল! তারও উত্তর নেই। সেই একই হোটেল এরপর সংস্থাটি বিক্রি করে দিল সাহারা গ্রুপের কাছে। কত টাকায়? ১১৫ কোটি টাকায়। সোজা মুনাফা! অল্প টাকায় কেনো, বেশি টাকায় বেচে দাও। উদয়পুরের ২৯ একর জমি নিয়ে থাকা বিলাসবহুল লক্ষ্মী বিলাস হোটেল কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল? ৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকায়! দক্ষিণ দিল্লি বা মুম্বইয়ের যে কোনো পশ এলাকার বাড়ির দাম তার থেকে বেশি। কিন্তু শুধুই কী কম্পিটিশনে টিকে থাকতে না পেরেই লোকসানে ডুবে গেল এয়ার ইন্ডিয়া? না। এয়ার ইন্ডিয়ার নিজস্ব রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে বিদেশমন্ত্রক যতবার বিদেশে মন্ত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন ট্যুরে গিয়েছে তার সিংহভাগ খরচই মেটায়নি। সব বকেয়া হয়ে

রয়েছে। কখনও কোনো প্রধানমন্ত্রীর ৬টি দেশ ভ্রমণের জন্য ৪৮ কোটি টাকা মেটায়নি বিদেশমন্ত্রক। কখনও রাষ্ট্রপতিদের ২২টি বিদেশ সফরের খরচ ২০৬ কোটি টাকা বাকি রয়ে গিয়েছে বছরের পর বছর। কখনও ভাইস প্রেসিডেন্টদের এয়ারক্র্যাফট মেইনটেন্যান্সের জন্য ব্যয় হওয়া ১৪৬ কোটি টাকা মেটানো হয়নি। এভাবে লোকসানের সমুদ্রে ডোবানো হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়াকে। আর এভাবে প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের সবথেকে নিজস্ব ব্র্যান্ডের এয়ারলাইন্সকে কোমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাবা হয়েছিল বিরোধী দল এসে আবার সেটিকে বাঁচিয়ে তুলবে। কিন্তু নতুন সরকার কোনো দ্বিধা করেনি। তারা এসেই ঘোষণা করে দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়াকে বিক্রি করা হবে। কারা কিনবে? দৌড়ে ইন্ডিগো, টাটা গোষ্ঠী এবং স্পাইস জেট।

এয়ার ইন্ডিয়ার লোকসানের পাশাপাশি কাদের লাভ ক্রমেই বাড়তে শুরু করল? বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলির। আর তাদের মধ্যে সবথেকে ইউনিক ঘটনা ঘটল একটি বিশেষ সংস্থার ক্ষেত্রে। সেই সংস্থার মালিক কলকাতার লা মার্টিনিয়ার স্কুলে আসতেন বিদেশি গাড়িতে চেপে। বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে থাকে একটি করে হাউস। তাদের নানারকম নাম হয়। ষাটের দশকে লা মার্টিনিয়ার স্কুলের এরকম একটি হাউস ছিল হেস্টিংস হাউস। সেই হাউসের ফ্ল্যাগের রং লাল। টকটকে লাল। ওই হাউসের এক সদস্য ওই লাল রঙটিকে প্রচণ্ড পছন্দ করে ফেলেছিলেন সেই স্কুল জীবন থেকেই। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি কোম্পানির সিগনেচার কালার হয় লাল। কলকাতার লা মার্টিনিয়ার স্কুল থেকে ১৯৭২ সালে পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে সবথেকে প্রতিষ্ঠিত, বিখ্যাত, চর্চিত এবং ধনী সেই ছাত্রের নাম বিজয় মালিয়া। দ্য ম্যান অফ রেড...

৪ অক্টোবর ২০১২ সালে দিল্লি এয়ারপোর্টের কাছে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বসে থাকা সুস্মিতা চক্রবর্তী সকাল থেকে কিছুই খাননি। তাঁর মন অস্থির। ঝড় চলছে। স্বামী মানস চক্রবর্তী সকাল থেকে বারংবার ফোন করছেন। তিনি ধরছেন না। তাঁর ভালো লাগছে না কিছুই। তারপর দুপুর দেড়টার সময় তিনি ধীরে সুস্থে চোখের জল মুছে বেডরুমে ঢুকে সিলিং ফ্যানে শাড়ি পেঁচিয়ে গলায় লাগালেন। এবং আত্মহত্যা করলেন। সুস্মিতা চক্রবর্তী

ছিলেন প্রচণ্ড টেনশনে। তাঁর স্বামী মানস চক্রবর্তী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ফোর্স অফিসার। অবসরের পর চাকরি নিয়েছিলেন কিংফিশার এয়ারলাইনসে। স্টোর ম্যানেজার। ৬ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। সুস্মিতা চক্রবর্তী এই টেনশন আর নিতে পারলেন না। অবশ্য সেই একই সময় কিং ফিশার এয়ারলাইন্সের মালিক বিজয় মালিয়ার ছেলে সিদ্ধার্থ মালিয়াও টেনশনে খুব। কারণ এই প্রথম তিনি টিভি শোতে নামছেন। কয়েক সপ্তাহ পরই শুটিং। কেমন হবে কে জানে। অনুষ্ঠানের নাম 'হান্ট ফর দ্য কিংফিশার ক্যালেন্ডার গার্লস সিজন ফোর'। আবার তাঁর পিতা বিজয় মালিয়াও বেশ টেনশনে। না না..নিজের কোম্পানির হাজার হাজার কর্মী বেতন পাচ্ছেন না সেই কারণে নয়। এয়ারলাইন্স ডুবছে সেই কারণেও নয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় ফরমুলা ওয়ান গ্রাঁ পিঁ রেসিং কার প্রতিযোগিতায় মালিয়ার টিম অংশ নেবে। যেদিন বিজয় মালিয়ার সংস্থা কিং ফিশারের একজন অখ্যাত স্টোর ম্যানেজার মানস চক্রবর্তীর স্ত্রী সুস্মিতা চক্রবর্তী আত্মহত্যা করলেন স্বামীর ৬ মাস বেতন না পাওয়ার টেনশনে, তার ঠিক একদিন পরই বিজয় মালিয়া প্রাইভেট এয়ারক্র্যাফটে চেপে দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়েছিলেন ওই ফরমুলা ওয়ান টিম নিয়ে। কিন্তু এসব ঘটনা অনেক পরের। তার আগের একটি ঘাত প্রতিঘাতে ভরা সোপ অপেরা রয়েছে এসবের আড়ালে। যার ইংরাজি নাম হওয়া উচিত কর্পোরেটাইজশন অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স। ভারতীয় রাজনীতির কর্পোরেটকরণ!

একে বলা যেতে পারে একটা যুগলবন্দি। ভারতের রাজনীতি আর কর্পোরেট মহলের। ২০০২ সালে বিজয় মালিয়া কর্ণাটক থেকে একজন নির্দল সদস্য হিসাবে রাজ্যসভায় এমপি হয়ে গেলেন। তাঁকে সকলেই সব দলই সমর্থন করেছিল। একজন লিকার ব্যারণ (ইউ বি গ্রুপ বিজয় মালিয়ার সবথেকে বড় মুনাফার শিল্প) বিজনেসম্যানকে কেন সব দল ভোট দিয়ে রাজ্যসভায় পাঠাল? জানা নেই। এটা নতুন কিছু নয়। বেশ কয়েক দশক ধরে চলছে এই প্রবণতা। ভারতীয় শিল্পপতিরা রাজ্যসভায় আসছেন বিভিন্ন দলের হয়ে। এমপি হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়? বিভিন্ন দপ্তরের স্থায়ী কমিটি, সিলেক্ট কমিটি, কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য হওয়া যায়। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রকের প্রতিটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায় কিংবা আলোচনা করা যায় অথবা রিভিউ করার সুযোগ আছে।

রয়েছে সংসদে প্রশ্ন তোলা, সরকারকে কোণঠাসা করার সুবিধা। এবং মতামত দেওয়ার সুবিধা। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রকই যাবতীয় শিল্পের নীতি নির্ধারণের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি। বিজয় মালিয়া এমপি হিসাবে তাঁর প্রথম টার্মেই কোন সংসদীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন? সিভিল এভিয়েশন, ডিফেন্স এবং ইন্ডাস্ট্রি। সিভিল এভিয়েশন অর্থাৎ অসামরিক বিমান পরিবহণ। সোজা কথায় দেশের বিমান পরিবহণে যুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিগুলির কাজকর্মের রিভিউ করা, নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় অংশ হলেন তিনি। যে কোনো সময় ওই মন্ত্রকগুলির সর্বোচ্চ আধিকারিকদের ডেকে পাঠানো যায়। জেরা করা যায়। সাফাই চাওয়া যায়। চাপ সৃষ্টিও করা যায়। এবং সিভিল এভিয়েশনের সংসদীয় কমিটির সদস্য হওয়ার ঠিক এক বছরের মধ্যে ২০০৩ সালে বিজয়া মালিয়া পুত্র সিদ্ধার্থ মালিয়াকে জন্মদিনে পছন্দসই একটি উপহার দিলেন। কিংফিশার এয়ারলাইন্স। অর্থাৎ তিনিই একটি বিমান সংস্থার মালিক। আবার তিনিই পার্লামেন্টের বিমান পরিবহণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য! এই প্রবণতা নতুন নয়। তিনিও প্রথম নয়। কল্পতরু দাস ওড়িশা থেকে নির্বাচিত এমপি। তাঁর পারিবারিক বাণিজ্য হল মাইনিং। আর তিনিই ছিলেন ২০১৫ সালে সংসদে পেশ হওয়া নতুন মাইনিং বিল ক্লিয়ার করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সদস্য। চন্দ্রপাল সিং যাদব কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্টিলাইজার সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। আবার তিনিই একটি ফার্টিলাইজার কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন। ডি আর মেঘে, পি বি কোরে, এম এ এম রামস্বামী সকলেই প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের পরিচালক। প্রত্যেকেই এমপি। আর তাঁরাই ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রক সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। এই তালিকা শেষ হবে না। সুতরাং বিজয় মালিয়া যে একদিকে কিং ফিশার এয়ারলাইন্সের মালিক এবং লাগাতার ব্যাংক থেকে লোন পেয়ে গেলেন, আবার তিনিই পার্লামেন্টের বিমান পরিবহণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য-এর মধ্যে কোনো বিস্ময় নেই। এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেল। এখানেই শেষ নয়। বিজয় মালিয়া দ্বিতীয় বারের জন্য রাজ্যসভায় এমপি হওয়ার পর ২০১২ সালে তিনি হয়েছিলেন পার্লামেন্টের কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্টিলাইজার মন্ত্রকসংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। অথচ তিনিই ম্যাঙ্গালোর কেমিকেলস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার

নামক বিপুল লাভদায়ক একটি সংস্থার চেয়ারম্যান। যে সংস্থা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি সার উৎপাদন করে। মালিয়া গ্রুপের শেয়ারের পরিমাণ ৩০ শতাংশ।

একটা সময় পর্যন্ত বিজয় মালিয়ার সবথেকে বড় বাণিজ্যিক প্রতিপক্ষের নাম ছিল মনু ছাবরিয়া। কলকাতার বিজনেস ম্যাগনেট। মালিয়ার ইউনাইটেড ব্রুয়ারিজের পাশাপাশি ওই শ ওয়ালেশের তৈরি বিয়ারের চাহিদা আকাশছোঁয়া ছিল। মনু ছাবরিয়ার আচমকা মৃত্যু হল। এবং তারপরই মাত্র ১৩০০ কোটি টাকার একটি ডিলে শ ওয়ালেস কিনে নিলেন বিজয় মালিয়া। সেই যৌথ সংস্থাকে মালিয়া দেশের মধ্যে শীর্ষে নিয়ে গেলেন ব্রিটিশ বিয়ার কোম্পানি স্কটিশ অ্যান্ড নিউক্যাসলের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে। কারণ ওই সংস্থা ৯৪০ কোটি টাকা দিয়ে মালিয়ার থেকে ৩৭ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছিল। এরপর মালিয়া চাইলেন আকাশ কিনতে। অর্থাৎ একটি নিজের এয়ারলাইন্স। কিং ফিশার। ব্যাংকের লোন চাই। প্রথম প্রস্তাব গেল আইডিবিআই কমিটির লোন স্যাংশন কমিটির কাছে। কিন্তু আইডিবিআই ব্যাংক রাজি নয়। কারণ এই কোম্পানির সঙ্গে ডিল করতে আর রাজি নয় তারা। কারণ ম্যাঙ্গালোর কেমিকেলস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং লোন অনুমোদন হবে না।

কিন্তু কিছু বছর পর আচমকা দেখা গেল পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। কেন কে জানে সেই আইডিবিআই কিং ফিশারকে ৯০০ কোটি টাকা লোন দিতে রাজি হয়ে গেল। অথচ তখন থেকেই এই এয়ারলাইন্স সেক্টরে লোকসান ঢুকেছে। সেই সময় বিশ্বজুড়ে চলছে মন্দা। তার ঠিক আগেই মালিয়া ৫৫০ কোটি টাকা দিয়ে এয়ার ডেকান কিনে নিয়েছেন। অথচ লাভ হচ্ছে না। ২০০৮ সালের মার্চে দেখা গেল কিং ফিশারের ক্ষতির ঋণের পরিমাণ ৯৪০ কোটি টাকা। পরের বছর? ৫৬৬৫ কোটি টাকা ঋণ। বার্ষিক লোকসান ২০০৭ সালে ছিল ১৮৮ কোটি টাকা। সেটা পরবর্তী বছরে হয়ে গেল ১৬০৮ কোটি টাকা। সেই লোন যখন ৭ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করছে তখন সরকার এগিয়ে এসেছিল তাঁকে বাঁচাতে। স্টেট ব্যাংকের নেতৃত্বে ব্যাংকারদের একটি কমিটি একজোট হয়ে মালিয়াকে ১৩৫৫ কোটি টাকার ঋণকে ইক্যুইটিতে পরিণত করে দিল। সেটাও আবার ৬১ শতাংশ প্রিমিয়ামে। কিন্তু

যাঁর জন্য এতকিছু করা হচ্ছে তিনি কী করছেন? তিনি তখনও ফরমুলা ওয়ান রেসিং টিম চালাচ্ছেন। আইপিএল চালাচ্ছেন। ফুটবল টিম চালাচ্ছেন। এবং কিং ফিশার ক্যালেন্ডার তৈরির জন্য ইওরোপের দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যাচ্ছেন মডেলদের। সাধারণ এয়ারহোস্টেসরা নয়, তাঁর এয়ারলাইন্সে সিকিউরিটি ফিচারস টেক অফের আগে যাত্রীদের দেখানোর জন্য ভিডিও রেকর্ডিংয়ে চুক্তি করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক মডেল আর ফিল্মস্টার ইয়ানা গুপ্তার সঙ্গে। কিং ফিশারে সোজা কথায় ইয়ানা গুপ্তার মতো ভারচুয়াল এয়ারহোস্টেজ কাজ করতেন। সবথেকে বেশি লোন দিয়েছে এসবিআই। ১৬০০ কোটি টাকা। সবথেকে কম ৫০ কোটি টাকা। অ্যাক্সিস ব্যাংক। মোট ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। আইডিবিআই, পিএনবি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাংক অফ বরোদা, সেন্ট্রাল ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক.....।

২০১০ সালে যখন বিজয় মালিয়া একপয়সাও আগের ঋণ পরিশোধ না করে আবার লোন চাইলেন তখন কমিটি অফ লেন্ডারসের মধ্যে তীব্র মতান্তর ছিল। একদলের বক্তব্য ছিল আর কেন ঋণ দেওয়া হবে? পাবলিকের টাকা। আয়করদাতার টাকা। এভাবে শিল্পপতিদের কেন উদারহস্তে বিলিয়ে দেওয়া হবে? কিন্তু কোনো এক জাদুবলে ওসব মতান্তর হাওয়ায় উড়ে যায়। দেখা যায় মালিয়া আবার লোন পাচ্ছেন। ২০১২ সালের মার্চ থেকে বিজয় মালিয়া সুকৌশলে প্ল্যান করছিলেন কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়। সবটাই হচ্ছিল সরকারের বিরোধীদের চোখের সামনে। তিনি কিং ফিশারের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট কমিয়ে আনলেন। ডোমেস্টিক ফ্লাইট কমানো শুরু হল প্রবলভাবে। কর্মীরা মাইনে পাচ্ছেন না। ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে গেল।

২০১৫ সালে মুম্বই ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড তাদের হ্যাঙ্গারে থাকা মালিয়ার প্রাইভেট জেট (ভিটি ভি জে এম) বিক্রি করে দিল বকেয়া কিছু পাওয়ার আদায়ের আশায়। কত টাকায় বিক্রি হল একটি আস্ত প্রাইভেট এয়ারক্র্যাফট? মাত্র ২২ লক্ষ টাকায়। ২০১৬ সালের ২ মার্চ বিজয় মালিয়া ভারত ছেড়ে লন্ডনে পালালেন। কীসের জোরে? ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের জোরে। সেটি কারা পায়? এমপি মন্ত্রীরা। সুতরাং

২০০২ সালে বিজয় মালিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রাজ্যসভার এমপি হতে হবে। ১৪ বছর পর সেই সিদ্ধান্ত তাঁকে রক্ষা করল। তিনি পালালেন এমপি হিসাবে পাওয়া ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের সাহায্যে! তার আগে ভারতীয় ব্যাংকে থাকা সিংহভাগ টাকা ও সম্পদ বিদেশের ব্যাংকে তাঁর ট্রান্সফার করা হয়ে গিয়েছে। এবং শিফট করার আগে লন্ডনের অভিজাত এলাকায় বাংলো কিনে রেখেছেন। সেই বাংলোর নাম 'লেডি ওয়াক'! দাম ৪৫ কোটি টাকা! নিজের টাকায় নয়। ভারতীয় ব্যাংকের টাকা। অর্থাৎ? ব্যাংকে কষ্টার্জিত আমাদের জমানো টাকা!!

২০

শেষ যে ট্যুইটগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেখানে তিনি লিখেছিলেন, কেএমএস থেকে এত নানারকম ইস্যু ডায়াগনোসিস হয়েছে যে, কেই বা বলতে পারবে আমি আর কতদিন আছি....হয়তো চলে যেতে হবে ...হাসতে হুয়ে যায়েঙ্গে...। তাঁর চিকিৎসা চলছিল কেরালা ইনিস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে (কে এম এস)। দেওয়া হয়েছিল সাতদিনের মেডিসিন কোর্স। কোন কোন বিভাগে তাঁর অনেকরকম পরীক্ষা, স্ক্যান, এমআরআই হয়েছিল? কার্ডিওলজি, ইএনটি, গ্যাসট্রোএনটোলজি, ডেন্টাল এবং রিউমেটোলজি। প্রাথমিকভাবে যে রোগটি সবথেকে বেশি ভোগাচ্ছিল তার নাম লুপুস। এমন একটি ক্রনিক অটোইমিউন রোগ যা দেহের যে কোনো অঙ্গকেই ড্যামেজ করতে পারে। তাই তিনি ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত নিরাশ আর বিষাদগ্রস্ত। বস্তুত যাতে তিনি স্থায়ী ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে না যান, তা ঠেকাতে হালকা ডোজের অ্যান্টিডিপ্রেশেন্ট ড্রাগও দেওয়া হয়। সুতরাং মানসিক ও শারীরিকভাবে ভালো ছিলেন না সুনন্দা পুষ্কর।

দিল্লির সরকারি বাসভবনে কাজ হচ্ছে। কিছু মেরামতি আর সংস্কারের কাজ। কয়েকদিন সময় লাগবে। তাই ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে চাণক্যপুরীর অভিজাত হোটেল লীলা প্যালেসে স্যুইট নম্বর ৩৪৫ এ এসে উঠেছিলেন সুনন্দা পুষ্কর। ঠিক দুপুর সাড়ে তিনটের সময় সুনন্দা পুষ্করকে দেখা গেল হোটেলের লবিতে। মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। বসছেন না লাউঞ্জ সোফায়। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে...। হোটেল রুমে তিনি একা ছিলেন কারণ সেদিন ভোরে তাঁর স্বামী বেরিয়ে গিয়েছেন। তিনি সারাদিন তালকাটোরা স্টেডিয়ামে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন চলছে। সুনন্দার স্বামীর নাম শশী থারুর। কংগ্রেসের এমপি। এই স্বামী স্ত্রী ছিলেন রাজনীতি এবং কর্পোরেটের অন্যতম সেলেব্রিটি দম্পতি। দুজনেই সোস্যালাইট। এবং শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তাঁরা জনপ্রিয়। তাঁদের নিয়ে আগ্রহ, কৌতুহল অন্তহীন। সুনন্দা পুষ্কর নামের এক মহিলা আচমকা কেন ভারতীয় রাজনীতি, ক্রিকেট আর বিতর্কে মাসের পর মাস জায়গা করে নিলেন? কীভাবে? সেটা জানার জন্য সামান্য পিছনে তাকাতে হবে।

কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারের কন্যা সুনন্দার বাবা ছিলেন লেফটেনান্ট কর্নেল পুষ্কর নাথ দাস। ১৯৮৪ সালের এক বসন্ত দিন। ২২ বছরের পিংকি গ্র্যাজুয়েশনের পর স্বাধীন অর্থনৈতিক জীবন শুরু করবেন বলে জানালেন বাবাকে। সেইমতো শ্রীনগরের একটি হোটেলে চাকরিও নিলেন। সেন্টুর লেক ভিউ হোটেল। ফ্রন্ট ডেস্কে কাজ। ঠিক এক মাস আগে সেই হোটেলে ম্যানেজার হিসেবে এসেছিলেন একটি যুবক। সেও কাশ্মীরি। ধবধবে ফর্সা। সুদর্শন। চওড়া গোঁফ। নাম সঞ্জয় রায়না। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। পিংকির সবথেকে প্রিয় পোশাক ছিল অলিভ গ্রিন রঙের চুড়িদার আর রাস্ট কালারের কুর্তা। মন ভালো থাকলে ওই রঙের পোশাক পরে আসতেন। হোটেলের যুবক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আর সদ্য কাজে যোগ দেওয়া এই ফ্রন্ট ডেস্ক হোস্টেসের মধ্যে মাঝেমধ্যেই চোখে চোখে যুগলবন্দি হতে থাকল। মৃদু চাউনি। চাপা হাসি। একে অন্যকে কাজে অযাচিত সাহায্য করা। যেমন সিনেমায় হয়। যেমন বাস্তবে হয়। সঞ্জয় একদিন কাজ সেরে বাইক নিয়ে বেরোলেন হোটেল থেকে। বাড়ি ফিরছেন। একটু এগোতেই বাস স্টপেজ। সেখানে দাঁড়িয়ে পিংকি। সুনন্দা পুষ্কর। চলো তোমায় পৌঁছে দিই।

কোথায়?

কেন তোমার বাড়ি?

আমি তো এখন বাড়ি যাব না!

মানে? কোথায় যাবে?

আমি ডাল লেকের কাছে যাব। শিকারায় চড়ব।

একা?

হ্যাঁ..একাই তো..আর কে আছে!

আমি যদি সঙ্গে যাই?

চলো..ভালোই তো হবে..

সেই শুরু ২২ বছরের সুনন্দা পুষ্কর এরকমই। প্রথম থেকেই স্বচ্ছ। কোনো ভনিতা নেই। এবং সেই প্রথম শিকারা সফরে সুনন্দা সঞ্জয়কে বলেছিলেন, গান গাইতে পারো। একটা গান শোনাও তো..। সঞ্জয় শোনালেন। এরপর থেকে এই রুটিন মাঝেমধ্যেই ঘটতে শুরু হল। হয় ডাল লেকে শিকারা। নয়তো এয়ারফোর্স মেসে কফি। খুব শীঘ্রই গোটা ব্যাপারটা কর্নেল সাহেবের কানে যেতে দেরি হল না। এমনিতে শ্রীনগর ছোট শহর। আর মিলিটারি অফিসারের পরিবারের সামাজিক পরিচিতি আরও বেশি। সুতরাং অনেকেরই চোখে পড়েছিল এই মেলামেশা। স্বাভাবিক নিয়মে একদিন কর্নেল দাস ডেকে পাঠালেন মেয়েকে। পিংকিকে বললেন, আমি ছেলেটিকে দেখতে চাই। এবং সেটা শুনে সঞ্জয় রায়নার প্রায় হাঁটু কাঁপছে। কারণ কর্নেল দাস প্রচণ্ড রাগী মানুষ। হয়তো সামনে গেলেই ফায়ারিং স্কোয়াড। আজ যাব, কাল যাব বলে সঞ্জয় আসলে এড়িয়ে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। একটা সময় যেতেই হল পিংকির ধমকে। এরপর যদি তুমি না যাও তাহলে কিন্তু আমাকে হারাবে। এটা শুনে আর দেরি করা যায় না। কর্নেল দাস বহুক্ষণ ধরে পাত্রটিকে যাচাই করলেন। এবং অবশেষে হ্যাঁ বললেন, তবে একটাই শর্ত। এই হোটেলের চাকরিতে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। একটা কিছু বড় ভাবতে হবে। দরকার হলে দিল্লি যাও। ১৯৮৫ সালে সুনন্দা আর সঞ্জয়ের এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। কিছুদিন পর বিয়ে হবে।

সুনন্দার খুব ইচ্ছে নিজে একটা কিছু শুরু করবে। তার সব থেকে আগ্রহের বিষয় হল ফ্যাশন। সঞ্জয় রাজি। তবে সেটা তো আর শ্রীনগরে বা জম্মুতে সম্ভব নয়। সেখানে তখনও এই কনসেপ্টই ছিল না যে এটা একটা পেশা হতে পারে। দিল্লিতে সুনন্দার কাকার বাড়ি। সুতরাং থাকার সমস্যা নেই। নিয়ে এলেন সঞ্জয়ই। ১৯৮৫ সালে ফ্যাশন ডিজাইনারের কোর্স কটা মেয়ে করতে যেতেন? কটাই বা ইনস্টিটিউট ছিল? হাতেগোনা। তার মধ্যেই সাউথ দিল্লির সাউথ এক্সটেনশনে একটি সংস্থা পাওয়া গেল। সেখানে ভর্তি হয়ে গেলেন সুনন্দা। আর সঞ্জয় ফিরে গেলেন। ৮ মাস পর সমাপ্ত হল সেই কোর্স। সুনন্দা ফিরলেন শ্রীনগর। এবং এরপর বিয়ে। সঞ্জয়ের ততদিনে প্রমোশন হয়েছে । এখন ম্যানেজার। তবে একটি নতুন চাকরির অফার এসেছে। হোটেলেই। দিল্লিতে। সুতরাং সবদিক থেকেই সুসংবাদ। কারণ সুনন্দাও একটি ডিজাইনার শপ খুলতে চায়। দুজনের

নতুন সংসার হবে দিল্লিতে। কর্নেল দাসের পারিবারিক বাড়ি সোপোরে। সেখানেই বিবাহের আয়োজন। যাকে বলা যেতে পারে পারফেক্ট সামার ওয়েডিং। খুব ধুমধাম হল। সুনন্দা ঠিক কেমন মানসিকতার ছিলেন? তাঁর একটি দুটি সিদ্ধান্তেই সেটা বোঝা যায়। সঞ্জয় আর সুনন্দা মাঝেমধ্যেই চলে যেতেন হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেরাদুনে। একবার হৃষীকেশে গিয়েছেন তাঁরা। হোটেলের ব্যালকনিতে বসে আছেন। স্নান করে বেরোচ্ছেন সঞ্জয়। একটু পর লাঞ্চ। হঠাৎ সুনন্দা বললেন, আমার ব্যানানা স্প্লিট খেতে ইচ্ছে করছে। এ আর এমন কী ব্যাপার? অর্ডার করলেই হয়! সঞ্জয় বলছেন। কিন্তু না। সুনন্দা এখানে খেতে চান না। তাঁর তখনই ইচ্ছা দিল্লির ওবেরয়ের ফ্রুট কাউন্টার থেকে খাবেন। সঞ্জয় জানেন এরকম মুডের কথা। অতএব তক্ষুনি গাড়িতে বসা হল। এবং সোজা দিল্লি। অন্তত সাত ঘণ্টার ড্রাইভ। ঠিক ওবেরয়ে এসে ব্যানানা স্প্লিট খেয়ে আবার গাড়িতে ওঠা। এবং সোজা ড্রাইভ করে ফের হৃষীকেশের সেই হোটেল। মধ্যরাত। ওটাই ছিলেন সুনন্দা। ইমপালসিভ। সারপ্রাইজে পূর্ণ। আর সর্বদাই ফাস্ট লাইফের প্রতি আচ্ছন্ন! কিন্তু এই বিয়ে টিকল না। সুনন্দা বিখ্যাত হতে চান। তিনি তাঁর ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক অনেক বড় আকারে দেখতে চান। আর এখানেই বিরোধ। প্রথমে তর্কাতর্কি। তারপর সংঘাত। এবং অবশেষে আর একসাথে থাকা চলে না। বিচ্ছেদ। পুষ্কর পরিবারটির বিচ্ছেদপর্বও তখন থেকেই শুরু। কারণ ১৯৮৯ সালে পারিবারিক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল কাশ্মীরি উগ্রপন্থীরা। বাকি দলে দলে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো কর্নেল পুষ্করনাথ দাসের পরিবারও উঠে আসতে বাধ্য হলেন দেশ-ঘর-মাটি-সংস্কৃতি ছেড়ে। দিল্লিতে। এবং সুনন্দাও সেই থেকে মানসিকভাবে ছিন্নমূল হতে শুরু করলেন।

ব্যবসায়িক ফার্মকে সম্প্রসারিত করতে সুনন্দা চলে গেলেন দুবাই। তাঁর প্রথম সংস্থার নাম এক্সপ্রেশনস। মূলত এই সংস্থার কাজ হল ফ্যাশন শো আর বিভিন্ন কর্পোরেট ইভেন্ট আয়োজন করা। আর সেখানে তাঁর সঙ্গে যাঁর পরিচয় হল তাঁর নাম সুজিত মেনন। সুনন্দার ফার্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন সেই ব্যক্তি। তাঁর উপর অনেকটাই নির্ভরশীল সুনন্দা। তাহলে তিনি যখন প্রপোজ করলেন কীভাবে আর প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব? সেই শক্তি ছিল না। অতএব বিবাহ হল। ১৯৯১ সালে। জন্ম হল সুনন্দার প্রথম

সন্তানের। শিব মেনন। যাকে বলা যেতে পারে হ্যাপি ফ্যামিলি। দিন কাটছে । দুবাই আর দিল্লির মধ্যে। সুখী সুনন্দা ততদিনে জুয়েলারি এক্সপোর্টেও যুক্ত হয়েছেন। মূল সংস্থাটির দেখভাল করছেন স্বামী। আর সুনন্দা আরও আর্থিক সচ্ছলতার জন্য একটি অ্যাড এজেন্সিতে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসাবে যোগ দিলেন। তাঁর বহুদিনের শখ বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে একবার অন্তত পরিচিত হওয়া। ছবি তোলা। সেই শখও মিটল। কারণ তখন প্রায় সকল সেলেব্রিটি দুবাই যেতেন নিয়ম করে। ফাংশন হত। ক্রিকেট ছিল শারজায়। নতুন সংস্থার নাম বোজেল প্রাইম অ্যাডভার্টাইজিং। সৌদি দুনিয়ায় তাদের ব্র্যান্ডনেম মোটামুটি বেশ খ্যাতনামা। সুজিত মেনন দিল্লিতে এলেন একদিন। ১৯৯৭ সাল। এখানে একটি অফিস আছে। করোল বাগে। আজমল খান মার্কেট থেকে বেরিয়ে সোজা বাঁদিকে টার্ন দিতে হবে। গাড়ি চালাচ্ছেন সুজিত। একবার ঝান্ডেওয়ালায় একটা কাজ আছে। লোনের ব্যাপার। মন ভালো নেই সুজিত মেননের। কারণ সবেমাত্র একটা ইভেন্ট আয়োজন করতে গিয়ে অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। কেরলের সুপারস্টার মামুঠি নাইট করার কথা ছিল। সেটার আয়োজক ছিলেন তাঁরা দুজনে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। টিকিটের চাহিদা নেই। টেনশন বাড়ছে। অথচ যেদিন শো, সেদিন দেখা গেল গোটা অডিটোরিয়াম পূর্ণ। একটিও সিট ফাঁকা নেই। মালায়ালিদের ভিড়ে ঠাসা। অথচ টিকিট বিক্রি হয়নি। এটা কীভাবে হয়? জানা গেল আসল কারণ। আগে থেকেই কেউ জাল টিকিট তৈরি করে হুবহু এই সংস্থার লেটারহেড নকল করে সব টাকা তুলে নিয়েছে। আর সিংহভাগ মানুষই সেদিন শো দেখেছিলেন ওই জাল টিকিট নিয়ে। ফলে একদিকে যেমন হয়েছিল বিপুল লোকসান। আবার অন্যদিকে তুমুল বদনাম। কারণ যাঁরা সত্যিকারের টিকিট কেটে সেই শো দেখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু দর্শক সিটই পেলেন না। আগেই তো জাল টিকিটের লোক এসে বসে আছে। ফলে আপাতত এক বছর যে কোনো শো আয়োজন থেকে ব্যান করা হল। অন্যমনস্ক ছিলেন সুজিত। আচমকা একটা উলটোদিক থেকে আসা গাড়ি ধাক্কা মারল। করোল বাগের রাস্তায় সুজিত মেনন মারা গেলেন। সুনন্দা পুষ্কর সেই সময় অনেক দূরে দুবাইয়ের একটি হোটেলে একটি

বিজনেস মিটিং এ। লোকসান হয়েছে ২২ লক্ষ টাকা। তাই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন একটা কোনো ইভেন্টের বরাত পাওয়ার জন্য।

স্বামীর মৃত্যু কিছুদিন স্তব্ধ করে দিল সুনন্দাকে। তাঁর দুবাইতে আর থাকা হবে না। এই বিপুল লিভিং কস্ট সামলানো কি সম্ভব একা? যদিও একটা ভালো চাকরি করেন। কিন্তু কীভাবে সম্ভব চাকরি আর সন্তান পালন একসাথে? কেউ তো নেই! চার বছরের ছেলেকে তাই ননদের বাড়িতে রেখে এলেন দিল্লিতে। বললেন কিছুদিন চাকরিটা সামলে নিই। নিজের একটা কিছু সংস্থান না করলে ছেলেকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। ছেলে বড় হতে লাগল দূরে। কিন্তু সুনন্দা খবর পেলেন ছেলে সুস্থ নয়। কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার আছে। মা ছাড়া আর কে পারবে এই সময় তাকে সঙ্গ দিয়ে সুস্থতার দিকে নিয়ে যেতে? তাই সুনন্দা নিয়ে গেলেন আবার ছেলেকে দুবাই। এবার আর চাকরি করা সম্ভব নয়। নিজের জুয়েলারি ব্যবসা চালু করলেন তিনি। নাম দেওয়া হল র‍্যাভিসেন্ট ট্রেডিং। শুধু নিজের সংসার চালানো নয়। ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফি দিতে হয় তাঁকে। কিন্তু এতকিছু সামলানো যাচ্ছে না। কারণ যত দিন যাচ্ছে ততই ওই ব্যবসাটি সম্প্রসারিত হচ্ছে সর্বত্র। আজকাল সকলেই মিডল ইস্টে প্রথম যে ব্যবসাটি শুরু করে সেটি হল জুয়েলারি। এর অন্য কারণও আছে। হাওলার কারবার। জুয়েলারি হল সবথেকে সহজ রাস্তা । তাই সুনন্দার প্রয়োজন মিটল না। তাহলে উপায়? ছেলে শিব মেননের উন্নতমানের একটি স্পিচ থেরাপি চাই। সেটা সবথেকে ভালো হয় যদি বিদেশে করা যায়। সুনন্দার কয়েকজন বন্ধু থাকে কানাডায়। কাশ্মীরের বন্ধু। তাঁরাই প্রস্তাব দিল এখানে চলে এসো। কানাডায় এসেই যথাসর্বস্ব দিয়ে একটা শেষ চেষ্টা শুরু। সেটি হল একটি আই টি ফার্মের পার্টনার হওয়া। ভ্যালি রিসোর্স। সান ফ্রান্সিসকোতে থাকা এক বন্ধু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী বেশ ভালোই চলছিল। এদিকে কানাডা হেলথকেয়ারের মাধ্যমে ছেলের স্পিচ থেরাপিও বেশ কার্যকরী হচ্ছে। ভালো হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখাচ্ছে শিব। এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে। সুনন্দা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এসেছিলেন। এবং কিছু বছর পর পেয়ে গেলেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তকমা। কিন্তু সুনন্দা পুষ্করের ভাগ্য তাঁকে কখনও থিতু হতে দেয়নি। সবই যখন ঠিকঠাক চলছে তখন সম্পূর্ণ অন্য এক প্রান্ত থেকে আঘাত এল।

ওসামা বিন লাদেন নামে এক সন্ত্রাসবাদী নিউইয়র্কে এমন এক আক্রমণ করল যে তার জেরে আমেরিকা মানসিকভাবে সবথেকে বড় ধাক্কা খেল শুধু তাই নয়, ৬ মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে গেল। আর সবথেকে বড় আঘাত ইনফরমেশন টেকনোলজিতে। যার প্রত্যাশিত প্রভাব এসে পড়ল কানাডায়। কারণ কানাডার আইটি ফার্মগুলি নির্ভরই করে থাকে আমেরিকার ব্যবসার উপর অতএব সুনন্দার জীবনে আবার নেমে এল অনিশ্চয়তার আঁধার। কেমন চলছিল ব্যবসা? যথেষ্ট ভালো। নিজের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট আর একটা বি এম ডব্লু কেনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আবার ছিন্নমূল হতে হল। এবার কোথায়? যে শহর তিনি সবথেকে বেশি চেনেন। সেই দুবাই। এবং অবশেষে...। অবশেষে সাফল্য এসে দেখা দিল স্থায়ীভাবে। বেস্ট হোমস নামের একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রথমে। এরপর টেকম ইনভেস্টমেন্টস। এই সংস্থাটি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া জোনের সঙ্গে যুক্ত। আর তারপর তিনি মুখোমুখি হলেন এমন একটি সেক্টরের সঙ্গে যে ইন্ডাস্ট্রি ভারত, দুবাই, পাকিস্তানে সবথেকে গ্ল্যামারাস এবং আর্থিক লেনদেনের মেলবন্ধন। সেই বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, ফ্যাশন দুনিয়া ওই জগতের কাছে নগণ্য। অন্তত প্রভাব, প্রতিপত্তি, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়। ওই সেক্টরটিকে ভরকেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে এগিয়ে গেলেন সুনন্দা পুষ্কর। আর সেভাবেই তাঁর স্বপ্নের শহরে সুনন্দা পুষ্কর পেলেন তিনটি বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা।

১) খ্যাতি

২) আর্থিক প্রতিষ্ঠা

৩) মনের মানুষ।

কী সেই সেক্টর যা এত শক্তিশালী? ক্রিকেট!

কৈলাশনাথ কাটজু কখনও ছিলেন ওড়িশার রাজ্যপাল। কখনও হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। কখনও ছিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। কখনও ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। একইসঙ্গে ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা ও সফল এক আইনজীবী। ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। বহুবার জেলে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ আমলে। তাঁর নাতনি

কলকাতার লরেটো হাউসের এক অত্যন্ত কৃতী ছাত্রী। উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং মেধাবী। মেয়েটির পিতা ও মাতা ছিলেন বাঙালি এবং কাশ্মীরি পরিবারের। নাম তিলোত্তমা মুখার্জি। সেই তিলোত্তমা মুখার্জির সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল কেরলের ছেলে শশী থারুরের। যাকে বলা যায় আদর্শ দম্পতি। কারণ দুজনেই মেধাবী এবং উজ্জ্বল কেরিয়ার গ্রাফ। যথাসময়ে তাঁদের যমজ পুত্র হয়েছিল। কনিষ্ক এবং ইশান। এঁদের পিতা ও মাতার বংশে প্রায় সকলেই লেখক, সাহিত্যিক। সুতরাং সেই ট্রাডিশন বজায় রেখেই এই দুই যমজ ভাইও আজ নিজেদের পেশার পাশাপাশি লেখকও। দুজনেই সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছেছেন। কখনও ওয়াশিংটন পোস্ট কখনও ওপেন ডেমোক্রেসি, কখনও টাইম ম্যাগাজিনে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে চলেছেন। একটা সময় পরে ব্যক্তিগত কারণে তিলোত্তমা মুখার্জি এবং শশী থারুরের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল। এবং তাঁদের পথ চলার রাস্তাও পৃথক হয়ে যায়। তিলোত্তমা মুখার্জি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। এবং একই সঙ্গে তিনি সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। বিচ্ছেদ সত্ত্বেও সম্পর্ক কখনও তিক্ত হয়নি।

২০০৭ সালে থারুর বিবাহ করেছিলেন রাষ্ট্রসংঘের ডিপার্টমেন্ট অফ কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি ক্রিস্টা গেইলজকে। কিন্তু তারপরই থারুর আরও বেশি করে ভারতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হতে চাইলেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিলেন নিজেকে। তাঁর মতো একজন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রসংঘের বিশ্লেষককে দলে পেয়ে কংগ্রেসও লাভবান হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক কেরিয়ার থেকে সরে এসে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করবেন শশী এটা ক্রিস্টার পছন্দ হয়নি। এটা নিয়ে দুজনের মধ্যে অনেক আলোচনাও হল। টানাপোড়েন চলল। তাহলে কী সম্পর্ক ভাঙনের মুখে? শেষবার সম্পর্কটিকে টিকিয়ে রাখা যায় কিনা তার প্রাণপণ প্রয়াস করেছেন দুজনেই। সেই লক্ষ্যে রাজস্থানের উদয়পুরে এসে থাকলেন আর এক বার শেষ চেষ্টার লক্ষ্যে। কিন্তু সেরকম লাভ হয়নি। দ্বিতীয় বিবাহও স্থিত হল না।

দুবাইয়ে সবথেকে ধনীদের ঠিকানা হল এমিরেটস হিলস। বেনজির ভুট্টোর পুত্রকন্যাদের বাড়িও যেমন সেখানে, আবার ব্রিটেনের রয়্যাল ফ্যামিলির অ্যাপার্টমেন্টও আছে। ২০০৯ সালের জুন মাসে মালয়ালি ব্যবসায়ী সানি ভারকে একটি পার্টি থ্রো করলেন। উপলক্ষ্য ভারতীয় রাজনীতিক কেরলের গর্ব শশী থারুরের দুবাই আগমন। সবেমাত্র থারুর তখন হয়েছেন ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানেই প্রথম দেখা সুনন্দা পুষ্করের সঙ্গে শশী থারুরের। ঠিক পাঁচ মাস পর সুনন্দাকে দেখা গিয়েছিল মাসকাটে। ওমানের রাজধানীতে। তাঁর বিজনেসের কাজে। আর গিয়েই দেখলেন যে হোটেলে তিনি উঠেছেন সেখানেই সরকারি কাজে এসে রয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শশী থারুর। এবং সেই শুরু। তাঁদের দুজনের কাছে আসা নিয়ে শুরু হয় অন্তহীন জল্পনা। বিজেপির এক মুখপাত্র সেই সময় বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন কংগ্রেস তো বিদেশমন্ত্রককে মিনিস্ট্রি অফ লাভ অ্যাফেয়ার্সে পরিণত করেছে। এসব উপেক্ষা করে বিয়ে হয়ে গেল তাঁদের। দুজনেরই এর আগে দুবার বিবাহ হয়েছে। দুজনেরই রয়েছে সন্তান। এবং গোটা বিবাহপর্বটি বস্তুত ফেয়ারি টেইলসের মতোই যেন হয়েছিল। প্রতিটি ফেয়ারি টেইলে একজন রাক্ষস আসে। যে রাজকন্যা রাজপুত্রের সুখের দিনে অন্ধকার আনে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। আধুনিক যুগের সেই নয়া অন্ধকারের নাম আইপিএল। সুনন্দা ও শশী থারুর যখনই আইপিএল নামক গ্ল্যামার জগতে পা রাখলেন, সেটাই যেন হয়েছিল এই সুখসফরের শেষের শুরু।

ললিত মোদি ট্যুইট করে গোটা দুনিয়াকে প্রথম জানালেন কোচি টাস্কার নামক নয়া আইপিএল টিমের পিছনে আসল মেন্টর শশী থারুর। যদিও সেটা কোনো গোপন তথ্যই নয়। সকলেই জানে। ললিত মোদি তার সঙ্গে যোগ করলেন কোচি টাস্কারের ৪.৯ শতাংশ সোয়েট ইক্যুইটি আসল সুনন্দা পুষ্করের নামে। যার মূল্য নাকি ৭০ কোটি টাকা। যদিও সেই অঙ্ক প্রমাণ করা যায়নি। তৎক্ষণাৎ সুনন্দা পুষ্কর এবং শশী থারুর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। রাজনৈতিক ঝড় ওঠে। কেন শশী থারুরের উপর রাগ ললিত মোদির? তাঁরা তো বন্ধু ছিলেন! কারণ একটাই। সেই সময় তিনটি দল আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে আগ্রহী ছিল। সুব্রত রায়ের সাহারা, সইফ আলি খান আর করিনা কাপুরের পুণে টিম এবং আমেদাবাদের জন্য আদানি গ্রুপ। সাহারা প্রথমেই ৩৭ কোটি ডলারের বিপুল অঙ্ক

হেঁকে সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিল। পুণে প্রথম ধাক্কায় সরে গেল। রইল বাকি দুজন। কোচি টাস্কার এবং আদানির আমেদাবাদ টিম। এই সময় ললিত মোদি চাইছিলেন বাকি থাকা একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি যেন পায় আমেদাবাদ। কারণ রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে তিনি পদচ্যুত তখন। মরিয়া হয়ে তিনি একটি কোনো ক্রিকেট বডি চাইছিলেন যেখানে নিজেকে যুক্ত করবেন। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমেদাবাদ টিমের জন্য আদানিকে সহায়তা করতে চাইছিলেন। আর সেই লক্ষ্যপূরণে তাঁর সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় কোচি টাস্কার। যার পিছনে শশী থারুর। এবং শত প্ররোচনা বা চাপেও পিছু না হটে কোচি টাস্কার ১৫০০ কোটি টাকার দরপত্র হেঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজি আদায় করে নিল। আর ললিত মোদি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন। তারপরই তাঁর থারুরকে আক্রমণ ও বদনাম করার লাগাতার প্রবণতা শুরু হয়ে যায়। একের পর এক ট্যুইট। একের পর এক অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন থারুর। সুনন্দা পুষ্কর বলেছিলেন, যে ইক্যুইটি নিয়ে এত বিতর্ক ছড়াল আদতে তা ভারতের কয়েকজন ক্রিকেটারের হয়ে আমার কাছে রাখা হয়েছিল। কারা তারা? সেকথা তিনি কখনও জানাননি। তবে একটা কথা জানা হয়েছিল আইপিএলকে মাঝখানে রেখে ব্যবসা করে সহজে কোটি কোটি টাকা আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সকলেই। কর্পোরেট, ক্রিকেটার, রাজনীতিক সবাই। টাকা ও সময় খরচ হয়েছে শুধু একটি শ্রেণির। পাবলিকের।

১৭ জানুয়ারি ২০১৪। বিকেল সাড়ে চারটের সময় সুনন্দা পুষ্কর একটি প্রেস কনফারেন্স করবেন। প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায়। দিল্লির সংবাদমাধ্যমগুলিতে বেশ কৌতূহল আর আগ্রহের বাতাবরণ। কী হয় কী হয়! ততদিনে যেটা জানা হয়ে গিয়েছে সেটি হল পাকিস্তানের সাংবাদিক মেহের তারারের সঙ্গে শশী থারুরের কোনো বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে এই সন্দেহ দানা বেঁধেছে সুনন্দা পুষ্করের মধ্যেও। কিছুদিন ধরেই চলছে লাগাতার ট্যুইট যুদ্ধ। গোপনে শশী ও মেহর তারার দেখাসাক্ষাৎ করেন বলে জল্পনা। যদিও দুপক্ষই প্রবল অস্বীকার করেছেন। কিন্তু মিডিয়া চুপ করে নেই। তাঁরা যতকম অ্যাঙ্গেল সম্ভব সবই দেখাচ্ছে। সবটাই মিডিয়ার গুজব বলে অভিহিত করা হচ্ছে। তাহলে কি সুনন্দা নিজেই এবার প্রকাশ্যে মুখ খুলবেন? নাকি অন্য কোনো বিষয়ে সেই প্রেস কনফারেন্স? কতটা

ক্ষিপ্ত ও নিরাশ ছিলেন সুনন্দা? তিনি একটি ট্যুইটে মেহর তারারকে আইএসআই এজেন্টেও আখ্যা দিয়েছিলেন। সাড়ে চারটের অনেক আগে থেকেই প্রেস ক্লাবে ভিড় জমতে শুরু করেছে। পরে এলে জায়গা পাওয়া যাবে না। ক্যামেরা রাখার স্থানের সংকুলান। এই প্রেস কনফারেন্সের আইডিয়া কার? বিখ্যাত সাংবাদিক নলিনী সিংয়ের। তিনি ছিলেন সুনন্দার বন্ধু। অনেকদিন ধরেই। তাঁকে বিশ্বাস করে বলতেন অনেক কথা। চারটে বাজে। এখনও আসছেন না কেন সুনন্দা? নলিনী সিং ফোন করছেন? ফোন বেজে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। হোটেল রুমে আর কেউ নেই। একা সুনন্দা। শশী থারুর ভোর সাড়ে ৬ টায় বেরিয়ে গিয়েছেন। কারণ তালকাটোরা স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের সম্মেলন চলছে। সারাদিন সেখানেই তিনি। কী ব্যাপার? হোটেল লীলা প্যালেসে একবার কি যাওয়া দরকার? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মিডিয়া চলে যাচ্ছে। সুনন্দা যে অসুস্থ সেটা অবশ্য অনেকে জানেন তাই সকলকে বলা হল। এআইসিসি মিটিং সমাপ্ত হওয়ার পর শশী থারুর তাড়াতাড়ি বেরোলেন। একটি হোটেলে তাঁর বক্তৃতা ছিল। সেখান থেকে সোজা হোটেল। এবং রুমে ঢুকলেন। ডুপ্লিকেট কি দিয়ে। সুনন্দা বিছানায় শুয়ে আছেন। এগিয়ে গেলেন শশী। এই সন্ধ্যায় অসময়ে ঘুমাচ্ছেন কেন? কিন্তু সুনন্দা নিথর! চমকে গেলেন শশী। তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন প্রাইভেট সেক্রেটারি অভিনব কুমার। তাঁকে বললেন, এখনই ডাক্তারকে ডাকতে হবে। তিনি নিজেই পরিচিত ডাক্তারকে কল করলেন। ততক্ষণে হোটেলের ইন হাউস ডক্টর এসে গিয়েছেন। তিনি জানালেন সুনন্দা পুষ্কর মৃত! ঠিক সাড়ে তিনটের সময় লবিতে এসে ফোন কলের পর রুমে ফিরেছিলেন তিনি। খাবারের অর্ডার করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর রুম থেকে কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। তাহলে কি খাবার খাওয়ার পর? নাকি অনেক পর?

প্রথম বিতর্ক দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল ঠিক তিনদিন পর। ২০ জানুয়ারি দিল্লি পুলিশ ঘোষণা করল প্রাথমিক তদন্তের পর মনে হচ্ছে মার্ডারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না! সম্ভবত বিষপ্রয়োগে। কিন্তু কে খুন করবে তাঁকে? অজস্র সম্ভাবনা আর কাহিনির জটাজালে আচ্ছন্ন হল আকাশ বাতাস। ১০ অক্টোবর প্রকাশ করা হল সুনন্দার শরীরে ১২ টি ইনজুরি মার্কস পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট গুরুতর নয়। তবুও? কীভাবে হল

ওই আঘাতচিহ্নগুলো? তবে তার থেকে বড় রহস্য বেশ কয়েকটি সিরিঞ্জ ঢোকানোর চিহ্ন রয়েছে। যদিও সেগুলি হতেই পারে একের পর এক রক্তপরীক্ষার জেরে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট, ভিসেরা রিপোর্টের নানাবিধ সংশয় আরও বেশি রহস্যকে ঘনীভূত করে দিল। কারণ যারা মৃত্যুর পর অটোপসি রিপোর্টে লিখেছিলেন ড্রাগ ওভারডোজের কারণে মৃত্যু, তারাই কীভাবে বললেন বিষক্রিয়ায়? কী কী নমুনা পাওয়া গেল সুনন্দার শরীরে? যে বিষগুলি থাকে নেরিয়াম ওলেন্ডার, স্নেক ভেনোম, হেরোইন, পলোনিয়াম ২১০ এবং থালিয়ামের মধ্যে। তাহলে এর মধ্যে কোনটা ঢুকেছিল তাঁর শরীরে? সে সম্পর্কে তিন সদস্যের একটি কমিটি তাদের অটোপসি রিপোর্টে কিছুই বলল না। অর্থাৎ ধোঁয়াশা। জিইয়ে থাকল। এসব চক্রান্তে থিওরির পাশাপাশি সিম্পল অন্য যে অ্যাঙ্গেলটি মোটামুটি বিশ্বাস করা হচ্ছিল সেটি হল আত্মহত্যা করেছেন ওভারডোজ ওষুধ খেয়েই। যদিও প্রশ্ন হল আত্মহত্যা কেন করবেন? যিনি মাত্র কয়েকঘন্টা পর প্রেস কনফারেন্স করবেন বলে স্থির করেছেন তিনি আচমকা তো আর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আত্মহত্যা করার? ইতিমধ্যেই আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা করে শশী থারুরের নামে চার্জ এনেছে পুলিশ। থারুর বলেছেন, আমি শেষ পর্যন্ত লড়তে চাই। সুনন্দার মৃত্যু আমি চাইব এটা অবিশ্বাস্য! এই চার্জ রাজনৈতিক চক্রান্ত।

তাহলে আর কোনো পয়েন্টে কী তদন্ত এগোয় নি? এগিয়েছে। জানা গেল তিনজন বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে আসা ব্যক্তি দুবাই থেকে দিল্লি এসেছিলেন। ১৬ জানুয়ারি তাঁরা হোটেল লীলা প্যালেসে চেক ইন করেন। কারা তারা? তাদের নাম বিদেশমন্ত্রকের কাছে গিয়ে জমা দেওয়ার পর জানা যায় ওই নামে কোনো পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়নি। ঠিক সেদিনই হোটেল ছেড়ে তারা চলে যায়! কারা ছিল তাঁরা? সুনন্দা-মৃত্যু আজও এক রহস্য।

২১

মুম্বই থেকে দূরে কল্যাণের সর্বোদয় রেসিডেন্সির ইউনানি ডাক্তার ইজাজ বদরুদ্দিন মাজিদের ঘরে এই তো কিছুদিন আগেও ছিল বেশ খুশি খুশি পরিবেশ। ছেলে আরিব লুর্ডাস হাই স্কুল থেকে ৮৩ পার্সেন্ট নিয়ে পাশ করেছে। মুম্বইয়ের শহরতলি ভাসির ফাদার অ্যাঞ্জেল পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হয়েছিল এই তো সেদিন। দেখতে দেখতে কেমন সময় কেটে যায়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএ ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ৭৭ পার্সেন্ট পেল আরিব। যথেষ্ট ভালো। এখন পড়ছে এ ই কালসেকর ডিগ্রি কলেজে। সিভিলেই। ছোট ছেলেটাও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। আর দিদি একটি ভালো হাসপাতালের নার্স। পরিবারটির মধ্যে বেশ একটা শিক্ষার চল রয়েছে। তাছাড়া ডক্টর ইজাজ মাজিদের নামডাকও রয়েছে। জনপ্রিয়। এই খুশির হাওয়ার মধ্যেই কখন যেন অন্ধকার ঢুকছিল। কেউ বুঝতে পারেনি। একবার আরিব একটি সংগঠনের হাত ধরে মাথেরান গিয়েছিল। সেখানে তিনদিনের একটা ওয়ার্কশপ। ফিরে আসার পর কেমন একটা গম্ভীর। ওখানে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে? কারও সঙ্গে শেয়ার করে না আরিব। সবথেকে প্রিয় বোনের সঙ্গেও নয়। তবে বিশেষ আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল সে অনেক অভ্যাস পালটে ফেলছে। এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করতে আপত্তি। ওটা নাকি বিলাসিতা। খাটে নয়। মেঝেতে শুতে শুরু করল । এখানেই তো শেষ নয়। একদিন সকালে মায়ের সঙ্গে সাংঘাতিক ঝগড়া। আরিবের মা একটি বিউটি পার্লার চালান। আরিবের জেদ মাকে ওই কাজটি বন্ধ করতে হবে। সৌন্দর্যচর্চা ইসলামের বিরোধী। বাড়িতে সকলে অবাক। এসব কী কথা! তাঁদের পরিবার অত্যন্ত উদার, প্রগতিশীল, শিক্ষিত আর আধুনিক। কী হল আরিবের? কে এসব শেখাচ্ছে? আরিব আজকাল পড়াশোনা কমিয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ মোবাইল। সব মিলিয়ে পরিবারটিতে একটা চাপা উদ্বেগ ছেলেকে নিয়ে। আরিব সবথেকে বেশি সময় কাটায় ফেসবুক আর ট্যুইটারে। একটি অ্যাকাউন্টকে আরিব নিয়ম করে ফলো করে। তার নাম magnetgas। এই ট্যুইটার অ্যাকাউন্টের সবথেকে ইন্টারেস্টিং বিষয় হল খুব আপডেটেড। কোথায় কী লড়াই হচ্ছে, কোথায় কী কী অত্যাচার হচ্ছে তার ভিডিও আর ছবি তৎক্ষণাৎ আপলোড

হয়ে যায়। যতই দিন যাচ্ছে এরকম ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট আর ফেসবুকে আকৃষ্ট হচ্ছে আরিব। কেন?

তিনজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আরিবের। ফাহাদ শেখ। ফাদার অ্যাঞ্জেল পলিটেকনিকের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র ফাহাদ শেখ আমন তাণ্ডেল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করে শিবাজিরাও এস জোনধালে কলেজে। আর একজনের নাম শাহিম তাঙ্কি। এই চারজনের মধ্যে এত বন্ধুত্ব কেন? কারণ এই কলেজছাত্ররা প্রত্যেকেই যেতে চায় একটি পবিত্র ভূমিতে। জায়গাটার নাম সিরিয়া! প্রত্যেকদিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর তারা একটা জায়গায় মিলিত হয়ে পড়াশোনা করতে যেত। এক বন্ধুর বাড়িতে। ফয়েজ খান। মুমব্রায় থাকে। সেখানে কিন্তু পড়াশোনা বেশি হয় না। অনেক বেশি দেখা হয় ইউটিউব। কারণ ২০১৩ সাল নাগাদ খবর আসতে শুরু করেছিল ইরাক আর সিরিয়াতে একটি স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। সেটি হবে খলিফার শাসন। অর্থাৎ সরাসরি এক পবিত্র ভূমি হতে চলেছে। পারস্য সাম্রাজ্য বহু দশক ধরে রোমান আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল মধ্যযুগে। কিন্তু আধুনিক যুগে মাত্র এক দশকের মধ্যেই রোমানদের থেকেও সম্ভবত বৃহৎ এক শক্তি পারস্যকে গ্রাস করতে শুরু করল। যাকে ঠেকাতে পারল না পারস্য সভ্যতা। তার নাম ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া। আইসিস। ২০১৪ সালের মধ্যে আইসিস নিজেদের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল উত্তরে আলেপ্পো থেকে দক্ষিণে বাগদাদ পর্যন্ত। সিরিয়ার রাক্কা এবং ইরাকের মসুল আসল শক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠল। সব মিলিয়ে ৬৫ লক্ষ জনসংখ্যা সরাসরি এই খলিফার শাসনের অধীনে চলে এল। আইসিস সংগঠন কীভাবে গড়ে উঠল? এই গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিল সুন্নি অধ্যুষিত কিছু আদিবাসী গ্রুপ, সাদ্দাম হুসেনের আরহিস নামক ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রাক্তন সদস্যরা এবং শিয়া অধ্যুষিত বিদ্রোহীরা, বাশার আল আসাদের শাসনের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছিল।

সুতরাং এরকম একটি সময় যখন আইসিস এগোচ্ছে সবরকম বাধা পেরিয়ে তখনই তাদের দরকার ছিল দেশবিদেশ থেকে যুবক-যুবতীকে টার্গেট করা। আইসিসের সবথেকে

বড় শক্তি হল সোস্যাল মিডিয়া। ১০ হাজার যুবক যুবতীর একটি চূড়ান্ত শার্প অনলাইন গ্রুপ আইসিসের সোস্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল করে। এদের বলা হয় ওয়েব রিক্রুটার। এবং নেট ক্যাম্পেনার। এটা এক অদ্ভুত প্যারাডক্স। যে আইসিস পশ্চিমি সভ্যতার বিলাসদ্রব্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে তারাই পশ্চিমি সভ্যতার সবথেকে শক্তিশালী আবিষ্কার ইন্টারনেট আর মোবাইলকে নিজেদের সেরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। কীভাবে যাওয়া সম্ভব সিরিয়া? চার যুবক রাতদিন ইন্টারনেটে পাগলের মতো পরিশ্রম করছে। একদিকে ট্যুইটারে খোঁজ চলছে আর অন্যদিকে ফোন নম্বরও জোগাড় হয়েছে। কয়েকজনের। জানতে চাওয়া হচ্ছে একটাই প্রশ্ন। সিরিয়া যাওয়ার সহজ রুট কোনটা? অধিকাংশই একটা কমন পরামর্শ দিল। সেটা হল আগে তুরস্ক পৌঁছাও। তারপর সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমাদের সঙ্গে মানে কারা? যাদের সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে ট্যুইটার আর ফেসবুকে একটা কন্ট্যাক্ট তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন সরাসরি ফাইটার। সবার মধ্যে দুটি নাম বাছাই করা হল। এই দুজনের কথায় বোঝা গেল এরা পারবে প্রকৃত হেল্প করতে। একজন হল ইরাকের আবু রামি। আর অন্যজন তুরস্কের আবু ফালুজা। আরিব মোটামুটি বুঝে গেল তিনটি রুটে যাওয়া সম্ভব তার প্রিয় স্থানে। প্যালেস্টাইন, তুরস্ক আর ইরাক। চারজনের মধ্যে আরিবই দায়িত্ব নিল রুট কনফার্ম করার। মুম্বইয়ের একটি শহরতলি কল্যাণ। চারটি ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তারা যাবে সিরিয়া। কোথায়? আইসিস অধ্যুষিত রাক্কা কিংবা মসুলে। ভারতের শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের চার যুবক থাকতে চায় অনেক দূরে এক পবিত্র ভূমিতে। তারা রেডি যে কোনো কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য। প্রথমেই আরিব গেল টমাস কুক সংস্থায়। এবং জানা গেল সিরিয়ায় যাওয়ার কথা ভাবা যতটা সহজ, যাওয়াটা ততই কঠিন। বিশেষ করে তুরস্কের ভিসা পাওয়া। তুরস্কের ভিসা পেতে দরকার পরিচয়পত্র, বাড়ির ঠিকানা, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি। আরিব ফিরে এল বাড়িতে। আবার মধ্যরাত পর্যন্ত ডুবে গেল ইন্টারনেটে। সমস্যার কথা বলল তার পরিচিত সেই পরামর্শদাতাদের। যারা আসলে সত্যিই কে কারা তা সঠিকভাবে জানা নেই। কিন্তু একটা বিকল্প জানা যাচ্ছে। তুরস্ক নয়। বরং ইরাক হয়ে যাওয়া একটু সহজ। কীভাবে? তীর্থযাত্রার ভিসায়। যাকে বলা

হয় জিয়ারত ভিসা। যে ভিসা পেতে হলে একটা মাত্র পাসপোর্ট আর ছবি চাই। ব্যস! আর কিছু প্রমাণপত্র দরকার হয় না। আলোচনা করে স্থির হল এই প্ল্যানই ফাইনাল। এবার একটা কোনো সংস্থার খোঁজ পেতে হবে যারা এরকম বিদেশের তীর্থ সফর করায় বৈধভাবে আরিব, শাহিম এবং ফারহাদ এবার গেল মুম্বইয়ের রাহত ট্যুর কোম্পানির অফিসে। জানানো হল ইরাকের জিয়ারত ভিসা তারা করে দেবে। তারা ট্যুর প্যাকেজ করায়। চারজনের জন্য লাগবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তবে এত টাকা একবারে দেওয়া সম্ভব নয়। ইনস্টলমেন্টে দিতে হবে। তাতে অবশ্য রাজি ওই সংস্থা। তবে এটা জানিয়ে দেওয়া হল যতক্ষণ না ফুল পেমেন্ট হচ্ছে ততক্ষণ টিকিট, ভিসা, প্রোগ্রামের বিস্তারিত কাগজপত্র কিছুই দেওয়া হবে না। কিন্তু এত টাকা আর জিয়ারতের কিছু নিয়মকানুন আছে সেসব পাওয়া যাবে কোথা থেকে? ভারত থেকে চারজন যুবক আসতে চায় তাদের দলে যোগ দিতে। এটা জানতে পেরে ততক্ষণে অ্যাকটিভ হয়ে গিয়েছে আইসিস ওয়েব ফোর্স। তাদের লোকাল স্লিপার সেলের নাম আবু বকর সিদ্দিকি। সে যোগাযোগ করে দিল এমন একজনের সঙ্গে যে গোটা অপারেশনটি মনিটর করবে। তার নাম রহমান দৌলতি। থাকে ইরাক ও সিরিয়ায়। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে মাঝেমাঝে আসে রিক্রুটমেন্টের জন্য। সর্বাগ্রে এই রহমান দৌলতি জানিয়ে দিল সে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। বাকিটা ওই ছাত্রদের জোগাড় করতে হবে। তাই হল। এতদিন ধরে টাকা জমানো হয়েছে। আর কিছু টাকা এদিক ওদিক থেকে নেওয়া হল ধার হিসাবে। গোটা অভিযানের পিছনে আসল প্ল্যান, মস্তিষ্ক এবং রুট নেটওয়ার্ক কে ছিল? একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রের পক্ষে এতবড় রিস্ক নেওয়ার মতো ব্রেন ছিল নাকি? না ছিল না। আরিব ও তার সঙ্গীরা একদিন ভোরে বাগদাদ এয়ারপোর্টে নামতে পারল যার নিখুঁত প্ল্যানে তার নাম তাহিরা ভাট! আরিবের ইন্টারনেট প্রেমিকা! আইসিসের হানিট্র্যাপ! যা আরিব বুঝতেই পারেনি এক বছর ধরে, প্রেমিকার ছদ্মবেশে তাহিরা ভাট আসলে ছিল এক গোপন রিক্রুটার!

আজকাল শুধুই প্রেম নয়! শুরু হয়েছে ইন্টারনেট ওয়েডিং! অর্থাৎ সোস্যাল মিডিয়াতেই বিবাহ হয়ে যাচ্ছে দুই প্রেমিক প্রেমিকার। কেউ কাউকে ফিজিক্যালি দেখেনি।

একবারও সামনে থেকে সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু কখনও না কখনও সাক্ষাৎ হবে এবং একসাথে ঘর বাঁধা হবে এই কমিটমেন্ট করে হয়ে চলেছে অসংখ্য ইন্টারনেট ওয়েডিং। আইসিসের হানিট্র্যাপ উইংএর মেয়েদের টার্গেট হল সেইসব যুবক, যারা আইসিস সম্পর্কে আগ্রহী। যাদের অ্যাকাউন্ট থেকে হামেশাই বিভিন্ন জেহাদ কিংবা অভিযান অথবা যুদ্ধের সম্পর্কে অনেক বেশি কৌতূহল প্রকাশ করা হচ্ছে দেখা যায়। এদের ফলো করা শুরু হয় প্রথমে। বুঝে নেওয়া হয় কেন এই যুবক এই আগ্রহ দেখাচ্ছে? শুধুই নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণে? পেশাগত প্রয়োজনে? সাংবাদিক? সিকিউরিটি এজেন্সি? গোয়েন্দা? গুপ্তচর? নাকি জেহাদি হতে চায় এরকম কেউ? শেষোক্ত পন্থীরাই আসল টার্গেট। তাদের ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়। নিয়মটা হল প্রথমেই নিজেকে বেশি প্রকাশ করতে নেই। তাহলে সন্দেহ হবে। মাসের পর পর মাস শুধু ভালো লাগা তৈরি হোক। রোমান্টিক আলোচনা চলুক। তারপর কমন ইন্টারেস্ট নিয়ে কথা শুরু হবে। এবং সবশেষে যখন জানা হয়ে যাবে যে দুজনের অনেক বিষয়ে মনের মিল, তখন মতাদর্শ আর ধর্মের শুদ্ধতার প্রশ্নে ঢোকা হবে। সেটাই আসল স্টেজ। কারণ তারপর রক্ত গরম করা, ক্ষোভ সৃষ্টি করা এবং দুর্দান্ত এক নতুন জীবনের দিকে অঙ্গুলিহেলনের ভিডিও, ছবি, ইউটিউব শেয়ার করা হবে। কখনও দেখানো হবে অত্যাচার চলছে নিজের সম্প্রদায়ের উপর। এভাবে ব্রেনওয়াশ চলবে। এই ফরমুলায় মুম্বইয়ের কল্যাণ এলাকার কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র আরিব মাজিদের বান্ধবীর নাম তাহিরা ভাট। তারা আলোচনা করে কীভাবে আদর্শ মুসলিম জীবন যাপন করা সম্ভব। তাহিরা ভাটের অন্য নামেও একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে। নাম উম বাকিয়া আল হামসি। একটা সমস্যা। কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে...সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। আচমকা একদিন উধাও তাহিরা। কোথায় গেল সে? আরিব বুঝতেই পারে না। আসল কথা হল তাহিরা ভাটকে ফলো করছে দুনিয়ার একাধিক ইনটেলিজেন্স এজেন্সি। তারা জানে এ আসলে কে। তাই কিছুদিনের মধ্যে তার অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়া হয়। তারপর চুপচাপ। কয়েকদিন পর আবার নতুন নামে, নতুন মেল আইডি, নতুন প্রোফাইল নিয়ে হাজির হয় সে। এবং প্রতিবারই নতুন অ্যাকাউন্ট থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে সে ইনবক্সে বলে, আমি তাহিরা! কখনও সেই নতুন প্রোফাইলের নাম হয়েছে 'ব্লেজ অফ গ্লোরি'

কখনও হয়েছে 'উম হল হামসি'! সুতরাং একদিন তাহিরাকে আরিব জানাল সে যাবে সিরিয়া। তাদের সেখানেই দেখা হবে। খুব খুশি তাহিরা। সে জানাল তুমি গেলে আমিও যাব। ওখানেই আছে আমাদের জন্নত। বাগদাদে নেমে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে? তাহিরা ভাট সেই নম্বর দিয়ে দিল। নাম আবু ফতিমা।

একদল তীর্থযাত্রী ট্যুরিস্টকে নিয়ে আজমির ট্র্যাভেলস রওনা হবে ইরাকে। ২০১৪ সালের ২২ মে আরিব মাজিদ ও তার সঙ্গীদের কাছে এল বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। ইরাক যাওয়ার টিকিট। জিয়ারতে যাচ্ছে মোট ৩০ জন যাত্রী। তাদের মধ্যে চারজন আসলে যাচ্ছে অন্য লক্ষ্যে। সেটা বাকি ২৬ জন যাত্রী কিংবা ওই আজমির ট্র্যাভেলসের কেউ জানেই না। বরং অন্যরা খুশি যে এরকম চারটি অল্পবয়সি যুবক তাদের সঙ্গে যাচ্ছে। বাহ! আজকালকার ছেলেদের এত ধর্মীয় চেতনা খুবই সুসংবাদ! ভাবছে সবাই। ২৪ মে আরিব বাড়ি থেকে বেরল। নর্মাল দিন। কাঁধে কলেজের ব্যাগ। বাড়িতে কেউ সন্দেহ করেনি। করার কথাও নয়। সোজা কলেজ। যে ছেলেটি আজ মাঝরাতে ইরাকে এক অজানার জীবনের দিকে উড়ে যাবে সে অত্যন্ত উদ্বেগহীনভাবে ক্লাস করল। নোট নিল। আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করল। এরপর বিকেলে মুমব্রা মার্কেটে গিয়ে একটা বড় ট্র্যাভেল ব্যাগ কিনে এক বন্ধুর বাড়িতে গেল। সেই ফয়েজ খান। তার বাড়িতে আগেই একটা ব্যাগ রাখা ছিল। জামাকাপড়ের। সেটা নিয়ে বড় নতুন ব্যাগে ভরা হল। রাত আটটায় চারজনের দেখা হল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের বাইরে। মাঝরাতে ফ্লাইট। আজমির ট্র্যাভেলসের গাইড আসার আগেই চার যুবক হাজির। মধ্যরাত। এতিহাদ এয়ারওয়েজ। ফ্লাইট নম্বর ইটি ২০৫! চারটি ছাত্র উড়ে গেল বাগদাদ। কারও বাড়িতে কেউ জানল না। ২৪ ঘণ্টা পরও কোনো খোঁজখবর না পেয়ে আরিবের মা বাবা থানে পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। ফাইল করা হল মিসিং ডায়েরি। আবু ধাবি হয়ে বাগদাদে নামার পর দ্রুত হোটেলে ঢোকা। একটু পর বেরোতে হবে। ৩০ জনের দলটি যাবে শরিফ আবদুল কাদির গিলানির দরগায়। কিন্তু চারটি যুবক যাবে না জানিয়ে দিল। তারা বিরক্ত। কারণ এরকম হোটেলে কষ্ট করে থাকতে পারছে না তারা। তাদের অন্যত্র কোনো হোটেলে রাখা হোক। দরকার হলে আরও টাকা দেবে। আসল কারণ হল এই দলের মধ্যে থেকে নিজেদের আলোচনা করা

সম্ভব নয়। তাই তাদের দরকার একটু প্রাইভেসি। সেই অনুযায়ী ট্যুর গাইডকে বলাও হল। এবং এক্সট্রা টাকা দিয়ে পাশের একটি হোটেলেই রাখা হল তাদের। কিন্তু সন্দেহের কারণ কাছে। ২৫ মে, ৩১ মে। একের পর এক দিন যাচ্ছে। অথচ এই চারজন কোনো জিয়ারতে যাচ্ছে না। এতসব দরগা, মসজিদ ধর্মস্থান আছে। সেই মুম্বই থেকে শুধু এই কারণেই তো আসা। তাও এই চার যুবক কোথাও যায় না। ব্যাপার কী? ব্যাপার হল টেনশন বাড়ছে। কারণ সেই আবু ফাতিমার খোঁজ নেই। সে ফোনও তুলছে না। মেসেজও করছে না। অগত্যা আবার সেই রহমান দৌলতিকে ফোন করা হল। বলা হল ভাইজান টাকা ফুরিয়ে আসছে। কী করব? এখানে কিছুই চিনি না। কোথায় যাব? আমাদের ভিসা শেষ হয়ে আসছে। এরপর তো ফিরে যেতে হবে মুম্বই! রহমান আশ্বস্ত করল তাদের। মাত্র এক ঘণ্টা পর একটি মেসেজ এল। হোয়াটস অ্যাপে। আবদুল রহমান আলেজি এক কুয়েতের নাগরিক। জানাল কিছুক্ষণের মধ্যে ১ হাজার ইউএস ডলার ট্রান্সফার করা হচ্ছে আরিবের অ্যাকাউন্টে। ২৯ মে ২০১৪ তারিখে আরিব মাজিদের কাছে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে টাকা চলে এল।

যে কেউ চাইল, আর ভিসা নিয়ে ইরাক কিংবা সিরিয়া চলে এল। তৎক্ষণাৎ আইসিসে যোগ দিতে পারল? এরকম হয় নাকি? আদৌ হয় না। অতটা সহজ নয় আইসিসে যোগ দেওয়া। আইসিসে যোগ দিতে হলে দরকার রেফারেন্স। এমন কেউ যে বেশ অনেকদিন ধরে আইসিসের অন্দরে আছে। সে যদি আস্থাভাজন হয় তাহলে তার রেফারেন্স যাবে আইসিস কর্তাদের কাছে। ওই প্রক্রিয়ার নাম 'তাজকিয়া'। তাজকিয়া এসে পৌঁছয়নি। তাই আবু ফাতিমা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেও না। এখন উপায়? আরিব ভাবছে তাহিরা কোথায়? সে কেন কিছু করছে না? তার জন্যই তো সব ছেড়ে আসা! ভারতে ফিরে যাওয়ার দিন এসে গেল। আর থাকা যাবে না। বৈধভাবে। চার যুবক হাতজোড় করে ট্যুর গাইডকে বলল আমাদের ভিসা এক্সটেনশন করে দিতে হবে। টাকা দিচ্ছি। কত দিতে হবে? ৫০০ ডলার। তাই দেওয়া হল। কিন্তু ৩১ মে বিকেলে সেই ট্যুর গাইড জানাল সম্ভব নয়। ভিসা বাড়ানো যাবে না। তোমাদের ফিরতে হবে ইন্ডিয়া। কাল ফ্লাইট ফেরার। তোমরা এলেই বা কেন বুঝলাম না। কোথাও তো গেলে না। আশ্চর্য! চারজন শুধু হাসল। তারা

জানাল ঠিক আছে আর একবার শরিফের দরগায় নিয়ে চলো আমাদের। আমরা তো আগে দেখিনি। অগত্যা! যাওয়া হল দরগায়।

ট্যুর গাইডকে সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায় রেখে চারজন ওই দরগা থেকে আড়ালে বেরিয়ে গেল। সোজা একটি হোটেলের সামনে গেল। তার নাম হোটেল বুর্জ। যেখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। একটি ট্যাক্সিকে ভাড়া করা হল। কোথায় যাওয়া হবে? মসুল! আর ঠিক তখনই হোয়াটস অ্যাপে আরিবের প্রেমিকা ভেসে উঠল।

মসুল যাচ্ছ?

তুমি কীভাবে জানলে? এতদিন কোথায় ছিলে? আমি সব খবর রাখি। তোমাদের ফলো করা হচ্ছে।

আরিব চমকে উঠল। মানে? কীভাবে? কোথায়? কারা করছে?

এই ড্রাইভার আমাদের লোক।

সে কী ?

ওকে বলা আছে। তোমাদের তুলবে সাবুঞ্জি মসজিদের পাশের হোটেলে। আর তুমি?

কী আমি?

তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

একটা হাসির এমোজি দিয়ে তাহিরা ভাট লিখল, চলো..বাই..আবার কথা হবে কখনও আরিবের মুখে পড়ল ম্লান এক উদ্বেগের ছাপ! সে কি ভুল করল?

বাগদাদে থাকতেই চারটি সিম কার্ড কেনা হয়েছিল। জেইন কোম্পানির। ৯৬৪৭৮২০২১ এবং ৯৬৪৭৮২০২১। এই ছিল আরিবের নম্বর। মসুলে ঠিক সেই হোটেলে তোলা হল তাদের। কিন্তু এবার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। তাদের ডেকে আনা হয়েছে। সব হেল্প করা হবে বলা হয়েছে। অথচ আসল জিনিস আসছে না? তাজকিয়া! অবশেষে তাজকিয়া এল। ৭ জুন। কে দিয়েছে রেফারেন্স? স্বয়ং উমর শিসানি। আইসিসের মিলিটারি কমান্ডার। হোটেলের

সামনে একটা গাড়ি এসে থামল সেদিন মাঝরাতে। তাদের চারজনকে তোলা হল গাড়িতে। গাড়ি চলেছে। চোখ বাঁধা। কতক্ষণ যাত্রা হল? বোঝার উপায় নেই। ওঠার আগে ঘড়ি ফেলে দিতে হয়েছে। ওটাই নিয়ম। মোবাইল ওই আগন্তুকদের দখলে। চোখ খোলার পর দেখা গেল ভোর হচ্ছে। একটা মরুভূমি। জায়গাটার নাম জাজিরা। এটাই ট্রেনিং ক্যাম্প। চোখের সামনে মুম্বইয়ের চারটি কলেজ ছাত্র এই প্রথম হাতে হাতে এত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে পেল। তাদের স্বাগত জানাল একদল জিহাদি। তারা যে সময়টায় জাজিরা ক্যাম্পে এসে যোগ দিল ঠিক তখনই চলছে মসুল দখল করার প্রাণপণ যুদ্ধ। ১২ দিন থাকতে হল জাজিরা ক্যাম্পে। এই চার ইন্ডিয়ান কি পারবে এত চাপ নিতে? সেটা দেখা দরকার। এই ক্যাম্পে সেই পরীক্ষা হচ্ছে। পাশ করল আরিব ও বাকিরা। ঠিক ১৩ দিনের মাথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হল একটি ধু ধু প্রান্তরে। জায়গাটার নাম হুদুদ সেন্টার। দায়িত্বে আমির অবু মহম্মদ ইরাকি। আমির মানে হল শিবিরের যে প্রধান। সে সবার আগে ফাহাদকে বুকে টেনে নিল। বললেন ম্যাগনেট গ্যাসকে স্বাগত। পাশেই হাসিমুখে দাঁড়ানো আরিব মাজিদ চমকে উঠল । তার মানে? সেই যে আজ থেকে এক দেড় বছর আগে সে যাকে ফলো করছিল, যার ট্যুইটার অ্যাকাউন্টের নাম magnetgas সে আসলে ফাহাদ? এতদিন বলেনি তো? এসব কী হচ্ছে? সবটাই এত গোপনীয় কেন? কে কার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত? এসব প্রশ্ন এবং এক অজানা আশংকা নিয়েই হুদুদ সেন্টার আরিব মাজিদকে বলল, ওয়েলকাম টু আইসিস। কারণ এখানে হবে নাম রেজিস্ট্রিকরণ। এবং প্রশিক্ষণ।

একদিন রাতে সারাদিনের হাড়ভাঙা প্রশিক্ষণের পর ক্যাম্পে ফিরে এল আরিব। আপাতত তাকে কোনো কাজ দেওয়া হবে না। আরও সময় লাগবে। তবে একটা জিনিস লক্ষ করা যাচ্ছে। এখানে ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ানরা নাকি ভালো ফাইটার হয় না। তাহলে? তাদের দিয়ে রাস্তা সারানো হচ্ছে। আর? তারা হচ্ছে সেক্স স্লেভ! ইউরোপীয়ান আর আরব ফাইটাররা প্রথম শ্রেণির নাগরিক। তাহলে কী করবে আরিব? ট্যুইটারে তাহিরা ভাটকে সেকথা বলতেই তাহিরা কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে বলল, আচ্ছা এসব ভেবো না। আমি কিন্তু আর আলাদা থাকতে

পারব না। এবার আমরা মিলিত হব। চলো বিয়ে করি। ইন্টারনেট ম্যারেজ। জনৈক জাঁবাজ উমর নিজেকে তাহিরার ভাই আখ্যা দিয়ে গোটা বিয়ের সাক্ষী ও প্রস্তাবক হিসাবে উপস্থিত হল। এবং একঝাঁক জিহাদির অনলাইন উপস্থিতিতে হল আরিব ও তাহিরার অনলাইন বিয়ে। ঠিক তিনদিন পর তাহিরা ভাট নিজের প্রোফাইল বদলে দিয়ে জানিয়ে দিল ম্যারেড টু আরিব মাজিদ। কেন এখন বিয়ে? কারণ আরিবকে দেওয়া হবে প্রথম কাজের দায়িত্ব। আত্মঘাতী হামলা। তাহিরাকেও একইভাবে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। তারা দুজনে চায় আত্মঘাতী হামলার পর তারা শহিদ হয়ে জন্নতে দেখা করবে। সেটাই হবে তাদের পবিত্র সংসার। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে! প্ল্যান তাহিরার!

মিসাইল, এ কে ফর্টি সেভেন আর লাইট মেশিনগান ট্রেনিং। প্রথম অপারেশনই শিয়া মিলিট্যান্ট ফোর্সকে উড়িয়ে দিতে হবে। ৩ টন বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়িতে বসানো হল আরিবকে। বলা হল এটা নিয়ে যাও। আরিব হয়ে গেল ফিদাইন। আত্মঘাতী বাহিনী। এবং প্রথম অপারেশনই লোন উলফ! অর্থাৎ একা আক্রমণকারী। এটা শুনে তাহিরা ভাট বলল আমাকেও পাঠানো হচ্ছে প্যালেস্টাইন। হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না। বিদায় আরিব। দেখা হবে জন্নতে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে এগোচ্ছে আরিব। একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার সে ব্যর্থ হল। প্রথমে তার গাড়িকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ছুড়লো কুর্দ বাহিনী। সে কোনো ক্রমে বেঁচে গেল। এরপর আমেরিকান বাহিনী বোমা বর্ষণ করতে শুরু করেছিল আইসিসের বিরুদ্ধে। আর তৃতীয়বার গুলিবিদ্ধ। কিন্তু আইসিসের শত্রুপক্ষকে আরিব কোনো ক্ষতিই করতে পারল না। গুরুতর জখম হয়ে ফিরল ক্যাম্পে। আইসিসি কর্তারা ক্ষুব্ধ। তিনবারই ব্যর্থ! নিজেরই উপর ধিক্কার হচ্ছে আরিবের। কিন্তু সেই রাতেই আমেরিকা আর কুর্দ বাহিনীর প্রবল বিমান হানা শুরু হল। জানা গেল আগস্টের সেই হামলায় আরিব মাজিদের মৃত্যু হয়েছে। গোটা অনলাইন জুড়ে প্রচার করা হল আরিবের শহিদ হওয়ার সংবাদ। আরিবের মৃতদেহ কোথায়? কেউ জানে না।

২ সেপ্টেম্বর! আরিব মাজিদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি মেসেজ ভেসে উঠল। ‘তুমি কি সবুজ পাখির দেশে চলে গিয়েছ?’...। কেউ উত্তর দিল না। তাহিরা ভাটের ওই প্রশ্নের

উত্তর দেওয়ার জন্য তো আরিব মাজিদ আর বেঁচে নেই। সবুজ পাখি মানে বোঝানো হচ্ছে শহিদের স্বর্গ। তাহিরা ভাট নিশ্চিত হল। সে লিখল আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। আমি বেঁচে আছি। আরিবের সঙ্গী শাহিম মুম্বইতে ফোন করে আরিব মাজিদের বাবা ইউনানি ডাক্তার বদরুদ্দিন সাহেবকে বলল, আরিব আর নেই! কান্নায় ভেঙে পড়ল গোটা পরিবার।

গোটা ইন্টারনেট দুনিয়ার জেহাদি ওয়েবসাইটগুলিতে যখন আরিব মাজিদকে শহিদের আখ্যা দিয়ে প্রচার চলছে, তখন আরিব ইরাক আর সিরিয়ার সীমান্তে এক হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। সে মারা যায়নি। সে তখন অচেতন অবস্থায় ভর্তি তেল হাফার হাসপাতালে। আটদিন হয়ে গেল। তার জ্ঞান নেই। কিন্তু বেঁচে আছে। তাই তাকে আর রাখা হবে না হাসপাতালে। কারণ হাসপাতালে জায়গা নেই। অসংখ্য জিহাদি আসছে। অসংখ্য সাধারণ মানুষ আসছে। লাগাতার বোমা ফেলছে আমেরিকার বাহিনী। উপচে পড়ছে হাসপাতাল।

ক্যাম্পে ফিরে এল আরিব এবং মোবাইল হাতে পেয়ে প্রথম দেখল তাহিরার মেসেজ। তবে জবাব দেওয়ার আগে দেখল তাহিরার অ্যাকাউন্ট। না নেই। সেখানে আরিব মাজিদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। বদলে গিয়েছে সব। আবার সে এক অন্য নারী। তাহিরার কোনো ছবি নেই তার কাছে। একটাই ছবি। বোরখা পরা। তাহিরা ভাট নামে আদৌ কি কেউ আছে? আরিব ভাবল তার গোটা মিশন কি ব্যর্থ? কারণ এই জখম অবস্থায় তাকে কেউ সহানুভূতি দেখাচ্ছে না। এমনকী সময়মতো মেডিসিনও পাওয়া যাচ্ছে না। সে এখন অকেজো। তাই তাকে অবহেলা? কোনো কাজ দেওয়া হচ্ছে না। তার কাজ গাড়ি মোছা। রাস্তা সাফাই। ২১ অক্টোবর ক্যাম্প থেকেই বাড়িতে বোনকে স্কাইপেতে ভিডিও কল করল সে। দুজনেই কাঁদছে। বোন বলছে তুমি আমার বিয়েতে এলে না.. ফিরে এসো ভাইজান..। ফিরে এসো। ততদিনে গোটা দেশ জেনে গিয়েছে এই চারজন কোথায় এসেছে। কারণ একমাত্র ফাহাদ বাড়িতে নিজের আলমারিতে চার পাতার একটি চিঠিতে সব জানিয়ে রেখে এসেছিল যে তারা চার বন্ধু চলেছে অন্য এক পবিত্র পথে।

আরিব মাজিদ ইরাক সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে আমিরকে বলল আমি ফিরে যেতে চাই। খুব অসুস্থ। আমির ঠান্ডা চোখে বলল, তোমাকে গেলেই কিন্তু গ্রেপ্তার করা হবে। তবু আরিব যেতে চায়। দয়া হল বোধহয় আমিরের। ২৫ নভেম্বর আরিবকে একটা কালো কাচে ঢাকা গাড়িতে তোলা হল। চোখ বাঁধা। তুরস্ক সীমান্তের একটি জনপদ গাজিয়ানতেপ। সেখানে এসে নামানো হল। সীমান্ত পেরিয়ে আরিব সোজা একটা বাসে চেপে বসল। ফিরছে আরিব মাজিদ। ইস্তাম্বুল। এবার আর কোথাও যাওয়া নয়। এবার লক্ষ্য ফেরা। ভারতীয় দূতাবাস। কর্মীরা হতচকিত। ছেলেটি বলছে সে সোজা এসেছে আইসিস ক্যাম্প থেকে! পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে। কী করা যায়? একরাত রাখা হল সেখানে। ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট দেওয়া হল আরিবকে। সে অসুস্থ। জখম। তাই ইস্যু করা হল ইমার্জেন্সি সার্টিফিকেট। আরিব টার্কিশ এয়ারলাইন্সে ওঠার আগে বাবাকে ফোন করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আব্বাজান.....আমি ফিরছি....। ২৮ নভেম্বর আরিব মাজিদ মুম্বই এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল। হাতে মাত্র একটা ব্যাগ। বাইরে বেরোতেই দেখল আব্বা, আম্মা, বোন দাঁড়িয়ে...সবাই কাঁদছে। এগিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে আরিব। জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে বদরুদ্দিন সাহেব। ভারতের প্রথম আইসিস জেহাদি ছিল এই কলেজ ছাত্র! আরিবের কাঁধে টোকা দিল কেউ। কে? আরিব চোখ মুখে পিছনে তাকিয়ে দেখল মুম্বই পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের চিফ হিমাংশু রায়!

আরিব ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!! আরিব হাসল। বলল, চলিয়ে স্যার....।

২২

দিল্লির আবহাওয়া বেশ মনোরম। আবুধাবি থেকে দিল্লি এয়ারপোর্টে নামার আগে তেক্কাত সিদ্দিকির ধারণা হয়েছিল বাইরেটা নিশ্চয়ই খুব গরম। এতক্ষণে কেরলে তো প্রচণ্ড তাপ। দিল্লিতেও হয়তো তাই হবে। যদিও তেক্কাত সিদ্দিকি বহু বছর হয়ে গেল আবুধাবিতেই সেটলড। বছরে একবার কেরল অবশ্য যান নিজের বাড়িতে। সুতরাং তাঁর আবার গরমের ভয় কী! আসলে ভয় নয়। বিস্ময়! এরকম মার্চ মাসে দিল্লিতে বেশ মৃদুমন্দ বাতাস। বরং হালকা শীতের কামড়ও যেন পাওয়া যাচ্ছে। অদ্ভুত তো! এর আগে দিল্লিতে আসা হলেও এয়ারপোর্ট থেকে আবার কোচির ফ্লাইট ধরতে হয়েছে। অর্থাৎ ওই শুধু ট্রান্সফারের সময়টুকু ছাড়া সেভাবে বেরনো হয়নি। এবার অনেকদিন পর তাই দিল্লি আসা। একটা জরুরি কাজে। বিজনেস ট্রিপ। এবারের ডিলটা হয়ে গেলে নতুন ভেঞ্চার করা যাবে। কালিকট থেকে প্রায় ২২ বছর আগে আবুধাবি চলে গিয়েছেন সিদ্দিকি। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির সঙ্গে অর্ডার সাপ্লাই আর কনস্ট্রাকশনের কাজ করে ২২ বছরে তিনি এক পরিচিত বিজনেসম্যান। ভারত সরকারের সঙ্গেও তাঁর কিছু কাজ আছে। সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলাপ আছে। সুতরাং সোজা কথায় তেক্কাত সিদ্দিকি একজন রেপুটেড এবং ধনী ব্যবসায়ী। ২০০১ সালের ১১ মার্চ। আজ তিনি ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজিত। বিজয় রাঠোরের সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল দুবাইতে। তখনই কন্ট্যাক্ট আদানপ্রদান। সেই বিজয় রাঠোর গত কয়েকমাস ধরে ফোন করেছিলেন। দিল্লির কোনো একটা সেরামিক ফার্ম ওয়েস্ট এশিয়ায় এক্সপোর্ট করতে চায়। সেই কন্ট্রাক্ট পাওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু। প্রাইমারি কন্ট্রাক্ট তাঁকে দিতে চায় বিজয় রাঠোর। রাঠোর নিজে মিডলম্যান। সেই মতো একবার তেক্কাতকে দিল্লিতে আসতে বলেছে রাঠোর। একটা মিটিং হবে। সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। আপাতত দুয়েকদিন আবুধাবির অফিসে ভাইকে বসিয়ে রেখে তাই সিদ্দিকি এসেছেন দিল্লি। আশা করা হচ্ছে একেবারে ফাইনাল এগ্রিমেন্ট সেটলড করেই ফিরতে পারবেন। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে পৌঁছে সিদ্দিকির মনে পড়ল এবার একটা ফোন করতে হবে। অমর নামে কাউকে। ফোনে কথা

হল। অমর এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল লাউঞ্জের বাইরে অপেক্ষা করছে। ফোনেই অমর জানাল রাঠোর সাব আসেনি। তবে চিন্তা নেই। তিনি নিজের অফিসেই আছেন। সেখানেই তেহাত সিদ্দিকি সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার কথা। অমর বলল আমি গাড়ি আনছি। আপনি দাঁড়ান। সিলভার হুন্ডাই অ্যাসেন্ট। দিল্লির কিছু সেভাবে চেনেন না সিদ্দিকি। আধঘণ্টা পর গাড়ি ঢুকল একটি দক্ষিণ দিল্লির কলোনির মধ্যে। রাস্তা ছেড়ে একটা বাইলেন। বাংলো টাইপের বড় বাড়ির গেট খুলে গেল। এবং গাড়িটি ঢুকতেই গেট বন্ধ। গাড়ি থেকে অমর তাঁকে নামতে বলে এক দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। অবাক সিদ্দিকি। ব্যাপার কী? তবে এখন নিশ্চয়ই বিজয় রাঠোরের সঙ্গে দেখা হবে! এটা বাংলো নাকি অফিস? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সামনেই দরজা। সেখানে আগে থেকে কিছু লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু মুখচোখ কেমন যেন রাফ। এরা কি অফিস স্টাফ? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাদের একজন এগিয়ে এসে বলল আইয়ে। বলে ভিতরে নিয়ে গেল। ড্রইংরুমের মধ্যে কিছু সোফা। কিছু চেয়ার। তেহ্কাত ঢুকতেই ড্রইংরুমের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হল। ঠিক তখনই তেহ্কাতের মাথায় ভয় প্রবেশ করল। কী হচ্ছে এসব? তাঁর কি আর একটু খোঁজখবর নিয়ে প্লেনে চাপা উচিত ছিল? ঠিক সেই সময় পিঠে একটা ধাক্কা। বৈঠ যাইয়ে...ইস চেয়ারপে বৈঠিয়ে..। এরকম একটা অদ্ভুত রুড ওয়েলকাম পেয়ে সিদ্দিকি যতটা বিস্মিত ততটাই ভীত হয়ে পড়ল। এক লহমায় মনে এল ভুল করেছি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাঁর কাঁধ ধরে জোর করে চেয়ারে বসানো হল। আর বলা হল, তুমি কিডন্যাপড। মানে? কিডন্যাপড! আবুধাবির বিখ্যাত হাই প্রোফাইল বিজনেসম্যান তেহ্কাত সিদ্দিকি কিডন্যাপড! তাও আবার দিল্লিতে। ব্রড ডে লাইটে? এরকম হয়? সিদ্দিকি ভাবতেই ভাবতে তাঁকে বলা হল ১২ কোটি! এখান থেকে ছাড়া পেতে হলে, বাঁচতে হলে ১২ কোটি টাকা দিতে হবে। তেহ্কাত স্তব্ধ। তাঁর ফোন কেড়ে নেওয়া হল। বলা হল বাড়িতে বউকে ফোন করো। তেহ্কাত নম্বর বলল। ফোন বাজছে। তেহ্কাতের স্ত্রী স্বামীর ব্যাগে একঝাঁক লিস্ট লিখে দিয়েছিলেন। সেখানে বলা আছে দিল্লির বিজনেস ডিল সেরে কী কী আনতে হবে তাঁকে। অন্তত তিনটে লখনউ চিকনের শাড়ি চাই বলেছেন। একটু আগেই তাই এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে তেহ্কাত গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখছিলেন বড়

কোনো মার্কেট বা দোকান আছে কিনা। সেই স্ত্রীকে ফোন করে তিনি এখন বলছেন, আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে...বলছে বাঁচতে হলে ১২ কোটি দিতে হবে...অন্য প্রান্তে থাকা স্ত্রী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এটুকু শুনতে শুনতে কিছু একটা বলতে যাবেন সিদ্দিকি। সেই সুযোগ দেওয়া হল না। ফোন কেড়ে নিল একটি যুবক। সিদ্দিকি কাঁপা গলায় কোনো মতে ভাঙা হিন্দিতে বললেন, আপনাদের ভুল হচ্ছে। আমি এত বড় বিজনেস চালাই না যে ১২ কোটি টাকা থাকবে। অফিস, অ্যাসেট বিক্রি করলেও হয়তো ১২ কোটি হবে না। প্লিজ...। এটা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। যুবকরা হাসল। তারা জানে একটা বৃহৎ অ্যামাউন্ট দিয়েই শুরু করতে হয়। তারপর তো নেগোসিয়েশন আছেই। আসল কথাটা হল ভিকটিম কতটা ভয় পেয়েছে। যত বেশি ভয় পাবে আর যত তাঁর পরিবার বা আত্মীয়রা মানসিকভাবে দুর্বল হবে ততই দরকষাকষির প্রবণতা কমবে। কারণ বেশিরভাগ বিজনেসম্যানের ফ্যামিলি চায় আগে লোকটা ভালোয় ভালোয় বেঁচে ফিরুক। টাকা যায় যাক! এই ভয়ই হল পুঁজি কিডন্যাপারদের। মৃত্যুকে কে না ভয় পায়? তাই একটা সজোরে চড় মারা হল সিদ্দিকিকে।

পরদিন। ১২ মার্চ। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে তেক্কাত সিদ্দিকির স্ত্রী ও দাদা আবুধাবিতে ভারতীয় দূতাবাসে গেলেন। দেখা করলেন রাষ্ট্রদূত কে সি সিং এর সঙ্গে। গিয়ে তাঁরা প্রায় ভেঙেই পড়লেন। কে সি সিং ধৈর্য ধরে পুরোটা শুনলেন। এবং তৎক্ষণাৎ দিল্লিতে একটি নম্বরে ফোন নম্বরটি সোজা গেল আর কে রাঘবনের কাছে। সিবিআইয়ের ডিরেক্টর। সিবিআই? কেন? সাধারণত সিবিআই ঘটে যাওয়া কোনো দুর্নীতি, আর্থিক ক্রাইম এবং কখনও সখনও মার্ডার বা গণহত্যা মামলার তদন্ত করে। সোজা কথায় যে অপরাধটি ঘটে গিয়েছে সেটির পিছনের কারণ কী, কারা জড়িত, ষড়যন্ত্রটির মূল চক্রী কে ইত্যাদি নিয়েই তদন্ত করে সিবিআই। কিন্তু একটি অপরাধ ঘটছে। লাইভ অ্যাকশন তখনও চলছে অর্থাৎ কিডন্যাপিং কেস ফলো করা, এটা সিবিআই কখনও করেনি। তাহলে কী করা উচিত? ডিরেক্টর আর কে রাঘবন ডেকে পাঠালেন নীরজকুমার নামের অফিসারকে। তাঁকে তিনি বিশ্বাস করেন। বললেন, তুমি হ্যান্ডল করবে? নীরজকুমার জানতে চাইলেন, এটা তো দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের কাজ। আমাদের এর মধ্যে ঢোকা কি উচিত? রাঘবন

বললেন, এটা সরকারের প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেপুটি পি এমের কানে গিয়েছে। তিনি বললেন, এটা আমাদের দেখতে হবে। আর অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল! ডেপুটি পি এম মানে উপ প্রধানমন্ত্রী। তিনি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। নাম লালকৃষ্ণ আদবানি। সবেমাত্র এক বছর আগেই এক ভয়াবহ ধাক্কা খেয়েছে সরকার একটি হাইজ্যাকিং কেসে। নেপাল থেকে আসা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট কাঠমান্ডু থেকে টেক অফের পরই হাইজ্যাকারদের হাতে চলে যায়। আর তারপর এক লজ্জার ও বেদনার কাহিনি ঘটে গিয়েছে। একজন যাত্রী রুপেন কাটিয়ালকে হাইজ্যাকাররা মেরে ফেলেছে। আর বহু কষ্টে গ্রেপ্তার হওয়া সন্ত্রাসবাদী মাসুদ আজহার সহ তিনজনকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল কান্দাহারে গিয়ে। সেই ধাক্কা এখনও দগদগে। তাই আর কোনো রিস্ক নিতে চাইছে না সরকার। একজন এনআরআই ব্যবসায়ী দিল্লিতে ব্যবসার কাজে এসে কিডন্যাপ হয়ে গেলেন এটার কোনো ফ্যাটাল পরিণতি হলে সরকারের মুখ দেখানোর আর উপায় থাকবে না। তাই আদবানি নিজেই রাঘবনকে বলেছেন টিম তৈরি করো বেস্ট অফিসারদের। তেক্কাতকে জীবন্ত উদ্ধার করতেই হবে। গোপন টেনশন বয়ে যাচ্ছে সরকারের অন্দরে। যদিও খুব সামান্য কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না।

আন্না এরা আর আমাকে টাইম দেবে না।

তুমি ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে আমরা ব্যবস্থা করছি

না না আমার খুব ভয় করছে (আমি সেকেন্ড ফ্লোরে আছি)...এরা যা চাইছে ঠিক সেই মতোই টাকাটা জোগাড় করো ...(একটা দোকান দেখা যাচ্ছে যার সাইনবোর্ডে নম্বর লেখা 6683899)

তেক্কাত তুমি এমনিতে ঠিক আছো তো?

হ্যাঁ আমার কিছু হয়নি..খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে (এটা এয়ারপোর্টের কাছে মনে হয়...মাথার উপরে খুব কাছে প্লেনের শব্দ...

ঠিক আছে আর একটু ধৈর্য ধরো..আমরা টাকার ব্যবস্থা করছি।

আচ্ছা আন্না...তাড়াতাড়ি করো (একটা টেলিফোন বুথও আছে দেখতে পাচ্ছি..)

তেক্কাত সিদ্দিকির বড় ভাই আহমেদ কোয়া দিল্লির লোদি রোডে সিজিও কমপ্লেক্সে ফোন করে সিবিআই অফিসারকে ফোন করে জানালেন তাঁর ভাই সকালে ফোন করেছিল। ওই কিডন্যাপাররা তাঁকে দিয়ে ফোন করিয়েছে। সিদ্দিকিরই ফোন। কিডন্যাপাররা নিশ্চয়ই সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ফোনই হল উপরের কথোপকথন। তেক্কাত সিদ্দিকি জানিয়েছে, তাঁর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। যতটা সম্ভব দ্রুত টাকাটা জোগাড় করতে হবে। তবে আসল তথ্য হল এই কথোপকথনের ভাষা হিন্দির মধ্যেই তেক্কাত সিদ্দিকি কৌশলে কয়েকটি মালয়ালি ভাষায় বাক্য বলে ইঙ্গিত দিতে চেয়েছে যে সে কোথায় আছে। উপরে ওই যে ব্র্যাকেটে লেখা বাক্যগুলি, ওগুলিই ছিল মালয়ালি ভাষায় তেক্কাতের কয়েকটি বাক্য। মালয়ালি ভাষাটা কিডন্যাপারদের জানা নেই। তবে প্রচণ্ড রিস্ক নিয়েছে বটে তেক্কাত। যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়তে পারত। কিন্তু অবশ্যই দুর্দান্ত বুদ্ধিমানের কাজও করেছে। তদন্তটা সিবিআই করার দায়িত্ব নিয়েছে বটে, কিন্তু দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলকেও একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি। সেটার কারণ কয়েকজন দুর্ধর্ষ অফিসার। সরকারের পক্ষ থেকে প্রবল চাপের জেরে এমন এক টিম তৈরি হল যা দিল্লি পুলিশ ও সিবিআইয়ের সেরা এবং নিখুঁত এক গোয়েন্দা দল। সিবিআইয়ের নীরজকুমার, দিল্লি পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রাজবীর সিং, ইনস্পেক্টর মোহনচাঁদ শর্‌মা, ইনস্পেক্টর রাজেন্দ্র বক্সি, সাব ইনস্পেক্টর মেহতাব সিং। এই পাঁচজনের টিম। সঙ্গে সহায়তার ব্যাক আপ। তেক্কাত সিদ্দিকি ফোন করে তাঁর দাদাকে আভাসে ইঙ্গিতে মালয়ালি ভাষায় মিনিমাম যেটুকু ইনফরমেশন দিতে পেরেছিলেন, সেটা পেয়েই অ্যাকশন শুরু। প্রথমেই ফোন করা হল ওয়ান নাইন সেভেনে। এনকোয়ারি। সেই যে তেক্কাত একটি দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা ফোন নম্বরের কথা বলেছিল সেটির সোর্স কী? ৬৬৮৩৮৯৯। ওয়ান নাইন সেভেন থেকে জানানো হল নম্বরটি দিল্লির মালবিয়া নগরের। ঠিকানা এফ ৭৩ বেগমপুর, মালবিয়া নগর। এই ইনপুট থেকে তদন্ত শুরু।

রাত দেড়টা। নীরজকুমার ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ ফোন বাজছে। এত রাতে? কে? কী হল? ফোন তুলে শোনা গেল রাজবীর সিংয়ের কণ্ঠ। স্যার!..ইয়েস রাজবীর...স্যার, লোকেশন

লোকেট করা গিয়েছে। যে দোকানের কথা তেব্বাত বলেছে সেটা আছে। আর পাশেই একটা বাড়ি। তাহলে? স্যার টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না। লেটস মুভ নাউ..

নীরজকুমার লাফ দিয়ে নামলেন বিছানা ছেড়ে। দ্রুত ওয়াশ রুম সেরে এসে পোশাক পরে নিলেন। অবশ্যই সিভিল ড্রেস। পয়েন্ট টু টু ওয়াল্টার পিপিকে পিস্তলটা আলমারি থেকে বের করছেন নীরজকুমার। সাবধানে। কিন্তু ওটুকু শব্দেই স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। একী ! এই মাঝরাতে কোথায়? পিস্তল কেন? নীরজকুমার বললেন, একটা ছোট কাজ আছে। স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হলেও বিস্মিত নয়। কারণ এটা অনেক সময়ই হয়েছে আগে। শুধু বললেন, বি কেয়ারফুল। নীরজকুমার হাসলেন। তাঁর মাথায় চিন্তা কাজটা কি হবে আজ? অফিসিয়াল গাড়ি ডাকার সময় নেই। তাই নিজের গাড়ি বের করলেন তিনি। নিজেই ড্রাইভ করে যাচ্ছেন। রাজবীরের ফোন আবার। স্যার...প্ল্যান কী? নীরজকুমার বললেন, এসেক্স ফার্ম। আইআইটির কাছে। কাম শার্প! তাই হল এবার সিবিআইয়ের আরও দুই অফিসারকে খবর দেওয়া হল। কারণ নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের একজন এই অপহরণ কেসের ইনভেস্টিগেশন অফিসার। তাঁর নাম রামনীশ এবং হিতেশ অবস্থি। বেগমপুর জায়গাটা কেমন? দক্ষিণ দিল্লির মধ্যে। একদিকে সবোদয় এনক্লেভ। অন্যদিকে সর্বপ্রিয়া বিহার। মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যে বিএমডব্লু আর মার্সিডিস দাঁড়িয়ে থাকে পার্কিংয়ে। আর এখানে গোরু, মহিষ ঘুরছে। সরু লেন। এরকম এলাকায় একজন করে লোক থাকে যাকে স্থানীয় মানুষ সম্বোধন করেন ‘প্রধান’। যেমন ধরা যাক আমাদের পরিচিত পঞ্চায়েত প্রধান। ইনস্পেক্টর রাজেন্দ্র বক্সিকে এই টিমে নেওয়ার কারণ কী? কারণ তিনি এই বেগমপুরেই বড় হয়েছেন এবং এখানেই তাঁর আসল বাড়ি। বক্সি চেনেন প্রধানকেও। তাই সেই ভোররাতেই প্রধানকে তোলা হল বাড়ি থেকে। অপারেশন একটু পরই শুরু হবে। দুটি গাড়িতে ওঠা হল। কিন্তু পুলিশের গাড়ি নয়। কোথাও লেখা নেই যে পুলিশের গাড়ি। প্রধানকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হল ওই বাড়িটায় কারা থাকে? প্রধান দেখা গেল কিছু কিছু জানে। বললেন, বাড়িটায় কিছু সন্দেহজনক লোকজন যাতায়াত করে এটা ঠিক। জামাকাপড় আর হ্যান্ডিক্র্যাফটের এক্সপোর্টার ওটার মালিক। ওই এক্সপোর্টার নিয়ম করে শুনেছি দুবাই আর গালফ কান্ট্রিজে যায়। বাড়িটার পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে গাড়ি দাঁড়াল। জায়গাটা বিরাট

বড় একটা লনের মতো। তেঙ্কাত মালায়ালি ভাষায় ফোনে বলেছিল, সেকেন্ড ফ্লোরে। কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোরে উঠতে গেলে মই চাই। সেটা সম্ভব নয়। অতএব ফ্রন্ট গেট। তাছাড়া উপায় নেই। প্রধানকে বলা হল আপনি ডোরবেল বাজান। তাই হল। ডোরবেল শুনেই মিনিটখানেকের মধ্যে ল্যান্ডিংয়ে একটা লাইট জ্বলল। আগাপাশতলা চাদরে মোড়া একটি ছেলে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। প্রধান গেটে দাঁড়ানো। কিন্তু পুলিশের টিম আড়ালে। লুকিয়ে। তাঁদের দেখা যাচ্ছে না। ছেলেটি জানতে চাইল কী ব্যাপার? প্রধান বললেন, দরজা খোলো! কিন্তু নিমেষের মধ্যে ছেলেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ধুপধাপ করে সিঁড়ি ধরে উপরে গিয়ে লাইট নিভিয়ে দিল। গোটা বাড়ি অন্ধকার। প্রধান এবার চিৎকার করছেন, দরওয়াজা খোল দো! দরওয়াজা খোল দো..। কোনো সাড়াই নেই। আর অপেক্ষা করা যায় না। যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়! অতএব আড়াল থেকে রাজবীর সিং নীরজকুমার মোহনচাঁদ শর্মারা বেরিয়ে এলেন। উপর্যুপরি ধাক্কা আর একটা ছুরি লকের মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিতেই গেট খুলে গেল। দুটি দলে ভাগ হয়ে গোটা টিম প্রথমে ফার্স্ট ফ্লোর আর দ্বিতীয় দলটি গেল সেকেন্ড ফ্লোরে। হাতে প্রত্যেকের অটোমেটিক রিভলভার। ব্যাকআপে দুজন। অন্ধকার নিকষ। প্রথম দরজাটায় ধাক্কা দেওয়ার আগেই অকস্মাৎ খুলে গেল। এরপর পাশেরটা। পরপর তিনটি রুম। আশ্চর্য ঘটনা। সব রুমে একঝাঁক নেপালি যুবক। ভয়ে জড়সড়। চাদরে ঢাকা। আর কে আছে? বাড়ির মালিক কোথায়? চিৎকার করে উঠলেন রাজবীর। ভয়ে আতংকে নেপালি দুটি ছেলে বলল তারা জানে না। তারা এখানে কাজ করে জামাকাপড় তৈরির। তাহলে দরজা না খুলে পালিয়ে এলে কেন? তারা জানাল যতজন এই বাড়িতে থাকার কথা কেয়ারটেকার তার থেকে আরও বেশি বাইরের কয়েকজনকে থাকতে দিয়েছে। তাই তার ভয় যদি মালিক জানতে পেরে যায় তাহলে চাকরি যাবে। এইসব ছেলেদেরও কাজ চলে যাবে। তাই কেয়ারটেকার ভয় পেয়ে ওরকম করেছে। কিছুটা হতচকিত হয়ে গেল পুলিশ টিম। কারণ এরা ছাড়া সত্যিই গোটা বাড়িতে কিছু নেই। অথচ বিবরণ সব মিলে যাচ্ছে। এমনকী আকাশে খুব কাছের থেকে প্লেন উড়ছে। তাহলে? এখন উপায় কী? আর কোনো পথ নেই। এখন আর রাখঢাক নয়। তল্লাশি করতে হবে গোটা মহল্লায়। যাকে বলা হয় কম্বিং অপারেশন। সমস্যা হল এই জাতীয় মহল্লায় প্রায় সব বাড়ি একইরকম দেখতে।

একই ছাঁচের। রং নেই। ইট বের করা। টানা উঠে গিয়েছে। প্লাস্টারহীন দাঁত বের করা দোতলা তিনতলা, চারতলা। ঘরে ঘরে হানা দেওয়া শুরু হল। রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াল। যদিও এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল। এবং সম্পূর্ণ আনপ্রফেশনাল। কারণ কিডন্যাপাররা প্রথমেই অপহৃতকে খুন করে দেবে। তারপর চলবে হয়তো এনকাউন্টার। কিন্তু এই কেসের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যেভাবেই হোক আবুধাবির ব্যবসায়ীকে অক্ষত ধরতেই হবে। একটুও আঁচ যেন না লাগে। বেশিরভাগ বাড়িই দেখা গেল আসলে মেস। একটি ঘরে দুটি তিনটি করে ছেলে। তারা আইআইটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় চান্স পেতে চায়। এখানে থাকে আর দিল্লির কোনো না কোনো ইনস্টিটিউটে কোর্স করে। তাঁরা সকলেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা। ভয়ে কম্পমান সকলেই। কোনো লাভই হল না। অপারেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এটা সেই জায়গাই না। কিন্তু সবই মিলে গেল যে? গোটা টিম ফিরে এল। সকলেই হতোদ্যম।

এরপর কী?

অন্যদিকে সেদিনই দুপুর আড়াইটের সময় আবার আহমেদ কোয়ার ফোন এল। ভাই তেক্কাত সিদ্দিকি।

ভাইয়া..আমাকে প্রচণ্ড ভয় দেখানো হচ্ছে। মারধরও করা হচ্ছে। তুমি কিছু ভেবো না। আমি টাকা প্রায় জোগাড় করেই ফেলেছি।

এত দেরি হচ্ছে কেন ভাইয়া? (উলটোদিকের ছাদে সবুজ একটা নেট। কার্নিশে প্লাস্টিকের টব।) কান্না..

কেঁদো না ভাই...কেঁদো না

আমাকে এরা মেরে ফেলবে আমাকে বাঁচাও (রাস্তায় জামাকাপড় শুকাচ্ছে..অনেক তারে জামাকাপড় মেলা)

আহমেদ কোয়া এসবই বললেন গোয়েন্দাদের। কারণ তাঁকে আবার মালয়ালি ভাষায় ওই কথাগুলোর মাঝখানেই ভাই এসব ইঙ্গিতগুলো দিয়ে দিয়েছে। সেটাই তিনি জানালেন

ফোনে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, তেক্কাতকে যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে উলটোদিকের বাড়ির ছাদে একটা সবুজ নেট লাগানো। কার্নিশে সার দিয়ে প্লাস্টিকের টব। টবগুলিতে ফুলের গাছ। আর একবার মাত্র বাইরে উঁকি মেরে দেখতে পেয়েছে রাস্তায় জামাকাপড় শুকাতে দেওয়া হয়েছে। বিরাট লম্বা তার গাছের সঙ্গে লাগানো। সেখানে ঝুলছে জামকাপড় আহমেদ কোয়ার থেকে এই ইনফরমেশন পেয়ে আরও সুবিধা হল। কিন্তু হলে হবে কি? মেন্টাল প্রেশারও তো বাড়ছে। কারণ স্বয়ং অপহৃত নিজেই নিজের জীবনকে বিপন্ন করে ফোনে কিডন্যাপারদের সামনেই দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে হলেও মালয়ালি ভাষায় গোপন কৌশলে অনেক ইনফরমেশন দিচ্ছে, আর তা সত্ত্বেও যদি ইন্ডিয়ান পুলিশ বা ডিটেকটিভ এজেন্সি অপরাধীদের ধরতে না পারে তাহলে সেটা হবে এক চরম লজ্জার। আবু ধাবির স্থায়ী বাসিন্দা তেক্কাত সিদ্দিকি। সেই দেশের সরকার থেকে ঘনঘন ফোন করা হচ্ছে ভারত সরকারের কাছে। কালিকটে রীতিমতো বিক্ষোভের পরিস্থিতি। সিদ্দিকির দেশের বাড়ি সেখানে। সব মিলিয়ে প্রবল মানসিক চাপ বাড়ছে। তদন্তকারী গোয়েন্দারা এবার তেক্কাতের ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল নম্বরটির কল ডিটেলস চেক করতে নামলেন। দেখা গেল একটা ফোন নম্বর থেকে বারংবার কল করা হয়েছে এই নম্বরে। সেটা স্যাটেলাইট ফোন। নম্বর ০০৮737627। আর তেক্কাতের কাছে লেখা এই নম্বরটির নাম হল বিজয় রাঠোর! কে এই বিজয় রাঠোর? আহমেদ কোয়া জানালেন এই সেই বিজনেসম্যান যার সঙ্গে ভাই সেরামিকস এক্সপোর্ট নিয়ে ডিল করতে গিয়েছে দিল্লি। এবার দেখা যাক দিল্লিতে নেমে আবু ধাবির নম্বর থেকে তেক্কাত কোথায় ফোন করেছিল। সেটা দিল্লির নম্বর। দেখা যাচ্ছে আবু ধাবি থেকে দিল্লিতে ল্যান্ড করেই তেক্কাত যে নম্বরে ফোন করেছিলেন সেটি হল ৯৮১০১। এবং কল রেকর্ড চেক করে দেখা যাচ্ছে সেই নম্বরের লোকটি একটি মেয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছে। আগামীকাল বিকেলে। বসন্ত কুঞ্জ এলাকায়। একটি সিনেমা হলের সামনে।

বিজয় রাঠোর.....বিজয় রাঠোর....বিজয় রাঠোর....। নামটা চেনা চেনা লাগছে। একইরকম যেন কিডন্যাপ..একইরকম ফোনকল। একইরকম মুক্তিপণ। নামটা কার যেন? দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের অফিসার মোহনচাঁদ শর্মা আর রাজবীর সিং পরস্পরের

দিকে তাকিয়ে আছেন। দুজনের ভুরু কুঁচকে। একই কথা ভাবছেন? এবং শর্মার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ইয়েস...গট ইট! ২০০০ সালে দিল্লির দেশবন্ধু গুপ্তা রোড থেকে অপহরণ করা হয়েছিল এক ব্যবসায়ী এম সি মহাজনকে। সেই কেস ক্র্যাক করেছিলেন তাঁরা। সেখানেও যে ফোন থেকে কল করা হয়েছিল মুক্তিপণের জন্য, সেটির IMEI নম্বর ছিল ৪৪৯১২৩৮৭১৫২ আর এই এখন যে ফোনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেটিরও IMEI নম্বর এই একই। অর্থাৎ একই ফোন? আগের কিডন্যাপিং কেসের আটজন ধরা পড়েছিল। কিন্তু আসল লোকটা পালিয়ে যায়। তার নাম বীরেন্দর পন্থ। ওরফে ছোটু। আর তার সবথেকে কাছের শাগরেদ চাঙ্কি। এই দুজনের কম্বিনেশন মারাত্মক। উত্তরপ্রদেশের নামজাদা মাফিয়া ডন বাবলু শ্রীবাস্তবের গ্যাং মেম্বার। বীরেন্দর পন্থ হিমাচল প্রদেশের এক হাই প্রোফাইল ধনী পরিবারের সন্তান। হরিয়ানার রাই ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছে। হ্যান্ডসাম, স্মার্ট এবং তুখোড় ইংরাজি বলতে পারে। বীরেন্দর আর চাঙ্কি গোটা দেশের অপরাধজগতে কিডন্যাপিং স্পেশালিস্ট। সুতরাং বিজয় রাঠোর আর কেউ নয়। ওই বীরেন্দর পন্থই। তার মানে বিরাট প্ল্যান! আবু ধাবিতে গিয়ে এই তেক্কাত সিদ্দিকির সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে বীরেন্দর। নিজেকে দিল্লির বিজনেসম্যান পরিচয় দিয়ে বিশ্বাসও অর্জন করেছে। তারপর ফাঁদ পেতেছে সেরামিকসের এক্সপোর্টের। আর সেই ফাঁদে পা দিয়েই তেক্কাত সিদ্দিকি আবু ধাবি থেকে চলে এসেছে দিল্লি। আর সেই সিদ্দিকি তাহলে আজ বীরেন্দরের কবজায়! আবু সালেম থেকে বাবলু শ্রীবাস্তব। ফজলুর রহমান থেকে কলকাতায় অ্যাটাক করা আফতাব আনসারির সর্বাগ্রে বীরেন্দর আর চাঙ্কি, এই দুজনের টিমকে বুক করে যে কোনো কিডন্যাপিংয়ে। এদের আন্ডারে ১২ জনের একটি নিখুঁত দল আছে। বাছাই করা ক্রিমিন্যাল। ১৭ মার্চ সিবিআই হেডকোয়ার্টারে ফোন করে তেকাত সিদ্দিকির দাদা আহমেদ কোয়া জানালেন, আর সময় দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ভাইকে বলা হয়েছে এবার মরার জন্য রেডি হতে। সিদ্দিকির পরিবার ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত দরকষাকষিতে রাজি হয়েছে। সেই টাকা তারা এবার পেমেন্ট করে ভাইকে বাঁচাবে। আর পুলিশের সাহায্য করার দরকার নেই। জানিয়ে দিলেন কোয়া। নীরজকুমার রাজবীর সিং স্তব্ধ! কারণ তাঁরা বাধা দিতে পারবেন না। সত্যিই তো! এত ক্লু পেয়েও এখনও বিশেষ কোনো ডেভেলপমেন্ট

নেই। কোয়া অনেক হেল্প করেছে। যে লোকটা কিডন্যাপড হয়ে আছে সে অনেক হেল্প করেছে। এরপরও কী চায় দিল্লি পুলিশ আর সিবিআই? নীরজকুমার একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের আজ কথা হয়েছে? কোয়া বললেন হ্যাঁ। কী বললেন তিনি? কোয়া নিস্পৃহ গলায় বললেন, কী বলার কথা? জানেন না! ভয়ে প্রায় হাফডেড। মারধর চলছে। নীরজকুমার বুঝলেন, কোয়া রেগে আছেন। স্বাভাবিক। তবু বললেন, আর কিছু? এবার কোয়া বললেন, হ্যাঁ আজও গোপনে আমাদের ল্যাংগুয়েজে বলল, কাছেই একটা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। কারণ প্রচণ্ড জোরে গান বাজছে। ব্যস!

এক নিমেষের মধ্যে রাজবীর সিংকে ফোন করলেন নীরজকুমার। তাঁকে বললেন এই ডিটেইলস। এবং ১০ মিনিটের মধ্যে রাজবীর রিং ব্যাক করলেন। জানালেন, স্যার, পাশের পাড়া সর্বপ্রিয়া বিহারে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। আর দেরি নয়। সেদিনই বিকেলে আহমেদ কোয়া দিল্লি আসছে টাকা নিয়ে। তাঁকে বলা হল আপনি টাকা দেওয়ার আগে একবার দিল্লি নেমে অন্তত আমাদের জানাবেন। আমরা ডিসটার্ব করব না। আমরা টাইমিং টা বলে দেব। সেই সময়ই টাকাটা দেবেন। কোয়া নিমরাজি হয়েও বললেন, আচ্ছা!

গোটা টিম আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়ে গেলেন হাউজ খাস এলাকায়। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে। কারণ যে সাইনবোর্ডে ফোন নম্বর দেখে তারা এই লোকালিটিকে আইডেন্টিফাই করেছেন সেই একই এক্সচেঞ্জ শুধু বেগমপুর নয়, সর্বপ্রিয়া বিহারেও হতে পারে এটা মাথায় আসেনি। যেহেতু ওটা পশ লোকালিটি। সর্বপ্রিয়া বিহার তো বোঝা গেল! কিন্তু ঠিক কোন বাড়িটা? পরপর গলি। সকলে একসঙ্গে যাওয়া হবে না। ঠিক হল একটি গলির এক প্রান্ত থেকে একজন প্রবেশ করবে, অন্য প্রান্ত থেকে আর একজন। আর যে কোনো সন্দেহ হলেই রাজবীরকে ফোন করা হবে। এই অপারেশনে লোক লাগবে। তাই দিল্লি পুলিশ আর সিবিআই মিলে ২১ জনের টিম করা হল। রবিবার। হঠাৎ এলাকায় কিছু অচেনা মুখ সন্দেহজনকভাবে ঘুরছে কেন? প্রায় প্রতিটি গলিতেই মুখে সন্দেহ নিয়ে জরিপ করছে আগন্তুকদের। কারা এরা। নিমেষে একটা ফিসফাস শুরু হল যে কিছু অচেনা মানুষ

এলাকায় ঢুকে পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে না তারা কারা! মোহনচাঁদ শর্মা আর বক্সিকে ফলো করা হচ্ছে। তাঁরা দ্রুত পায়ে লেন চেঞ্জ করছেন। কিন্তু পিছনে তিনজনে প্রায় তাড়া করছে ক্রূর চোখে। মেহতাব সিংকে ততক্ষণে আটকে দিয়েছে একদল লোক অন্য গলিতে। সমস্যা হল পুলিশের আইডেন্টিটি কখন ডিসক্লোজ করা হবে সেটা প্ল্যানে বলা নেই। তাই কেউই পাবলিকের সন্দেহ ভাঙাতে বলতে পারছেন না তাঁরা যে ডিটেকটিভ এজেন্সির। মেহতাবকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে। আচমকা সামনে উদয় হলেন রাজবীর সিং। তিনি এসেই মেহতাবকে হাত ধরে টেনে বললেন রান মেহতাব রান...। স্পট মিল গ্যায়া..। মেহতাব দৌড়। শুরু করলেন। নীরজুমার ততক্ষণে একটা গলির সামনে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে। তিনিই ফোন করেছেন রাজবীরকে। ফোন করা হয়েছে মোহনচাঁদ শর্মা ও বক্সিকে। ছুটছেন মেহতাব আর রাজবীর। পিছনে একদল জনতা। এবার রাজবীরের হাতে উঠে এল একটা পিস্তল! ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখে হাত দিয়ে বললেন, বিলকুল সাইলেন্ট! কোই পিছে নেহি আওগে..পুলিশ..এখানে একটা অপারেশন হবে। চুপ করে ঘরে ঢুকে যাও। ওয়েল বিল্ট, হ্যান্ডসাম, শীতল চোখের রাজবীরের হিসহিসানি থ্রেট শুনে জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল। এবং শান্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করল। নীরজকুমার একা দাঁড়িয়ে। তিনি এগোচ্ছেন সামনে। সেখানে একটা ধোপা জামাকাপড়। ইস্ত্রি করছে। এটাই সেই এলাকা যেখানে রাস্তায় জামাকাপড় সার দিয়ে শুকানো হচ্ছে। ধোপাকে জিজ্ঞাসা করা হল এখানে একটা ক্রিমিন্যাল গ্রুপ লুকিয়ে আছে। ধোপাটি কোনো প্রশ্ন করলেন না। কোনো ভয় পেলেন না। শুধু হাত বাড়িয়ে বললেন, তিনটি বাড়ি পরে। ওই যে...। অবাক নীরজকুমার। এবং এগিয়ে দেখলেন সত্যিই একটা বাড়ির ছাদে সবুজ নেট। আর তার সামনেই একঝাঁক টব রাখা। লাল রঙের গোলাপ ফুটে আছে। ততক্ষণে উলটোদিক থেকে ঢুকেছেন রাজবীর। তিনি এসেই নীরজকুমারের দিকে তাকিয়ে বুঝে গেলেন কী করতে হবে। চারজনের টিম ভিতরে ঢুকে গেলেন। এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শোনা যাচ্ছে ভয়ংকর গুলির যুদ্ধের শব্দ। প্রবল আর্তচিৎকার। অবিরল গুলির শব্দে গোটা লেনের দুপাশে জড়ো হচ্ছে সাধারণ বাসিন্দারা। ব্যালকনি টেরেসে ভিড় জমছে। ঠিক তখন যে বাড়ির তিনতলায় চলছে যুদ্ধ সেখানে দোতলার বারান্দায় একটি মেয়ে কোলে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কাঁদছেন...কাঁপছেন.........মুঝে বাঁচাও....মেরে বাচ্চেকো বাঁচাও কোই...। নীচে থাকা মেহতাব সিং এক লহমায় গ্রিল ধরে ঝুলতে ঝুলতে একতলার কার্নিশে। একটা দড়ি ঝুলছে। টবে আটকানো। সেটি ধরে তিনি উপরে উঠতে গেলেন। কিন্তু পলকা দড়ি। ছিঁড়ে যেতে পারে। ছিঁড়েও গেল কিন্তু একটা শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে দোতলার রেলিং এক হাতে ধরে ফেললেন। অন্য হাতে বাচ্চাটাকে দিতে বললেন। কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি বাচ্চাকে দিল। ততক্ষণে আরও দুজন পুলিশ নীচে দাঁড়িয়েছেন। বাচ্চাকে ফেলে দিলেন মেহতাব। নিখুঁত ক্যাচ নিলেন সেই দুজন। এবার মেয়েটিকে বলা হল নেমে আসতে। মেয়েটি মেহতাবের কাঁধে পা রেখে একইভাবে কোলে। আর নিরাপদে নেমে এলেন।

তিনতলায় গুলি থামছে না। গোটা এলাকা ব্যাক আপে রাখা হয়েছে । আর একটি টিম যাবে উপরে। সেইমতো সিঁড়ির দিকে এগনো হচ্ছে। আচমকা স্তব্ধ সবদিক। গুলি নেই। এক মিনিট...দুই মিনিট...। তিনতলার ব্যালকনির দরজা খুলে গেল। মোহনচাঁদ শর্মার মুখে হাসি, কাঁধে রক্ত, বুকে রক্ত...। ডান হাতে ধরা তেহাত সিদ্দিকির হাত। চিৎকার করে বললেন, স্যার..সাকসেস..। গোটা টিম এবার উপরে উঠে এলেন। দেখা গেল মেঝেতে ব্যালকনিতে সিঁড়িতে রক্তাপ্লুত হয়ে তিনটি দেহ। তারা কারা? স্বয়ং বীরেন্দর পন্থ, চাঙ্কি আর সুনীল নাথানি। এই অপারেশন সম্পূর্ণ সফল হল। অসামান্য সাহসিকতা দেখালেন গোটা টিম। এদিকে ততক্ষণে আর একটি টিম বসন্তকুঞ্জে গিয়ে একটি সিনেমা হলের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করেছে অমরকে। সে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

ভারত সরকার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নীরজকুমার রাজবীর সিংয়ের প্ল্যানমাফিক তিনতলায় উঠে কিন্তু একাই অপারেশনের নেতৃত্ব দিলেন ইনস্পেক্টর মোহনচাঁদ শর্মা। কারণ তিনি দুর্দান্ত শার্প শুটার। গুলির লড়াইতে তাঁর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু ঠিক ৭ বছর পর ২০০৮ সালে দক্ষিণ দিল্লিরই আর একটি ঘিঞ্জি লোকালিটিতে এরকমই এক শ্বাসরুদ্ধকর অপারেশনে তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে ধরতে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। নেতৃত্বে ছিলেন মোহনচাঁদ শর্‌মা। সকাল থেকে প্রবল গুলি বিনিময়। রহস্যময়ভাবে একজন সেই এনকাউন্টারে মারা গিয়েছিলেন। সবথেকে আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি বুলেটপ্রুফ

ভেস্ট পরেননি সেদিন। বাকিরা সকলে কিন্তু পরেছিলেন। কেন? সামনে থেকে নয়। পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। কেন? কে সেই পুলিশ অফিসার? মোহনচাদ শর্মা! সে তো অন্য গল্প!

২৩

দাদাকে ভালোবাসে দাউদ। কিন্তু এসব তার পছন্দ হচ্ছে না। সরাসরি কেউ বলেনি। কিন্তু দাউদের কানে এসেছে দাদা আজকাল মাঝেমাঝেই রাতে বাড়ি থাকে না। সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যায়। ফেরে পরদিন সকালে। অথচ ভাবী প্রেগন্যান্ট। এমনিতে বাড়িতে দেখভালের জন্য সবাই আছে। সেরকম রিস্ক নেই। তবু নিজের স্বামীর তো পাশে থাকা উচিত এসব সময়। তাছাড়া এমন নয় যে বিজনেসের কাজে দাদা বাইরে রাত কাটাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে দেখা করছে এসবও দাউদের জানা। তাই বিরক্ত লাগছে। রাগ হচ্ছে। দু একদিন বাড়িতে ঢোকার সময় ভাবীর কান্না আর দাদার চিৎকার তার কানে এসেছে। কিন্তু এই দাদা তাকে ছোট থেকে সবসময় সবরকম ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছে। একবার একটা লোক মাহিমের রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা গুনছিল। বাড়িতে চরম অভাব তখন। দাউদ সেটা দেখতে পেয়ে টাকাটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু লোকটা তাকে চিনতে পেরে গেল কীভাবে যেন। সোজা বাবাকে এসে বলে দেয়। বাবা তখন চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়ে বসে আছেন। সংসারে এতই টানাটানি যে সবার খাওয়া জুটছে না রোজ। তাই দাউদ ওই বাচ্চা বয়সেই প্রথম ক্রাইমটা করেছিল। বাবা সেদিনই ঘরে ঢুকে রাতে তাকে একের পর এক থাপ্পড় দিলেন। কান থেকে রক্ত বেরিয়ে যায়। সকলেই বাবাকে ভয় পায়। তাই কেউ কিছু বলতে পারছিল না। দিদি হাসিনা শুধু কাঁদছিল খুব। একমাত্র দাদা এগিয়ে এসে বাবাকে বলেছিল, ওর দোষ নেই, আমিই ওকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। ও রাজি হয়নি। আমিই জোর করি। বলি ডরপোক। আর তাই ও ওরকম একটা কাজ করে ফেলেছে। বাবা ইব্রাহিম কাসকর শুনে অগ্নিমূর্তি হয়ে যান। এবং বড় ছেলেকে বেল্ট দিয়ে পেটান। একটুও নড়েনি দাদা সাবির ইব্রাহিম। ভাইয়ের অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। রাতে পাশাপাশি শোয়ার পর দাউদ দাদার পিঠে মলম লাগাতে লাগাতে কাঁদছিল। দাদা তাকে বলে ধুস, কিচ্ছু হয়নি। চিন্তা করিস না। তবে এরপর আব্বুর কানে যেন এসব না যায়! সেই দাদাকে তাই অন্যায় দেখলেও দাউদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। সে জানে এ দুনিয়ায়

আম্মা ছাড়া এই লোকটা তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। কিন্তু ভাবীর সঙ্গে দাদা এটা কী করছে? এটা ঠিক নয়।

সাবির ইব্রাহিম চিত্রাকে ভালোবেসে ফেলেছে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের কংগ্রেস হাউস নামক বিল্ডিং আসলে একটি রেডলাইট এরিয়া। দেহোপজীবিনীদের বসবাস। সেখানেই থাকে চিত্রা। সাবির আগেও একবার ভালোবেসেছে। শাহনাজকে। তাকেই বিয়ে করেছে সে। ভালোই তো দিন কাটছিল। দুজনের একটি সন্তানও হয়েছে। ভাইয়ের বিজনেস বাড়ছে। সবথেকে বড় কথা গত বছর পাঠান গ্যাংয়ের সঙ্গে সবরকম বিবাদ সমাপ্ত হয়েছে। একটা ডিল হয়েছে।

পাঠান আর তাদের গ্যাং একসঙ্গেই কাজ করবে। এই মিলন ঘটিয়েছে হাজি মস্তান। ফলে বিজনেসও বাড়ছে। বিজনেসের কাজে একবার এই কংগ্রেস হাউসে আসতে হয়েছিল। সেবারই প্রথম মুখোমুখি দুজন দুজনকে দেখে। চিত্রা আর সাবির। এবং ভালোবাসা তৈরি হল। আর ঠিক সেই সময় দ্বিতীয়বারের জন্য সন্তানসম্ভবা হল স্ত্রী শাহনাজ। প্রথম সন্তান পুত্র। সিরাজ। দ্বিতীয়টি কন্যা হোক। এটাই চায় দুজনে। চিত্রার সঙ্গে আলাপের পর সাবিরের আচরণ কি বদলে গেছে? সে কি আর ভালোবাসে না শাহনাজকে? একদমই নয়। শাহনাজের প্রতি তার প্রেম অটুট। সেটা শাহনাজও জানে। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে চিত্রাকে ভুলতে পারে না। সাবির। সেটি হল যতই আন্ডারওয়ার্ল্ডের জগতে যাতায়াত হোক, সাবিরের মধ্যে একটা যেন অন্য মনও আছে। সে গজল শুনতে ভালোবাসে। বেশ কিছু শায়েরিও লিখেছে। আর চিত্রার সেগুলোই বেশি পছন্দ। সে ওখানে গেলে চিত্রা বলে, নতুন কী লিখেছ? আমাকে শোনাতে হবে কিন্তু! এভাবে কখনও কেউ সাবিরের কাছে শায়েরি শুনতে চায়নি। গজলের অর্থ জানতে চায়নি। ক্র্যাফোর্ড মার্কেট থেকে কেনা একটা চামড়ার হোলস্টারে কোমরে পিস্তল রাখা থাকে সাবিরের। কারণ চারদিকে শত্রু। সেই হোলস্টারে পিস্তল রাখা অবস্থায় দক্ষিণ মুম্বইয়ের কংগ্রেস হাউসের একটি ছোট্ট ঘরে এক দেহোপজীবিনীকে এক মাফিয়া গ্যাংস্টার

শায়েরি শোনাচ্ছে এই দৃশ্যটি একেবারেই হিন্দি সিনেমার চিত্রনাট্য বটে। তবে ঠিক এরকমই ঘটে চলেছে দিনের পর দিন। সকলের অলক্ষে!

কিন্তু সাবির কিংবা তার ভাই জানেই না যে দুই পাঠান ভাই আমীরজাদা আর আলমজেব এক বছর মিত্রতার পরই বুঝে গিয়েছে ওই দাউদ গ্যাংয়ের সঙ্গে হাত মেলানোয় তাদের কোনো লাভই হয়নি। বিজনেসের সব লাভ ঘরে তুলছে দাউদ একাই। তাদের সিন্ডিকেট ইউজ করে দাউদ। মুনাফার লাভ দেয় না। তারা কিছুদিন ধরেই চাইছিল দাউদের পোর্টে আসা মালের একাংশের বিজনেস যেন তাদের দেওয়া হয়। দাউদ রাজি নয়। সে শুধু কমিশনই দিতে রাজি। ডাইরেক্ট বিজনেস নেটওয়ার্ক সে তুলে দেবে না এদের হাতে। কারণ কী? কারণ তার আগে কেউ এই স্মাগলিং বিজনেসকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যায়নি। সকলে দেশের মধ্যেই পাচার করত বাইরে থেকে আসা মাল। দাউদ একাই নিজের প্রচেষ্টায় দুবার দুবাই গিয়ে নেটওয়ার্ক করে এসেছে। সুতরাং তার ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। এসব সে ভাগীদার করবে কেন? অতএব দূরত্ব বাড়ল। পাঠান ভাইয়ারা অবশেষে স্থির করল একটাই প্ল্যান। এই দুই ভাইকে খতম করতে হবে। তাহলে গোটা গ্যাং তাদের হাতে আসবে। এটাই একমাত্র পথ। সুতরাং প্রথমে অপারেশন সাবির!

সাবিরের সঙ্গে চিত্রা নিজের বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির পথ পেয়েছে। সাবির এলেই কিছুক্ষণ পরই তারা বেরিয়ে পড়ে বাইরে। গোটা মুম্বই চক্কর খায় গাড়িতে। সাবির গজল শোনায়। চিত্রা শোনে। সাবির স্পিড তোলে ফাঁকা জুহুবিচকে পাশে রেখে সমুদ্রতীরে। চিত্রা স্টিয়ারিংয়ে হাতে হাত রাখে। ছোট্ট গাড়ি। ছোট্ট পরিসর। চিত্রার প্রিয় তাদের এই ছোট্ট গাড়ি-সংসার। গাড়ির নাম প্রিমিয়ার পদ্মিনী। ১৯৮১ সালের মুম্বই অনেক ফাঁকা। সন্ধ্যায় শাহনাজের মেডিকেল চেক আপ ছিল। দুজনে ফিরে এসেছে। আজ বেরোবে না তো সাবির? ভাবছিল শাহনাজ। সেই সময়ই ফোনটা বাজল। সাবির ধরল। ওপ্রান্তে চিত্রা। চিত্রা শুধু বলল, আমার ভালো লাগছে না। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। আজ আসবে একবার? সাবির একটু ইতস্তত করছে। আজ তার বেরনোর প্ল্যান বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না। কিন্তু এভাবে তো কখনও চিত্রা ডাকে না। কী হয়েছে? অতএব একবার যাবে সাবির।

আমি একটু বেরোচ্ছি। বলে বেরিয়ে গেল সাবির। শাহনাজ বিষণ্ন হয়ে পড়ল আবার। চোখে জল এল। কিন্তু কিছু বলল না।

না। আজ ঘরে বসা হবে না। চিত্রা চায় একটু খোলা বাতাস। বাইরে চলো। গেল তারা বাইরে। ঠিক হাজি আলি দরগার বাইরের রাস্তায় ফাঁকা সড়কে সাবির রিয়ারভিউ আয়নায় দেখতে পেল তার গাড়ির পিছনে একটি অ্যামবাসাডর। দেখে হাসল। বিয়ের মরশুম চলছে। ওই গাড়িতে নতুন বরবধূ বসে। গোটা গাড়ি ফুলে ঢাকা। আর সঙ্গে বেশ কিছু বিয়েবাড়ির লোক। অবশ্য ফুলে মুখ ঢাকা বরবধূর। এবার আচমকা চোখ পড়ল গাড়ির ফুয়েল মিটারে। যাহ! তেল তো প্রায় নেইই। পেট্রল ভরতে হবে। কাছেপিঠে পেট্রল পাম্পও নেই। কোথায় যাওয়া যায়? প্রভাদেবীতে একটা আছে। সাবির সেদিকেই গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই পেট্রল পাম্পে পৌঁছে ট্যাংক ফুল করে দিতে বলে চিত্রার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাবে। তখন আচমকা আবার জানালা থেকে দেখা গেল সেই সাদা অ্যামবাসাডর। বিয়ের বরকনেকে নিয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার সাবিরের সিক্সথ সেন্স কিছু একটা বলল তাকে। এটা তো খুব স্বাভাবিক নয়! কারা এরা? সাবির চিত্রাকে বলল গাড়ির জানালা তুলে দাও। নিজেও তুলে দিল। হোলস্টার থেকে আচমকা বের করে আনল পিস্তল। কিছু একটা হচ্ছে, কিন্তু কী হচ্ছে? বুঝতে পারছে না চিত্রা। আজ পর্যন্ত কোনোদিন পিস্তল বের করেনি সাবির তার সামনে। সর্বদাই সেটা আড়াল করে রেখেছে। আজ কী হল? এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে পেট্রল পাম্পের ছেলেটি এসে জানালায় মুখ বাড়িয়ে বলল, সাব, হো গয়া...। অ্যাক্সিলেটারে প্রবল শব্দে একটা গাড়ি ঢুকে এল। সোজা ব্লক করে দাঁড়াল সাবিরের গাড়িকে। চারজন লাফ দিয়ে সামনে। একজন প্রথমেই ড্রাইভিং সিটের পাশে এসে এক ঝটকায় দরজা খুলে চিত্রাকে বলল, নেমে যাও যদি বাঁচতে চাও...। চিত্রার মুখে কথা নেই। কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? সাবির স্তব্ধ । হাতে পিস্তল কিন্তু চোখের সামনে চিত্রাকেও তো পিস্তলের সামনে ধরে আছে একটি যুবক। যুবককে চেনে সাবির। মনোহর সুরভে। সবাই ডাকে মান্যা। অন্যরা আরও বেশি চেনা। আমিজাদা, আলমজেব। তাদের গ্যাংয়ের নতুন বিজনেস পার্টনার। পাঠান ভাই। নিজের মৃত্যু নয়, সম্ভবত সাবিরের চোখের সামনে প্রথম ভেসে উঠল ভাইয়ের মুখটা। ভাই দাউদ এই সময়

পাশে থাকলে...সে যখন জানবে তখন...। ড্রাইভিং ডোর খুলেই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল সাবির। আর তৎক্ষণাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। রক্ত, রক্ত, রক্ত। সাদা রঙের প্রিমিয়ার পদ্মিনীর ভিতরটা লাল হয়ে গেল। চিত্রা ঠিক বুঝতে পারছে না এসব যে সত্যিই হচ্ছে! এও হয়! চোখের সামনে? একটু আগেই সাবিরের হাতে তার হাত ধরা ছিল। আর সাবির এখন নেই? চিত্রা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সাবির মারা গিয়েছে। দাউদ ইব্রাহিমের বড় ভাই, সবথেকে প্রিয় মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলমজেব এখানেই শেষ করল না ব্যাপারটা। সাবিরের মাথা স্টিয়ারিং এ ঠেকেছে। সে মৃত। কিন্তু এখানেই রাগ শেষ হচ্ছে না। আলমজেব এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল। সাবিরের রিস্ট কেটে দেওয়া হল এক ঝটকায়! আবার। রক্ত..রক্ত..রক্ত!

সাবিরকে খুন করে অবশ্য শেষ হয়নি পাঠান গ্যাংয়ের সেদিনের অপারেশন। তারা এরপর আরও বড় আত্মবিশ্বাস নিয়ে গাড়িতে উঠল। এত সহজে এত বড় একটা অভিযান হয়ে যাওয়ায় তারা ভাবল "ভ কাজে দেরি কেন? আসল লোকটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাক। তাই সেই অ্যামবাসাডর সোজা এল পাকমোড়িয়া স্ট্রিট। বাড়ির নাম মুসাফিরখানা। লোহার গেট বন্ধ। দাউদ ভিতরে। বাইরের সিকিউরিটি গার্ডকে দুটো গুলিতে স্তব্ধ করে দেওয়া হল। এবার ঢুকতে হবে। আজ বংশ নিকেশ করা হবে এই কাসকরদের। এটাই টার্গেট। আর তৎক্ষণাৎ হঠাৎ ভিতরের দিক থেকে ধেয়ে এল উপর্যুপরি গুলিবৃষ্টি। পাঠান গ্যাং হতচকিত! একী ? এত রাতে এভাবে ভিতর থেকে গুলি চালাচ্ছে কে? এরা প্রত্যাশাই করেনি যে এভাবে কেউ গুলি চালানোর মতো এই মধ্যরাতে জেগে থাকতে পারে। ফলে শুরু হল গুলির লড়াই। যে গুলি চালাচ্ছিল তার নাম খালিদ পেহলওয়ান। দাউদের একনম্বর দক্ষিণ হস্ত আর শার্প শুটার। কিছুক্ষণ পরই পিছু হটে গেল পাঠান বাহিনী। কারণ তাদের গুলি শেষ। ছুটে আসছে দাউদ.. ছুটে আসছে আনীস, ছুটে আসছে খালিদ...। পালাচ্ছে পাঠানরা। পিছনে বাইক নিয়ে তাড়া করছে দাউদ। গুলি চলছে পাকমোড়িয়া স্ট্রিটে। এবার আচমকা দাউদের বাইকের স্পিড কমে গেল। কারণ তার মাথায় এল একটা অদ্ভুত বিস্ময়। দাদা কোথায়? গুলির শব্দ শুনে তারা সকলেই বেরিয়ে এল। দাদা নেই কেন? সে কোথায় ? বাড়িতে নেই? ততক্ষণে

পাঠানদের অ্যামবাসাডার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আর দাউদ খালিদকে জিজ্ঞাসা করেছে ভাইয়া কোথায়? খালিদ বাইক থেকে নেমে চোখ নামাল। মুখে কথা নেই। দাউদ বুঝল। ভাইয়া আজও বেরিয়ে গিয়েছে রাতে। সেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক তখন একটা বাইক আসছে উর্ধ্বশ্বাসে। কে আসছে? রঞ্জিত। দাউদের আর এক সাথী। রঞ্জিত কাঁদছে। রঞ্জিত কথা বলতে পারছে না। কেন? কী হয়েছে? রঞ্জিত কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলল, সাবির ভাইকো মার দিয়া কিসিনে! দাউদের বিশ্বাস হল না যেন কানকে। সে ঝাঁকাচ্ছে রঞ্জিতকে। তার মাথা কাজ করছে না। সাবির ভাই নেই?

দাউদ যেন এবার কোনো বদলা না নেয়! তার বাবা তাকে বোঝাচ্ছেন। ইব্রাহিম কাসকর জানেন দাউদ গোটা মুম্বইকে শ্মশান করে দিতে চাইছে। কারণ দাদাকে সে ভালোবাসে প্রাণের থেকেও বেশি। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক সময়ের হেড কনস্টেবল ইব্রাহিম কাসকর সোজা নিজের কর্মস্থলে গেলেন। সেখানে হাতজোড় করে বললেন, আমার বড় ছেলের খুনের তদন্ত করুন স্যার। দোষীদের সাজা না হলে আপনাদের চোখের সামনে শহরে রক্তের স্রোত বইবে কিন্তু। দাউদ এসব জানছে। দেখছে। কিন্তু এতদিন বাবা আর তার মধ্যে ছিল দাদা। বরাবর দাদা তাদের দুজনের মধ্যে হাজির হয়ে সবরকম ঝামেলা মিটিয়েছে। এখন দাদা নেই। সে তাই আর বাবার কথা শুনবে না। প্রতিশোধ নিতেই হবে। নাহলে তার স্বপ্ন ভেঙে যাবে। স্বপ্ন হল নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। সে হবে বেতাজ বাদশা। মুম্বই থেকে পাঠানদের উধাও করে দেওয়া হবে। একটাই গ্যাং থাকবে। তার গ্যাং। আর তার জন্য দরকার প্রতিশোধ। তার জন্য দরকার ভয়। সাম্রাজ্যের হাতিয়ার একমাত্র ত্রাস সঞ্চার করা। সুতরাং সুযোগ খুঁজছে সে। তবে ইব্রাহিম কাসকরের বারংবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে যাওয়া আর তার সতর্কবাণী এই কেসের ব্রেক থ্রু না হলে মুম্বইয়ের রক্তস্রোত বন্ধ করা যাবে না শুনে সত্যিই মরিয়া হয়ে ঝাঁপাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। কিন্তু কোথায় দুই পাঠান ভাই? তারা ততদিনে পালিয়েছে গুজরাতে। আমেদাবাদে কালুপুরা এলাকায়। সেখানে কী আছে? তাদের ওখানেও কি কোনো হাইড আউট আছে নাকি? তখনও পুলিশ জানে না এই দুই পাঠান ভাইকে কে আশ্রয় দিয়েছে? আমেদাবাদের মতো জায়গায় ক্রাইম শুধু আবর্তিত হয় মদ সাপ্লাই নিয়ে। বেআইনি মদের ভাণ্ডারের দখলদারি প্রধান

অপরাধ। এছাড়া জুয়া আর মটকা ডন আছে কিছু। আলমজেব আর আমিরজাদার কি তাহলে আমেদাবাদেও কোনো নেটওয়ার্ক আছে? এখনও পর্যন্ত পুলিশ জানে না সেটার সন্ধান।

দাউদের সবথেকে বড় শত্রুদের মুম্বই থেকে অনেক দূরে আমেদাবাদের এক গলির মধ্যে গোপন ঘরে যে আশ্রয় দিয়েছে সে লোকটির নাম আবদুল লতিফ। ১৯৫১ সালের ২৪ অক্টোবর জন্ম। বাবা আবদুল ওয়াহাব শেখ এলাকায় তামাক আর বিড়ি বিক্রেতা। সাত সন্তান। লতিফের স্কুলে পড়া বেশিদিন হল না। বাবার দোকানে সে বিড়ি তৈরি করতে শুরু করল। প্রতিদিন তার মজুরি ২ টাকা। কিন্তু এই টাকায় চলে না তার। আরও বেশি টাকা চাই। অতএব অন্য ধান্দা। মনজুর আলির মদ আর জুয়ার আড্ডায় যাওয়া আসার ফাঁকেই একদিন আবদুল লতিফ প্রবেশ করল মদের দুনিয়ায়। বেআইনি মদের ব্যবসা করলে টাকা যে জলের মতো আসবে সেটা প্রথম বুঝেছিল লতিফ। তাই শুরুতেই লতিফের প্রথম কাজ হয়েছিল যেভাবেই হোক পথের ছোটখাটো কাঁটা সরানো। হঠাৎ করেই দেখা যেত গুজরাত আর দিউর মধ্যে চলাচল করা ফেরি, ডিঙিতে একের পর এক মৃতদেহ ভেসে আসছে। কখনও সমুদ্রের চরে এসে ঠেকছে মৃতদেহ। কেন এই মৃত্যুমিছিল? কারণ লতিফ। গোটা গুজরাত জুড়ে এক ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গেল। বেআইনি মদের ব্যবসা করলেই লতিফের হাতে মরতে হবে। কারণ সে কোনো ছোট গ্যাংকেও এই ব্যবসা করতে দেবে না। এই সাম্রাজ্য তার একার। এভাবেই তার এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য চালাতে দরকার অন্তহীন অস্ত্র। সেসব কোথা থেকে আসবে? অস্ত্রের খোঁজে লতিফ গিয়েছিল মুম্বই। সেখানে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে দুই পাঠান ভাইয়ের। আলমজেব আর আমিরজাদা। তারা অস্ত্র দেবে লতিফকে। আর বিনিময়ে গুজরাতের কাছে দমন পোর্টে আরব থেকে ইলেকট্রনিক গুডস আর রুপোর বাট নিয়ে এসে সমুদ্রপথে মুম্বই পাঠাবে লতিফ। সেই বিজনেসের কমিশনও পাবে লতিফ। শুধু একটাই শর্ত। ওই আরব, দমন আর মুম্বই....এই রুটের মধ্যে আর যেন কোনো গ্যাং নাক গলাতে না পারে। আর কোন গ্যাংকে ভয়? দাউদ। সে মাঝেমাঝেই যায় দুবাই। তার নজর আছে গুজরাত উপকূলের দিকে। সুতরাং সাবধান। লতিফ অবজ্ঞাভরে হেসেছিল। সে নাম শুনেছে দাউদের। কিন্তু

পরিচয় নেই। চেনেও না। আর দেখেওনি। একটা জিনিস শুধু জানে। গুজরাতে সেই ডন। আর কেউ নেই। সুতরাং আলমজেব আর আমিরজাদা যখন সাবিরকে হত্যা করে মুম্বই থেকে পালানোর কথা ভাবল, তাদের একমাত্র মাথায় এল একটাই নাম। আমেদাবাদ। আবদুল লতিফ।

প্রেস্টিজ থাকছে না মুম্বই পুলিশের। সাবিরকে এভাবে হত্যা করার পর একজনও ধরা পড়ল না। ঠিক সেই সময়ই একজন প্রযোজককে কিডন্যাপ করা হল। মুশির আহমেদ। মুক্তিপণ নিয়ে ছাড়াও পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল একটু। মুক্তি পেয়েও ভয় পেলেন না। সোজা ক্রাইম ব্রাঞ্চে গিয়ে জানালেন কীভাবে অপহরণ হয়েছিলেন। কোন কোন রাস্তায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুদিক থেকে দুজন ধরে রেখেছিল। তার মধ্যেই যেটা

তিনি দেখেছিলেন তা হল একটা জায়গায় শোলের বিরাট পোস্টার। তারপর ১৫ মিনিট পর এমন একটা বাড়িতে ঢোকানো হল যেখান থেকে বাচ্চাদের কোরান পাঠের শব্দ শোনা যায়। আর বাড়িটা কাঠের ছিল। পুরোনো দিনের। ব্যস! আর কিছু নয়। ক্রাইম ব্রাঞ্চে একটা ফোন এসেছে। কোনো এক ইনফর্মার। সেই রহস্যময় ফোনটি জানিয়ে দিল প্রযোজক মুশির আহমেদকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যেখানে রাখা হয়েছিল সেটি কুখ্যাত পাঠান আলমজেবের অফিস। ট্রান্সপোর্টের। সেটাই তার ক্যামোফ্লেজ করা ব্যবসা। সবাইকে সে বোঝানোর চেষ্টা করে সে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করে। আসল ব্যবসা আড়ালে। সেই ফোনটিই ব্রেক থ্রু। তৎক্ষণাৎ ক্রাইম ব্রাঞ্চ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আলমজেবের অফিসে গিয়ে কাউকেই পাওয়া গেল না। শুধু কেয়ারটেকার একটি ছেলে একাই ছিল। সেলিম। তাকে জেরা করে অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল একটি নতুন ঠিকানার। আমেদাবাদ। কালুপুরা। পুলিশ দেখল একটি হোটেল। সাদা পোশাকে গিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না। কয়েকজন শুধু খাওয়া দাওয়া করছে। অপেক্ষা করতে হবে। এই হোটেল আবদুল লতিফের। পিছনেই আছে গেস্ট হাউস সেখানে চারটি ঘর। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর আসছে। গাড়ির নম্বর GUJ ৭৯৯৯। নামছে এক

ব্যক্তি। আমিরজাদা। গ্রেপ্তার করা হল তাকে সাবিরকে হত্যা আর মুশির আহমেদকে কিডন্যাপের অপরাধে। পিছনের গাড়িটি একটু দেরি করছিল। একটা বাড়িতে রাখা মদের ক্রেট লুকিয়ে আনতে হবে। সেই গাড়ি সেখান থেকে ফিরে দূর থেকে দেখতে পেল কী কারা যেন আমিরজাদাকে ধরে একটা অন্য গাড়িতে তুলছে। গাড়িতে বসা আবদুল লতিফ। আকবর নামের বাচ্চা একটা ছেলে খাবার জল ভরে আনে টিউবওয়েল থেকে। হোটেলের কর্মী। সে পিছনের গেট থেকে এসে লতিফকে জানাল পুলিশ এসেছে। বম্বে থেকে।

আর ঠিক সেই সময়ই আর একটি ফোন গিয়েছে পাকমোড়িয়া স্ট্রিটে। গুজরাত থেকে। ফোন ধরেছে খালিদ পেহলওয়ান। ফোনটি কানে নিয়ে ওদিক থেকে কোনো একটি সংবাদ শুনেই খালিদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে শুধু বলল, শুক্রিয়া! এক দৌড়ে ভিতরের ঘরে গিয়ে দাউদকে বলল, পাঠানকো পাকড় লিয়া পুলিশ! দাউদের মুখটা এক নিমেষে শক্ত হয়ে গেল। এবার! এবার টাইম এসেছে।

এমন কাউকে চাই যার কোনো পিছুটান নেই। যে এনকাউন্টারে মারা গেলে কোনো আফশোস নেই। যে ধরা পড়লেও জেরায় কোনো ডিটেইলস জানাতে পারবে না। সর্বোপরি যে হবে প্রচণ্ড শার্প শুটার। এরকম কাকে পাওয়া যাবে? চেনা আর অভিজ্ঞ ক্রিমিন্যালকে দিয়ে এটা করানো যাবে না। কারণ কার নার্ভ কতক্ষণ স্ট্রং থাকবে তা অনিশ্চিত। সব ফাঁস করে দেবে। অতএব আনকোরা কেউ করুক। যে প্রায় কিছুই জানে না। সেই আনকোরা নতুন ক্রিমিন্যালের নাম ডেভিড পরদেশি। রাজন নায়ার অর্থাৎ বড়া রাজন তাকে বাছাই করেছে। দাউদের কন্ট্রাক্ট। ছেলেটিকে তৈরি করতে হবে। ট্রেনিং দিতে হবে। টার্গেট আমিরজাদা। আমিরজাদা? তাকে তো অলরেডি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাহলে তাকে আর কীভাবে খতম করা ম্ভব? দাউদ জানে, যা সম্ভব না, সেটাই সে করে দেখাবে দুনিয়ায়। অতএব আমিরজাদাকে খতম করার প্ল্যান হয়েছে আদালতের মধ্যেই! যা ভূভারতে কখনও ঘটেনি।

১৯৮৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ডেভিড পরদেশিকে গাড়ির পিছনে বসিয়ে রাজন আর দুই শাগরেদ বলরাম বেণুগোপাল ও আলি আন্তুলে সিটি সিভিল কোর্টে নিয়ে গেল। গাড়ি চালাচ্ছে বলরাম। সেদিন আমিরজাদাকে কোর্টে প্রোডিউস করা হবে। প্ল্যান কী? প্ল্যান হল কোর্টের মধ্যে আমিরজাদাকে গুলি করবে ডেভিড। ঠিক যেখানে কাঠগড়া তার পাশেই একটা জানালা আছে। গুলিটা করেই ডেভিড সেই জানালা থেকে ঝাঁপ দেবে নীচে এমনভাবে যাতে একটা গাড়ির বনেটের উপর বা ছাদে সে পড়ে। সেই গাড়িতে বসে থাকবে রাজন নায়ার, বলরাম গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাখবে আর বাইরে থাকবে আলি। যদি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় ডেভিড তাহলে আলি তাকে তুলে ধরে ঢুকিয়ে দেবে গাড়িতে। এবং গাড়িটি জোরে চালিয়ে ৩ নং গেট থেকে পালানো হবে। নিখুঁত প্ল্যান। কারণ এই একই জিনিস দিনের পর দিন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। মহড়ার সময় ডেভিড এখন আর দোতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দিলে গড়িয়ে পড়ে না। সোজা গাড়ির বনেটেই নামতে পারে রোগা চেহারায়। চড়া সিকিউরিটি তেমন একটা নেই। কারণ পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে আদালতে আনা হবে এবং শুনানির পর জানা কথা জামিনের আবেদন ক্যান্সেল হবে। তাই আবার পুলিশ নিয়ে যাবে জেলে। সুতরাং রিস্ক নেই। ঢলঢলে জামা, হালকা প্যান্ট। ডেভিডের জামার মধ্যেই রাখা আছে রিভলভার। আমিরজাদাকে কোর্টে আনা হয়েছে। কাঠগড়ায় নয়। পাশে একটা জায়গায় দাঁড়ানো সে। কিন্তু একী ? এত ভিড় কেন? এটা তো আগে ভাবা হয়নি। ডেভিড দেরি করে ঢুকেছে। তাই পিছনে পড়ে গেল। সামনে অসংখ্য পুলিশ। উৎসাহী জনতা। কালো কোটের উকিল। ঘরটা এমন কিছু বড়ও নয়। তবু আমিরজাদাকে দেখা যাচ্ছে না। ভিতরে মাথায় ঢেকে যাচ্ছে সে। কী করবে ডেভিড? সে তো এগোতেই পারছে না! উত্তেজনায় ঘাম জমছে তার কপালে। এখন কি আগে থেকেই রিভলবার বের করে রাখবে? কিন্তু পাশের লোকজন দেখে ফেললে? আগেই ধরা পড়ে যেতে হবে। জোর করে সামনে দাঁড়ানো পুলিশের মাথা সরানো সম্ভব নয়। তাহলে সন্দেহ হবে। বের করে দেওয়া হতে পারে। কোর্টের বিচারক এসে গিয়েছেন। সরকারপক্ষের আইনজীবী পুলিশের চার্জ জানালেন। আমিরজাদার উকিল পালটা বলছেন, কোনো প্রমাণই তো নেই পুলিশের কাছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে...। ঠিক এই সময় দুজন

পুলিশ বেরিয়ে আসছে বাইরে। সামনে কিছুটা জায়গা পেল ডেভিড। নিমেষে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতেই জামার ভিতর থেকে রিভলবার হাতে নিয়েছে। এবার আমিরের মাথা টার্গেট করবে? নাকি বুক? মাথায় রিস্ক আছে। যদি একটু এদিক ওদিক হেলিয়ে দেয়? ডেভিডের নিজেরই মাথা ব্ল্যাংক হয়ে যাচ্ছে টেনশনে। সে পেশাদার অপরাধী নয়। প্রচুর টাকার লোভে রাজি হয়েছে। এরকম সময় একবার যেন তারই দিকে তাকাল আমিরজাদা। সোজা। ডেভিড আর দেরি না করে রিভলভার তুলে নিশানা স্থির করল। এদিকে কোর্ট প্রসিডিংস চলছে। দুই উকিল মুখোমুখি। বিচারক কিছু একটা নোট করছেন। পেশকারের হাতে একটা কিছু কাগজ, তিনি দেবেন বিচারককে। যে কোনো সাধারণ কোর্টরুমের স্বাভাবিক দৃশ্য। আমিরজাদার মুখে যেন একটু অবিশ্বাস! এটা হতে পারে নাকি? কিন্তু কয়েক সেকেন্ড! ডেভিড গুলি ছুঁড়ল। আমিরের কপালের মাঝখানে! বিস্ফারিত নেত্রে কাঠগড়ার কাঠের রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল আমিরজাদা। আর নিমেষের মধ্যে ডেভিড জানালার কাছে। কিন্তু তার থেকেও তৎপর ছিলেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ অফিসাররা। তাকে লক্ষ্য করে পালটা গুলি করল পুলিশ। ছিটকে পড়ে গেল ডেভিড। ঠিক জানালার নীচে তখন অপেক্ষা করছে রাজন নায়ারের টিম। কখন ঝাঁপ দেবে ডেভিড? আলি বাইরে দাঁড়িয়ে। সে বুঝে নিয়েছে কী হয়েছে। বলল, ডেভিড ধরা পড়েছে। গুলিও খেয়েছে। আর পাঠান? পাঠান খতম! ব্যস! এটাই তো জানার ছিল। এবার পালাও! কিন্তু ডেভিড কি বেঁচে আছে? নাকি মারা গিয়েছে সেও?

ডেভিড বেঁচে গেল শুধু তাই নয়। ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেরায় বলেও দিল রাজন নায়ার আর দাউদের নাম। গ্রেপ্তার করা হল দাউদকে। এর আগে তার বিরুদ্ধে ছিল কনসারভেশন অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ স্মাগলিং অ্যাক্ট (কফেপোসা) আইনের মামলা। ১৯৮০ সালে তাকে ওই মামলায় একবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এবার আবার সেই মামলার পাশাপাশি খুনের চক্রান্তে জড়িত থাকার অভিযোগ। কফেপোসা মামলায় যেহেতু দাউদ গুজরাত থেকে স্মাগলিংয়ের রুট তৈরি করেছিল তাই তাকে বারংবার হাজির করানো হত বরোদা আদালতে। পুলিশকে ক্রয় করা দাউদের বরাবরের শখ। এরকম সাফল্য আর কোনো অপরাধীর আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কাফেপোসা মামলায়

তাকে মুম্বই থেকে আমেদাবাদে আনা হত। আমেদাবাদের জেল থেকে বরোদা আদালতে যাওয়া একপ্রকার নিত্য রুটিনে পরিণত হয়েছিল কিছুদিন অন্তরই। সাব ইনস্পেক্টর বিশনয়কে হাত করেছিল দাউদ। সাব ইনস্পেক্টর বিশনয় 'আর টিমই দাউদকে বরোদা আদালতে নিয়ে আসা যাওয়া করত। আর দাউদের গুজরাতের নেটওয়ার্ক এতই স্ট্রং ছিল যে এই গোটা রুটে নারোল হাইওয়েতে একটি হোটেল চালাত তারই এক স্মাগলিং পার্টনার। সুতরাং আদালতে যাওয়া আসার পথে ওই হোটেলে পুলিশের জিপ ঢুকে যেত। দাউদ খাওয়া দাওয়া, পানীয় সহ রিলাক্স করত সেখানে। এজন্য অবশ্যই সাব ইনস্পেক্টর বিশনয় পারিশ্রমিক পেতেন। তিনি খুশি মনেই তাই দাউদকে সাহায্য করতেন।

সেদিন ছিল প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। জামালপুর মোড়। নারোলা হাইওয়ে। বরোদা আদালতে হাজিরা দিয়ে দাউদ ফিরছে। স্বাভাবিক ভাবেই দাউদ সেই হোটেলে ঢুকবে। একটু পরই আসবে হোটেলে। কিন্তু এত জ্যাম কেন? একটা লরি আড়াআড়ি রাখা আছে রাস্তার উপর। তাই জ্যাম। সাব ইনস্পেক্টর বিশনয় গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে তদারকি করছেন জ্যাম যাতে কেটে যায়। দাউদ আর তিনজন গাড়িতে। হঠাৎ পাশের গাড়িটির দরজা খুলে গেল। একটি লোক বেরিয়ে এল। দাউদকে লক্ষ্য করে আচমকা গুলিবৃষ্টি। চমকে উঠে দাউদ সিটের নীচে। তার সঙ্গে থাকা একজন পুলিশ হাতে রাখা লাঠি ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু লোকটা গুলি থামাচ্ছে না। দাউদ অন্যদিকের দরজা খুলেই ছোটা শুরু করল। ততক্ষণে ছুটে আসছেন সাব ইনস্পেক্টর বিশনয়। কে এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে দাউদকে টার্গেট করেছে? যে লোকটা গুলি করছিল তার নাম লিয়াকৎ মাস্টার। আর অন্য গাড়িতে যে বসে ছিল অর্থাৎ লিয়াকৎ মাস্টার যার অঙ্গুলিহেলনে এই অপারেশন করতে নেমেছে তার নাম আবদুল লতিফ। সেই আবদুল লতিফ যে আমিরজাদা আলমজেবের বন্ধু। আমিরজাদাকে খুনের বদলা নিতে নেমেছে সে। তাই এই দুঃসাহসিক টার্গেট। দাউদ বেঁচে গেল। কিন্তু দাউদ বুঝে গেল ভারত তার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। পালাতে হবে। আপাতত তাকে পালাতে হবে আবদুল লতিফের থেকে। এই লোকটা তো ভয়ংকর! যে কোনোদিন মেরে দিতে পারে! দাউদ বনাম আবদুল লতিফের এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কী হল? কে এই আবদুল লতিফ যে দাউদকে খতম করার কথা ভাবছে? তাকে আমরা

দেখেছি সবাই। একটা সিনেমায়। রইস! শাহরুখ খান সেজেছিলেন আবদুল লতিফ! কিন্তু সে তো সিনেমা! অনেকটাই চিত্রনাট্য। আসলে আবদুল লতিফের স্টোরিটা কী? চূড়ান্ত নাটকীয় !

২৪

ভাগ লতিফ ভাগ...

চিৎকার করছে জামিরা বেগম...ভাগ লতিফ ভাগ...। চিৎকার করছে লুৎফর.. ভাগ লতিফ ভাগ... চিৎকার করছে সুলেমানের আব্বা, ভাগ লতিফ ভাগ..

ওই যে ছুটছে আবদুল লতিফ! মরিয়া সেই দৌড়। আমেদাবাদের বাসস্ট্যান্ডের পিছনে পোপাতিয়াবাদের গলির মধ্যে থাকা কার্পেন্টার রশিদ, সেলুনের কর্মচারী আকবর, মদের ঠেকের রুস্তমভাই, মসজিদের বাইরে ফুল বিক্রি করা সাবির সকলের সামনে থেকে যখনই লতিফ প্রাণপণে ছুটে পেরোচ্ছে, তখন তারাও সব ফেলে দৌড়, শুরু করেছে তার পিছনে। আর পিছন থেকে বলছে ভাগ লতিফ ভাগ...। ছুটছে রশিদ, ছুটছে আকবর, ছুটছে রুস্তম, ছুটছে সাবির। আর সকলের পিছনে হাতে খোলা রিভলভার নিয়ে ছুটে আসছেন সাব ইনস্পেক্টর যোশী। অনেকটা পিছনে জিপ। সেখানে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে গুজরাতি ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে মাঝেমধ্যে, আবদুল লতিফ সারেন্ডার করো..। সারেন্ডার করা ধাতে নেই আবদুল লতিফের। সে সব বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে শুধু সামনের দিকে ছুটতে ভালোবাসে। তার প্রিয় গেম হল দৌড়। সেই ছেলেবেলা থেকে সে দৌড়ে চলেছে। কালুপুরের স্কুল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রচণ্ড খিদে থাকলেও আগে ছুটতে হত বাবার বিড়ির দোকানে। সেখান থেকে বিড়ির বান্ডিল নিয়ে ছুটতে হয়েছে মহল্লায় মহল্লায় পানের দোকানগুলিতে। রাত ৯ টা পর্যন্ত। একদিনে যতগুলো দোকান কভার করা যাবে ততই টাকা পাওয়া যাবে। দু টাকা রোজগার করতে তাই লতিফ ছুটেছে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। আজ সেই লতিফ কালুপুর আর পোপাতিয়াবাদের নতুন মসিহা। সকলেই তাকে ভালোবাসে। সকলের বিপদে লতিফের ছেলেরা আছে সবাই জানে। তাই আজ তার দৌড় আরও বেড়ে গিয়েছে। মনজুরের বিজনেসের থেকেও বড় বিজনেস করতে হবে। তাই ছুটেছে লতিফ। আজ আর ভয় কীসের। যাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে সে চেয়েছিল প্রচুর টাকার মালিক হতে সেই পরিবারের কর্তা বাবা আবদুল ওয়াহাব পাপের টাকা ছুঁতে ঘেন্না পান। তিনি বলে দিয়েছেন তোমার রোজগারের টাকা আমাদের দেবে না।

আমাদের চাই না। পাপের টাকা কেন? কারণ চোরাই মদ বিক্রির টাকা। লতিফ যতই নিজের পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করল, ততই কাছে এল হানিফ দুধওয়ালা, সঈদ বাপু, পিলু মারওয়াদি, আব্বাস অন্ধা। সকলেই মদের ব্যবসার বাদশা, শাহেনশাহ, সুলতান। এসব তো অনেক পরের কথা। তারও আগে কালুপুরের মনজুর আলির কাছে এই পথে হাতেখড়ি হয়েছিল লতিফের। বিড়ি সাপ্লাই করে করে তার আর ভালো লাগেনি। তাই একটা কিছু করতে হবে এই জেদ ছিল। আর আটজনের সংসার বাবার ওই বিড়ির দোকান টানবে কীভাবে? তাই আবদুল লতিফ ঠিক করেছিল তাকে রোজগার করতে হবে। অনেক টাকা। নতুন রাজ্য হিসাবে জন্মের পর গুজরাত শুরু থেকেই ড্রাই স্টেট। অর্থাৎ মদ বন্ধ। তাই এখানে ক্রিমিনালদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় একটিই পেশার মাধ্যমে। চোরাই মদের সাপ্লাই। অতএব প্রথম অপরাধ ব্যাগে কান্ট্রি লিকার ঢুকিয়ে সাপ্লাই করা দোকানে দোকানে। বাচ্চাদের পুলিশ বেশি সন্দেহ করে না। স্কুলের ব্যাগ নিয়ে একদিন দৌলত গলির দোকানে বিড়ির বান্ডিল পৌঁছে দেওয়ার সময় দেখা হয়েছিল দুই সাহেবের সঙ্গে। তারা পানের অর্ডার দিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু একটা ভাবে আলোচনা করছে। কানে এল লতিফের। সবরমতীর ওপারে নাকাবন্দি চলছে। বেজায়। চেনা মুখ দেখলেই পাকড়াও করছে পুলিশ। এখন উপায়? কাল সকালের মধ্যে সাপ্লাই করতে হবে। আর তার জন্য দরকার আনকোরা নতুন কোনো মুখ। যাকে কেউ চেনে না। কিন্তু এখন এত তাড়াতাড়ি কীভাবে সম্ভব পাওয়া? পানের দোকানের আসিফ চাচাও তাহলে সব শুনছিল? নাহলে তিনি কেন বলে উঠবেন মনজুর মিঞা রাতে কাউকে পাঠাব ঠেকায়? 'ঠেকা' হল মনজুরের জুয়া আর মদের দোকান। কয়েকটি রাস্তা পেরিয়ে যেতে হবে। মনজুর বিস্মিত। কাকে পাঠাবে? হাসিমুখে আসিফ বলল, সে আছে। তোমার কাজ হওয়া নিয়ে কথা। মনজুর রাজি। আগে তো পাঠাও! দেখি আবার কেমন হয়!

চলে গেল তারা। আর আসিফ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা লতিফকে বলে উঠল কীরে, টাকা চাই! অনেক টাকা! কোনো খাটনি নেই! শুধুই একটা মাল সাপ্লাই করতে বে। লতিফ আগুপিছু কিছুই চিন্তা না করে ঘাড় হেলিয়ে বলল রাজি। কী মাল জানিস?

লতিফের উত্তর ছিল, উসসে কেয়া ফর্ক পরতা চাচা! কাম তো কাম হোতা হ্যায়..বাস পয়সা চাহিয়ে। চমকে উঠল আসিফ! এরকম কথা এই বাচ্চা ছেলের মুখে শোনার প্রত্যাশা ছিল না। আসিফ জানত আবদুল ওয়াহাবের পরিবারের অবস্থা ভালো নয়। এই ছেলেটা রোজ এসে ব্যাগের মধ্যে থেকে বিড়ির বান্ডিল বিক্রি করে দেয়। তারপর দৌড়ায়। আবার অন্য কোনো দোকানে। তাই একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। আসিফ আর আসিফের মতো এই মহল্লার অন্যান্য দোকানি জানে এখানে মুশকিল আসান একজনই। মনজুর ভাই। লোকাল এলাকায় মদের ঠেক চালায়। আর অন্যান্য কিছু পাচারের কারবারও আছে। কিন্তু নিজের মহল্লার পাবলিকের কাছে সে লিডার গোছের। কাজে অকাজে টাকার দরকার পড়লে হেল্প করবে। ছেলে ছোকরাদের কোনো একটা কাজ জুটিয়ে দেয়। সে কাজ অবশ্য আলো অন্ধকার মেশানো। তাতে কী! খালি পেটে থাকার থেকে তো ভালো! তাই আসিফ মিঞার কাছে আর কোনো নাম মনে আসেনি। লতিফকে পাঠানো হল মনজুর আলির কাছে। সেই শুরু। পরদিন স্কুল ব্যাগের মধ্যে চারটে বোতল প্রথমে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল বাসস্ট্যান্ডে। টেস্ট কেস। সে আদৌ অভিনয় করে রাস্তা পেরিয়ে যথাস্থানে মাল পৌঁছাতে পারবে কিনা তা জানা দরকার। চোখেমুখে ভয় থাকলে হাবিলদারগুলো সন্দেহ করতেই পারে। লতিফ একচান্সে সেদিন পাশ করেছে। সে বিন্দুমাত্র ভুল না করে বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে লস্যির দোকানে দাঁড়ানো নীল জামার লোককে দেখে জিজ্ঞাসা করেছে ভাইয়া টিকিট কাউন্টার কোথায়? সে লোকটা হেসে বলেছে মাল কোথায়? লতিফ নির্বিকার কণ্ঠে বলেছিল, আগে টাকা চাই। হুবহু এসব শিখিয়ে দিয়েছিল আলি। নিখুঁতভাবে সেসব মনে রেখেছে লতিফ। অতএব লোকটিও নতুন এক ছেলেকে দেখে মনে মনে ভাবছিল মনজুর ভাই কোথা থেকে এসব গোল্ডেন রিক্রুটমেন্ট করে কে জানে! এই ছেলে বড় হলে কোথায় পৌঁছবে? টাকা দিয়ে মৃদু হেসে লোকটি চলে যায়। আর সেদিন থেকেই মাসিক ৩০ টাকা বেতনে মনজুর আলির কাছে বহাল হল আবদুল লতিফ। তারপর? তারপর আর পিছনে ফিরে তাকায়নি লতিফ। ঠিক তিন বছর ধরে এই কাজটি করার পর একদিন লতিফ বুঝল নেহাৎ আমেদাবাদের মধ্যে কান্ট্রি লিকার বিক্রি করে লাভ কী? সে মনজুর আলিকে বলেছিল আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। গোটা গুজরাত আমাদের টার্গেট

হোক। মনজুর চমকে উঠেছিল। এতবড় কথা কেউ ভাবেনি। এমনকী এই লাইনের সবথেকে ডেঞ্জারাস লোক হংসরাজও নয়। এই ছেলেটা কি একটু নিজেকে ওজন দিয়ে ফেলছে? ও জানে এই লাইন কীভাবে চলে। শুধু গোপনে কিছু দেশি মদের কারখানা তৈরি করে আর সোমনাথ মন্দিরের রুটে দিউ থেকে মাল নিয়ে এসেই কি এত বড় সম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখা যায় নাকি? লতিফকে ডেকে সেকথা বলল মনজুর। লতিফ বলেছিল আপনাকে কে বলেছে এসব থাকলেই শাহেনশাহ হওয়া যায়! আমিও জানি হওয়া যায় না। যা করলে হওয়া যায় আমি সেটাই করতে চাই। তবে একটাই কন্ডিশন। প্রত্যেক সাপ্লাইয়ে ফিফটি ফিফটি কমিশন থাকবে। মনজুর ঠাণ্ডা চোখে তাকাল। ছেলেটা বলে কী? এত সাহস পায় কীভাবে? এই সেদিন হাতে ধরে নিয়ে এলাম। শেখালাম সব নেটওয়ার্ক। আর আজ আমার পার্টনার হওয়ার শখ! ফুৎকারে ওসব প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে বলল মনজুর, এসব হবে না লতিফ। যেভাবে কাজ চলছে সেভাবেই চলবে। আমি এই গ্রুপের বস। আমিই ঠিক করব। লতিফ বলল, কাল থেকে আপনি ভাবতে শুরু করুন কী ভুল করেছেন আজ! কাল থেকে বিজনেস নয় আলি চাচা, আপনার মাথায় শুধু ঘুরবে কীভাবে একদিন আবদুল হওয়া যায়। এই মহল্লার সবাই চাইবে আবদুল হতে। আমি দেখিয়ে দেব মটকা থেকে জুয়া, ঠেকা থেকে সোনা, গুজরাতের বাদশা হবে একজনই। আবদুল লতিফ। মনজুর চিৎকার করে ডাকল তার দক্ষিণ হস্ত জহাঙ্গিরকে। জহাঙ্গির..ইসে বহার কা রাস্তা দিখা দো..। জহাঙ্গির...। কোথায় জহাঙ্গির? সে তো সর্বদাই খিদমত খাটার জন্য আলিভাইয়ের জন্য জান কবুল। রুবেল! রুবেল! জহাঙ্গিরকে না পেয়ে এবার রুবেলকে ডাকল আলি। রুবেল আর এক অনুগত। দুর্দান্ত ছুরি চালাতে পারে। বিরোধী পক্ষের কাউকে ডেকে এনে গলায় মসৃণভাবে ছুরি চালাতে জুড়ি নেই রুবেলের। একটুও নড়ছে না লতিফ। সোজা তাকিয়ে রয়েছে সামনে। মনজুর আলির দিকে। মনজুরের চোখে বিস্ময় জমছে। কী ব্যাপার? রুবেল নেই! জহাঙ্গির নেই! কোথায় গেল? ওরা তো এক মিনিটও মনজুরকে ছেড়ে যায় না। মিনিট খানেক কেটেছে। লতিফ এগিয়ে আসছে। কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, আলিচাচা, তুমহে আভি থোড়া রেস্ট লেনা চাহিয়ে! তুমি পুরানা খিলাড়ি হয়ে গেছ। আলি বিস্ফারিত নেত্রে দেখল রুবেল আর জহাঙ্গির কখন যেন

নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে লতিফের পিছনে। লতিফ শুধু বলল, ওরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে চাচা! নঈ দুনিয়ায়! আলির কাঁধ ছেড়ে দিয়ে লতিফ শুধু বলল, আসব মাঝে মাঝে...তোমার এলাইচি খেতে। দারুণ টেস্ট!

ঠিক পরদিন দুপুরে সাব ইনস্পেক্টর যোশী তার ফুল ফোর্স নিয়ে জিপে করে ঢুকলেন কালুপুরে গলিতে। আবদুল লতিফকে চাই। কেন? লোকাল থানায় খবর গিয়েছে পোপাতিয়াবাদের আঞ্জুম মহল্লার পিছনে মদ ডাম্প করা আছে। আর ওই গুদাম লতিফের। সত্যিই লতিফের। কিন্তু ওটা তো কাপড় জামার গোডাউন। ভর্তি কাটপিস। সেগুলো এসেছে কটন মিল থেকে। এলাকার মেয়েরা জামা বানাবে সারামাস ধরে। তারপর সাপ্লাই হবে ছোট মার্কেটগুলোয়। এটাও ঠিক। কিন্তু প্রতিটি কাপড়ের কার্টুনের মধ্যে রয়েছে প্রচুর মদের বোতল। সেগুলো সাপ্লাই যাবে পোরবন্দর। ঠিক সেই সময় ঝড়ের গতিতে জিপ নিয়ে ঢুকলেন সাব ইনস্পেক্টর যোশী। গোডাউন কোনদিকে? লোকজন একে অন্যের মুখে চাওয়া চাওয়ি করছে। মুখে বলছে না। সামনে ছিল একটি যুবক। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কোথায় লতিফ? সে বলল জানি না। একটা সজোরে থাপ্পড়! ছিটকে পড়ল ছেলেটি। উত্তাপ ছড়াচ্ছে কালুপুরে। যোশী ভ্রূক্ষেপ করছেন না। এসব মহল্লায় তার ইনফর্মার আছে। তারা বলেছে এখন লতিফ ওই গোডাউনে। কিন্তু আসল সোর্স অন্য কেউ। তার নাম মনজুর আলি। কাল রাতেই সে যোশীকে জানিয়ে দিয়েছে লতিফ আর তার সঙ্গে নেই। গ্রুপ ছেড়ে দিয়েছে। লতিফের গোডাউনে প্রচুর মাল। একবার লকআপে গেলে অন্তত ৬ মাস এক বছরের জন্য জেল। ততদিনে বিষদাঁত ভেঙে যাবে। ওকে ধরতেই হবে। যোশী তাই আগে খোঁজ নিয়েছে কখন কোথায় থাকবে লতিফ। গোডাউনের দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। যোশী চিৎকার করে বললেন, আবদুল....ফোর্স ঘিরে রেখেছে। পালাতে পারবে না। দরজা খোলো। নয়তো গুলি করে দরজা খুলব। কেউ উত্তর দিচ্ছে না ভিতর থেকে। যোশী বললেন, এক...দো....তিন..। গুলি চলল না অবশ্য! দরজা ভাঙা হল। এবং ভেতরে কেউ নেই। জানালার শিক খোলা। সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখা গেল ওই যে দৌড়চ্ছে লতিফ। যোশী এক লাফে বাইরে। শুরু হল তাড়া করা। ছুটছে লতিফ। এই মহল্লার দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ লতিফের থেকে উপকার পায়।

প্রতি পদে ভিড় টপকে যেতে হচ্ছে যোশীকে। আর সঙ্গে চলছে সমস্বরে চিৎকার ভাগ লতিফ ভাগ! ঠিক তখন আচমকা একটা দরজা খুলে গেল। কাঠের। দৌড়ের সামনে মুখের উপর দরজা এসে পড়ায় প্রায় পড়ে যাচ্ছিল লতিফ। কিন্তু একটা হাত তাকে টেনে নিয়ে এল ঘরের দিকে। বাধা দিতে পারেনি সে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ। ঘর অন্ধকার। পিছনে শুধু চিৎকার শোনা যাচ্ছে ভাগ লতিফ ভাগ। লতিফ কিছু বলতে যেতেই কেউ মুখে হাত চাপা দিল। চাঁপা ফুলের গন্ধ মাখা হাত। লতিফ নিমেষে বুঝে গেল বিলকিস। সেদিন বেঁচে গেল লতিফ। বিলকিসের জন্য। সাব ইনস্পেক্টর যোশী গোটা মহল্লা তোলপাড় করেও আর খুঁজে পেলেন না। সব শান্ত হয়ে গেলে চুপিসারে পিছনের একটা দরজা দিয়ে লতিফ বেরিয়ে যাওয়ার আগে বিলকিসের হাত ধরে শুধু বলল, আজ তুই না থাকলে...বিলকিস কোনো কথা বলেনি। নিঃশব্দে চোখের জল গোপন করল। সে তো প্রাণ দিতে পারে লতিফের জন্য। কিন্তু লতিফের মন টেনেছে ততদিনে অন্য কেউ। আকিলা বানু! লতিফ ওই যে চলে যাচ্ছে আবার। বিলকিস একটি শ্বাস ফেলল। তার আর লতিফকে পাওয়া হল না।

হংসরাজ মানবে না আবদুল ভাই! কী করা যায়? বলল রুবেল। যেখানে বসে আছে লতিফ সেই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে ক্লাব। সকাল থেকে বাইরে লাইন পড়ে। রিটেল মদের সাপ্লায়াররা এসেছে। ঘরে ঢুকেই একটা বড় হল। সেখানে সার দিয়ে রাখা টেবিল। আর টেবিলে নম্বর দিয়ে সাজানো দেশি মদের বোতল। অন্য ঘরে বিদেশি মদের সারি। প্রত্যেকে আগে থেকেই দিয়ে গিয়েছিল কার কটা লাগবে আর সেইমতো কুপন বিলি করা হয়। এবার সকাল থেকে সেই কুপন মিলিয়ে টাকা নিয়ে নম্বর দেখে দেখে বোতল বণ্টন। সকালটা এখানেই কাটায় আবদুল লতিফ। কারণ একদিকে যেমন সে এই বেআইনি মদের ব্যবসার আপাতত শীর্ষে, তেমনই আবার এলাকার সরকার। সকাল থেকে বাইরে দুটি লাইন পড়ে। একটি ওই মদের সাপ্লায়াররা। আর দ্বিতীয় লাইনে আসে গরিব রিকশচালক, দিনমজুর, দোকানের কর্মচারীর মা, কটন মিলের শ্রমিকের বউ, ছাত্র। নিজেদের সমস্যা নিয়ে। এদের কাছে লতিফই আদালত। সে ঠিক করে দেবে কোন সমস্যার কী সমাধান। সেই বিচারের রায় সকলকে মানতে হবে। নয়তো লতিফের ছেলেরা অমান্যকারীকে উচিত

শিক্ষা দেবে। হাতেনাতে বিচার হয় লতিফ কোর্টে। কোনো শুনানি নেই, কোনো তারিখ নেই, কোনো জেল জরিমানা জামিন নেই। এলাকায় এই রবিনহুড ইমেজ তৈরি করা অপরাধীদের বরাবরের স্টাইল দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরির কাছে পাকমোড়িয়া স্ট্রিটে একবার যাবেন সময় পেলে। ঢুকে দেখবেন একটা বিল্ডিং এর নাম গর্ডন হাউস। সেখানে থাকত হাসিনা পার্কার। গোটা রাস্তায় যত দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ আছে সকলেই অচেনা আগন্তুককে কাছে এবং দূর থেকে জরিপ করে। এবং ঠিক কয়েক মিনিট পর একটা ফোন যায় করাচিতে। জানিয়ে দেওয়া হয় এরকম দেখতে একটি লোক ঘুরছে। এটাই নেটওয়ার্ক দাউদ ইব্রাহিমের। কারণ দাউদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের কয়েকটি এলাকায় আজও রবিনহুড। এই স্টাইল নিলে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়। তাই হাজি মস্তান থেকে করিম লালা। দাউদ থেকে আবদুল লতিফের ফরমুলা এটাই। যাতে পুলিশ প্রশাসন সরকার কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আগে দুবার ভাবে। অর্থাৎ ডনরা জানে আসল শক্তি নিজের গ্যাং নয়। আসল শক্তি পাবলিক সিমপ্যাথি। অগ্নিপথের বিজয় দীননাথ চৌহানকে তাই নামজাদা এলিট রেস্তোরাঁয় অসম্মান করা হয়, ইনস্পেক্টর গায়কোন্ডের ছেলে তাকে দেখে বলে গুন্ডা..কিন্তু পরের দৃশ্যেই দেখা যায় ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির বিজয় দীননাথ চৌহান মুম্বইয়ের বস্তি এলাকায় ঢুকতেই হাজার হাজার লোক তার পায়ে পড়ছে, তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াচ্ছে, আর মুখে জয়ধ্বনি দিচ্ছে ভাই..ভাই...। এসব সিনেমার চিত্রনাট্য অবিকল তৈরি হয় আসল ডনদের আদলে। সত্যিমিথ্যে মিথ মিশিয়ে। তাদের হিরো বানানো হয়। আমেদাবাদের আবদুল লতিফও ছিল এরকমই জনপ্রিয় গরিবের কাছে। কিন্তু ততটাই ভয়ংকর অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত পুলিশ ফাইলে। কারণ লতিফের অপরাধের কোনো মাত্রাজ্ঞান নেই। হংসরাজ ত্রিবেদী এই চোরাই মদের লাইনে সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ লতিফের। বরোদা, গোধরা, সুরাতের নেটওয়ার্কে সে বারংবার লতিফের ট্রাক আটকে দেয়। পুলিশকে গোপন খবর দিয়ে দেয়। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে। এলাকা ভাগাভাগি করার প্রস্তাব দিয়ে অথবা একসঙ্গেই কাজ করার ডিল হোক এই আশায় নিজের বিশ্বস্ত ডানহাত রুবেলকে পাঠাল লতিফ হংসরাজের কাছে। হংসরাজ প্রস্তাবটা শুনল। আর গোটা গ্রুপ চরম অপমান করল তাকে। বলা হল কী রে লতিফের এত

জোশ সব কোথায় গেল? আজ আমার সঙ্গে ডিল করতে হচ্ছে? লতিফ নিজেকে শাহেনশাহ ভাবে তো! আজ চুহা হয়ে গেছে! শুধু মুখেই এসব কথা নয়। রুবেলকে চড়থাপ্পড়ও মারা হল। কারণ একটাই, হংসরাজের পিছনে আছে রাজনৈতিক শক্তি। প্রতিটি মদের সাপ্লাইয়ের কমিশন যায় রাজনৈতিক দলগুলির নীচের তলার নেতা ও পদাধিকারীর কাছে। একদিকে যদি বিজেপির মদত থাকে, অন্যদিকে তাহলে কংগ্রেসের মদত। হংসরাজ বনাম লতিফের এই লড়াইয়ের পিছনে তাই রয়েছে আসলে পরোক্ষ যুব বিজেপি মোর্চা বনাম গুজরাত কংগ্রেসের দুই নেতার দাবাখেলাও। রুবেল ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে এসে বলল, হংসরাজ মানবে না। বরং আমাদের মাল আজও আটকে দিয়েছে সে। লতিফের মুখ শক্ত হয়ে গেল সে ফোর স্কোয়ার ব্র্যান্ডের সিগারেট খায়। টেনশন আর রেগে গেলে সেই সিগারেটের ফিল্টারের অংশ দাঁত দিয়ে চিবানো স্বভাব! ওটাই লক্ষণ লতিফ এবার অ্যাকশনের কথা ভাবছে। ঠিক তাই। বলা হল খতম কর দো! কাকে? হংসরাজকে। চমকে উঠল দলের লোকজন। হংসরাজকে খতম! এটা মুখের কথা নাকি। বহু খুন করিয়েছে লতিফ। সেসব চুনোপুঁটি। তাই বলে হংসরাজ! সম্ভব নাকি?

১৯৯২ সালের ৩ আগস্ট সন্ধ্যা সাতটা পঁয়তাল্লিশে আবদুল চারজন বাছাই করা হিটম্যানকে পাঠাল হংসরাজের অফিসে। প্রথমে দুজন ঢুকল। মদের সাপ্লাই চাই বলে তারা জানতে চায় কোথায় ত্রিবেদী ভাই। কিন্তু হংসরাজ অফিসে নেই। কোথায়? সেটা বলার নিয়ম নেই। অতএব প্ল্যান সাকসেসফুল হচ্ছে না। ফিরে এল তারা। ঠিক সাড়ে ৮টার সময় আবদুল লতিফ খবর পেল হংসরাজ আছে রাধিকা জিমখানা ক্লাবে। আবার গেল সেই চারজন। জিমখানা ক্লাবে ঢুকে দেখা গেল একটা করে টেবিল সাজানো চারদিকে। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ অনেকেই বসে আছে। বেশিরভাগ খেলছে তাস। কিন্তু এর মধ্যে কে হংসরাজ? আসল লোকটাকেই তো চেনে না এই নতুন বাইরে থেকে আসা হিটম্যানরা। এরা এসেছে মুম্বই থেকে। তাহলে? আবার কি প্ল্যান ফেল করবে? তারা দ্রুত বেরিয়ে এল। একটা দোকানের বাইরে ঝুলছে টেলিফোন বুথ। সেখানে কয়েন ফেলে কথা বলতে হয়। এক টাকার কয়েন ফেলে ফোন করা হল ক্লাবে। সেই লতিফের ক্লাব। আগে থেকেই লতিফ বসে আছে। সে খবর চায়। ফাইনাল খবর। কিন্তু কোথায় খবর? তার

পাঠানো গ্যাংস্টাররা এবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ওখানে ১০ জন মতো বসে আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বুঝব কীভাবে কে হংসরাজ? লতিফ তিন সেকেন্ড ভাবল সম্ভবত। এবং ঠাণ্ডা গলায় অর্ডার দিল সবকো উড়া দো! ওপ্রান্তে থাকা লোকটি এটা আশা করেনি। কেয়া ভাই? এবার ধমকে উঠল লতিফ! শুনতে পাচ্ছ না? সব কটাকে খতম করো! এক টাকার কয়েনের সময়সীমা শেষ। ফোন কেটে গেল। ঠিক ১২ মিনিট পর জিমখানা ক্লাবে ঢুকে চারজন হিটম্যান চেয়ারে বসে তাস খেলা সবাইকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করল। আটজনই খতম। হংসরাজ ত্রিবেদীর গোটা গ্যাংয়ের প্রধান শাগরেদরা কেউ নেই। হংসরাজ নিজেও নিহত। এটাই হল ভারতীয় অপরাধ ইতিহাসে কুখ্যাত রাধিকা জিমখানা কিলিং। কেন কুখ্যাত আর গুরুত্বপূর্ণ এই গ্যাং ওয়ার? কারণ সেই প্রথম ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে ভারতের কোনো অপরাধী গ্যাং হত্যাকাণ্ডে ইউজ করল এ কে ফর্টি সেভেন! হ্যাঁ আবদুল লতিফের হাত ধরে অপরাধ দুনিয়ায় ঢুকল এ কে ফর্টি সেভেন! আর এই রাধিকা জিমখানা মামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে আর রেয়াত করা হবে না । গোটা রাজ্যে সমালোচনার ঝড়। এমনিতেই কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেলের বিরুদ্ধে বিরোধীরা অভিযোগ তোলে তাঁর সঙ্গে নাকি ক্রিমিন্যালদের যোগসূত্র। আর এইসব ক্রিমিন্যালদের সাহায্যে তিনি ভোটেও জেতান কংগ্রেসকে। সুতরাং রাধিকা জিমখানা মামলা হাইপ্রোফাইল অপরাধ হিসাবে গণ্য হল। অচিরেই লতিফ বুঝতে পারল বড়সড় হিসাবে গোলমাল করেছে সে। একসঙ্গে আটজনকে খুন করার মধ্যে যে হিরোইজম দেখাতে গিয়েছে সে তা আসলে ব্যাকফায়ার করেছে। একের পর এক গ্রুপ মেম্বারকে অ্যারেস্ট করছে আমেদাবাদ পুলিশ। সব মিলিয়ে ১১টি গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে হাজার হাজার লিটার বেআইনি মদ আটক। আবার পালাচ্ছে লতিফ। পিছনে পুলিশ। পোরবন্দর, রাজকোট, জুনাগড়, সোমনাথ...লতিফ ছুটছে। যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই পুলিশ আসছে রেইডে। একমাত্র বাঁচাতে পারে একজনই। হাসান লালা। ছোটবেলার বন্ধু। কিন্তু এখন সে গুজরাত যুব কংগ্রেসের সভাপতি। আর উপায় নেই। তাঁকেই ফোন করল লতিফ। কিন্তু হাসান লালা এখন আর কোনো হেল্প করতে পারবে না

জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এবার তুমি যা করেছ এরপর সবটাই হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। আর উপায় নেই আবদুল। সারেন্ডার করো।

সারেন্ডার?

আজ পর্যন্ত সারেন্ডার করেছে লতিফ? হাসান লালা তাকে বলল তোমাকে যেভাবে হোক ধরার জন্য সবথেকে বেশি চাপ দিচ্ছে একজন। কে? রউফ ওয়ালিউল্লাহ। রাজ্যসভার প্রাক্তন এমপি। তিনি গুজরাতের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। কারণ একটাই। এটা এখন পলিটিক্যাল ইস্যু। তাহলে একমাত্র বাধা ওই রউফ? হ্যাঁ। বললেন, হাসান। লতিফ ঠিক দুদিন পর চলে গেল দুবাই। আর দুবাই থেকে সে রসুল পাত্তিকে বলল, একজনকে খতম করতে হবে। কে সে? ওয়ালিউল্লাহ! রসুল পাত্তি লতিফের অনেক পুরোনো লেফটেন্যান্ট। সে পারে না হেন কাজ নেই। এরকম গুলির নিশানা আর কারও কি আছে? সেই রসুলও কেঁপে উঠল। ওয়ালিউল্লাহ সাবকে টার্গেট করার অর্থ আত্মহত্যা করা। কিন্তু লতিফ তার জন্য যে রেট ফিক্সড করল রসুলের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। ৫০ লক্ষ!! ১৯৯২ সালে ৫০ লক্ষ!! ৯ অক্টোবর ১৯৯২। আমেদাবাদ রেলওয়ে আন্ডার ব্রিজের কাছে টাউন হলের পাশে একটা ফোটোকপির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়ালিউল্লাহের গাড়ি। দুটি যুবক কাছে এল। ভরদুপুর। যুবকদুটির নাম সাজ্জাদ ওরফে ড্যানি। আর মহম্মদ ওরফে ফাইটার। রসুল পাত্তির সবথেকে সেরা দুই হিটম্যান। শার্প শ্যুটার। গাড়ির কাছে এল ফাইটার। সালাম আলাইকুম, আর গুলি চালাল। তখনও আলাইকুম আসসালাম বলে হাত নামাননি রউফসাহেব। গাড়িতেই ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। মোটরবাইক চালাল ড্যানি। নিমেষে উধাও!

আবদুল লতিফ বদলা না নিয়ে থাকতে পারে না। তার পথের কাঁটা সবাইকে সে সরিয়ে দেবে নির্মমভাবে। কিন্তু আসল কথাটাই তো বলা হল না। এখানে এই দুবাইতে ১৯৯২ সালে সে এল কীভাবে? গত ৮ বছর ধরে যার সঙ্গে তার প্রতিনিয়ত বিবাদ চলছে, গ্যাং ওয়ার হচ্ছে সেই দাউদ ইব্রাহিমের গুহা দুবাইতে ঢুকে গেল সে? এ তো সুইসাইড করতে

আসা। একেবারেই নয়। দাউদ ইব্রাহিম লোকটা বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থকে সর্বদাই অগ্রাহ্য করে। গুজরাত উপকূল তার কাজে লাগবে। অস্ত্র পাচার, ড্রাগ পাচার আর স্মাগলিংয়ে। আর গুজরাতে আবদুল লতিফের থেকে বড় নেটওয়ার্ক কারও নেই। অতএব যতই এই লতিফ একদিন দাউদকে খতম করার জন্য মরিয়া হয়ে যাক, তাকেই কাছে ডাকতে কোনো দ্বিধা নেই দাউদের। অতএব এর আগেই ১৯৯০ সালের নভেম্বরে একদিন আবদুল লতিফ একটা মেসেজ পেয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে দাউদ ভাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সেই কথা হয়। ফোন করিয়ে দিয়েছিল আনিস ইব্রাহিম। দাউদ স্পষ্ট কথায় বিশ্বাসী। বলেছিল গুজরাত তোমার থাকবে। আমি শুধু এন্ট্রি চাই গুজরাত কোস্টে। কমিশন পাবে। লতিফ প্রথমে ভাবল এটা কোনো কৌশল কিনা। কিন্তু তারপর দেখল মুম্বইয়ে আলমজেব আর আমিরজাদা কেউ আর নেই। দাউদের সঙ্গে অযথা এখন দুশমনি জিইয়ে রেখে লাভ কী? সুতরাং দাউদের দলে নাম লেখাল গুজরাতের ডন! নতুন যুগলবন্দির জন্ম হল। আর রাধিকা জিমখানার মামলার পর সেই দাউদের হেল্পেই দুবাই পালিয়ে এসেছিল লতিফ। রউফকে খুন করার প্ল্যান দুবাইতে বসে।

৩১ ডিসেম্বর দুবাইয়ে দাউদের বাড়িতে একটি বৈঠক হচ্ছে। আয়োজক আইএসআই। দাউদের কাছে আইএসআই একটি প্ল্যান দিল। সেই প্ল্যানের জন্য দরকার এমন একটি নেটওয়ার্ক যার সবথেকে ভালো হাত রয়েছে একমাত্র সমুদ্র উপকূলে। কে আছে এমন? দাউদের প্রথম যার নাম মনে পড়ল সে হল আবদুল লতিফ। লতিফ ছাড়া আর কেউ পারবে না আরব সাগরকে হ্যান্ডল করতে। ১৯৯৩ সালের ৯ জানুয়ারি গুজরাতের ডিগি পোর্টে একঝাঁক বাক্স এসে পৌঁছল জলপথে। আরবসাগর দিয়ে। সেই বাক্সগুলিতে ছিল কয়েক কেজি আরডিএক্স, ২৯টি রাইফেল। গোটা সাপ্লাইয়ের দায়িত্বে ছিল আর কেউ নয়। আবদুল লতিফ। কী হবে এই এত আরডিএক্স দিয়ে? আবদুল লতিফ সোনা স্মাগলিং করেছে। বেআইনি মদের সাপ্লাই নিয়েছে সে। কিন্তু এত আর্মস আর আরডিএক্স সে এই প্রথম নিখুঁতভাবে নিয়ে আসতে সফল হল। কী হবে এত আরডিএক্স দিয়ে? একটা অপারেশন আছে। অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছে তেহরিক ই ইন্তকাম! সিক্রেট মিশন! কী সেটা?

লঞ্চের নাম মুস্তাফা মজনু আল-সাদা বাহার। দুবাই থেকে আসছে। জানুয়ারি ১৯৯৩। আরব সাগর। আপাতত শান্ত। প্রথম স্টপেজ পাকিস্তানের করাচির কাছে একটি ছোট বন্দর। ডাক নাম পাকিস্তান কা খাড়া! অফিসিয়াল পোর্ট নয়। সারেংদের ওপর নির্দেশ আছে কারা লঞ্চে উঠছে আর সঙ্গে কী কী ব্যাগ তুলছে সেসব নিয়ে যেন তারা মাথা না ঘামায়। তাদের তো টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। আর কোনো শব্দ যেন মুখে উচ্চারিত না হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা দাঁড়াতে হল। কিছু ব্যাগ উঠছে। তারপর সবুজ সংকেত। ছাড়ল লঞ্চ। ওদ্দার উপকূল ধরে যেতে হবে। সেভাবেই গুজরাতের পোরবন্দরে এসে পৌঁছল পরদিন সকালে। ঘোসাবারা উপকূল। সচরাচর এদিকটায় কেউ আসে না। শুধু মাঝেমাঝে এরকম লঞ্চ আসে নিয়ম করে। পুলিশ জানে। কাস্টমস অফিসারও জানে। তবে সব লঞ্চে তো আর কোনো বেআইনি কারবার হয় না। বলা যায় মিলিয়ে মিশিয়ে । কিছু বেআইনি মাল থাকে। কিছু নর্মাল। তাই সন্দেহজনক কারবার থাকলেও সেসব ব্যবস্থা করাই থাকে। তাছাড়া সন্দেহজনক লঞ্চের মধ্যে থাকা কিছু বস্তায় ম্যাক্সিমাম থাকে রুপোর বার। আর সোনার বিস্কুট। এছাড়া কখনও সখনও সাদা আর কালো পাউডার। তার নাম ড্রাগস। সেটা অবশ্য গোয়া, মেঘালয়, মণিপুর আর পাঞ্জাবে যাবে। প্রতিটি বস্তার জন্য পৃথক রেট আছে কাস্টমসের। ঘোসাবারা উপকূলের সমুদ্রতীরে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পোর্টার। তারা মাল ওঠানো নামানোর কাজ করে থাকে সারা বছর। চুনিলাল কারভা ওই পোর্টারের নাম।

এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠল, কারভা তোর লোকদের বল আস্তে আস্তে মালগুলো নামাতে। চুনিলাল কারভার সঙ্গে আছে আরও তিনজন। তারাও পোর্টার। সকলে লঞ্চে উঠল। লঞ্চে আগে থেকেই দুজন এসে বসে আছে। তারা মালগুলো নামানোয় হেল্প করবে। কোথা থেকে যেন এসেছে লঞ্চ নিয়ে। ইকবাল হুসেন সৈয়দ আর ইউসুফ কুচ্চি। এক মিনিট পরপর বুখারি চিৎকার করছে, আস্তে..আস্তে। কী ব্যাপার? এতবার আস্তে আস্তে বলার মানে কী? আমরা কি নতুন কাজ করছি নাকি? ভাবছে চুনিলাল। বিরক্তও হচ্ছে। কয়েকটা বস্তা থেকে সাদা পাউডারের মতো কিছু বেরোচ্ছে মনে হল। চুনিলাল দেখছে। কিছুক্ষণ পর আর একটা বস্তা পিঠে নিতে গিয়ে খোঁচা খেল। কিছু

একটা লোহার রডজাতীয়। প্রায় ২৮টি বস্তা নামানোর পর চুনিলাল ঘাম মুছছে। জানুয়ারি মাস হলেও গুজরাতের পোরবন্দরে সেরকম কোনো শীতের অনুভব নেই। বরং ভরদুপুরে বেশ গরম লাগছে। সামুদ্রিক হাওয়ায় গরম ভাব। মাঝেমধ্যে সিগাল ওড়ে এই খাঁড়ির মতো জায়গাটায়। ঘাম মোছার ফাঁকেই চুনিলাল ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতেয় জানতে চাইল, মামুমিয়াঁ! এসব বস্তায় কী আছে বলো তো? কেমন যেন রডের মতো। পিঠে তোলার সময় খুব ব্যথা লাগল। চুনিলাল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল পরের মুহূর্তে। বুখারিকে সকলে ওই নামেই ডাকে। মামুমিঁয়া। পোরবন্দরের সে হল খ্যাতনামা স্মাগলার। সেই বুখারির মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। চিৎকার করে বলে উঠল, তোর কী দরকার? বস্তায় কী আছে সেটা তোর জানার কথা? নিজের কাজ মন দিয়ে করে যা। আর পেমেন্ট অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছি মনে রাখিস। আর কী চাই! চুনিলাল বুঝতে পারছে না এতে এত রাগের কী আছে! এসব লাইনে মাল ওঠানামা তো সে আজ থেকে দেখছে না। সোনা রুপো থাকেই। জানে ড্রাগও থাকে। এতে আবার গোপন কিছু আছে নাকি? পুলিশই জানে সবকিছু। তাই এই সামান্য নিরীহ প্রশ্নের সামনে এতটা রাগারাগির ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মুখে আর কিছু বলল না সে। সত্যিই তো! তার কী যায় আসে। টাকা পাবে, কাজ করবে। তার মতো ছোটা আদমির এর বেশি জানতে চাওয়াই উচিত হয়নি বলে ভাবছিল চুনিলাল। এবার মালগুলো লোড করতে হবে। বাইরে টেম্পো রাখা আছে। তিনটে। সেখানে মাল নিয়ে যেতে হবে। সব কাজ হয়ে গেলে চুনিলালকে আরও এক্সট্রা কিছু টাকা হাতে দিয়ে বুখারি বলল, আবার মাল আসতে পারে। তৈয়ার রহেনা! চুনিলাল হেসে চলে গেল। সেটা ছিল প্রথম কনসাইনমেন্ট। ৪৫টি বস্তায় ওই যে লোহার রডের মতো জিনিস। সেগুলির নাম একে ফর্টি সেভেন। ২২৫ টা বড় বড় রুপোর বার। ৩০টি বাক্সে রয়েছে পাউডার। সেই পাউডারের নাম আরডিএক্স! টেম্পো প্রথমে যাবে ভালসাদে। সেখানে একজনের কাছে মাল ডেলিভারি করতে হবে। এসব মাল তার নামেই এসেছে। তিনদিন পর আরও দুটি লঞ্চ এল। ঠিক একইভাবে। সেই এক রুটে। তবে এবার আর পোরবন্দর লক্ষ্য নয়। এবার নেমেছিল ভালসাদ। পোরবন্দরের ঘোসাবারা থেকে সেই তিনটি টেম্পো প্রথমে থামল ধোরাজি। টেম্পো তিনটি জোগাড় করা আর ওই মাল তুলে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার

জন্য কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল ইজু শেখকে। ইজুর এটাই কাজ। সুতরাং গোটা নেটওয়ার্কে সকলে সকলকে চেনে। ভালসাদে এসে অপেক্ষা করছিল টেম্পো তিনটি। কারণ অন্য মাল এখনও এসে পৌঁছয়নি। ঠিক তিনদিন পর এসে গেল। তবে যেটি এসে পৌঁছেছিল সেটা কোনো টেম্পো বা ম্যাটাডর ছিল না। ছিল সরকারি অ্যাম্বুলেন্স হুটার বাজিয়ে এবং বেকন লাইট জ্বালিয়ে গোটা পথ চলেছে যে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স, সেটার মধ্যে ছিল ১০৫টি একে৪৭, ১৯০ কেজি আরডিএক্স আর ৩৯০ হ্যান্ড গ্রেনেড!

চারটে গাড়ি আমেদাবাদে যখন পৌঁছেছে তখন ভোর। শহরের ঘুম ভাঙেনি। সবরমতী আশ্রমের নিয়ম হল সকলেই ভোর চারটের মধ্যেই উঠে যান। সেটাই নিয়ম ছিল মহাত্মা গান্ধীর। উঠে প্রথমেই প্রার্থনা। আর কিছু বাজার খুলতে শুরু করেছে শহরে। ঠিক ওরকম এক টিপিক্যাল আমেদাবাদের দিন শুরুর মধ্যেই একটি অ্যাম্বুলেন্স আর তিনটি টেম্পো কালুপুরের একটি গোডাউনে দাঁড়াল এসে। টোকা মারতেই যে দরজা খুললো তাকে চেনে ইজু শেখ। কিন্তু চমকে উঠলো। কারণ লোকটি ছিল আবদুল লতিফ। যে আছে দুবাইতে। এরকম সকলে জানে। লতিফ ভাই কবে ফিরল? মামুমিয়াঁ জানে? সেসব প্রশ্ন মনে এসেছিল ইজু শেখের। কিন্তু লতিফ ভাইয়ের সামনে কে মুখ খুলবে? ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে যায় কথা বললেই। লতিফ সম্পূর্ণ গোপনে ফিরে এসেছে গুজরাত। তাকে পাগলের মতো খুঁজছে পুলিশ। সে জানে। তা সত্ত্বেও সে ফিরে এল কেন? কারণ দাউদ ভাই একটা কাজ দিয়েছে। সেটা তাকে সম্পন্ন করতে হবে। আর সেই কাজ সে ছাড়া এই গোটা গুজরাতে কেউ পারবে না। কারণ গুজরাতের তীর ঘেঁষে বয়ে যাওয়া আরব সাগর তার সাম্রাজ্য। তার মতো আরব সাগরকে কেউ চেনে না। আর তার থেকেও বড় একটা কারণ আছে। যত ছোট ডনই হোক। সে গুজরাতের সম্রাট। দুবাইতে তাকে থাকতে হয়েছিল সম্পূর্ণ দাউদের আর এক নিছকই গ্যাং মেম্বার হয়ে। সেখানে আনিস ভাই থেকে সেলিম সকলেই চোখ রাঙায়। আবদুল লতিফকে এসব ভাইয়ের অনুগ্রহে পালিত দু কড়ির মস্তানদের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হবে? আরে আমি তো নিজের সাম্রাজ্য নিজে তৈরি করে দেখিয়েছি। আর এরা তো সবাই দাউদ ভাইয়ের আলোয় আলোকিত। নিজেরা কী করেছে? এরকমই ভেবে একদিন দাউদকে বলেছিল আমাদের ফের পাঠানোর ব্যবস্থা

করুন। আমি আপনার সব সাপ্লাই দেখব এবার থেকে। দাউদ এর থেকে বড় নিশ্চিন্ত আর কীসেই বা হবে। কারণ বম্বে তার হাতে। এবার যদি গুজরাত কোস্ট সবটাই নিজের লোকের হাতে থাকে তাহলে আর মাল পাচার নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই। দুবাইয়ে কলকাঠি নেড়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে লতিফকে তাই আবার গোপনে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। তাই আইএসআই যখন দাউদকে বলেছিল ভারতে অ্যাটাক করতে হবে, তখন গোটা প্ল্যান শুনে প্রথমেই দাউদের মনে পড়েছিল একজনেরই কথা। কারণ একমাত্র সেই পারবে আর্মস সাপ্লাই রিসিভ করতে। আসলে রিসিভ তো সকলেই করতে পারে। কিন্তু সমুদ্রপথে কোনো বেআইনি পণ্য আসা এবং সেই পণ্য সঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার জন্য যে পুলিশ আর কাস্টমস নেটওয়ার্ককে হাত করা দরকার সেটা কজনের কাছে থাকে? ওই ব্যাপারে তো সিদ্ধহস্ত একজনই। আবদুল লতিফ।

তাই দুবাই থেকে এসেই পোরবন্দরের ঘোসাবারা উপকূল মারফত সে নিয়ে এসেছে বিপুল অস্ত্রের এক সাপ্লাই। কাজে লাগবে। ওই অস্ত্র পাঠাতে হবে বম্বে। কোন রুটে এসেছে এই সাপ্লাই? ওই যে আগেই বললাম, আরবসাগরে ওদ্দারা কোস্ট রুটে! করাচি থেকে। একবার তো বলা হয়েছে। আবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে কেন? হচ্ছে, কারণ এই বিশেষ রুটটি মনে রাখা দরকার। ১৯৯৩ সালের সেই জানুয়ারির ১৫ বছর পর ঠিক এই রুটেই করাচি থেকে আর একটি বোট আসবে। ২০০৮ সালে। তার নাম হবে কুবের। সেই বোটেও থাকবে অসংখ্য অস্ত্র। আর থাকবে ১০ জন যুবক। যাদের একজনের নাম আজমল কাসব। সেই বোটের যাত্রী ও অস্ত্রশস্ত্রের গন্তব্যও হবে সেই একই টার্গেট। বম্বে!

কীভাবে একজন নেহাত বেআইনি মদের কারবারি থেকে আর্মস সাপ্লাইয়ের মাস্টারমাইন্ড হয়ে উঠল লতিফ? পোরবন্দরে ছোটখাটো অপরাধ আর পাচার হওয়া মাল সাপ্লাইকারী মামুমিয়াঁর দাদা একদিন খুন হয়ে গেল। সেই ছিল পাঁচজনের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে লোক। সুতরাং তার খুন হয়ে যাওয়ার পর গোটা বুখারি পরিবার সম্পূর্ণ জলে পড়ে গেল। মেজ ছেলে ওসমান বুখারি তখনও ক্লাস ইলেভেনে। কিন্তু আর পড়াশোনা করে কী হবে? অতএব সে একদিন স্কুলে না গিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে পৌঁছল

খারওয়া নারান সুধার জুয়ার আড্ডায়। নারান সুধার আড্ডার বৈশিষ্ট্য হল এখানে জুয়া খেলতে আসে পুলিশ কনস্টেবলও। অবশ্যই লুকিয়ে। তার সুবিধাটা হল কখনও এখানে রেইড হওয়ার প্ল্যান হলে আগেভাগে নারান সুধা খবর পেয়ে যেত। কারণ তার তো কাস্টমার স্বয়ং পুলিশ। সুতরাং এহেন এক আড্ডার রমরমা বাড়বেই। বাড়ছিলও। জুয়ার সঙ্গে মদের সম্পর্ক কে না জানে অঙ্গাঙ্গী। অতএব বেআইনি মদের দরকার হয়ে পড়ল অনেক। মামুমিয়াঁকে কাজ দেওয়া হল ক্যারিয়ারের। সেই শুরু তার নিজের কেরিয়ার। মাল বেশিরভাগ আসত সাগরপথে। সুতরাং কোস্টাল রুটের মাস্টার হয়ে উঠল মামুমিয়াঁ। কয়েক বছরের মধ্যেই তার ডাক পড়ল সোনা আর রূপোর বাট আনা নেওয়ার ক্যারিয়ার হিসাবে। সেই থেকে আর অন্য কোনো বিজনেসে যায়নি সে। কিন্তু বড় মাল নেওয়ার মতো লোক কোথায়? সব তো ছোটখাটো বিজনেস করে। সেই কলজের জোরই নেই কারও। অথচ সাপ্লাইয়ের লোক বসে আছে দুবাইয়ে। অবশ্য একটা লোক আছে। আমেদাবাদে। সেই পারে বড় অর্ডার দিতে। ১৯৯০। সেই লোকটির কাছে একদিন মামুমিয়াঁ যেতে চায়। কেন?

লতিফ ভাই আপনি যদি সোনা চান আমি দিতে পারি।

কীভাবে? তুমি কে?

আমি ভাই, পোরবন্দরে ঘোসাবারায় কাজ করি। ছোটখাটো সাপ্লাই করে দিন গুজরান হয়।

ছোটখাটো সাপ্লায়ার আমাকে ফোন করছে কেন? ধান্দা কী?

ভাই সোনার সাপ্লাই আমি জানি। নেওয়ার লোক গুজরাতে কেউ নেই। আপনি ছাড়া। ওপারে ফোনে একটু নিস্তব্ধতা। ৩০ সেকেন্ড পর বলল পরশু তুমি আমার কাছে এসো।

পরশু কেন? আমি কালই যেতে পারি

ঠান্ডা গলায় লতিফ বলল, দরকার নেই। পরশু মানে পরশু!

আচ্ছা ভাই! ফোন রেখে দিল মামুমিয়াঁ!

পরশু নয়, কারণ পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় লতিফ নিজের পুলিশের সোর্সকে দিয়ে জেনে নিল মামুমিয়াঁ আদতে কী কাজ করে। আজ কাদের সঙ্গে তার কন্ট্যাক্ট। কারণ রাইভ্যাল গ্যাংয়ের লোকজন এভাবে ট্র্যাপও পাততে পারে। যে কোনো সময়। সোজা গাড়ি নিয়ে আমেদাবাদ গেল মামুমিয়াঁ। ততক্ষণে খবর পেয়েছে লতিফ যে মামু জেনুইন লোক। সোনা রুপোর সাপ্লাই করে। প্রথম অর্ডারেই লতিফ মামুমিয়াঁকে দিল ২৫ লক্ষ টাকা! বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না মামুমিয়াঁর। কারণ এই লেভেলের অর্ডার সে কল্পনাই করেনি। কে পাঠাবে সোনা? তার নাম হাজি কাসেম। থাকে দুবাইতে। প্রকাশ্যে একটা টেলারিং কোম্পানির দরজি। কিন্তু সন্ধ্যার পর সে করে সোনার স্মাগলিং। তার সঙ্গেই যোগাযোগ মামুমিয়াঁর। ২৫ লক্ষ টাকার অর্ডার ১৫ দিনের মধ্যেই এসে হাজির। চারটে জ্যাকেট এল। ১০০টা গোল্ড বিস্কুট। সেই শুরু! মামমিয়ার সঙ্গে লতিফের সোনা রুপোর স্মাগলিং ব্যবসা তুঙ্গে উঠল। তখনই এল একটা বিশেষ দিন। নিজেই চলে এল লতিফ একদিন সোজা পোরবন্দর। কেন? মামুমিয়াঁকে ডেকে পাঠালেই তো হত। তা হল না। সে নিজেই এসে পোরবন্দরে সুদামা চকের পাশের গলিতে ঢুকে একটা হোটেলের রুমে দরজা বন্ধ করে বলল পঞ্জু, আর্মস পাওয়া যাবে? মামুমিয়াঁ অবাক। আর্মস? আবদুল লতিফ মামুমিয়াঁকে সম্বোধন করে পঞ্জু নামে। ওটা তার পারিবারিক ডাক নাম। কেন? আপনার আবার আর্মসের অভাব? ওসব দিয়ে হবে না। আমার চাই স্পেশাল কিছু। কী সেই স্পেশাল আর্মস? লতিফ বলল, একে ফর্টি সেভেন। বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইল মামুমিয়াঁ। কোথায় পাবে সে? চোখেই দেখেনি! তাহলে উপায়? মামুমিয়াঁর কাছে কেন হেল্প চাইছে লতিফ? কারণ তার দুবাইতে কানেকশন আছে। আর দুবাইয়ের এক মাফিয়া তৌফিক জারিওয়ালার নেটওয়ার্ক করাচির সঙ্গে। করাচি হল আর্মস সাপ্লাইয়ের ডেন। সুতরাং মামুমিয়াঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হবে। মাত্র দুটো একে ফর্টি সেভেন! জারিওয়ালাকে খবর পাঠানোর পর সে জানাল এটা কোনো ব্যাপার নয়। পাঠিয়ে দিচ্ছি। এসেও গেল। কী করা হয়েছিল ওই দুটি একে ফর্টি সেভেন দিয়ে? আমেদাবাদের সেই গণহত্যায় কাজে লাগাল লতিফ। যার বিবরণ আগের পর্বে দেওয়া হয়েছে। রাধিকা জিমখানা কিলিং! সেখানে যে আটজনকে হত্যা করা হয়, সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ব্যবহার করা হয় এই দুটি একে ফর্টি সেভেন। সেই প্রথম ভারতে কোনো

মাফিয়া নেতা গ্যাং ওয়ারের বদলা হিসাবে ব্যবহার করেছিল একে ফর্টি সেভেন! অতএব আর্মস সাপ্লাইয়ের সঙ্গে আবদুল লতিফের সম্পর্ক নতুন নয়। তবে দুটি একে ফর্টি সেভেন আনা আর এভাবে বস্তা বস্তা আর্মস নিয়ে আসার মধ্যে বিরাট ফারাক। নিখুঁত ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবস্থায় সেই বিপুল অস্ত্র ঠিক সময়মতো পৌঁছে গেল মুম্বই থেকে দূরে রায়গড়ে।

অপারেশনের নাম তেহরিক ই ইন্তেকাম। আইএসআই এই অপারেশন এমন এক বৃহৎ মাত্রায় করতে চেয়েছিল যে ভারতের মাফিয়া গ্যাং, দাউদ ইব্রাহিম, সৌদি আরবের দুটি সংগঠনকে কাজে লাগিয়েই নিশ্চিন্ত হচ্ছিল না। এমনকী প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন এবং আফগান মুজাহিদিনের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনকেও বলেছিল সহায়তা করতে। যত টাকা লাগে নিতে রাজি ছিল পাকিস্তান। মিটিং হচ্ছিল দুবাইতে। মিটিং হয়েছে আবু ধাবিতে। মিটিং হয়েছে লন্ডনে। করাচিতে। কাবুলে। আইএসআই দাউদকে দায়িত্ব নিতে বলেছিল। তাহলে দাউদ যেচে কেন টাইগার মেমনকে গোটা অপারেশনের দায়িত্ব দিয়েছিল? দাউদ আইএসআইকে বলেছিল যে এই কাজটি সবথেকে ভালো পারবে মেমন! ওর নেটওয়ার্ক দুর্দান্ত! আর আবদুল লতিফের মাধ্যমে যাবে আর্মস। টাইগার মেমন আর মহম্মদ দোসা গোটা অপারেশন করবে। এরকমই হল। ৩০ জন যুবককে মুম্বই, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ থেকে সংগ্রহ করে পাঠানো হল দুবাই। সেখান থেকে করাচি। তারপর পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ট্রেনিং। ১২ মার্চ ১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ে কী হয়েছিল সেই আর্মস আর আরডিএক্স দিয়ে সেকথা এখন সবাই জানে। বম্বের সেই ঘটনা বস্তুত ভারতকে বলেছিল ওয়েলকাম টেররিজিম! গোটা ভারত কেঁপে উঠেছিল ওই একটি বিস্ফোরণে। আর তারপর থেকেই দাউদ ইব্রাহিম নামটির সঙ্গে মিশে গেল প্রবল ঘৃণা। এতদিন সে ছিল নেহাৎ এক মাফিয়া ডন। শিবসেনা প্রধান সর্বপ্রথম দিলেন নতুন নাম। দেশদ্রোহী! দাউদের নিজের অনুগামীরা পর্যন্ত বম্বেতে বসে বিশ্বাস করেনি সে এরকম একটি কাজ করতে পারে নিজের শহরে।

একটি বাক্স এসেছিল দাউদের ঠিকানায়। সেটি খুলে দেখা গেল একঝাঁক কাচের চুড়ি। একটা চিরকুটে লেখা, ‘এক ভাইকে লিয়ে, যো আপনে বহেনকা হিফাজৎ না কর সকে!

ইয়ে চুড়িয়া প্যাহেন লে'..।

টাইগার মেমন সেই সময় হয়ে উঠছিল বম্বের এক শক্তিশালী ডন। স্মাগলিং আর তোলাবাজিতে সে ক্রমেই সবাইকে ছাপিয়ে যায়। ঠিক মোক্ষম সেই সময়টায় টাইগার মেমনকে বম্বে ব্লাস্টের দায়িত্ব দিয়ে বম্বে থেকে তাকে পালাতে বাধ্য করেছিল দাউদ। আর অস্ত্রপাচারের সঙ্গে যুক্ত করেছিল আবু সালেম আর আবদুল লতিফকে। তার মানে কী? মানে হল নিখুঁত কৌশলে গোটা প্ল্যানের মাস্টারমাইন্ড নিজে হলেও কোনো প্ল্যান প্রয়োগেই নিজের প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখেনি দাউদ। এটাই ছিল তার মাস্টারস্ট্রোক। মেমনরা পুরো পরিবার চক্রান্তের প্রধান কারিগর হিসাবে দোষী। আর ফলে বম্বের ফাঁকা মাঠ আবার দাউদেরই লতিফের কী হল? লতিফ উধাও! কেউ তার খোঁজ পাচ্ছে না।

হয়ে গেল! আর আবদুল ১৯৯৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর গুজরাত পুলিশের ডিআইজি কেএন শর্মা দিল্লির অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের কুলদীপ শর্মাকে ফোন করে বললেন, আবদুল লতিফ আমেদাবাদের দুটি নম্বরে ফোন করে ৫০ লক্ষ টাকা চাইছে। সেই টাকা ওই ব্যবসায়ী দিতে পারবেন না। তাই তিনি যোগাযোগ করেছেন গুজরাত পুলিশের সঙ্গে। এরপরই আমেদাবাদ পুলিশ সেই ব্যবসায়ীর ফোন ট্যাপ করে। আর জানা যায় ফোন আসছে ডি ট্যাক্স ব্যবস্থার মাধ্যমে। যাকে পরিভাষায় বলা হয় ডিজিট্যাল টেলিফোন অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ। সেটির লোকেশন দেখাচ্ছে দিল্লির জনপথে খুরশিদ লাল ভবনে। তাই গুজরাত পুলিশ সাহায্য চায় দিল্লির। ডিআইজি কুলদীপ শর্‌মা তৎক্ষণাৎ সিবিআইকেও যোগাযোগ করলেন। ঠিক হল সত্যিই যদি এটা আবদুল লতিফ হয় তাহলে সিবিআই, দিল্লি পুলিশ আর আমেদাবাদ পুলিশ একজোট হয়ে অপারেশন চালাবে। এটাই হবে আবদুল লতিফের প্রকৃত লোকেশন জানার সবথেকে সহজ উপায়। সবার আগে যেতে হবে টেলিকম দপ্তরে। আজকের এই মোবাইলের যুগে কল্পনাই করা যাবে না ১৯৯৫ সালে একটি টেলিফোন কলকে মনিটর করা এবং সেই নম্বর থেকে কোন নম্বরে কল করা হচ্ছে তা নিখুঁতভাবে জানা রীতিমতো দুঃসাধ্য ছিল। দিল্লি পুলিশকে মহানগর টেলিফোন নিগম লিমিটেডের ডিজিএম সুনীল সাকসেনা বললেন, মনিটর করা সম্ভব! তবে একটা

শর্ত আছে। ওই ফোন কল অন্ততপক্ষে ১০ থেকে ১২ মিনিট চালু থাকতে হবে। তাহলেই জানা সম্ভব কোথা থেকে কল আসছে, কোথায় করা হচ্ছে। আর প্রকৃত লোকেশন। ঠিক যখন আমেদাবাদে ফোন আসবে ঠিক তখনই লোকাল এক্সচেঞ্জে সবার আগে জানাতে হবে। সেই এক্সচেঞ্জ এরপর আমেদাবাদের ডি ট্যাক্সকে সতর্ক করবে। সঙ্গে সঙ্গে। আমেদাবাদ ডি ট্যাক্স মনিটর করতে পারবে দিল্লির কোন ডি ট্যাক্স রাউটার ব্যবহার করে কলটি আসছে। ডি ট্যাক্স ওয়ান? নাকি ডি ট্যাক্স টু? সেখনেই শেষ নয় কিন্তু। এরপর দিল্লির ওই ডি ট্যাক্স মনিটর করবে দিল্লির বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ। সব মিলিয়ে যে শহরে আছে ৩১টি এক্সচেঞ্জ। আর আপনাদের এই গোটা মনিটর প্রসেসে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। পারবেন? দিল্লি পুলিশ বলেছিল থাকতেই হবে। যাকে ধরার জন্য এই প্ল্যান সে ধরা পড়লে বিরাট সাকসেস!

সাধারণত আবদুল লতিফের ফোনকল আসছিল সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ১০ টার মধ্যে। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ওই তিন ঘণ্টায় আমেদাবাদ, দিল্লি টেলিকমকে একজোট হয়ে প্রতিটি মোমেন্ট অ্যালার্ট থাকতে হবে। পরদিন কিন্তু ফোন এল যথাসময়ে। তার পরদিনও তাই। তার পরদিনও এল ফোন। কিন্তু কোথা থেকে কল আসছে তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ একটাই। আবদুল লতিফ ফোন করছে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। তিন মিনিটের আগেই সে ফোন কেটে দিচ্ছে। অথচ কল চালু থাকতে হবে অন্তত ১২ মিনিট। ওই ব্যবসায়ীকে বলা হল এরপর তিনি যেন অনেক বেশি সময় নেন। আর বিভিন্ন কথার জালে লতিফকে ব্যস্ত করে ফেলেন। যাতে টেলিফোন কল অনেকটা সময় ধরে করা সম্ভব হয়। ৭ সেপ্টেম্বর। ফোন কল এল। এবং এই প্রথম কিছুটা সাফল্যের আলো দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রায় ১৩ মিনিট ধরে কথা হয়েছে। দিল্লি আর গুজরাতের এটিএস বাহিনী এবং অধীর হয়ে জানতে চাইছে কোথা থেকে এল কল? এবং জেনে চমকে উঠল সবাই। যে ফোন থেকে এসেছে সেটির নম্বর হল ৩২৮১। দরিয়াগঞ্জ এক্সচেঞ্জ। দুবাই টুবাই কিছুই নয়। দিল্লির দরিয়াগঞ্জ। আর ওই নম্বরটি কার? একটি পাবলিক বুথের। জামা মসজিদের পাশেই। অর্থাৎ এতদিন ধরে আবদুল লতিফ দিল্লিতে লুকিয়ে? আর সে জামা মসজিদের

পাশের থেকে রোজ কল করছে? যে জামা মসজিদের অদূরে আইটিও ক্রসিংয়ে খোদ দিল্লি পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স!! আশ্চর্য! দিল্লি পুলিশ জানেই না!

কিন্তু আগের কলগুলোও এই একই নম্বর থেকেই করা হয়েছিল কিনা তা জানার জন্য আবার অন্য ব্যবস্থা। সেটি হল ডিজিট্যাল ডেটা টেপ রিড করতে হবে। দরিয়াগঞ্জ এক্সচেঞ্জের। সেটা কীভাবে সম্ভব? টেলিকম দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজার (কম্পিউটার) পারবেন বিশেষ অর্ডার বের করে। দিল্লি পুলিশ তাঁর কাছে গেল। ঠান্ডা মাথায় সবটা শুনলেন। এবং আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। একটা রিকোয়েস্ট লেটার দিয়ে যান। ১৫ দিন পর খোঁজ করবেন। দেখি কী করা যায়। স্যার এত দেরি করে চলবে না আমাদের! আমাদের একটা জরুরি কেস! বললেন, এইচ সি সিং । সিবিআইয়ের এক ডিএসপি। কিন্তু সেই জেনারেল ম্যানেজার কোনোরকম হেলদোলই দেখালেন না। এর থেকে আগে করা যাবে না। সবকিছুর একটা নিয়ম আছে। ফোন করে সব বলা হল অরুণ ভগতকে । সিবিআই এর স্পেশাল ডিরেক্টর। অরুণ ভগত বললেন, ঠিক আছে। আমি ভাটকে পাঠাচ্ছি। আর এস ডিএসপি। এম কে ভাট। তিনি বেশি কথা বলার লোক নয়।

ঠিক দু ঘণ্টা পর গেলেন সেই জেনারেল ম্যানেজারের কাছে।

এবং বললেন, আপনার গত এক মাসের পার্সোনাল কল রেকর্ড দেখান। জেনারেল ম্যানেজার বললেন, কেন?

আমরা একটা কেসে আপনার নাম পাচ্ছি। সেটা ভেরিফাই করতে হবে। ২৪ ঘণ্টা টাইম দিলাম।

প্রিন্ট আউট রেডি রাখবেন। দুবাই কানেকশনের কেস। খুব জটিল মামলা। আর শুনুন, আপাতত দিল্লি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আচ্ছা! চলি! নমস্কার!

জেনারেল ম্যানেজারের মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হতে শুরু করেছে। ভাট বেরিয়ে আসার আগে হাসলেন। যে রোগের যে ওষুধ! ওষুধ ধরেছে।

ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর দরিয়াগঞ্জ এক্সচেঞ্জের সম্পূর্ণ ডিজিট্যাল টেপ দক্ষিণ দিল্লির সিবিআই সদর দপ্তরে এসে পৌঁছল। দিয়ে গেল স্বয়ং সেই এক টেলিকম জেনারেল ম্যানেজার। অরুণ ভগতকে ধন্যবাদ জানালেন দিল্লি পুলিশের এটিএস বাহিনীর ডিআইজি। হাসলেন ভগত তিনি জানেন ঘি ওঠাতে গেলে কখন আঙুল বাঁকা করতে হয়। এবং আর কোনো সন্দেহ রইল না। জানা গেল সমস্ত ফোনই এসেছে ওই একই নম্বর থেকে। অর্থাৎ জামা মসজিদের পাশের পাবলিক বুথ। এবার ফাইনাল প্ল্যান! কী প্ল্যান? দরিয়াগঞ্জ এক্সচেঞ্জের কর্মীরা ওই বিশেষ টেলিফোন বুথের সমস্ত কল মনিটর করবেন সাড়ে ৬ টা থেকে সাড়ে ১০ টার মধ্যে। প্রতিদিন সন্ধ্যায়। মোটোরোলা আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়্যারলেস সেট নিয়ে দুটো পুলিশের টিম ওই পাবলিক বুথের ধারেকাছে গোপনে সাদা পোশাকে থাকবে। সেই টিমে থাকবে দিল্লি আর গুজরাত দুই রাজ্যের পুলিশই। এমনভাবে যাতে কোনো সন্দেহ না হয়। গুজরাত পুলিশ যদি সংকেত দেয় যে হ্যাঁ এই লোকটিই আবদুল লতিফ, তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে দরিয়াগঞ্জ এক্সচেঞ্জ থেকে ওই পাবলিক বুথের আশেপাশে থাকা পুলিশ টিমকে অ্যালার্ট করে দেবে। অয়্যারলেসের মাধ্যমে। তারা তখন ন্যাব করবে লতিফকে। দুদিক থেকে! থার্ড টিম থাকবে একটু দূরে। কারণ লতিফের নিজের টিমও তো থাকতে পারে ব্যাকআপ কভারের জন্য! তাদের মোকাবিলা করবে ওই তিন নম্বর টিম।

দিল্লি পুলিশের টিম তো কখনও আবদুল লতিফকে দেখেইনি। তাহলে তাকে চিনবে কীভাবে জোগাড় করা হল একটি ভিডিও। কোনো একটি বিবাহের। যে বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির ছিল আবদুল লতিফ। সেই ভিডিওতে দেখা গেল অন্যদেরও। লতিফের সঙ্গীদের। রউফ, শরিফ খান, রসুল পাত্তি, সাত্তার ব্যাটারি। গুজরাত পুলিশের পাঠানো একঝাঁক ছবিও বারংবার করে স্ক্রিনে দেখানো হল। আইডিয়াটি ছিল লতিফকে কেমন দেখতে সেটা তো বটেই, পাশাপাশি তার ম্যানারিজম, আচরণ, কথা বলার ধরন সবই যেন দেখে দেখে মনে রাখে পুলিশ টিম। কারণ এমন হতেই পারে লতিফ নিজের এই পুরোনো চেহারা বদলে ফেলেছে। গোটা টেলিফোন কথোপকথন মনিটর করার জন্য ডাকা হল দিল্লির ডিসিপি (সেন্ট্রাল) অফিসের এক আইটি ইঞ্জিনিয়ারকে। রাজু সিনহা। তুখড় অফিসার। ৯ অক্টোবর থেকে শুরু হল। প্রথম দিন ফোন কলই এল না। ১০ অক্টোবর। একইভাবে

দরিয়াগঞ্জ এক্সচেঞ্জে দিল্লি পুলিশ, সিবিআই, গুজরাত পুলিশের অফিসাররা বসলেন। ওদিকে দুটি টিম জামা মসজিদে। সাড়ে ৮টা। ওই পাবলিক বুথ থেকে একটা কল হচ্ছে। কিন্তু পাত্তা দেওয়ার মতো নয়। কারণ সেটা যাচ্ছে রাজস্থানের উদয়পুরে। আমেদাবাদে নয়। লতিফ তো নিশ্চয়ই আমেদাবাদে করবে! কিন্তু এক মিনিট পরই আচমকা কোনো একটা কারণে ডিআইজি কুলদীপ শর্মার সন্দেহ হল। চেনা লাগছে না কণ্ঠ? এতবার করে শোনা হয়েছে লতিফের স্বর। তাই চেনা হয়ে গেছে। তবু তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য হেডফোন দিলেন ডিআইজি সিবিআই নীরজকুমারের দিকে। এরপর রাজু সিনহা। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল সেই একই কণ্ঠ! অর্থাৎ লতিফ আছে লাইনে! তৎক্ষণাৎ দরিয়াগঞ্জ এক্সচেঞ্জের কর্মীদের ইশারায় বলা হল টিমকে মেসেজ পাঠাতে। অয়্যারলেসে মেসেজ গেল জামা মসজিদের বাইরে পাবলিক বুথের কাছেই থাকা দুটি টিমের কাছেই।

প্রথমে এগোলেন ইনস্পেক্টর রাজ। তিনি গুজরাত পুলিশের। সন্তর্পণে এগোচ্ছেন। পিছন ঘুরে একটা হাত বুথের কাচঘেরা দেওয়ালে রেখে কথা বলছে আবদুল লতিফ। কিন্তু তারও কিছু একটা সন্দেহ হল। এক নিমেষে ঘুরে দাঁড়াল। কথা বলতে বলতে। বাইরে চোখ গেল। আর তাকিয়েই দেখতে পেল ইনস্পেক্টরকে। তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে ইনস্পেক্টর রাজ দরজার সামনে ঝাঁপিয়ে এলেন। তাকে ধাক্কায় শুইয়ে দিল লতিফ। পালাচ্ছে। কয়েক পা এগোতেই দেখল পালানোর উপায় নেই। তিনদিক থেকেই সাদা পোশাকে সাত আটজন লোক আসছে। আর এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে জানে এই লোকগুলো কারা। চোখ দেখলে বোঝা যায় । শ্বাপদের মতো পা ফেলা দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হল না। তাকে আগেই একজন পুলিশ অফিসার অ্যাথলেটের ধাঁচে ঝাঁপালেন লতিফকে লক্ষ্য করে। এবং জাপটে ধরলেন মোক্ষম প্যাচে। লোকটির নাম এইচ পি এস চিমা। দরিয়াগঞ্জের স্টেশন হাউস অফিসার! সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর অরুণ ভগত নিজের কানকে বিশ্বাস করছিলেন না। তিনি তাঁর টিমের ফোন পেয়ে বলেছিলেন, ডোন্ট টেল দ্যাট! আবদুল লতিফ আবদুল ওয়াহাব শেখ তোমাদের জিম্মায়! এ তো সাংঘাতিক! কনগ্র্যাটস বয়েজ!!

আবদুল লতিফের ইতিহাস তাহলে ওই গ্রেপ্তারের পর সমাপ্ত হল? হল না। লতিফ কাহানির তখনও শেষ দৃশ্য বাকি! ১৯৯৭ সালের এক শনিবার। ২৯ নভেম্বর। লতিফকে কোর্টে পেশ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমেদাবাদ থেকে। পরদিন গোটা গুজরাত জানতে পারল লতিফ কোর্ট থেকে ফেরার সময় পুলিশ ভ্যান থেকে নেমেছিল প্রস্রাব করবে বলে। কারণ সেটা ছিল একটা লেভেল ক্রসিং। নারোদা লেভেল ক্রসিং। তাই পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন আসছে দূরে। লতিফ পাশের মাঠে নেমেছে। আচমকা দুটি পুলিশ গার্ডকে ধাক্কা দিয়ে সে পালানোর চেষ্টা করে! এমনকী গুলিও ছুড়েছে গোপনে রাখা পিস্তল দিয়ে। এক দৌড়ে রেললাইন ক্রস করার মরিয়া প্রয়াস। ছুটছে লতিফ! তার কানে আসছে একটা চেনা বাক্য, ভাগ লতিফ ভাগ! সারা জীবন লতিফ ছুটেছে। লতিফ আবার ভাগছে! হঠাৎ একটি গরম সিসা আচমকা লতিফের পিঠে এসে স্পর্শ করল। পালাচ্ছে লতিফ! কিন্তু পারল না। আর একটি গুলি এসে লাগল! তখনও কেউ যেন বলছে, ভাগ লতিফ ভাগ...! ওই যে পড়ে যাচ্ছে লতিফ। অবশেষে। শেষবারের মতো। আবদুল লতিফের জীবনের চিত্রনাট্যের ক্লাইম্যাক্সের নাম ছিল এনকাউন্টার!!

২৫

ক্যান আই স্পিক টু মিস্টার কুমার প্লিজ!

স্পিকিং! বাট আই অ্যাম ইন আ মিটিং রাইট নাউ! উইল ইট বি পসিবল ফর ইউ টু কল মি লেটার?

মিস্টার কুমার দিস ইজ মেজর ?

মেজর? ও কে টেল মি! কলিং ফ্রম?

ইয়েস, ফ্রম দুবাই!

মেজর...দুবাই...দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের জয়েন্ট কমিশনার কুমার ভাবছেন কে এই মেজর? এবং কয়েক সেকেন্ড লাগল চিনতে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, মেজর, হাউ আর ইউ স্যার..হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! এনি অর্ডার ফর মি? হাসতে হাসতে বলছেন নীরজকুমার।

ফোনের ও প্রান্তে মেজরের কণ্ঠ কিন্তু সিরিয়াস। তিনি বলছেন, কুমার সাব একটা প্রবলেম নিয়ে ফোন করছি আপনাকে। কুমার বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না! আমার পক্ষে কিছু হেল্প করা সম্ভব হলে অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস মেজর! মেজর এরপর যা জানালেন তা চমকে দেওয়ার মতো। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের জয়েন্ট কমিশনার ভাবলেন এটা তো খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতো এক অসাধ্য সাধন! এই কাজটি আদৌ করা সম্ভব? ২ এপ্রিল ২০০২। দুবাই পুলিশের ডিপার্টমেন্ট অফ ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনের পক্ষ থেকে তদন্তকারী শাখার প্রধান ওই মেজর দিল্লি পুলিশকে জানালেন, একটি ভারতীয় মেয়ে দুবাইতে এসে এক শেখকে বিবাহ করেছিল। প্রায় ৭ বছর আগে। সেই আরব শেখের নাম হামিদ কাবানজি। তাঁদের একটি সন্তানও হয়েছে। মেয়ে। নাম হিন্দ কাবানজি। এখন বয়স ৫ বছর। তবে কাবানজি শেখের এটা ছিল দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় বছর দশেক আগেই। সেই প্রথম স্ত্রীর সন্তানের নাম মুনা আহমেদ। সেই থাকে কাবানজির সঙ্গেই। যখন কাবানজির সঙ্গে ওই বম্বে থেকে আসা

ভারতীয় মেয়েটির বিবাহ হয়েছে তখন মুনা আহমেদের বয়স ১৩। অর্থাৎ সৎ মেয়ে আর নিজের মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে বসবাস ভারতীয় নারী রোশন আনসারির! যার নিজের বাড়ি মুম্বই। শেখ সাহেব নিজের অফিসে গিয়েছিলেন সেদিন। ফিরে এসে দেখেন স্ত্রী নেই। নেই তো নেই! ছোট বাচ্চাটাও নেই। কোথায় গেল? রাত হয়ে যাচ্ছে। কেউ ফিরছে না। পরদিন সকাল । কেউ ফেরেনি। কাবানজি সোজা দুবাই পুলিশকে জানালেন। তদন্তে এসে পুলিশ খুঁজে পেয়েছিল একটি ক্লু। চারটি কাগজের টুকরো। স্টোররুমের কাছে পড়ে আছে। কাবানজি স্টোররুমে যাননি। সারারাত স্ত্রী আর দুই মেয়ের জন্য অপেক্ষা করেছেন। ঘর থেকে বাইরে গিয়েছেন। আবার ঘরে এসেছেন। কিন্তু স্টোরের দিকে যাননি। পুলিশ এসে সেই কাগজপত্রের মধ্যেই পেল কয়েকটি কনট্যাক্ট নম্বর। সেই নম্বর ধরে এগোতেই একে একে তিনজনের সন্ধান পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি। বাকি দুজন ইন্ডিয়ান। তিনজনকেই জেরা শুরু। আলাদা আলাদা।

এবং একসঙ্গে। দেখা গেল অসংখ্য অসঙ্গতি। ঘটনার দিন তারা কেন ওই শেখের বাড়িতে গিয়েছিল? কীভাবে ওই কাগজের টুকরো তাদের কারও একজনের মানিব্যাগ থেকে মাটিতে পড়ে গেল? এসব নিয়ে তিনজনের বয়ান পরস্পরের সঙ্গে মিলছে না। সন্দেহ বেড়ে গেল। ক্রমেই নিশ্চিত সন্দেহ হচ্ছে এরা কোনো গ্যাংয়ের হয়ে কাজ করে। আর শেখসাহেবের স্ত্রী রোশন আনসারি এবং দুই কন্যা হিন্দ ও মুনাকে নির্ঘাৎ কিডন্যাপ করা হয়েছে। কারা সেই কিডন্যাপার? কাদের অর্ডারে এই কাজ করা হয়েছে? দুবাই পুলিশের ইন্টারোগেশন সেলের কাজ করার ধরনটি আলাদা। হু হু সমুদ্রের বাতাস আসা সাদা রঙের অ্যাপার্টমেন্ট। চারতলা। তারই বেসমেন্ট হল সন্দেহভাজনদের রাখার সেল। তখনও কিন্তু অফিসিয়ালি অ্যারেস্ট দেখানো হয়নি। কারণ মুখ খোলেনি কেউ। বারংবার বলছে, ওই শেখের বাড়ি থেকে তাদের ফোন করা হয়েছিল। তারা কাজ করে যে ট্র্যান্সপোর্ট সংস্থায় সেখানে ফোন এসেছে। কিছু একটা বড় বাস নাকি লাগবে। সে বিষয়ে কথা বলার জন্য। বাস লাগবে? শেখ কাবানজি বুঝতে পারছেন না। কীসের জন্য বাস লাগবে? আর রোশন কেনই বা বাস চাইবে? তাঁদের তো তিনটে গাড়ি। একটা ক্যারাভান! তিনি তো কিছু জানেন না! সুতরাং দুবাই পুলিশ তখনও অন্ধকারে যে কীভাবে এদের থেকে জানা সম্ভব

আদৌ সত্যি বলছে কিনা। সমস্যা হল ওরা যে ট্রান্সপোর্ট সংস্থার কথা বলছে সেখানে কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছে সত্যিই ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু একসঙ্গে তিনজনকে পাঠানো হয়নি। পাঠানো হয়েছে দুজনকে। এই বাংলাদেশি কেন সেখানে গিয়েছে তারা ওই সংস্থা জানে না। চেনেও না। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হচ্ছে। বাংলাদেশি নাগরিককে উপরে নিয়ে আসা হল। জায়গাটা একটা টেরেস। সামনেই সমুদ্র। খাঁড়ির মতো। তবে বড় বড় পাথর দেওয়া। একজন আরবকে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। দুই পুলিশ। আরবের ভাষাটা এখনও জানে না বাংলাদেশি লোকটি। তাই বুঝতে পারছে না কী কথাবার্তা হচ্ছে! আর তাকে এখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে? হঠাৎ আরব লোকটির দুটি কাঁধ ধরে কিছু একটা প্রশ্ন করা হল। সেই লোকটি মাথা নেড়ে যাচ্ছে অবিরত। এবং নিমেষের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। লোকটিকে একটা জাস্ট ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা পিছনে পা ফসকে পড়ে গেল। নীচে। 1 মানে? সেই সমুদ্র খাঁড়িতে যে অসংখ্য পাথর রাখা আছে সেইসব পাথরের উপর পড়ছে লোকটি? তাহলে তো সাক্ষাৎ মৃত্যু! হ্যাঁ। তাই। লোকটি পড়ে গেল নীচে। অর্থাৎ মারাই গেল। চারতলার উপর থেকে। একটা আর্তচিৎকার! তারপর সব শেষ। বাংলাদেশি লোকটি আতঙ্কে বসে পড়ল মাটিতে। তাকে বলা হল ওই লোকটি চুরি করেছে একটা শপিং মল থেকে। সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু স্বীকার করছে না। অনেকবার বোঝানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও। অনড়। তাই এছাড়া উপায় নেই। এটাই আমাদের নিয়ম। বিস্ফারিত নেত্রে বাংলাদেশি লোকটি তাকিয়ে। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দুবাই পুলিশের তদন্তকারী অফিসার। তুমি কী করবে? বাংলাদেশি মাথা নাড়ল! অর্থাৎ সব বলবে। এবং নীচে তখনও বেসমেন্টে থাকা লোকদুটি জানতেই পারল না তাদের সঙ্গী সব কথা বলে দিচ্ছে। কী সেই কথা? যা শুনে দুবাই পুলিশের মতো ঠান্ডা মাথার শার্প অফিসাররা পর্যন্ত চমকে গেলেন? ওই বাংলাদেশির বয়ানে জানা যাচ্ছে, রোশন আনসারি অথবা তাঁর মেয়েদের কেউ কিডন্যাপ করেনি। সে নিজেই নিজের সৎ কন্যা ২০ বছরের মুনা আহমেদকে হত্যা করেছে। অদূরের এক ফ্ল্যাটে। সেখানেই মুনা আহমেদ থাকত। একা। হত্যা করে স্টোররুমের মেঝেতে পুঁতেও দিয়েছে। ওই পুঁতে ফেলার কাজটির জন্য সে ডেকে এনেছে নিজের এই পুরোনো

চেনা সঙ্গীদের। যাদের দিয়েছে কয়েক লক্ষ ইন্ডিয়ান টাকা। স্টোররুমের একটা ডিভান রাখা ছিল পরিত্যক্ত। সেখানে। ডিভানের নীচের ভাগে পুঁতে ফেলার কাজটি করা হয়েছে। বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। নিখুঁতভাবে সিমেন্ট দিয়ে প্লাস্টার। আর তার উপর দামি কার্পেট। যেটা আগে থেকেই ছিল। তারপর? রোশন আনসারি কোথায়?

রোশন আনসারি ভারতে পালিয়েছে গতকাল রাতেই। ছোট মেয়েকে নিয়ে। এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট নম্বর AI ৭০০। সব কথা শোনার পর দুবাই পুলিশ তিনজনকেই সেই বাড়ির বাইরে বের করে আনল। এবার পাঠানো হবে কোর্টে। গাড়িতে তোলা হল। গেট দিয়ে বেরনোর সময় বাংলাদেশি লোকটি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। কারণ গেটের অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই আরব লোকটি। যাকে একটু আগেই চারতলা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে বহাল তবিয়তে এই পুলিশদের সঙ্গেই গল্প করছে! কী ব্যাপার? ব্যাপার আর কিছুই নয়। ওই আরব লোকটিও আসলে তদন্তকারী টিমের সদস্য। বাংলাদেশি লোকটির মুখ খোলার জন্যই তাকে অপরাধী সাজিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নাটক করা হয়েছিল। আর টেরেস থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলেও আদতে নীচে ছিল নেট। সেখানেই সে পড়েছে। সোজা কথায় বাংলাদেশিকে ভয় পাওয়ানোই ছিল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। প্ল্যানের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুবাই পুলিশ ওই তিন হত্যার সহকারীকে নিয়ে দৌড়ল সেই অ্যাপার্টমেন্টে। এবং সত্যিই তাই! স্টোররুমের ডিভান সরিয়ে দেখা গেল সবেমাত্র করা সিমেন্টিং এখনও কাঁচাই। একটু খোঁচাতেই তীব্র গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা দিল কেউ। কেউ বাইরে বেরিয়ে এসে বেসিনে বমি করে দিল। কারণ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ২০ বছরের মুনা আহমেদের। পচন ধরেছে। গলিত শব থেকে আসছে তীব্র গন্ধ। গলায় ছুরি দিয়ে নির্বিচারে মারা হয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেলেন শেখ কাবানজি। রোশনের মতো শান্ত মেয়ে হয় না। ভারতীয় মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করেছিলেন ওই নিপাট শান্ত স্বভাবের জন্যই। এবং সে গোটা সংসারের কাজ করে এসেছে। একাই সামলেছে সবকিছু। অবশ্যই একটা প্রধান সমস্যা ছিল। সেটা হল মুনা আহমেদ শুরু থেকেই এই নতুন সৎ মাকে মেনে নিতে পারেনি। সে বাবাকে বলেই দিয়েছিল এই মহিলার সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। তার মায়ের জায়গা আর কেউ নিক সে তা চায় না। আর ঠিক ওই কারণেই

পাশের অ্যাপার্টমেন্টেই সে থাকতে শুরু করে আলাদা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৎ মা আর সৎ মেয়ের মধ্যে ঝগড়া তুমুল হয়েছে একাধিকবার। তাই বলে সেই ঝগড়ার এই পরিণতি! একটা ২০ বছরের মেয়েকে নির্মমভাবে হত্যা করে পালিয়ে গেল রোশন? এর বদলা চান শেখ! কিছুতেই যেন ওই মহিলাকে ছাড়া না হয়। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত এক বিজনেসম্যান। তাঁর কথা দুবাই প্রশাসনের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সব চাপ এসে পড়ল দুবাই পুলিশের উপর। বলা হল, যেভাবেই হোক ভারত থেকে ওই মহিলাকে ধরে আনতেই হবে। অ্যাট এনি কস্ট!

অতএব দুবাই পুলিশ দিল্লি স্পেশাল সেলে ফোন করে সাহায্য চায়। যেভাবেই হোক রোশন আনসারিকে খুঁজে দুবাইয়ে পাঠাতে হবে। কারণ হামিদ কাবানজি অনেক পাওয়ারফুল। সে যখন জেনেছে তাঁর ভারতীয় স্ত্রী এভাবে বড় মেয়েকে হত্যা করে পালিয়েছে সে সোজা সরকারের উচ্চস্তরে চাপ দিয়েছে। যেভাবেই হোক তিনি বিচার চান। আর সরকার থেকে তাই দুবাই পুলিশকে প্রচণ্ড প্রেশার দেওয়া হচ্ছে। এখন ভারতের উপরই ভরসা। দেখা যাক ভারত প্রতিদান দিতে পারে কিনা! প্রতিদান আবার কীসের? প্রতিদান হল ওই বছরের এই ঘটনার মাত্র দুমাস আগেই দুবাই পুলিশ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতের এক দুর্ধর্ষ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল। দিল্লি পুলিশ আর সিবিআই এর টিম এসে সেই লোকটিকে দুবাই থেকে ভারতে বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই দুই পুলিশ অফিসার দুবাই পুলিশকে বলে গিয়েছিলেন তাঁরা এই সাহায্যের কথা কখনও ভুলবেন না। যে কোনো মূল্যে যে কোনো সময় দুবাই পুলিশ সহায়তা চাইলে ভারতকে পাশে পাবে। কে ছিল সেই অপরাধী? যাকে হন্যে হয়ে ভারতের অন্তত চারটি শহরের পুলিশ দিনের পর দিন মাসের পর মাস খুঁজেছে? তাকেই দুবাই পুলিশ গ্রেপ্তার করে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে মাত্র দু মাস আগে। লোকটির নাম আফতাব আনসারি! কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলা থেকে খাদিম কর্তা অপহরণ। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত। আফতাব আনসারিকে ভারতে ফিরিয়ে দিয়েছে দুবাই। এবার সামান্য একজন আনপ্রফেশনাল নারী হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারবে না ভারত? সত্যিই ভারত পড়ে গেল প্রবল চাপে। কারণ এই কাজটি করে দিতে না পারলে

দুবাইয়ের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে কোনো সাহায্য পাওয়াও যাবে না। অতএব যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে রোশন আনসারিকে! কোথায় সে? দুবাই পুলিশ ঠিকানা জানাল। ভারতে রোশন আনসারির বাড়ির ঠিকানা হল মারু মিয়া চাল, পাংখে শাহ বাবা দরগার কাছে, লালবাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, ঘাটকোপার (ওয়েস্ট), মুম্বই।

ফোন নম্বর আছে একটা। ৫০০২। রোশনের বাবা মা দাদা থাকেন। গোটা অপারেশনের দায়িত্বে কে থাকবে? সিবিআই এর মুম্বই ইকনমিক অফেন্স উইং এর ডিআইজি বীরেন্দ্র সিংকে বলা হল। বীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজের একটা টিম তৈরি করে ফেললেন। টিম ইনচার্জ ডিএসপি ডি এস শুক্লা। প্রথমেই যেতে হবে রোশনের বাড়ি। অর্থাৎ যেখানে এখন তার পিতামাতা দাদারা থাকে। কিন্তু সিবিআই অফিসার হিসেবে গেলে তো লাভ নেই। গোপনে যেতে হবে। কারণ প্রাথমিকভাবে মনে হয় রোশন ওখানে থাকবে না। তার এটুকু বুদ্ধি আছে যে পুলিশ হানা দিলে সর্বাগ্রে বাপের বাড়িতেই টার্গেট করবে। তবু অপরাধের তদন্তের নিয়ম হল কোনো চান্সকেই অগ্রাহ্য করতে নেই। তাই ডিএসপি শুক্লা ভাবছেন কীভাবে ওই ঠিকানার বাড়িটার অন্দরে যাওয়া যায়। যদি এখানে নাও থাকে, নিশ্চয়ই ফোন করবে রোশন। আচমকা দুবাই থেকে পালিয়ে এসে কতদিন সে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরবে? নিজের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট তো রাখতেই হবে। এই চিন্তা মাথায় আসতে তৎক্ষণাৎ পাওয়া গেল সমাধান। টেলিফোন। লোকাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জের এই এলাকার লাইনম্যানকে ধরা হল। সিবিআই? সে চমকে গেল। এসব ঝামেলায় সে পড়তে চায় না। কিন্তু একটু কড়কানিতেই লাভ হল। শুক্লাকে সঙ্গে নিতে রাজি সে। লোকটির সঙ্গে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের লাইনম্যান সেজে শুক্লা ঢুকলেন সেই বাড়িতে। বলা হল টেলিফোন লাইন সারাতে আসা হয়েছে। রোশনের আম্মি বললেন, সারাতে কেন? আমাদের ফোন তো ঠিকই আছে। ওই লাইনম্যান বললেন, রিসিভারের স্পিকার চেঞ্জ করতে হবে। নতুন অর্ডার। পুরোনো সমস্ত স্পিকার রিপ্লেস করতে হবে। হতেই পারে। তাই কেউ সন্দেহ করছে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে ল্যান্ডলাইনের ফোনের রিসিভার খুলে একটা গোপন যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হল। যেটি আসলে মনিটরিং ডিভাইস। এক্সচেঞ্জে বসে জানা যাবে এখান থেকে

কোথায় ফোন করা হচ্ছে। আর বাইরে থেকে কারা ফান করছে এই নম্বরে। সুতরাং প্রাথমিক কাজ সফল। এবার অপেক্ষা করা কখন ফোন করে রোশন।

একদিন..দুদিন....তিনদিন...রোশন ফোন করেনি। এমনকী অন্য কোনো ফোন নম্বরেও কথা বলার সময় রোশন সম্পর্কে কোনো শব্দই উচ্চারিত হচ্ছে না। অপেক্ষা করছেন সিবিআই অফিসাররা। কোনো একটি ব্রেক থ্রুর আশায় বসে আছেন। এদিকে দুবাইতে ততক্ষণে আরও উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কারণ আগেই বলা হয়েছে শেখ কাবানজি প্রচণ্ড প্রভাবশালী এক ব্যবসায়ী। তিনি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের দিয়ে দুবাই পুলিশকে চাপ দিচ্ছেন । এখনও কেন তাঁর মেয়ের হত্যাকারী ধরা পড়ল না। তাঁকে বলা হল ভারতীয় পুলিশ প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে। এখনও রোশনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে কোথায় গিয়েছে বা যেতে পারে তার হদিশ মিলছে না। আপনি অপেক্ষা করুন। ইন্ডিয়ান পুলিশ পারবেই খুঁজে বের করতে। শেখ কাবানজি ফিরে এলেন নিজের বাড়ি। এবং এসেই তাঁর মনে হল একবার রোশনের নিজের আলমারিতে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যাক কোনো ক্লু মেলে কিনা। কোনো চিঠি, কোনো লিংক। সত্যিই পাওয়া গেল। একটি ডায়েরি। সেখানে পাঁচটি হাতে লেখা ঠিকানা। মুম্বই, দিল্লি, আজমের। আর দুটি ঠিকানা ব্যাঙ্গালোর। আর একঝাঁক ফোন নম্বর। যার মধ্যে বড় অংশই দুবাই, শারজার। তৎক্ষণাৎ আবার দুবাই পুলিশের ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন হেডকোয়ার্টার্সে ছুটলেন শেখ। সেই ডায়েরি পেয়ে তার স্ক্যান কপি পাঠানো হল মুম্বইয়ে সিবিআই দপ্তরে। আর ইতিমধ্যেই দুবাই পুলিশ দুবাইতে রোশনের যেসব বন্ধু ছিল সেইসব পরিচিতদের ফোন ট্যাপ করতে শুরু করে দিয়েছে। মুম্বই সিবিআই ব্যাঙ্গালোরে ফোন করছে। ওখানে সিবিআই শাখার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ হলেন প্রতাপ রেড্ডি।

রেড্ডি, একটা ঠিকানা লেখো, বললেন ডিআইজি বীরেন্দ্র।

ইয়েস স্যার।

ইজ দ্যাট ওকে?

ইয়েস স্যার।

ওখানে এই দুটো ঠিকানাকে অ্যাপ্রিহেন্ড করতে হবে রেড্ডি।

রেড্ডি চুপ।

কী হল? এনি প্রবলেম?

ইয়েস স্যার।

কী প্রবলেম? বিস্মিত ডিআইজি বীরেন্দ্র।

স্যার ওই জায়গা সাংঘাতিক সেনসিটিভ। ওখানে রেইড করতে গিয়ে বহুবার পুলিশের গাড়ি পুড়েছে। ক্রিমিন্যাল ডেন। লোকাল পুলিশকে ইনভলভ করতে হবে।

বীরেন্দ্র ভাবছেন। লোকাল পুলিশকে সর্বদা যে কোনো অভিযানে ইনভলভ করতে রাজি হয় না সিবিআই। কারণ অনেক। প্রথমত লোকাল পুলিশ মনেপ্রাণে পছন্দ করে না যে তার এলাকা থেকে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর তারা কিছুই জানতে পারেনি এই অপরাধীর লুকিয়ে থাকা, এটা ব্যর্থতা। তাই তারা সর্বদাই নানারকম প্রটোকলের ঝামেলা উত্থাপন করে। শেষে এসব করতে গিয়ে অভিযানটাই ব্যর্থ হয়।

বীরেন্দ্র বললেন, ওকে। রেড্ডি একটা কাজ করো। শুধু ঠিকানাটা কনফার্ম করো। বলেন। এবারও তাই বললেন, ইয়েস স্যার।

রেড্ডি কম কথা বলেন, এবারও তাই বললেন ইয়েস স্যার।

দুবাই পুলিশ সক্রিয়। তারা যে ফোন ট্যাপিং করে রেখেছে ওই দেশে থাকা রোশনের বন্ধু বান্ধবীদের, তারই একটি নম্বর থেকে ব্যাঙ্গালোরে ফোন এসেছে। শোনা গেল এক মহিলা আর এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। দুবাই থেকে ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোরের মহিলার নাম সায়রা। রেকর্ড করার পর সেই কণ্ঠস্বর শোনানো হয়েছে শেখ কাবানজিকে। তিনি বললেন, সায়রা নয়, এটাই রোশনের ভয়েস! অর্থাৎ রোশন আনসারি ব্যাঙ্গালোরেই রয়েছে? দুবাই পুলিশ জানিয়ে দিল ইন্ডিয়াকে। আর বলল, এরপরও তোমরা ধরতে পারবে না? এটা শ্লেষ ছিল। দিল্লি পুলিশ চুপ করে রয়েছে। এবার জাল গোটানোর পালা। তবে সাবধান থাকতে

হবে। কিন্তু ফাইনাল অপারেশনের আগে অনেক কিছু ভাবনাচিন্তার আছে। তাই চিন্তিত বীরেন্দ্র। লোকাল পুলিশকে বলতেই হবে। কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ করা দরকার। সেটা হল যদি রোশন আনসারি নামক মহিলাকে সত্যিই ধরা যায় তাকে দুবাইতে ফেরত পাঠানো হবে কীভাবে? এজন্য দরকার ডিপোরশন অর্ডার। অর্থাৎ প্রত্যর্পণ নির্দেশ সংবলিত একটি সরকারি অর্ডার। যে কোনো ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করে অন্য দেশে পাঠানো যায় না। একটা নিয়ম আছে। আর সেই অর্ডার আজকালের মধ্যেই করতে হবে। কারণ ততক্ষণে নিশ্চিত যে ব্যাঙ্গালোরে আছে রোশন। ২০ দিন কেটে গেল। এখনও সন্ধান নেই। দুবাই পুলিশ, দুবাই সরকার চাপ বাড়াচ্ছে। সবথেকে লজ্জার কথা হল দুবাই পুলিশের ডিরেক্টর ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন এটাও মনে করিয়ে দিলেন আমরা কিন্তু মাত্র দুদিনের মধ্যে আফতাব আনসারিকে গ্রেপ্তার করে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সে ছিল মারাত্মক আন্তর্জাতিক মাফিয়া। আর আপনারা একটা সাধারণ হাউসওয়াইফকে ধরতে পারছেন না? দিল্লি পুলিশ, সিবিআই সকলেই এই বার্তা পেয়ে চুপ করে রয়েছে। কারণ কথাটা সত্যি।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ঠিকানা জানা আছে। লোকাল পুলিশকে সঙ্গে নেওয়া হল। কারণ জায়গাটা গলির গলি তস্য গলি। দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সিবিআই। একইসঙ্গে রয়েছে ব্যাঙ্গালোর পুলিশ। একটি ৩৫ বছরের মহিলাকে যার সঙ্গে আবার পাঁচ বছরের বাচ্চাও রয়েছে, পাকড়াও করার জন্য নাজেহাল এই বিরাট বাহিনী। বাড়িটা দোতলা। একতলায় থাকে সায়রা। আসলে সায়রাই রোশন। ডোরবেল বাজানো হল। বাইরে পজিশন নিয়ে আছে ব্যাঙ্গালোর পুলিশ। ভিতরে সাদা পোশাকে সিবিআই আর দিল্লি পুলিশ। একটু সময় লাগছে দরজা খুলতে। কিন্তু খুলল। মহিলাটি দাঁড়িয়ে। না রোশন নয়। অন্য কেউ। রোশন কোথায়? মহিলাটি বললেন, রোশন? সে কে? ডিএসপি শুক্লা আই কার্ড বের করলেন।

বললেন, কোনো এক্সট্রা চালাকি করবেন না। রোশনকে ডেকে দিন।

সায়রা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ঘরে আর কেউ নেই। আপনারা ঢুকে চেক করে আসুন।

পুলিশ বাহিনী থমকে গেল। ভাবল, হতে পারে রোশন বাইরে কোথাও গেছে। তাই বলা হল, আমরা কিন্তু অপেক্ষা করব। আপনার নাম কী? মহিলার উত্তর, আমি সায়রা! আপনি সায়রা? আপনিই ফোন করেছিলেন দুবাই? হ্যাঁ। কেন? কে থাকে? আমার স্বামীই তো থাকে ওখানে। ফোন করা অন্যায় নাকি?

ডিএসপি শুক্লা এবার ভাবতে শুরু করেছেন সম্ভবত অপারেশন ফেইল করছে। কারণ বোঝাই যাচ্ছে পাখি এখানে নেই। তা না হলে এই মহিলা এতটা স্মার্টলি আর কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলতে পারতেন না।

তবু সাবধানের মার নেই। সেদিন সারারাত দুজন পুলিশকে মোতায়েন করা হল। কিন্তু কোনো লাভই হল না। কারণ সায়রা একাই থাকে এই বাড়িতে। রোশন নেই। হতাশ গোটা বাহিনী ফিরে এল। একটা সামান্য গৃহবধূ এতটা জেরবার করে দিচ্ছে এত বড় একটা ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সিকে? আশ্চর্য! ডি আই জি বীরেন্দ্রর কাছে ক্রমেই প্রেস্টিজ ফাইট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পুলিশ যখন হাতড়ে বেড়াচ্ছে ক্লু, ঠিক তখন একটি ফোন এসেছে ঘাটকোপারে রোশনের বাবার কাছে। একটি মহিলা কণ্ঠ। আগে থেকেই সেই ফোনটি ট্যাপ করা। তাই কন্ট্রোলরুমে বসে শোনা গেল, মামুজান, সায়রা বলছি। রোশন আপাকে খুঁজতে পুলিশ এসেছিল। আল্লা কা শুকর হ্যায় কী রোশন আপা পহেলেই ইহাসে যা চুকি। আপকো অগর ফোন করে তো বাতা দে না ব্যাঙ্গালোর না আয়ে!

কন্ট্রোল রুমে বসে সবই শুনল মুম্বই পুলিশ। এবং জানা গেল ব্যাঙ্গালোরে হানা দিতে দেরি হয়েছে। এবার কী উপায়! যে নম্বর থেকে সায়রা কল করেছে সেটা কিন্তু নিজের বাড়ি নয়। ব্যাঙ্গালোর বি এস এন এল জানাল ওই নম্বর তাজউদ্দিন মেহমুদের। যে আসলে রোশনের মামা। কীভাবে জানা গেল? কারণ ওই নম্বরটি মনিটর করা শুরু হল। এবং দুদিনের মধ্যে একটি মোবাইল থেকে ফোন। এবার স্বয়ং রোশন। কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ফোন কানে নিয়েই মামা বললেন তুই কোথায়? রোশন বলল, আমি গোয়ায়। চিন্তা নেই।

মামা আরও বেশি চিন্তিত। বললেন, শোন। বম্বে আর দিল্লির পুলিশ সব জেনে গিয়েছে। তোর পিছনে ছুটছে। কী করবি? রোশন কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বলল, দেখছি কী করা যায়। ব্যস! পুলিশ শুনল। তার মানে গোয়া? সিবিআইকে খবর দেওয়া হল। আর দেরি করা যাবে না। তৎক্ষণাৎ গোয়া পুলিশকে বলা হল ওই সিমকার্ডের লোকেশন ট্র্যাক করতে। সেই ২০০২ সালে এত আধুনিক প্রযুক্তি ছিলও না। তাই সার্ভিস প্রোভাইডারকে বলা হলেও কাজটা করতে অনেকটা সময় লাগত। আজকাল তো নিমেষে মোবাইল ট্র্যাক করা যায়। তখন তা ছিল না। রাতারাতি মুম্বই থেকে সিবিআই টিম এল। গোয়া কোলাবা পুলিশ স্টেশনের গায়েই কন্ট্রোল রুম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানা হয়ে গেল জায়গাটা কোথায়। সাউথ গোয়ায়। আমরা যাচ্ছি। ফোনে গোয়া পুলিশের ডিআইজি সুরেশ সাওয়ান্তকে বললেন বীরেন্দ্র। কিন্তু আপনারা তার আগে বেরিয়ে যান। আমি ফ্যাক্স করছি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট। সাওয়ান্ত পরের মুহূর্তেই পেয়ে গেলেন ফ্যাক্স। আর টিমকে বললেন, প্রসিড বয়েজ! তিনটি গাড়ি ছুটে চলল। কিন্তু এবারও হতাশ হতে হয়েছে। সাউথ গোয়ার যে হোটেলে রোশন ছিল সেখান থেকে রোশন সেদিন ভোরেই বেরিয়ে গিয়েছে। রোশন ফোন করছে মুম্বই। রোশন ফোন করছে দুবাই। রোশন ফোন করছে দিল্লি। যখনই ফোন করছে তার সিম কার্ড ট্র্যাক করে দেখা যাচ্ছে সেটা অন্য এক নম্বর। অন্য এক সিম কার্ড। আর অন্য কোনো শহর। আজ গোয়া। কাল হায়দরাবাদ। পরশু আমেদাবাদ। তারপর নাসিক। একটি মহিলা গোটা সিবিআই থেকে দিল্লি পুলিশকে ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে। কারণ সে যে কোনো শহরে নেমেই প্রথমে একটা নতুন সিম কার্ড নিচ্ছে। তারপর হোটেলে ঢুকছে। দুদিনের বেশি থাকছে না। আর সিবিআইয়ের পক্ষে ওই সিম কার্ড লোকেট করে সঠিক লোকেশন জানার জন্য অন্তত ৪৮ ঘন্টাই লাগছে। যেই স্থানীয় পুলিশকে ওই লোকেশনে যেতে বলা হচ্ছে প্রতিবার দেখা যাচ্ছে পুলিশ পৌঁছনোর আগেই রোশন উধাও। এবং একই কাহিনি হোটেলের রিসেপশনিস্ট বলছে একটা বাচ্চা কোলে মহিলা। সারাদিনে বেশি বাইরে বেরোয় না। দুবার বেরোয়। কোথায় জানি না। এই তো আপনারা আসার আগে আজ ভোরে কিংবা গতকাল রাতে চলে গেল চেক আউট করে। এ যেন সত্যিকারের চোরপুলিশ খেলা চলছে।

এবং অবশেষে সুযোগ এসেছে। সেই মামার কাছে ফোন এল। কল করছে রোশন। তার টাকা ফুরিয়ে আসছে। আর সে পালাতে পারছে না। আর কত পালানো সম্ভব? কতদিন ধরে পালানো সম্ভব? হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে রোশন আনসারি। তার মামা কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, ফিরে আয়। আর কতদিন পালাবি? পরদিন সকালেই মামার কাছে আবার ফোন। রোশন জানাল সে মুম্বই এসেছে। মামা বললেন, একটা কাজ কর। ভাসি ব্রিজের কাছে আয়। বাড়িতে গেলেই পুলিশ ধরবে। আশেপাশেই ওত পেতে আছে পুলিশ। সাবধান। রোশন আর তার মামা জানতেই পারছে না গোটা কথোপকথন সিবিআই আর মুম্বই পুলিশ শুনছে। সবটা শুনেছে পুলিশ। ডিএসপি শুক্লা নিজেকেই যেন বললেন, এতদিন পর বেটি বাইরে থেকে আসছে। তাই আর কেউ দেখা করুক না করুক। রোশনের মা অবশ্যই দেখা করতে যাবে একবার অন্তত মেয়ের কাছে। তাহলেই জানা যাবে ভাসি এলাকার কোথায় আছে রোশন এখন। অভিজ্ঞ শুক্লার কথায় সামান্য ভুল হয়নি। সিবিআইয়ের একটি টিম ঘাটকোপারে রোশনের বাড়ির সামনে দুদিন ধরে নজরদারি চালাচ্ছিল। দ্বিতীয় দিনে তারা দেখতে পেল বোরখায় ঢাকা রোশনের মা বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। পিছু নিল তারা। এবার নিশ্চয়ই ট্রেনে উঠবে। হ্যাঁ। তাই হল। বোরখা পরা মহিলা রোশনের মা ট্রেনে উঠলেন লেডিজ কম্পার্টমেন্টে। পুলিশ টিম সোজা পাশের কামরায়। দরজায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু একী !! মহিলা পরের স্টেশনেই যে নেমে যাচ্ছে? এখানে কোথায় যাবে? তৎক্ষণাৎ পুলিশ টিমও নেমে গেল। ফলো করা হচ্ছে মহিলাকে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা শপিং মার্কেটে। সেখানে ঢুকলেন তিনি। এবং জামাকাপড় দেখা শুরু। অর্থাৎ মেয়ের সঙ্গে দেখা করার আগে কিছু কেনাকাটা করবেন। প্রায় এক ঘন্টা কাটল। সামান্য কিছু কেনাকাটা করলেন মহিলা। লস্যি খেলেন। এবং এবার ফিরছেন। ততক্ষণে দু ঘণ্টা। এবার নিশ্চয়ই আবার ভাসির ট্রেন। সেইমতো আগেভাগেই স্টেশনে পৌঁছে গেলেন পুলিশ কর্মীরা। কিন্তু একী ! মহিলা তো আবার ডাউন ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন! এটা কী হল? তার মানে মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে না? আর ঘাটকোপারের বাসিন্দা এতদূর এসে সামান্য জামাকাপড় কিনবে কেন? ব্যাপারটা অদ্ভুত। আসলে কিছুই অদ্ভুত না। পুলিশ জানতেই পারল না এই মহিলা

মোটেই রোশনের মা নয়। এটা হল সেই ব্যাঙ্গালোরের সায়রা। যে আসলে রোশনের এক বোন। সে গোপনে মুম্বই চলে এসেছে। এবং প্রথম থেকেই তারা জানে পুলিশ বাড়িতে নজরদারি করছে। রোশনের মা বাড়ি থেকে বেরোলে যে পুলিশ পিছু নেবে তাও জানা কথা। তাই সায়রা ইচ্ছা করে বেরিয়ে এসেছিল। পুলিশকে বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে আনতে। পুলিশকর্মীরা তাকে ফলো করার জন্য বাড়ির সামনে থেকে সরে এসেছে। এবং ২ ঘন্টার বেশি ঘোরাঘুরি করাও সমাপ্ত। এতক্ষণে গোপনে ঘাটকোপারে এসে নিজের বাড়িতেই বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে রোশন! গোটাটাই রোশনের প্ল্যান! পুলিশ জানতেই পারল না। তারা অযথা বাড়ির সামনে থেকে চলে এসে সায়রার পিছনে ফলো করে গেল। এতটা ধোঁকা খেতে হবে পুলিশ কর্মীরা ভাবেননি। তাঁরা যখন হাঁফাতে হাঁফাতে আবার ঘাটকোপারে রোশনের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন ততক্ষণে রোশন বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করে আবার উধাও!

২ মে। ২০০২। রোশন নিজের ১৫ বছর বয়সি ভাইকে ফোন করেছে। ভাইয়ের মোবাইল ফোন। কিন্তু রোশন ফোন করছে একটি ল্যান্ডলাইন থেকে। নম্বর ট্র্যাক করে দেখা গেল সেটা আসলে একটা পাবলিক বুথ। কোথায়? মুন্দ্রা। জায়গাটা ঘিঞ্জি। লাইন দিয়ে কলোনি। আবার একইসঙ্গে রয়েছে পয়সাওগালা লোকের অট্টালিকাও। পাবলিক বুথটা কোথায়? তার জন্য যেতে হবে টেলিকম অফিসে। কোন এলাকা? মুন্দ্রা? ওখানে লাইনম্যান তো হরি সিং। ডিভিশনাল ম্যানেজার ফাইল চেয়ে পাঠালেন। দেখা গেল আইসক্রিম কারখানার পাশের ক্রসিংয়ে পাবলিক বুথ। চারের বি লাজপত কলোনি। সোজা যাওয়া হল সেখানে। আশ্চর্য! ফাইলে লেখা আছে লাজপত কলোনির এই ঠিকানায় পাবলিক বুথ আছে। আর গিয়ে দেখা যাচ্ছে কোথায় বুথ? কোনো পাবলিক বুথই নেই! এটা কীভাবে হয়? পাশেই পান সিগারেটের দোকান। জানতে চাওয়া হল। তারা বলল এখানে কোনো বুথ নেই। তোমরা কোথায় যাও? আমরা তো ফোন করতে রেললাইনের ওপারে যাই। আবার ফিরে এলেন এ আর রাউত। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর সিবিআই। মুম্বইয়ের গলিঘুঁজি নখদর্পণে। তাই তাঁকেই পাঠানো হয় এসব কেসে। ব্যাপার কী? তিনি ফিরে এলেন। এবার ডিভিশনাল ম্যানেজার অবাক! ওখানে ফোনবুথ নেই? তা কীভাবে হয়? ডেকে পাঠানো হল হরি

সিংকে। লাইনম্যান। তাঁকে দুচারটে কথা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলল। পা জড়িয়ে ধরেছে টেলিকম অফিসারের। পা ছাড়ছে না। কান্নাও থামছে না। আশ্চর্য! কী ব্যাপার! অনেক পর জানা গেল হরি সিং ওস্তাদ টাইপের লোক! এই টেলিফোন বুথ বসানোর অর্ডার নিয়েও সে টাকা কামানোর ধান্দা আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওই ২০০২ সালে মোবাইলের এত রমরমা ছিল না। তখনও পাবলিক বুথই সম্বল পথচলতি ফোনের জন্য। তাই প্রতিটি মহল্লায় পাবলিক বুথের খুব চাহিদা। কোনো একটি লোকালিটিতে পাবলিক বুথ বসানোর অর্ডার হয়তো বেরিয়েছে। হরি সিংকে টাকা দিয়ে অন্য এলাকার কিছু ব্যবসায়ী বা পাড়ার লোকজন নিজেদের পাড়ায় বসিয়ে দিতে বলত। টাকা পেয়ে হরি সিং তাইই করত। ওইসব ছোটখাটো কোনো ব্যাপার পরিদর্শন করতেও অফিসার লেভেলের কেউ আসত না। অতএব এভাবেই হরি সিং দিনের পর দিন লাজপত কলোনির নামে বরাদ্দ হওয়া ফোনবুথ বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে হয়তো তিলক মার্গে। শিবাজি মহল্লার নামে ইস্যু হওয়া টেলিফোন বুথ মীরাবাঈ চবুতরায় লাগানো হয়েছে। সেরকমই ওই মুম্ব্রার ঠিকানায় বরাদ্দ হলেও হরি সিং ওই নম্বরের বুথটি বসিয়েছে আসলে অন্যত্র। এই যে জানাজানি হয়ে গেল এবার তো সাসপেন্ড হতেই হবে। তাই কাঁদছে সে। বোঝা গেল ভারতের দুর্নীতিটা কত রঙবেরঙ পথে হাঁটে। স্রেফ ফোনের ঠিকানা বদলে টাকা কামাচ্ছে এরকম কতশত হরি সিং।

কিন্তু এবার আসল বুথের জায়গাটা দেখিয়ে দিল হরি সিং। এ আর রাউত দেখে নিল জায়গাটা। আর সেদিন থেকে বুথের কাছেই তাঁর স্থায়ী ডিউটি হয়ে গেল। রোশনের ছবি তাঁকে দেখানো হয়েছে। একদিন...দুদিন....তিনদিন...। সারাদিন দাঁড়িয়ে রাউত। রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে, ঘুরে বসে চা খেয়ে অপেক্ষা করছেন। কখন রোশন আসবে অসংখ্য লোক মহিলা ফোন করতে আসছে। ফোন করছে। চলে যাচ্ছে। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে নজর করেও রাউত বুঝতে পারছে রোশন নয়। তাহলে? অবশেষে। ৬ মে। বোরখা পরা একটা মহিলা এগিয়ে আসছে। হাইট দেখে মনে হল রোশন হতেও পারে। সন্ধ্যা হচ্ছে। অন্ধকার আসছে। আলো আঁধারি। যেই মহিলা এস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে এ আর রাউত এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ। মহিলা পাবলিক বুথের সামনে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কিছু লাইন পড়েছে

বুথের সামনে। যারা ফোন করবে। পয়সা ফেলে ফোন করতে হয়। দ্রুত সরে এলেন এএসআই রাউত। যাতে মেয়েটির ঠিক পিছনে দাঁড়াতে পারেন। মেয়েটি লাইনে। পিছনেই রাউত। অন্যমনস্কভাবে। কিন্তু এখনও মেয়েটির বোরখা পরা। তাই এখনও সংশয়। এবার মেয়েটির পালা এল। বুথের সামনে গিয়ে আশেপাশে একবার তাকিয়ে বোরখাটা তুলে ফেলে ডায়াল শুরু করল মেয়েটি। ওই আলো আঁধারিতেই চকিতে দেখে রাউত বুঝে গেল অবশেষে!! এটাই রোশন! কিন্তু রাউত কোনো শব্দই করলেন না। কোনো উত্তেজনা নয়। মেয়েটি ফোন করে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবার পিছু নিলেন। উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছে। কারণ অনেকদিন ধরে রোশন গোটা নিরাপত্তা বাহিনীকে বোকা বানিয়ে পালাচ্ছে। আরও একবার ভুল হলেই সে আবার পালাবে। তাই এবার চরম সতর্কতা নিতে হবে। রোশন একটি গলির মধ্যে ঢুকল। দ্বিতীয় বাড়ি। নোট করে নিলেন রাউত। এবং তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন মোবাইল বের করে। ডিএসপি শুক্লাকে। স্যার...মিল গয়া চিড়িয়া!

সিবিআই এর ডিআইজি বীরেন্দ্র তখন পরিবারকে নিয়ে দক্ষিণ মুম্বইয়ের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় ডিনার খাচ্ছেন। সবেমাত্র সার্ভ করেছে স্টার্টার। মেন কোর্স আসছে এরপর। ইটিং জয়েন্টের নাম খাইবার! দক্ষিণ মুম্বইয়ের কালা ঘোড়া এলাকা। ঠিক তখন মোবাইল ফোন বাজল। ডিএসপি শুক্লা। স্যার রোশনকে পাওয়া গিয়েছে।

বীরেন্দ্র বিষম খেলেন। পাওয়া গিয়েছে? অবশেষে? কিন্তু আগেও অনেকবার পাওয়া গিয়েছে। তাই এত আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। বীরেন্দ্র বললেন আমি আসছি। পরিবারকে হতবুদ্ধি করে বীরেন্দ্র বললেন, তোমরা খাও! আমায় যেতে হবে। এক দৌড়ে বেরোলেন। ড্রাইভারকে বললেন, দের বাড়ি পৌঁছে দিও। তিনি একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে প্রায় জাম্প করে উঠে পড়লেন দরজা খুলে। শুক্লাকে বললেন, ওখানেই থাক। আসছি। লোকাল পুলিশকে খবর দাও।

বাইরেটা অন্ধকার আজ। আলো জ্বলছে না কেন? ভাবছে রোশন। নিশ্চয়ই আবার কেউ ঢিল মেরে বাল্ব ভেঙেছে। সাবধানে থাকতে হবে। নিশ্চয়ই চোর আসবে আজ মহল্লায়। রাত ১১ টা ৪০। একটা কালো ছায়া জানালায় পড়ল না? মেয়ে ঘুমিয়েছে। রোশন

শ্বাস বন্ধ করে আছে। কে বাইরে? চকিতে একটা বুটের শব্দ। আচমকা দরজায় করাঘাত। দরওয়াজা খোলো রোশন আনসারি! তুম ভাগ নহি সাকতে! রোশন স্তব্ধ! পুলিশ! এই এত কষ্ট করেও পালানো গেল না? ধরা পড়ে যাবে? এক ..দুই ..তিন...পুলিশ দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। রোশন এক নিমেষে উঠে এল। আর দরজা খুলে দিল। একসাথে চারজন ঢুকল। তবে লেডি অফিসারও আছে। তিনিই হাত বাড়ালেন। রোশন হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন কাঁদতে কাঁদতে।

শুধু বলল, সাব ওহ লেড়কি আমার বেটিকে খুন করার চেষ্টা করছিল! আমি তাই....।

পরদিন ভোর সাড়ে ৫ টার প্রথম ফ্লাইট। এমিরেটস। রোশনকে নিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে সিবিআই। কিন্তু তার পাসপোর্ট? রোশন মুখ নীচু করে আছে। তারপর নিজেই বলে দিল কাকার বাড়িতে ঘাটকোপারে বাক্সে লুকানো আছে। তৎক্ষণাৎ একজন পুলিশকর্মী ছুটলেন। কিন্তু রোশনকে নিয়ে দুবাই যাবে কে? লেডি অফিসার জ্যোৎস্না রসম রাজি। কিন্তু তাঁর পাসপোর্টও তো বাড়িতে আনতে যেতে হবে। বাড়ি আন্ধেরি। তিনি ছুটলেন। আর এদিকে সিবিআই অফিসাররা এমিরেটসের ফ্লাইট আটকে রেখেছেন। সিবিআইয়ের গাড়ি ছুটছে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে। আন্ধেরি। আধঘণ্টা লাগল। সময় হয়ে গিয়েছে। এখনও প্লেন টেক অফ করছে না কেন? যাত্রীরা উত্তপ্ত। পাইলট আর এয়ার পোর্ট অথরিটি সিবিআইকে আক্রমণ করছে। এসব কী হচ্ছে? একটা আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এভাবে আটকে রাখা যায় নাকি? একজন প্যাসেঞ্জারের জন্য? সিবিআই ডিআইজি বীরেন্দ্র ঠান্ডা গলায় বললেন, একদম চুপ!! বেশি কথা বললে, ফ্লাইট অপারেশন বন্ধ হয়ে যাবে এই প্যাসেঞ্জারকে না নিয়ে গেলে! ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওই কঠোর চোখ দেখে আর কেউ কথা বলার সাহস পেল না। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় দুবাই এয়ারপোর্টে নামানো হল রোশন আনসারিকে। কোলে পাঁচ বছরের বাচ্চা। এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে খালিফান আবদুল্লা। দুবাই পুলিশের ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল। রোশন তাঁর দিকে তাকালেন। এবং তাঁর বিশাল শরীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন শেখ কাবানজি। রোশনের স্বামী। দুজনে দুজনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কাবানজি এগিয়ে এসে শুধু

রোশনের কোলের থেকে পাঁচ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে নিলেন। রোশনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুবাই পুলিশের প্রিজনার ভ্যানের দিকে! ওঠার আগে শেষবারের মতো রোশন তাকাচ্ছে পিছনে। মেয়েকে দেখছে।

দুবাই পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কন্ট্রোল রুম তখন ফোনে ইন্ডিয়ার সিবিআই হেডকোয়ার্টারকে জানাচ্ছে থ্যাংক ইউ!!

২৬

নাসিক হাইওয়ের উপর দিয়ে তীব্রবেগে ছুটছে নীল স্যান্ট্রো। থানে সেশন কোর্টে একটা কেস ছিল। বেল অ্যাপ্লিকেশনটা জরুরি। ওটা না হলে ক্লায়েন্টের খুব সমস্যা হয়ে যেত। অ্যাডভোকেট সুরেশ শেখের দুদিন ধরেই টেনশনে। গাড়ি চালাচ্ছেন নিজেই। যদিও সাবস্ট্যান্টশিয়াল এভিডেন্স এমন, যে এই টাকা তছরুপের কেস টিকবে না। মনে হচ্ছে ক্লায়েন্টকে সত্যিই ফাঁসানো হয়েছে। পিপির (পাবলিক প্রসিকিউটর) সঙ্গে কথা বলে আপাতত একটু নিশ্চিন্ত। তবে শেষ পর্যন্ত জামিন হয়েছে। ক্লায়েন্ট খুশি। এবার দেখা যাক। এটা তেমন জটিল ব্যাপার নয়। শেখরের কাছে বেশি চিন্তা হল দুজন দাঙ্গার চার্জের আসামি আছে। সেটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না যে আসলে কী হয়েছিল। কেস ডায়েরিতে পুলিশ প্রায় নিখুঁত চার্জ আনছে বোঝাই যায়। কিন্তু দাঙ্গার সময় কখনও একহাতে তালি বাজে নাকি? বিশেষ করে যেখানে হয়েছে সেই বোরিভিলি পাড়গা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যালে ভর্তি। দুপক্ষেরই হিটম্যান আছে। সুতরাং একটু স্টাডি করা দরকার। জামিন কি হবে? নেক্সট ডেটের আগে আর একবার দেখতে হবে এফআইআর কপি। তবে আজ মনে হল পুলিশ সহজে ছাড়বে না। পলিটিক্যাল প্রেশার আছে। পি.সির (পুলিশ কাস্টডি) জন্য একটা চাপ তো থাকবেই। জামিন চাওয়া উচিত নাকি আপাতত জেল কাস্টডিতেই সন্তুষ্ট থেকে পরের হিয়ারিংয়ে নেক্সট স্টেপ নেওয়া উচিত? এসব ভাবতে ভাবতেই অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিচ্ছেন সুরেশ। রাস্তা ফাঁকা। দুপুর। তাই নাসিক হাইওয়েতে গাড়ির চাপ নেই। বাহুলি ভিলেজ ৪ কিলোমিটার দূরে। মাঝে মাঝে কিছু গাড়ি শোঁ শোঁ করে ওভারটেক করছে। সুরেশ ফিরছেন মুম্বই। একবার মুম্বই কোর্টেও যেতে হবে। তারপর রাতে একটা মিটিং আছে। অতএব আরও জোরে যাওয়া উচিত। রিয়ার ভিউ মিররে একটা অস্পষ্ট ছায়া। না ভুল হল। একটা নয়। দুটি। এতক্ষণ ছিল না। হঠাৎ করেই কোনো একটি ক্রসিং থেকে দুটি মোটরবাইক রাস্তায় উঠেছে। একবার দেখেই চোখ সরিয়ে নিলেন সুরেশ। মাথায় মামলার চিন্তা। সুরেশ শেখর মুম্বই আর থানের বেশ পরিচিত আর খ্যাতনামা আইনজীবী। একইসঙ্গে সোস্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। বেশ কিছু সোস্যাল ইস্যুতে

তিনি সর্বদাই সরব। অতএব কোর্টের বাইরেও তাঁর অনেক কাজ। নীল রঙের স্যান্ট্রো স্পিড বাড়িয়েছে। আশা করা যায় সন্ধ্যার আগেই পৌঁছনো যাবে মুম্বই। মোটরবাইক দুটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। স্যান্ট্রোর ঠিক পিছনে। বেশি সময় লাগল না স্যান্ট্রোকে টপকে যেতে। ওভারটেক করার নিয়ম হল ডানদিক থেকে। হাইওয়েতে তো অবশ্যই। কিন্তু এই মোটরবাইক দুটির একটি ডানদিক এবং অন্যটি বাঁদিক থেকে ওভারটেক করছে। ওভারটেক করেই আচমকা একটু এগিয়ে স্পিড কমাচ্ছে। এসব কী হচ্ছে? সুরেশ শেখর বিরক্ত হলেন। এসব ছেলেছোকরার দল কোনো নিয়মই মানে না। আশ্চর্য! তিনিও বাধ্য হয়ে স্পিড কমালেন। এবং মোটরবাইক দুটির পাশ থেকে যাওয়ার সময় বিরক্তির চোখে তাকালেন। সেই বিরক্তি বদলে গেল প্রথমে বিস্ময়ে। তারপর আতঙ্কে। কারণ বাইকের দুজনের হাতে কখন যেন উঠে এসেছে নাইন এমএম পিস্তল। স্যান্ট্রো চলছে। মোটরবাইকও চলছে। ওই চলন্ত অবস্থায় সেই দুই হেলমেট পরিহিত যুবক পরপর গুলি চালাল। ২৮ জানুয়ারি, ২০০২। তাই গরম নেই। বর্ষাও নেই। স্যান্ট্রোর জানালা খোলা ছিল। একঝাঁক গুলি লাগল বুকে, পেটে, গলায়। স্যান্ট্রোর ব্যালান্স হারিয়ে গেল। এবং গড়িয়ে গেল রাস্তার পাশে। বিপুল স্পিড তুলে চলে গেল মোটরবাইক দুটি। সুরেশ শেখর নিথর হয়ে পড়ে রইলেন ড্রাইভার সিটে!

অ্যাডভোকেট ললিত জৈন সব কিছুতেই আগ্রাসী। একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাঁর আত্মবিশ্বাসও বেশি। ক্রিমিন্যাল ল ইয়ার হলেও পলিটিক্যাল ক্ল্যাশ কিংবা সোস্যাল ইস্যুর নানাবিধ মামলা তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ে। ২৪ এপ্রিল, ২০০২। মুম্বই আদালতের অ্যাডভোকেট ললিত জৈন যাচ্ছিলেন একটা স্পেশাল মামলার শুনানিতে। নিজের গাড়িতে। আদালত এসে গিয়েছে। আর কয়েক মিনিট। তবে এই জায়গাটা একটু ভিড় আর যানজট হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় ট্রাফিক পুলিশ থাকে না। এটা হল তিন বাত্তি মার্গ। ভিওয়ান্ডি। বাইক, অটো, গাড়ি, টেম্পো, সাইকেল আর ছোট ছোট ম্যাটাডরে ভর্তি এই ক্রসিং। তাই স্বাভাবিকভাবেই পাশে এসে দাঁড়ানো অটোরিকশকে সন্দেহ করেননি ললিত জৈন বা তাঁর ড্রাইভার। কিন্তু সেই অটোর মধ্যেই বসে ছিল তিন হত্যাকারী। নিখুঁত নিশানা। এবং বাঘের মতো তৎপরতা। কারণ অটো থেকে নিমেষের

জন্য নেমে প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি চালিয়েছিল তারা। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল ললিত জৈনের। সকাল ১১ টা ৪৫।

তারিক গুজ্জর। বোরিভিলি পাগাড়ার এক হোটেল ব্যবসায়ী। একইসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। স্কুটারে চেপে যাচ্ছেন ভাহিন্দার। তাছাড়া আর একটা কাজও আছে। তাই স্কুটার জোরে চালাচ্ছেন গুজ্জর। মুম্বই আগ্রা হাইওয়ে। পিছনে বসে আছেন রাজিন গ্যারেল। সবসময়ের সাথী। তারিক গুজ্জরের শত্রুর সংখ্যা কম নয়। কারণ তার দাদাগিরিসুলভ আচরণ। একটা জমি দখলের কেস আছে। মীরা রোডের এক ব্যবসায়ী ভাহিন্দরে জমি কিনেছে। সেই জমির দখল ছাড়বে না এলাকার কিছু যুবক। তারা ইতিমধ্যেই সেই জমি প্রশাসনের থেকে পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছিল। সেখানে কমিউনিটি সেন্টার করার কথা। সেই নিয়ে টানাপোড়েন। অতএব ডাক পড়েছে তারিক গুজ্জরের। কিন্তু তারিক বেশিদূর পৌঁছতে পারলেন না। একটিমাত্র স্কুটারে চেপে দুটি ছেলে হঠাৎ মাঝপথে উঠে এসেছিল একটি চৌরাস্তার ক্রসিংয়ে। সন্দেহ করার প্রশ্ন নেই। এসব এলাকায় তারিকের প্রভাব প্রবল। অতএব সন্দেহ হয়ওনি। কিন্তু সেই অতি আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে ছেলেদুটি ক্যাজুয়ালি এসে গুলি চালিয়েছিল। বেঁচে গেলেন শুধু রাজিন গ্যারেল। এবং তিনি সোজা থানায় গিয়ে একজনের নামেই এফআইআর করলেন। পাড়াগা পুলিশ স্টেশনকে বললেন, আমি সাক্ষী। আর আমার অভিযোগ এই খুন করিয়েছে আর কেউ নয়, একজনই। তার নাম সাকিব নাচান! কেন এই খুন? গ্যারেল জানালেন সাকিব হুমকি দিয়েছিল সম্প্রতি । জমি নিয়ে শত্রুতা। ওই এফআইআর করার সঙ্গে সঙ্গে, পরদিনই ১৮ জুলাই ২০০২ সালে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হল সাকিব নাচানকে। তিনমাস কেটে গেল। কিন্তু পুলিশ চার্জশিট তৈরি করতে পারেনি। কারণ নাচানের বিরুদ্ধে কোনো এভিডেন্স তো প্রমাণ করা যাচ্ছে না। অক্টোবর মাসেই জামিন পেয়ে গেল সাকিব নাচান। নাচান জেল থেকে বেরনোর সময় বলেছিল আমাকে জেলে রাখতে হলে আইন আর ইনভেস্টিগেশন দুটোই একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। বলেই হাসতে হাসতে জেল থেকে বেরিয়ে গেল।

মুম্বই সেন্ট্রাল স্টেশনের মধ্যেই ম্যাকডোনাল্ড আউটলেট। এয়ারকন্ডিশনার ডাক্টের মধ্যে রাখা হয়েছিল বোমা। ৬ ডিসেম্বর ২০০২। বিস্ফোরণ হল। বোঝা গেল এটা তেমন শক্তিশালী বোমা ছিল না। কারণ পাঁচজন আহত হলেন। প্রাণহানি ঘটেনি। কে এই বিস্ফোরণের পিছনে? পুলিশ তদন্ত করছে। কিন্তু ক্লু মিলছে না। তদন্তের মাঝেই ভিলে পার্লে রেল স্টেশনে আবার বিস্ফোরণ। একটা সাইকেলে ডিভাইস রাখা হয়েছিল। এবার এক সবজি বিক্রেতার মৃত্যু হল। ২৭ জানুয়ারি। ২০০৩। কিন্তু এবারও ক্লু নেই। এরকম তো হয় না। ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইনফর্মাররা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে এটা কি হতে পারে? ১৩ মার্চ। মুলুন্ড স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। সন্ধ্যা পৌনে আটটা। প্রবল ভিড়। অফিসযাত্রীরা বাড়ি ফিরছে। ট্রেন থামার মুহূর্তে ফার্স্ট ক্লাস লেডিজ কামরায় বিস্ফোরণ। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ১০ জন যাত্রীর মৃত্যু। এবং সেই প্রথম বিদ্যুচ্চমকের মতো মাথায় এল একটা থিওরি। ৬ ডিসেম্বর সেন্ট্রাল স্টেশনে বিস্ফোরণে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরকে? তারই বদলা? ২৭ জানুয়ারি ভিলে পার্লে স্টেশন। তার মানে প্রজাতন্ত্র দিবসের পরদিন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ ? আর ১৩ মার্চ মুলুন্ড স্টেশনে বিস্ফোরণের অর্থ হল ১৯৯৩ সালের মুম্বই ব্লাস্টের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা? আর এভাবে যখনই কোনো চক্রান্তের জাল বোনা হয় তখন সেটার পিছনে থাকে জঙ্গি সংগঠনের মাস্টারমাইন্ড। কে সে? এই তিন বিস্ফোরণের নাম দেওয়া হল ট্রিপল ব্লাস্ট কেস!

রাত সাড়ে ৯ টা। ক্র্যাফোর্ড মার্কেটের মহারাষ্ট্র পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ক্রাইম ব্রাঞ্চে ফোন বাজছে। এখন সেরকম বড় অফিসার কেউ থাকার কথাই নয়। ইনস্পেক্টর শচীন ভাজ একটা ফাইল ওয়ার্ক করতে করতে ফোন ধরলেন।

হ্যালো

কে?

সাব উয়ো যো মুলুন্ড মে ব্লাস্ট হুয়া থা উসকে পিছে হ্যায় নাচান!

ভুরু কুঁচকে গেল শচীন ভাজের। বললেন, তুম কওন?

ম্যায় তো এক ইন্ডিয়ান সাব!

এসব ফিল্মি ডায়লগে কান দেওয়ার সময় নেই। ধমকে উঠলেন শচীন। ক্যায়সে পাতা চলা!

সাব একটা অ্যাড্রেস নোট করুন।

লোকটা যে অ্যাড্রেস দিল সেটা মুম্বই শহর থেকে দূরের এক কলোনি এলাকা। ইনস্পেক্টর শচীন ভাজ গোটা ঘটনা জানালেন তাঁর কর্তা এক জয়েন্ট কমিশনারকে। তিনি বললেন, আজ রাতেই রেইড করো। কল্যাণের সেই ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে সেদিনই ২১ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেল দুই ব্যক্তি। আকবর আর কামিল। এই হাইড আউট যে পুলিশ খুঁজে বের করতে পারে তা কল্পনাই করা যায়নি। তাই আকবর আর কামিল বিস্মিত। জিপে তোলার পথেই তাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক অফিসার বললেন, বেশি টাইম নিবি না। কী কী করেছিস কবে থেকে প্ল্যান সব তাড়াতাড়ি বলবি। নয়তো শর্মা সাব ইন্টারোগেট করবে আকবর আর কামিলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কারণ শর্মা সাব জেরা করলে....। তাই তারা রিস্ক নিল না। পরদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যে দুজনেই বিনা বাক্যব্যয়ে জানিয়ে দিল মুলুন্ড ব্লাস্ট করিয়েছে সাকিব নাচান! আরও তিনটি প্ল্যান আছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের সেই ইন্টারোগেশন রুমে এক স্তব্ধতা নেমে এল। আবার নাচান! কিন্তু এবারও যদি এভিডেন্স ফুলপ্রুফ না হয়? আবার তো ছাড়া পেয়ে যাবে নাচান! কিন্তু এই সুযোগ ছাড়া যাবে না। নাচানকে অ্যারেস্ট করতেই হবে। নাহলে একের পর এক ব্লাস্ট হয়েই যাবে। আর সবই আনসলভড। এভাবে চললে গোটা দেশে মুম্বই পুলিশের বদনাম হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় যেতে হবে তাকে ধরতে? বোরিভিলা পাগাড়া গ্রাম। সাকিব নাচানের দুর্গ। সেখানে সে এতই পপুলার যে তাকে স্পর্শ করা হলে যে কোনো সময় পালটা জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে। সাকিব ভাই ওখানে স্বয়ং ঈশ্বর!

পুলিশ কমিশনার সত্যপাল সিংয়ের ঘরে মিটিং চলছে। সত্যপাল বললেন, জেন্টলম্যান, এবার আমাদের কোনো ভুল করলে চলবে না। বেস্ট অফিসার্সদের নিয়ে টিম করুন। ৬ জনের টিম হল। ইনস্পেক্টর শচীন ভাজ। সাব ইনস্পেক্টর সঞ্জীব গাওয়ারে। সাব ইনস্পেক্টর ভাচারে। ইনস্পেক্টর প্রদীপ শর্মা। সাব ইনস্পেক্টর দয়া নায়েক। পাগাড়া পুলিশ

স্টেশনের ইনস্পেক্টর ইন চার্জ নীতীন প্যাটেল। সেই ইনস্পেক্টর প্রদীপ শর্মা যাঁর কথা শুনেই আকবর আর কামিল সময় নষ্ট না করে সব স্বীকার করে নিয়েছিল। কেন? ১০০ কেজির ওজন। লম্বা। বড়সড়। ট্রাইসেপ আর বাইসেপ। ২০০২ সালের ওই দিন পর্যন্ত প্রদীপ শর্মার ৯৫টি এনকাউন্টার হয়ে গিয়েছে। আর একজন দয়া নায়েক। তাঁর হাতে গুলি খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে ৫১ জন অপরাধী। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের এঁরাই দুই সেরা এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। আর এই দুজন একই টিমে? তাও আবার একজনকে স্রেফ গ্রেপ্তার করার অভিযানে? সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে নাচানকে নিছক জেরা করার জন্য গ্রেপ্তার করা কতটা কঠিন। এর আগে যখন সেই তারিক গুজ্জর হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তখন পরিস্থিতি ছিল অন্য। কারণ খোদ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর এফআইআর ছিল। তাই গ্রেপ্তারে কোনো আইনি জটিলতা নেই। আর আজ নাচানকে আবার গ্রেপ্তার করা কঠিন, কারণ আগের মামলায় তার বিরুদ্ধে কোনো এভিডেন্স ছিল না। জামিন দিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। এবার এভিডেন্স পাওয়া যাবে তো? এই টিমকে লিড করবে কে? পুলিশ কমিশনার সত্যপাল সিং জানিয়ে দিলেন ইনস্পেক্টর প্রদীপ শর্মা হবেন লিডার। তিনি আলাদাভাবে ডেকে নিলেন প্রদীপ শর্মাকে। আর যেটা বললেন সেটা শুনে প্রদীপ শর্মার মনে হল এর থেকে কঠিন কাজ অন্তত তিনি তাঁর এতদিনের দুর্ধর্ষ কেরিয়ারে করেননি কখনও। কারণ পুলিশ কমিশনার তাঁকে গোটা অপারেশনে একটাই শর্ত দিয়েছেন। সেটাই মারাত্মক তাঁর কাছে। শর্তটি হল সাকিব নাচানকে জীবিত ধরতে হবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ। কোনোভাবেই যেন সে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। প্রদীপ শর্‌মা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পুলিশ কমিশনারের দিকে। কারণ তাঁর অপারেশনের স্টাইল খুব সিম্পল। কোনো জটিলতা নেই। তিনি অপরাধীকে ধরতে যান। ওয়ার্নিং দেন সারেন্ডারের জন্য। একবার। দুবার। তিনবার। তারপর বেশি সময় নষ্ট করেন না। গুলি মারেন। সেই সিম্পল সিস্টেমের জন্যই তো প্রদীপ শর্মার নামের পাশে আজ ৯৫টি এনকাউন্টারের তালিকা। আর একজন দয়া নায়েক। তাঁকে যখন প্রদীপ শর্মা বললেন, নায়েক ডোন্ট শুট! অর্ডার আছে। নায়েক শুধু বললেন, তাহলে যাচ্ছি কেন! অন্য কেউ গেলেই তো হয়!! তারপর দুজনে হাসলেন পরস্পরের দিকে

তাকিয়ে। কারণ এই গুলি না চালানোর সংযমটাই যে তাঁদের দুজনের সবথেকে কঠিন পরীক্ষা! তাঁদের জুটিকে মুম্বই পাবলিক আর মিডিয়া নামই দিয়েছে ট্রিগার হ্যাপি!

মারুতি জিপসি থেকে লাফ দিয়ে নামলেন ইনস্পেক্টর প্রদীপ শর্মা। তিনিই ছিলেন ফ্রন্ট সিটে। বোরিভালি। ২৭ মার্চ। ২০০৩। মুম্বই থেকে ৬৫ কিলোমিটার। সামনেই বিটুমিন রোড। উলটোদিকেই বাড়ি সাকিব নাচানের। গলিটা সরু। মুখোমুখি বাড়িগুলো। সাইকেল চলাচল পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু গাড়ি ঢোকার প্রশ্নই নেই। এমনকী দুটি মোটরবাইক হয়তো পরস্পরকে ক্রস করতে পারবে না। তৃতীয় বাড়িতে ঢুকতে হবে। ঢুকলেন প্রদীপ শর্মা। পিছনে দয়া নায়েক। একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে সাকিব নাচান। বসার ঘরে। প্রদীপ শর্মা বললেন, আইয়ে, আপকো একবার হামারে সাথ জানা হোগা। একটা মামলার ব্যাপারে। সাকিব নাচান কম কথা বলে। ঠান্ডা চোখে তাকায়। সেরকমভাবেই বলল কেন যাব? প্রদীপ শর্মা আরও শীতল। বললেন, আমাদের কিছু কথা জানার আছে। নাচান উঠছে না সোফা থেকে। এগিয়ে গেলেন দয়া নায়েক। এত সময় ওয়েস্ট তার পোষায় না। বাহুর কাছে শক্ত হাতে ধরে জোর করে তুললেন। বললেন, সব কোশ্চেনের আনসার দেওয়া হবে। কোনো প্রবলেম হবে না। সাকিব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে? দেখান! প্রদীপ শর্মা পয়েন্ট থার্টি এইট রজার্স রিভলবার বের করে সোজা সাকিবের মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, চল, নেহি তো গোলি মার দুঙ্গা! এটাই ওয়ারেন্ট! চল..।

সাকিব নাচান নতুন ক্রিমিন্যাল নয়। ১৯৯১ সালেই টাডা আদালতের মাধ্যমে তার সাজা হয়েছিল যাবজ্জীবন। পাকিস্তানের K২ প্ল্যানের অন্যতম সদস্য ছিল সে। এরকমই অভিযোগ আনা হয়েছিল। কে টু মানে হল পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া উল হকের খলিস্তান-কাশ্মীর প্ল্যান। আশির দশক থেকে এই প্ল্যান কার্যকর। পাঞ্জাব আর কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তথাকথিত আজাদির লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে জঙ্গি সাপ্লাই। এটাই ছিল কে টু প্ল্যান। সেই সময় সাকিব আফগানিস্তান আর পাকিস্তান গিয়েছিল। আদালতের সাজা ঘোষণায় বলাই হয়েছিল ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সাকিব

পাকিস্তানে জঙ্গি ট্রেনিংয়ের জন্য যুবকদের পাঠাত। সেই কেসেই তার যাবজ্জীবন সাজা হয়। সেই জেল খেটে বেরনোর পরই ওই ২০০২ সাল থেকে আবার তার দিকে পুলিশের নজর পড়ল। আবার ফিরে এল নাচানের নাম গোয়েন্দাদের র‍্যাডারে।

সাকিব ভাইকে ধরতে পুলিশ এসেছে! চিৎকার করে দৌড়চ্ছে তিনটি ছেলে। গোটা এলাকায় খবর হয়ে গিয়েছে মুম্বই পুলিশ টিম এসেছে নাচানকে গ্রেপ্তার করতে। সেই টিমে আছে কুখ্যাত প্রদীপ শর্মা আর দয়া নায়েক। তার মানেই হল সাকিব ভাইকে এনকাউন্টার করা হবে। মাত্র ৪০ মিটার দূরে রাখা আছে পুলিশ জিপ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক হাতে দয়া নায়েক সাকিব নাচানকে ধরে এগোচ্ছেন। পিছনে বাকি টিমের দুজন। আর বাকি তিনজন রয়েছে জিপের সামনে । গোটা টিমকে ব্যাকআপ হিসাবে কভার করার জন্য আছে একটি বিশেষ অপারেশন বাহিনী। যার নাম স্পেশাল অপারেশন স্কোয়াড! ওই ৪০ মিনিট পেরনোকে মনে হচ্ছিল তীব্র এক সংকট। কারণ ততক্ষণে সাকিবের বাড়ি ঘিরে গোটা গলিতে ভিড়ে ভিড়াক্কার। মহিলারা হাউ হাউ করে কাঁদছে। যুবকরা শক্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে রাস্তা আটকে। পুলিশের দিকে কেউই তাকাচ্ছে না। সকলের চোখ নাচানের দিকে। তার চোখ কী বলছে? সেই চোখ যে অর্ডার করবে সেটাই করবে এই গোটা জনতা! পুলিশ টিম কোনোদিকে তাকাচ্ছে না। এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য শুধু ওই ৪০ মিটার পথটুকু অতিক্রম করা। জায়গা নেই। মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগছে। কেউ সরে জায়গা করে দিচ্ছে না। দাঁতে দাঁত চেপে দয়া নায়েক, প্রদীপ শর্মারা এগোচ্ছেন। আচমকা একটি শব্দ উঠল। কেউ একজন চিৎকার করছে, সাকিব ভাই কো ছোড় দো!! কাছে এসে গিয়েছে জিপ। তখনই নড়ে উঠল জনতা। তারাও এগোচ্ছে। সঙ্গে স্লোগান..ছোড় দো সাকিব ভাই কো! দয়া নায়েক আর সময় নষ্ট করলেন না। তিনি দুহাতে সাকিব নাচানকে তুলে ধরলেন, আর প্রায় ছুঁড়ে দিলেন জিপের পিছনের সিটে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ঝড়ের আভাস। সবার আগে সাকিব নাচানের আত্মীয় শোভান মোল্লা এগিয়ে এসে দয়া নায়েককে ধাক্কা দিল। দয়া নায়েকের চোখে বিস্ময়। তাঁকে ধাক্কা? এত সাহস? ৫২ নম্বর এনকাউন্টার করতে সত সময় লাগবে তাঁর? তাঁর হাত তৎক্ষণাৎ চলে গেল হোলস্টারে। সেখানে রিভলভার। কিন্তু ততক্ষণে বাকি জনতা এগিয়ে আসছে। মহিলারা দল বেঁধে আচমকা থুতু দিতে শুরু

করেছে। বাচ্চারা ছুঁড়ছে কাদা আর ঢিল। চারজন যুবক ওই প্রবল ধাক্কাধাক্কির মধ্যে জিপের মধ্যে হাত বাড়িয়ে নাচানকে কোলে তুলে নিয়েছে। তাদের বাধা দিতে গিয়ে পুলিশের এসওএস টিম মেম্বাররা মহিলাদের ধাক্কা খেতে শুরু করলেন। নাচানকে বের করে আনা হয়েছে জিপ থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের গলির মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে গেল। দুজন যুবক নাচানকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত গলির অভ্যন্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নাচানকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে জনতা। গোটা দৃশ্যটা দেখতে দেখতে প্রদীপ শর্মা অবশেষে রিভলভার উপরে তুলে ধরলেন। পাবলিক কিন্তু সরছে না সামান্যও। কেউ চোখের পাতাও ফেলছে না। শর্মা সামনের দিকে যেদিকে নাচান পালাচ্ছে সেখানেই রিভলভার তাক করলেন। তাঁর মুখ থমথম করছে। আঙুল ট্রিগারে। সেফটি ক্যাচ কি অন? বোঝা যাচ্ছে না! টকটক করছে মুখ। দয়া নায়েকের হাতে পিস্তল। কিন্তু সে তাক করেনি। উপরে তুলে ধরেছে। প্রবল ধাক্কা দিয়ে পিছনের ব্যাকআপ জিপটা এইমাত্র উলটে দেওয়া হল। কী করবেন প্রদীপ শর্মা? আজ পর্যন্ত গুলি চালাতে তাঁর এত সময় লাগেনি। এত ভাবতেও হয়নি। পুলিশ কমিশনার সত্যপাল সিং এর কথা মনে পড়ে গেল নাকি শর্মার। তিনি বলেছিলেন, ডোন্ট শুট প্রদীপ!! পাগাড়া পুলিশ স্টেশনে ততক্ষণে খবর পৌঁছেছে। সেখান থেকে খবর গেল ওই গ্রামেরই এক বৃদ্ধের কাছে। ওয়াকফ কমিটির নেতা। নাসের মোল্লা। তাঁকে বলা হল, পুলিশ টিমের সামান্য কিছু হলে গোটা গ্রাম কিন্তু আর থাকবে না। সবাই অ্যারেস্ট হবে। দরকার হলে গোটা মুম্বই ফোর্স আসবে। দোষী, নির্দোষ সবাই জেলে যাবে। সিস্টেমের সঙ্গে লড়াই করবে এত স্পর্ধা দেখাবেন না। আপনি যান স্পটে। সবাইকে বোঝান। পুলিশের গায়ে যেন টাচ না করে কেউ! নাসের মোল্লা বৃদ্ধ । এবং বুঝদার মানুষ। তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে গেলেন। শোভান মোল্লার দাদা আদনান মোল্লাকে বললেন, তোমরা পাগল হয়ে গিয়েছ? এরা এখন এসেছে অল্প লোক। এরপর গোটা ফোর্স আসছে। দরকার হলে মিলিটারি আসবে। তোমরা সারাজীবনের জন্য জেলে যাবে? এই বৃদ্ধকে সবাই মান্য করে। গোটা পুলিশ টিমকে ঘিরে ধরা হয়েছে। ঠিক মাঝখানে প্রদীপ শর্মা আর দয়া নায়েক। দুজনের হাতেই রিভলবার। কিন্তু তাঁরা নীরব ও স্তব্ধ। কারণ এই প্রথম হাতে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও তাঁদের খালি হাতে

ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে। হচ্ছেও। একটা ঠান্ডা চোখে শর্মা তাকালেন জনতার দিকে। অনেকক্ষণ। দয়া নায়েক যুবকদের দিকে তাকিয়ে। তাঁর চোখও স্থির। জিপ স্টার্ট দেওয়া হল। নিঃশব্দে তাঁরা উঠে বসলেন। ধরা হল না সাকিব নাচানকে।

ঠিক তিনদিন পর সংবাদপত্রে একটা খবর প্রকাশিত হল। তিনজন লস্কর ই তৈবা জঙ্গি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি। সেই প্রথম মুম্বই পুলিশের হাতে কোনো লস্কর জঙ্গি এনকাউন্টারে মারা গেল। যে দুজন ভারতীয় জঙ্গি ছিল তাদের নাম আকবর আর কামিল। এনকাউন্টার কাদের সঙ্গে হয়েছিল? প্রদীপ শর্মা আর দয়া নায়েক। এই সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর সেদিনই দুপুরে সাকিব নাচানের বাবা আবদুল হামিদ নাচান সোজা মুম্বই হাইকোর্টে এলেন। এবং প্রেয়ার দিলেন আমার ছেলেকে মুম্বই পুলিশ এনকাউন্টারে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে। পুলিশের হাত থেকে ছেলেকে বাঁচান জজসাহেব। আমার ছেলে আপনার সামনেই সারেন্ডার করতে রাজি। আকবর আর কামিলকে এনকাউন্টারে ফিনিশ করে বস্তুত প্রদীপ শর্মা সাকিব নাচানকে বার্তা দিলেন সময় আর সুযোগের অপেক্ষা! এরপর আর অ্যারেস্ট না। সত্যি এনকাউন্টারের জন্য সে প্রস্তুত থাকে। সেই চাপ নিতে পারেনি সাকিব। তাই সারেন্ডার। কিন্তু তারপর শুরু হল আর এক চমকপ্রদ অধ্যায়! যা মুম্বই পুলিশের কল্পনাতেই ছিল না।

শুধু মুলুন্ড ব্লাস্ট নয়। সাকিব নাচানের বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশ চার্জ নিয়ে এল আরও ভয়ংকর। সেই দুই আইনজীবীর হত্যার পিছনেও সাকিবের হাত। পাগাড়া এলাকার চারজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ মামলা সাজানো শুরু করল। ট্রিপল ব্লাস্ট কেস। দুই আইনজীবী মার্ডার। বাড়ি থেকে একে ফর্টি সেভেন পাওয়া। আর কী চাই। সাকিবের নাম হল অ্যাডভোকেট কিলার। তার ফলে কী সমস্যা! সমস্যা হল ভিওয়ান্ডি আর থানের বার অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করে দিল কোনো আইনজীবী সাকিবের হয়ে লড়াই করবেন না। কেউই সাকিবের কেস হাতে নেবেন না। যেহেতু সে অ্যাডভোকেট খুনের আসামি। নাচান কি ভেঙে পড়ল? আর তো বাঁচার উপায় নেই! একেবারেই না। বরং উলটো। সাকিব নাচান আবেদন করল আমার কেস আমিই লড়ব। সাকিব একজন

কমার্স গ্রাজুয়েট। সে কিছুই জানে না আইনের। কিন্তু আদালতে আপিল করার সঙ্গে সঙ্গে যেই তার আবেদন মঞ্জুর হল সেদিন থেকে থানের জেলে তার কাজ হল সারাদিন ধরে পুলিশ ডকুমেন্ট, এফআইআর কপি, পুলিশের কেস ডায়েরির অভিযোগগুলি আর আইনের ধারা পড়াশোনা করা। প্রতিদিন তার সঙ্গে জেলে দেখা করতে আসা যুবকদের হাতে থাকত কোনো না কোনো বই। সবই আইনের। থানের জেলে প্রতিদিন রাত আড়াইটের সময় সাকিব নাচান ঘুম থেকে উঠে যায়। আর সেই রাত থেকেই কেস ফাইল পড়তে শুরু করে। এর সঙ্গে তার প্রধান কাজ হল নিয়ম করে রাইট টু ইনফর্মেশন আইন অনুযায়ী প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে আবেদন করা। এ পর্যন্ত কতগুলি রাইট টু ইনফরমেশন আবেদন করেছে সাকিব? ৩১৪টি! এবং তার প্রত্যেকটি সরকারি উত্তর সে নিজের ডিফেন্স ডকুমেন্টে অ্যাটাচ করেছে। মাস যায়। বছর যায়। যত দিন যাচ্ছে সরকারি উকিল অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটর রীতিমতো চমৎকৃত এবং ক্রুদ্ধ। কারণ অভিযুক্ত সাকিব নাচান যেভাবে প্রত্যেকটা উইটনেস আর পুলিশ অফিসারদের ক্রস এক্সামিনেশন করছে এবং যে কোনো এভিডেন্সের কাউন্টার আরগুমেন্ট একেবারে আইনের মারপ্যাঁচ দিয়ে নথিপত্র প্রদান করে দিচ্ছে যে কোনো পুলিশের কেস দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়। সারারাত জেগে সাকিব কেস ফাইল তৈরি করে। সকালে তিন ঘণ্টা ঘুমোয়। জেলের মধ্যে বসে সাকিব যখন নিজের ডিফেন্স স্ট্রং করছে, তখন বাইরে তার নেটওয়ার্ক অন্য কাজে ব্যস্ত। সেটা হল সাক্ষীদের সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেওয়া। একের পর এক পুলিশ সাক্ষী হোস্টাইল হয়ে যাচ্ছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আদালতে তারা বলছে পুলিশ শিখিয়ে দিয়েছে তাই এসব বলেছি। আসলে আমি কিছুই জানি না। পুলিশ দিশাহারা। আর কোনো উপায় নেই। এবার একমাত্র পথ সাকিবের সঙ্গে আরও যাদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হচ্ছে, যারা সহ অভিযুক্ত তাদের মধ্যে থেকেই রাজসাক্ষী করে দেওয়া। এটা যে কোনো পুলিশের পরিচিত খেলা। কোনো অপরাধের সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স না থাকলে অভিযুক্তদের মধ্যে থেকেই একজনকে বাছাই করা হয় রাজসাক্ষীর জন্য। তাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে সে মুক্তি পাবে। কিন্তু গোটা অপরাধের প্রধান সাক্ষী হয়ে ১৬৪ ধারায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সে বিবরণ দিক ঘটনার। তাহলে বাকিদের কনভিকশন বা সাজা ঘোষণা করানো

সম্ভব হবে। সে বেঁচে যাবে। এই টোপ সকলেই খাবে। কারণ চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। এটাই শেষ চেষ্টা পুলিশের। সেইমতো বোমা বিস্ফোরণের অন্যতম অভিযুক্ত তনভির জামিনদারকে বলা হল তুমি রাজসাক্ষী হয়ে যাও। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে সব কেস থেকে। সেই তনভির পুলিশকে বলেছে, আমার মাথায় একে ফিফটি সিক্স ঠেকান, আমার গায়ে বোমা বেঁধে দিন। আমার শরীরের উপর দিয়ে একটা ট্যাংক চালিয়ে দিন। তবুও আমি সাকিব ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলব না। রাজসাক্ষী হওয়ার দরকার নেই। সাজা দিন আমাকে।

সাকিবের সামনে কোনো কেস টিকছে না। হতাশ পুলিশ। ২০০৮ সালের মধ্যে দুই আইনজীবী এবং সেই তারিক গুজ্জর মার্ডার কেসে তার নাম যুক্ত থাকার অভিযোগ মুম্বই পুলিশ প্রমাণই করতে পারল না। তিনটি মার্ডার কেস থেকেই সাকিব মুক্তি পেয়ে গেল। ২০১১ সালে ট্রিপল ব্লাস্ট কেস থেকে সাকিব জামিন পেয়ে গেল। কারণ সেই একই। একমাত্র মামলা বাকি অস্ত্র আইন। সাকিব কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষীদের এবং চার্জ তৈরি করা পুলিশ অফিসারদের এমনভাবে জেরা করেছে যে প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত তার জেরার সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাকে জেল হেফাজতে রাখার কোনো শক্ত কারণই আদালতে জমা দিতে ব্যর্থ পুলিশ। গোটা সরকারি আইনজীবী মহল, গোটা মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, রাজ্য সরকারের আইনদপ্তর একজোট হয়েছিল। উলটোদিকে একজন জেলখাটা আসামি সাকিব নাচান। তা সত্ত্বেও তার আরগুমেন্টের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারছে না। একের পর এক কেস থেকে সে মুক্ত হচ্ছে। অথবা যে কেসে জামিন পাওয়া অসম্ভব, তাও জামিন হয়ে যাচ্ছে তার নিজের তৈরি সুকৌশলী পেপার ওয়ার্কসে। জেলে বসে সে যে শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য আইনি লড়াইয়ের কাগজপত্র তৈরি করছে তাই নয়। একটা আস্ত বই লিখেছে। যার নাম 'দ্য রিয়াল ফেস অফ ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি'। অথচ পুলিশ জানে প্রত্যেক কেসে সাকিব প্রকৃতই অপরাধী। কিন্তু সমস্যা হল একটা কেসেও তাকে জড়ানো যাচ্ছে না। কারণ তার অসম্ভব ভালো কাউন্টার ডিফেন্স। বস্তুত কোনো আইনজীবীকে না পেয়ে একা সাকিব কোর্টরুমে যেভাবে কেস লড়েছে তা আর কোনো পাশ করা আইনজীবী পারতেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

২০১৬ সালে সাকিব নাচান একটিই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি একে ৫৬ রাইফেল তার কাছে পাওয়া গিয়েছে। ১০ বছরের জেল। যে সময়টা তার জেলেই কেটে গিয়েছে। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি পেল সাকিব নাচান। যানে জেলে থাকাকালীন তার সঙ্গে বহু অপরাধীর দেখা হয়েছে। কিন্তু কার সঙ্গে একদিন সকালে জেলে দেখা হওয়ার পর জেলপ্রাঙ্গণে স্বভাববিরুদ্ধভাবে হো হো হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল শান্ত সাকিব? সেই লোকটিও জেল খাটতে এসেছে। নাম প্রদীপ শর্মা। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি ফেক এনকাউন্টারের। তাই জেল হেফাজতে আসতে হয়েছে। আর নিয়তির অদ্ভুত খেলা। তাঁকে যেখানে পাঠানো হয়েছে জেল খাটতে সেখানেই সাকিব নাচান বন্দি।

জেলের খাবার লাইনে দাঁড়িয়ে সাকিব নাচান ইনস্পেক্টর প্রদীপ শর্মার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, সালাম আলাইকুম শর্মা স্যার! প্রদীপ শর্মা হেসেছিলেন! হাত বাড়াননি! শুধু বলেছিলেন, ক্যায়সে হো সাকিব! সাকিব বলেছিল, আপনাদের কেসগুলো প্রুফ করতে পারছেন না কেন? আমার তো সব অ্যাকিউটাল হয়ে যাচ্ছে! স্পষ্ট কটাক্ষ ছিল। প্রদীপ শর্মা হাসিমুখে বললেন, জেল থেকে বেরোতে তো পারলে না সাকিব? কোর্টে লড়েই যাচ্ছ। জীবনের ২০ বছর তো জেলেই কেটে যাচ্ছে! ফির কওন জিতা কওন হারা সাকিব? সাকিব নাচানের হাসি এবার একটু ম্লান হল! হাসছিলেন প্রদীপ শর্মা।

২৭

৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। এই যে ধবধবে সাদা ব্র্যাক ব্রাশ ধরনের চুলকে বলা হয় সিলভার লাইনিং হেয়ার। মার্ক শিল্ডস। জামাইকার পুলিশ কনস্ট্যাবুলারির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। কেরিয়ারের বায়োডেটা অবশ্য এটাই একমাত্র নয়। প্রথমে ব্রিটেনের এসেক্স মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং তারপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অন্যতম শার্প গোয়েন্দা। ২০০২ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বনাম সাউদাম্পটনের খেলা দেখছিলেন ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম। স্বামী খেলবেন। ঠিক ম্যাচ শুরুর আগে একটা ফোন এল। ম্যাডাম, দিজ ইজ মার্ক শিল্ডস...স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড..। সরি টু ডিসটার্ব ইউ..। এরপর ঠান্ডা মাথায় ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম শুনলেন মার্ক শিল্ডস বলছেন, তাঁকে এবং দুই সন্তান ব্রুকলিন আর রোমিওকে কিডন্যাপের প্ল্যান করা হয়েছে। ৫ মিলিয়ন পাউন্ড চাওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। পাঁচজন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ডিটেকটিভ ঠিক তাঁর পাশের বক্সে বসে তাঁর উপর নজরদারি চালাচ্ছেন। সুতরাং কোনো ভয় নেই। শুধু তিনি যেন আচমকা সিট ছেড়ে কোথাও উঠে না যান। যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন। বাকিটা আমরা দেখছি। কাউকে কল করবেন না এখন। বি কাম ম্যাম...ডোন্ট ওরি..। একটা ঠান্ডা ঘামের স্রোত ভিক্টোরিয়ার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেলেও তিনি কাউকে বুঝতে দেননি। ডেভিড বেকহ্যাম ততক্ষণে মাঠে নেমে পড়েছেন। বেকহ্যাম দুটি গোল করলেন। খেলা শেষ। এবং সেই রাত থেকেই ব্রিটেনের সব ধনী ও জনপ্রিয় এই সেলেব্রিটি দম্পতির হার্টফোর্ডশায়ারের ম্যানসনে একমাত্র পুলিশ অফিসার, সিকিউরিটি কোম্পানির এজেন্ট আর ডিটেকটিভরা ছাড়া কেউই ঢুকতে পারবে না বলে মার্ক শিল্ডস ফতোয়া দিলেন। আমরা কোথাও বেরোতে পারব না? এটা আবার হয় নাকি? ভিক্টোরিয়া জানতে চাইছিলেন অসহিষ্ণু হয়ে। মার্ক শিল্ডস বলেছিলেন, আমাকে মাত্র দুদিন সময় দিন। তার পরই আপনারা আবার যে কোনো জায়গায় যাবেন! এবং মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে গেল ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামকে কিডন্যাপ করার প্লট করা ৫ জন সন্দেহভাজন। দুজন আলবেনিয়ার, দুজন রোমানিয়ার এবং একটি ১৮ বছরের আরব তরুণ! জেরা আর তদন্তে জানা গেল একটি বিশেষ সংবাদ সংস্থা এই গোটা প্লটের সঙ্গে

যুক্ত। গোটা রহস্য উদঘাটনের কৃতিত্ব কার? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হ্যান্ডসাম ডিটেকটিভ মার্কের। জামাইকান কুখ্যাত ড্রাগ, গ্যাং ইয়ার্ডির পিছনে তাড়া করে আন্তর্জাতিক ড্রাগ গ্রুপকে কে ধরে ফেলেছেন? মার্ক শিল্ডস। এহেন মার্ক জামাইকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পদে যোগ দেওয়ার পর থেকেই স্থানীয় অপরাধীদের মধ্যে ছিল চরম আতঙ্ক। কারণ ক্রমেই জানা হয়ে গেল যে ক্যারিবিয়ান মাফিয়া আর ক্রিমিন্যালদের মধ্যেই ছিল মার্কের নিজস্ব চর। তারাই হয়ে যেত ডাবল এজেন্ট। অতএব মারিজুয়ানা আর ব্রাউন সুগারের ব্যবসা প্রচণ্ড মার খাচ্ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জুড়ে জনমনে পপুলার হয়ে গেলেন মার্ক শিল্ডস। যিনি তার আগেই লন্ডনে এক সুপার কপ হিসাবে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। যে কোনো আন্তর্জাতিক অপরাধের রহস্যভেদে তাঁর ডাক পড়ত। বলা যেতে পারে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের আধুনিক নিজস্ব এক জেমস বন্ড।

এহেন মার্ক শিল্ডস ২০০৭ সালের ১৮ মার্চ ডার্ক ব্লু ব্লেজার আর আকাশি টাই পরে জামাইকার পিগাসাস হোটেলের ৩৭৪ নম্বর রুমে ঢুকেই বললেন, ফার্স্ট কে ঢুকেছিল ঘরে? ফাইভ স্টার পিগাসাস হোটেলের ম্যানেজার পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় ভয়ে কাঁপছেন। কোনোমতে বললেন, মর্নিং স্টাফ ডিউটি স্যার..কারণ গেস্ট দরজা খুলছিলেন না.. আমরা ডুপ্লিকেট দিয়ে খুলেছি। তারপর কী দেখলেন? ম্যানেজার বললেন, ঘরে কেউই ছিল না। টয়লেটের ডোর সামান্য ভেজানো। আর ভিতরে টাইলসে পড়েছিলেন গেস্ট! সম্পূর্ণ নগ্ন। শাওয়ার খোলা। প্যানেলে জল থইথই। চোখ কুঁচকে গেল মার্ক শিল্ডসের। তাহলে কি স্নান করছিলেন? তার মধ্যেই মৃত্যু? কীভাবে? খুব বেশি সময় নিয়ে ভেতরে তদন্ত করা যাবে না। কারণ ততক্ষণে গোটা জামাইকাই নয়, বস্তুত পৃথিবীর ক্রিকেট দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। হোটেলের লবিতে মিডিয়া আছড়ে পড়েছে। কারণ যাঁর মৃতদেহ একটু আগে জামাইকার হোটেল পিগাসাসের টুয়েলথ ফ্লোরের ৩৭৪ নম্বর রুমে পাওয়া গিয়েছে তিনি যে সে কেউ নয়? তাঁর নাম বব উলমার! আধুনিক ক্রিকেট কোচিংয়ের একচ্ছত্র দ্রোণাচার্য! দক্ষিণ আফ্রিকার উত্থানের একমাত্র কারিগর। আর এই রহস্যময় মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের কোচ। ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১৭ মার্চ যে পাকিস্তান আয়ার্ল্যান্ডের কাছে বিস্ময়করভাবে হেরে গিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়

নিচ্ছে। গতকাল রাত থেকেই প্রশ্ন উঠেছে আয়ার্ল্যান্ডের কাছে এভাবে পাকিস্তান কীভাবে হেরে গেল? সোজা পথে হার? নাকি....? মার্ক শিল্ডস কাউকেই জানাননি যে গতকাল রাতেই ইন্টারপোলের এক গোপন বৈঠকে স্থির হয়েছে এই ম্যাচের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নিঃশব্দে তদন্ত হবে। সন্দেহের লক্ষ্য দুটি শব্দ। ম্যাচ ফিক্সিং! কেউই জানে না যে এই সন্দেহ নিয়ে ইন্টারপোল আসরে নামছে। আর তার আগেই মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানের কোচের রহস্যময় মৃত্যু? কীভাবে?

জামাইকার কিংস্টনের সাবাইনা পার্ক স্টেডিয়াম, ১৭ মার্চ ২০০৭। আইসিসি বিশ্বকাপ ম্যাচ। পাকিস্তান বনাম আয়ার্ল্যান্ড। প্রথম ওভারেই মহম্মদ হাফিজ আউট। এবং তারপর ইউনুস খান। পাকিস্তান ১৫ রান দুই উইকেট। এবং বোঝা গেল আজ কেউ ম্যাচ বাঁচানোর লোক নেই। কারণ ১৩২ রানে পাকিস্তান ইনিংস শেষ। কীভাবে সম্ভবত আয়ার্ল্যান্ড সাইড এত ভালো বোলিং এ? আগে তো বোঝা যায়নি! বৃষ্টি এসে গেল আচমকা। এবং আয়ার্ল্যান্ডের টার্গেট আরও কমে গেল। ১২৮। জিতে গেল বিশ্বক্রিকেটের শিশু একটি টিম। মাঠেই শুরু হয়েছিল বিক্ষোভ। ড্রেসিং রুম ঘিরে পাকিস্তান সমর্থকদের গালিগালাজ। ডাকা হয়েছিল জামাইকার রায়ট পুলিশ। কারণ একের পর এক গাড়িতেও ভাঙচুর শুরু হয়েছিল। আর অন্যদিকে স্বাভাবিকভাবেই রাওয়ালপিন্ডি, করাচি, লাহোরের পরিস্থিতি আরও জটিল। তুমুল বিক্ষোভ, গাড়িতে আগুন, ক্রিকেটারদের বাড়িতে আক্রমণ। কারণ একটাই। বিশ্বকাপ থেকে পাকিস্তান ছিটকেই যাচ্ছে এই একটি ম্যাচে যাওয়ার জন্য। অথচ তুমুলভাবে টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আগের ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পরাজয়। পরের ম্যাচ জিম্বাবোয়ে। সুতরাং এই আয়ার্ল্যান্ড ম্যাচটি জিতে গেলেই বিশ্বকাপে পরের রাউন্ডে যাওয়া ছিল নিশ্চিত। কিন্তু বিস্ময়করভাবে হেরে গেল ইনজামাম উল হকের টিম। প্রেস কনফারেন্সের প্রত্যাশিত প্রশ্ন ছিল এটা কেন হল? কোচ বব উলমারকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। ইনজামাম উল হক মাথা নীচু করে বসে। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল সর্বদাই এক নির্লিপ্ত উদাসীন আচরণ। কোনো সমস্যাই যেন তাঁকে স্পর্শ করে না। এমনিতেই কোচের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আছে। বাদানুবাদ হয়েছে একাধিকবার। কারণ অতিরিক্ত ধর্মপ্রাণ ইনজামাম উল হক প্র্যাকটিসের থেকে বেশি প্রার্থনা করেন, নমাজ পরেন এবং

সময়মতো নেটে আসেন না। উলমারের ক্ষোভ ছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল ধর্মপালন করলে আপত্তির কিছুই নেই। কিন্তু পারফরম্যান্স আর প্র্যাকটিস মার খেলে সেটা তো প্রফেশনালিজম নয়। উলমার সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, আমার আজ দিন ছিল না। ওয়ার্ল্ড কাপ ইজ ওভার ফর আস। এবং তারপরই একটি তীক্ষ্ণ বাক্য ব্যবহার করলেন। আমি বুঝতেই পারছি না আমরা এত কম রান কেন করলাম? কীভাবে করলাম? বলে উঠে গেলেন।

স্টেডিয়াম থেকে টিমবাসে চেপে ফিরে হোটেল রুমে ঢুকলেন সকলেই। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া গোটা টিমের কিছু খেলোয়াড় চলে এলেন কোচের রুমে। উলমার তাঁদের দেখে বসতে বলেছিলেন, তবে এটা ওটা কথার পর বললেন, আমার আজ কথা বলতে ভালো লাগছে না। আমরা কাল ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করব। প্রত্যেকে নিজেদের রিপোর্ট তৈরি কর। সকলের মতামতই জানতে চাই। যদিও ততক্ষণে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উপর প্রবল চাপ আসতে শুরু করেছে উলমারকে সরিয়ে দিতে হবে। যত নষ্টের গোড়া। অতিরিক্ত সিস্টেমের জন্য প্লেয়ারদের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট করেছেন তিনি। অতএব উলমার হঠাও। যে কোনো ম্যাচে দলের খারাপ ফল হলে এই প্রচার ও দাবি প্রধানত পাওয়ার সেন্টারের কাছে কারা তোলে? শুধুই ক্রিকেট ফ্যান নয়। কিছু রহস্যময় চরিত্র যাঁরা প্লেয়ারদের যে কোনো মূল্যে বাঁচাতে চায়। খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য কোচের চাকরি যাক। কিন্তু কোনো প্লেয়ার যেন টিম থেকে বাদ না পড়ে। আর একটি মহল চায় অবশ্যই কয়েকজন প্লেয়ারকে টার্গেট করে বাদ দেওয়া হোক। কারণ এদের লক্ষ্য নতুন এক দুজন প্লেয়ার ঢুকুক। কারা এঁরা। এঁদের কী স্বার্থ? অপেক্ষা করুন। একটু পরই জানব সেই জটিল অঙ্কটির কথা। সেদিন ছিল শনিবার। পরদিন রবিবার কিংস্টনের আকাশ ছিল ঝকঝকে। হোটেল পিগাসাসের ৩৭৪ নম্বর রুমের গেস্ট সাধারণত খুব সকালেই উঠে হোটেলের জিমে চলে আসেন। আর তার আগে নিয়ম হল একটা গ্রিন টি উইথ টোস্ট। পাকিস্তানের ক্রিকেট কোচ বব উলমার। তাঁর সুগার আছে। হয়তো প্রেশারও। কারণ কথার মাঝেই হাঁফিয়ে ওঠেন এবং অসম্ভব ঘাম হয় তাঁর। রুম সার্ভিস এসে কোনো সাড়া পাচ্ছিল না। এরকম হয় না। প্রতিদিন সকালে প্রথমে উলমার সুইমিংয়ে যান। সেদিন

যাননি। এবং দরজা বন্ধ। সকাল ১০ টা বেজে গেছে। ম্যানেজারকে ডাকা হল। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে গেল ওয়াশ রুমের সাদা টাইলস রক্তে ভাসছে। দেওয়ালে ছড়ানো রক্ত আর বমির দাগ। উপুড় হয়ে শুয়ে নগ্ন উলমার। তার আগে কী করছিলেন তিনি? আয়ার্ল্যান্ড ম্যাচে পরাজয়ের পর যখন ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে আসছেন তখন লিফটে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শোয়েব মালিক। তিনতলায় লিফট থামল। দুজনেই চুপ। বব তাঁর টিমের সঙ্গে ইয়ার্কি করতেন খুব। সেরকমই লিফট থামলে শুধু দরজা থেকে সরে গিয়ে শোয়েবকে জায়গা করে দিয়ে বললেন, লেডিজ ফার্স্ট। ম্লান হাসি হেসে মালিক নিজের রুমে চলে যান। ঠিক সাড়ে সাতটায় উলমার নিজের ঘরে ঢুকলেন এবং স্নান সেরে আটটায় ডিনার অর্ডার করেন। এবং শুয়ে পড়েন। একটু আগেই প্রেস কনফারেন্সের পর তিনি বলেছিলেন, আজ রাতে ঘুম হবে না...। তাই হয়েছিল। রাত তিনটে বারো মিনিটে উঠে পড়লেন উলমার। নিজের ল্যাপটপ খুলে ইমেলে লিখতে শুরু করলেন কিছু বার্তা। কাকে পাঠালেন সেই মেইল? স্ত্রী গিল উলমারকে। এবং চরম রহস্যময় সেই ইমেল। সেখানে বলা হয়েছিল 'হাই ডার্লিং...ফিলিং আ লিটল ডিপ্রেসড। কেন তা তো তুমি বুঝতেই পারছ। আমি ঠিক জানি না যে সেমিফাইনাল পর্যন্ত গিয়ে তারপর হেরে যাওয়া বেশি দুঃখের হত, নাকি এভাবে প্রথম রাউন্ডে বিদায় বেশি খারাপ..। আজ আমাদের ব্যাটিং বিপর্যস্ত ছিল..আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে এভাবে আমার সবথেকে বড় আশঙ্কাটা এত তাড়াতাড়ি সত্যি হয়ে যাবে...। বব উলমার ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন? কী ছিল তাঁর সবথেকে বড় আশঙ্কা? এরকম খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে এটা তিনি আন্দাজ করছিলেন? কেন? রাত তিনটের সময় এটা লিখতে হল কেন?

এটা একটা মার্ডার! ঠিক দুদিন তদন্তের পর ঘোষণা করলেন মার্ক শিল্ডস! আর লোকাল কেউ এই খুনটা করেনি। বাইরের ক্রিমিনাল। কেন? মার্ক শিল্ডসের থিওরি হল তিনি জানেন জামাইকার হাঞ্চম্যানরা (এদের বলা হয় ইয়ার্ডি) হয় ছুরি, রিভলবার অথবা ভোঁতা অস্ত্র নিয়েই ঢোকে খুন করতে। কিন্তু এটা শ্বাসরুদ্ধ করে খুন । যা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে সবথেকে বেশি। অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে। নাকে আর ঘাড়ে কিছু আঘাতের চিহ্ন। অর্থাৎ ধস্তাধস্তি হয়েছিল আততায়ীর সঙ্গে। আর কিংস্টনের প্যাথলজিস্টের

সেশাইয়া জানালেন, অ্যাসিফিক্সিয়া। ঘাড়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে। শ্বাসরুদ্ধ করার সময় এরকম হয়ে থাকে। বমি হল কেন তাহলে? সেটা কখন? একটি থিওরি প্রচার করা হল শ্বাসরোধ করার আগে বিষপ্রয়োগ হয়েছিল। সেটা কীভাবে সম্ভব? কখন বমি করেছেন উলমার? মৃত্যুর অনেক আগেই? আরও কয়েকদিন কেটে গেল। আচমকা মার্ক শিল্ডস কয়েকদিনের জন্য উধাও ছিলেন। ২৪ মার্চ তিনি তড়িঘড়ি প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন।

প্রশ্ন : উলমারকে কি বিষ দেওয়া হয়েছিল?

শিল্ডস : হতেও পারে

প্রশ্ন : হিটম্যানের কাজ?

শিল্ডস : সেটাও সম্ভব

প্রশ্ন : ম্যাচ ফিক্সিং সিন্ডিকেট জড়িত?

শিল্ডস : শ্রেফ কাঁধ নাচিয়ে শ্রাগ করলেন আর হালকা করে হাসলেন। জানালেন ক্রিকেটের অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জামাইকায় এসে গিয়েছে।

এসবের থেকে ঠিক ৩০ মাইল দূরে। মন্টেগো বে এয়ারপোর্ট। একটি বিমান দাঁড়িয়ে। পাকিস্তান ক্রিকেট টিম যাবে হোটেল থেকে বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি পা চালানো হচ্ছে। আচমকা জামাইকান পুলিশের একটি টিম দৌড়ে এল। ক্যাপ্টেন ইনজামাম উল হক, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ মুস্তাক আলি আর টিম ম্যানেজার তালাত আলিকে আলাদা করে অপেক্ষা করতে বলা হল। পৃথক একটি রুমে গিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু। কারণ কী? তদন্ত চলাকালীন তাঁরা পরস্পর বিরোধী কিছু মন্তব্য করেছেন। সেগুলি মেলানো যাচ্ছে না। প্রায় এক ঘণ্টা পর তাঁদের যেতে দেওয়া হল। ততক্ষণে খবর এসেছে বাইরে। মিডিয়া ঢুকে পড়েছে। এবং জেরার পর বেরনোর সময় ইনজামামকে সামনে পেয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, ইঞ্জি...তুমি কি ববকে খুন করেছ?..। ইনজামাম শূন্য চোখে তাকালেন। এবং কোনো কথা না বলে এগোলেন গ্রে হাউন্ড বাসের দিকে। এয়ারপোর্ট।

কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই গোটা পরিস্থিতি বদলে গেল। জামাইকার ডিটেকটিভ দপ্তরের বয়ানের সঙ্গে মার্ক শিল্ডসের বক্তব্যের চরম অসঙ্গতি। জামাইকান গোয়েন্দাদের সন্দেহ খুনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিসিটিভিতে ৩৭৪ নম্বর রুমের বাইরের করিডরে কাউকে কেন দেখা গেল না? তাহলে আততায়ী কোথা থেকে ঢুকেছে? সুতরাং তাঁরা চাপ দিল আবার নতুন করে অটোপসি রিপোর্ট পরীক্ষা করা হোক। মার্ক শিল্ডস শুধু তাঁদের একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ১৮ মার্চ সকালে বডি পাওয়ার পর পাকিস্তানের ৬ জন প্লেয়ার ওই ৩৭৪ নম্বর রুমে ঢুকেছিলেন কীভাবে? বড়ি থাকলে সেটা তো সঙ্গে সঙ্গে কর্ডন করে দেওয়ার কথা! হয়নি কেন? জামাইকান গোয়েন্দারা জবাব দেননি ঠিক যেমন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না ১৭ মার্চ রাতে বব উলমার ঠিক কী খেয়েছিলেন? কে অর্ডার নিয়েছিল? খোঁজ পাওয়া যায়নি। জামাইকান গোয়েন্দাদের ওই থিওরি কিন্তু দ্রুত প্রতিষ্ঠার দিকে এগোতে শুরু করে দিল। মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে কানাডা থেকে একটি রিপোর্ট এল। বলা হল কোনো ঘাড়ের হাড় ভাঙা নয়। এবং জুন মাসের ১২ তারিখ জামাইকা পুলিশ ঘোষণা করে বব উলমারের স্বাভাবিক মৃত্যু! তাহলে ওই রক্ত? ওই বমি? ওই শরীরে আঘাত? মার্ক শিল্ডস শুধু বলেছিলেন, মার্ডার মিস্ট্রি কোনো টিভি সিরিয়াল নয় যে ৪৫ মিনিটের মধ্যে ক্লোজ হয়ে যাবে। যাক গে...এটা জামাইকা পুলিশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমার কিছু বলা উচিত নয়। বাট আমি সার্টেন যে সেটি মার্ডার! এসবকে ছাপিয়ে গেল একটি মারাত্মক তথ্য। জামাইকার নাইট ক্লাবের এক ডিস্ক জকি (ডিজে) পুলিশকে বলেছিল তাঁর কাছে উলমার নিয়ে কিছু বিস্ফোরক খবর আছে। কিন্তু তাঁকে যখন ডাকা হল জেরা ও সাক্ষ্যের জন্য, দেখা গেল সে উধাও!

ততক্ষণে নিঃশব্দে তদন্ত শুরু করেছে আইসিসি ক্রিকেটের অ্যান্টি করাপশন ইউনিট। এবং সবার আগে ইন্ডিয়ান অ্যাঙ্গেল দেখতে হবে। ইন্ডিয়ান অ্যাঙ্গেল? এখানে আবার ভারত আসছে কোথা থেকে? পাকিস্তান আর আয়ার্ল্যান্ডের ম্যাচ ফিক্সিং হয়েছিল কিনা এবং সেই সম্পর্কে গোপন কোনো বিস্ফোরক তথ্য উলমার জেনে গিয়েছিলেন কিনা সেই তদন্তই তো প্রধান বিষয়! এখানে ইন্ডিয়া কেন? একেবারেই নয়। ক্রিকেটের বেটিং আর ফিক্সিং সিন্ডিকেট চক্রকে পাকড়াও করতে হলে ভারতকে টাচ করতেই হবে। তাই ময়দানে

নেমেছে। গোপনে। কারণ ২০০৭ সালের সাবাইনা পার্কে পাকিস্তান ও আয়ার্লান্ডের ম্যাচ ঘিরে তাবত সন্দেহ এবং পাকিস্তান কোচের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে দুনিয়া তোলপাড় হলেও আড়ালে ইন্টারপোল অনেক বেশি অ্যালার্ট দিয়েছে দিল্লিকে। কারণ ঠিক সেদিনই ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই পোর্ট অফ ছিল আর একটি ম্যাচ। ভারত বনাম বাংলাদেশ। এবং ভারতও অবিশ্বাস্যভাবে হেরে গিয়েছিল সেই ম্যাচ। মাত্র ১৯১ রানে অলআউট। ইন্টারপোল ভারতের শাখাকে (সিবিআই) অ্যালার্ট করে দিল। ততক্ষণে সিবিআই আগে থেকেই সক্রিয় হয়েছে।

কারণ আচমকা সন্ধ্যার পর দেশের বিভিন্ন সিটিতে প্রচুর ক্যাশের আনাগোনা আর হাওলা সিন্ডিকেটকে সক্রিয় হওয়ার খোঁজ পেয়েছিল ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। হঠাৎ করে আবার তাহলে আন্তর্জাতিক বেটিং আর ম্যাচ ফিক্সিং সিন্ডিকেট অ্যাকটিভ? এবার কার হাত ধরে? দিল্লি পুলিশ ভাবল এম কে গুপ্তা কি আবার শহরে হাজির হয়েছে ৭ বছর পর? নাহলে এত বড় র‍্যাকেট আর কার থাকতে পারে? যাঁর ডায়েরি আর মোবাইলে বিশ্বের সব দেশের ক্রিকেট প্লেয়ারদের মোবাইল নম্বর থাকে কোড নেম দিয়ে? যাঁর একটা ফোনে তাবত লোভী ক্রিকেটাররা বহু ম্যাচ ডুবিয়েছে! সবথেকে বড় কথা যাঁর সঙ্গে দিল্লির পাওয়ার করিডরের যোগাযোগ অবিশ্বাস্য। তাহলে কি বিটিং সিন্ডিকেটে রাজনীতির রাঘব বোয়ালরাও আছে? কে এই এম কে গুপ্তা?

দুটি নম্বর থেকে ফোন আসছে। দিল্লির এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছে। ৯৭১-৫০-৬৭99*** এবং ৯৭১-৫০-৬৭৯৬***। তাঁর প্রধান ব্যবসা হল হস্তশিল্পের রপ্তানি। দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ দেখেই বুঝে গেল দুবাইয়ের নম্বর। এবার স্বাভাবিক নিয়ম হল ফোন ট্যাপ করা। কেসটি হ্যান্ডল করতে বলা হল ইনস্পেক্টর ঈশ্বর সিংকে। প্রথমেই দেখতে হবে দিল্লির কেউ এই নম্বরগুলিতে কল করছে কিনা। কারণ সাধারণত যে শহরে টার্গেট ধরা হয় সেখানে অবশ্যই এক বা একাধিক স্লিপার সেল থাকে। ফোন দুবাই থেকে এলেও সেই শহরের কেউ না কেউ ওই টার্গেটের মুভমেন্ট ফলো করে এবং রিপোর্ট করে। ঠিক যেভাবে বহু বছর আগে কলকাতায় খাদিম সংস্থার কর্তা পার্থ রায়বর্মণের অপহরণের ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

মুক্তিপণ চেয়ে ফোন এসেছিল দুবাই থেকে। কিন্তু আসল কাজটি করেছিল লোকাল অপারেটিভ। আমরা এই সিরিজের আগামী কোনো এক সংখ্যায় সেই গল্পটি নিশ্চয়ই শুনব। শুনতেই হবে। কারণ সেই গল্পের সবথেকে মারাত্মক আন্তর্জাতিক লিংক হল কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে পাওয়া মুক্তিপণের টাকা গিয়েছিল আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের প্রোজেক্টে। অর্থাৎ ওসামা বিন লাদেনের ফান্ডে। ভায়া মহম্মদ আট্টা! কে কে ছিল সেই লিংকে? ওই যে বললাম, এখন নয়, পরে জানব। আপাতত দেখা যাক ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লির ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসার ঈশ্বর সিং সেই নম্বরগুলিতে আড়ি পেতে কী কী পেলেন! একটি নম্বরের সঙ্গে প্রায় রোজ যোগাযোগ। দিল্লির নম্বর। ৯৮১১০**৪১১। কার নম্বর? নাম পাওয়া গেল কৃষাণ কুমার। কে এই কৃষাণ কুমার? ঈশ্বর সিং মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে জানতে চাইলেন। এবং দুদিনের মধ্যে জানা গেল কৃষাণ কুমার আসলে গুলশান কুমারের ভাই। যে গুলশান কুমারকে মুম্বইয়ের রাস্তায় মাফিয়া গ্যাংস্টাররা প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করেছিল। আর যে মামলায় অভিযুক্ত গুলশান কুমারের সবথেকে প্রিয় সংগীত পরিচালক নাদিম শ্রাবনের নাদিম। যাঁকে তিনিই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ঘটনার পর থেকে যে লন্ডনে পলাতক। কৃষাণ কুমার কি তাহলে দুবাইয়ের মাফিয়াগোষ্ঠীর স্লিপার সেল? ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো!! এভাবেই পাওয়া গেল আরও কিছু নম্বর। সেরকমই একটি নম্বরে দুপুর আড়াইটের সময় আড়ি পেতে আচমকা শোনা গেল একটা আপাত নিরীহ বাক্যালাপ। কে এক সঞ্জীব চাওলার সঙ্গে একটি পাঁচতারা হোটেলে দেখা হবে এক বিদেশির। বিদেশির নাম হ্যান্সি ক্রোনিয়ে! কিন্তু এই নামটা যেন চেনা চেনা। এবং সেদিন থেকে দিল্লি পুলিশের তদন্তের গতিপথ ঘুরে গেল। ঝড় উঠল বিশ্বজুড়ে। দিল্লি পুলিশ গ্রেপ্তার করল কৃষাণ কুমার, সুনীল দারা এবং রাজেশ কালরাকে। সঞ্জীব চাওলার শাগরেদ। মূল চক্রী সঞ্জীব লন্ডনে পালিয়েছে। তিনজনই ক্রিকেট বুকি। দিল্লি পুলিশ জানিয়ে দিল ভারত সফরে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা ক্যাপ্টেন ক্রোনিয়ে একাধিক ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছেন বুকিদের থেকে টাকা নিয়ে। কিন্তু হ্যান্সি ক্রোনিয়ে এরকম কাজ করতে পারে? কেউ বিশ্বাস করবে না। করেওনি। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড ডিরেক্টর ডক্টর আলি বাখার। ৭ এপ্রিল ২০০০। ইউনাইটেড

ক্রিকেট বোর্ডের কমিউনিকেশন ম্যানেজার ব্রনউইন উইলকিনসনকে ইংল্যান্ড থেকে ফোন করে এক সাংবাদিক জানালেন, শুনেছেন তো? ক্রোনিয়ে হ্যাজ বিন চার্জড! দিল্লি পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার কে কে পল একটু আগে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। উইলকিনসন আকাশ থেকে পড়লেন! তৎক্ষণাৎ আলি বাখারকে ফোন করে জানালেন। বাখার প্রচণ্ড বিরক্ত। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অ্যাবসলিউট রাবিশ! এখনই কে কে পলকে ফোন করে আপনি বলুন, আপনারা আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে না জানিয়ে মিডিয়াকে কেন জানালেন? আগে তো আমাদের জানাতে হবে এত বড় এক অভিযোগ! মিসেস উইলকিনসন ঠিক তাই করলেন। এবং দিল্লির আইটিও ক্রসিং এর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে বসে জয়েন্ট কমিশনার কে কে পল কেটে কেটে ঠান্ডা গলায় বললেন, ম্যাডাম, আপনাদের কে বলেছে যে আমরা কী তদন্ত করছি আর সেই তদন্ত থেকে কী পাওয়া গেল সেসব আপনাদের জানাতে আমরা বাধ্য? বরং আপনারা তৈরি থাকুন..এবার আপনাদের বোর্ড আর ক্রিকেটারদের একে একে ডাকা হবে। ডোন্ট বি ওভার স্মার্ট!! এই শীতল হুমকি শুনে স্বাভাবিকভাবে আলি বাখারও আশঙ্কা করলেন এভাবে যখন দিল্লি পুলিশ কথা বলছে, তাহলে কি সত্যিই কিছু হয়েছে? কিন্তু তাই বলে ক্রোনিয়ে? অসম্ভব! তিনি ক্রোনিয়েকে বললেন, হ্যান্সি আমি তোমার পাশে আছি। হ্যান্সি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, থ্যাংকস ডক! সেটি ছিল একটি বারবিকিউ ডিনার পার্টি। ঠিক দুদিন পর দক্ষিণ আফ্রিকার টিম ডারবানে একজোট হল। তিনটি একদিনের ম্যাচের সিরিজ।. অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। হ্যালি ক্রোনিয়ে প্রেস কনফারেন্সে জানাচ্ছেন, আমি ১০০ শতাংশ সৎ আমি এক পয়সাও নিইনি কোনো ম্যাচ ফিক্সিংয়ে। দুনিয়ার যে কোনো পুলিশ, যে কোনো আদালত তদন্ত করুক। আমি নিজেকে সৎ প্রমাণ করব। এবং তারও দুদিনের পর ১১ এপ্রিল ২০০০। দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ আলি বাখারের ক্যাম্প বাংলোয় ভোর তিনটের সময় একটি ফোনের রিং হচ্ছে। বিরক্ত বাখার। এই মাঝরাতে কে ফোন করছে? আশ্চর্য! কাণ্ডজ্ঞান নেই! ফোন কানে নিয়ে বাখার শুনলেন, চেনা কণ্ঠ। গুলাম রাজা। দক্ষিণ আফ্রিকার টিম ম্যানেজার। বাখারকে টিমমেটরা সকলেই সম্বোধন করেন ডক! তিনি ডাক্তার। তাই ডক। রাজা বললেন, ডক! ইয়ে...তোমার সঙ্গে ক্যাপ্টেন কথা বলতে চায়।

এখন? হ্যান্সি? বাখার টেনশনে উঠে বসলেন! ক্রোনিয়ে অন্য প্রান্তে! হ্যালো..ডক! আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছি। আমি দেশকে ঠকিয়েছি! বাখার বললেন, হ্যান্সি? তার মানে তুমি টাকা নিয়েছ? কত? হ্যান্সি জানালেন, প্রথমে ১০ হাজার ডলার, তারপর ১৫ হাজার ডলার। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ টাকা। কবে থেকে? ১৯৯৬ সাল থেকে চলছে। অবিশ্বাস্য কথা বলছে হ্যান্সি! কীভাবে এত টাকার লেনদেন হতে পারে? হতে পারে ডক! তুমি তো জানো আমি পিচ স্পেশালিস্ট। একটা ইন্ডিয়ান সিন্ডিকেট আমাকে শুধু পিচ রিপোর্টের জন্যই ৫ কোটি টাকার অফার দিয়েছিল...। ৫ কোটি টাকা!! শুধু পিচ কেমন সেটা জানার জন্য? মাথা ঘুরতে লাগল আলি বাখারের। ইটস অল ওভার হ্যান্সি!

ইয়েস ডক! ইটস ওভার। নাও আই উইল স্লিপ..।

জুন মাস! ক্রিকেট ফিক্সিং নিয়ে একদিকে যেমন পুলিশি তদন্ত চলছে, তেমনই তৈরি হয়েছে তদন্ত কমিশন। কিং কমিশন। প্রথম বোমা ফাটালেন হার্সল গিবস। কিং কমিশনে জানালেন, ক্যাপ্টেন আমাকে ১৫ হাজার ডলার দিয়েছিলেন ইন্ডিয়া ট্যুরে। একটা ম্যাচে ২০ রানের মধ্যে আউট হয়ে যেতে হবে। আমি তাই করেছিলাম। এরপর একে একে জ্যাক কালিস, মার্ক বাউচার, ল্যান্স ক্রুজনার জানালেন, ব্যাঙ্গালোর ম্যাচে তাদের টাকার অফার দেওয়া হয়। এবং অবশেষে স্বয়ং হ্যান্সি ক্রোনিয়ে। সব স্বীকার করলেন। এবং একটি বিস্ফোরণ ঘটালেন। জানালেন, ১৯৯৬ সালে তাঁকে প্রথম বেটিং সিন্ডিকেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এক ভারতীয় প্লেয়ার। তখন তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। কে? মহম্মদ আজহারউদ্দিন!!

সিবিআই এর জয়েন্ট ডিরেক্টর (ইকনমিক অফেন্স) নীরজকুমারের কাছে একটি ফোন এল। অপরাধ জগতের সঙ্গে যোগ থাকা তাঁরই এক ইনফর্মার। অর্থাৎ সোর্স। সে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে এম কে কথা বলতে চায়। নীরজকুমার জানতে চাইলেন এম কে মানে কি? সে আবার কে? ফোনের অন্য প্রান্তে থাকা লোকটি বিস্মিত। বলল, আপনার ডেস্কে বেটিংয়ের কেস এসেছে। আর আপনি এম কে গুপ্তার নাম শোনেননি? সেই তো ভারতের ক্রিকেট বেটিংয়ের গডফাদার? নীরজ কুমার রাজি হয়ে গেলেন। দিল্লির হোটেল

ওবেরয়। রুম নম্বর ৬৫০। এম কে গুপ্তাকে দেখে কেউ বলবেই না এহেন একজন সাধারণ দেখতে আন ইমপ্রেসিভ মানুষ দেশের সবথেকে প্রভাবশালী বেটিং সিন্ডিকেট চালায়। স্যার..চা খাবেন? নীরজকুমার বললেন, কাম টু দ্য পয়েন্ট! আমার সঙ্গে কী কাজ? স্যার..আমি সারেন্ডার করতে চাই! আমার প্রাণের পিছনে অনেকে আছে। যে কোনো সময় মার্ডার হয়ে যাব!

জানা গেল ইতিহাস। এক সাধারণ ব্যাংক কর্মী ছিল এই এম কে গুপ্তা। একটু এক্সট্রা পয়সার লোভ কার না থাকে। তাই প্রথমে সাট্টা এবং রাজ্য লটারিতে টাকা ইনভেস্ট করত সে। আর তারপর একদিন এক বন্ধুই নিয়ে গেল চাঁদনি চক। গলির গলি তস্য গলি। একটি মাত্র ছোট ঘর। সেখানে হচ্ছে বেটিং। আশির দশক। তার মানে তখন থেকেই ঢুকে পড়েছে বেটিং! একের পর এক বাজি ধরে এম কে গুপ্তা এতই মুনাফা করতে লাগল যে একসময় সে ব্যাংকের নিরাপদ চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিল স্রেফ ফুল টাইম বুকি হয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯৮৮ সালে এম কে গুপ্তা দিল্লির মাঠে একটি ক্লাব স্তরের ম্যাচ দেখার সময় লক্ষ করে এক তরুণ ক্রিকেটার দারুণ খেলছে। সেঞ্চুরি করল খুব অল্প সময়ে। এম কে বুঝে গেল সে তার প্রথম ঘোড়া পেয়ে গিয়েছে। ভালো খেলে ফেরার পর ক্লাব কর্তারা কিংবা সমর্থকদের কেউ অথবা ক্রিকেট ফ্যানরা তরুণ প্লেয়ারদের হাতে, হাজার টাকা ঢুকিয়ে দিলেন ওই প্লেয়ারের পকেটে। প্লেয়ারটি বিস্মিত। এত টাকা! কে ইনি? সঙ্গে সঙ্গে এক সতীর্থ এসে সেই প্লেয়ারকে বলে দিল চিনে রাখো ইনি এম কে গুপ্তা। তোমার নতুন বন্ধু। প্লেয়ারের নাম অজয় শর্মা। এম কে কিন্তু ট্যালেন্ট চিনতে ভুল করেনি। দু বছরের মধ্যে অজয় শর্মা ইন্ডিয়া টিমে চান্স পেল, নিউজিল্যান্ড সফরে। ১৯৯০। তার সঙ্গেই আর এক নতুন প্লেয়ার। দিল্লি থেকে নির্বাচিত। আপাতত ইন্ডিয়া টিমে এম কের দুই এজেন্ট ঢুকে গেল। সেই শুরু। বেশ লাভ হল। কারণ অনেক ইনপুট পেয়ে সেই ট্যুর থেকে যথেষ্ট মুনাফা হল। ইন্ডিয়া টেস্ট সিরিজ পরাজিত হয়ে ফিরে এল। এরপর ইংল্যান্ড। কিন্তু আচমকা এম কের নিজের দুই প্লেয়ারই টিম থেকে বাদ। এবার উপায়? তাঁরা বলেছিল কোনো চিন্তা নেই। যারা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। এই নতুন রিক্রুটদের এম কে জানিয়ে দিল ইংল্যান্ড থেকে সফল হয়ে ফিরলেই মারুতি জিপসি দেওয়া হবে একটা

করে। আর অ্যাডভান্স ৪০ হাজার টাকা। এই নতুন অলরাউন্ডার অপ্রত্যাশিত ভালো পারফরম করেছিল। কারণ সে যে নিছক আবহাওয়া, পিচ কন্ডিশন, কোন ম্যাচে ব্যাটিং অর্ডারের রদবদল হচ্ছে এসব খবরই দিয়েছিল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একঝাঁক আন্তর্জাতিক প্লেয়ারের ফোন নম্বর। এম কে আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। সে হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ক্রিকেট সিন্ডিকেটের বেতাজ বাদশা। আর নব্বই দশকের মাঝামাঝি তাঁর সবথেকে পুরোনো সেই কাছের প্লেয়ার আলাপ করিয়ে দিল এমন একজনের সঙ্গে যে আলাপ পরিচয় ভারতের ক্রিকেট কেলেঙ্কারিকে নিয়ে গেল এক অন্য স্তরে। সেই নতুন আলাপ হওয়া মানুষের নাম মহম্মদ আজহার উদ্দিন। আর এরপর কী হল সেটা তো বহু চর্চিত এক ইতিহাস। এরপর আর নীরজকুমারের সন্দেহ রইল না কীভাবে এগিয়েছে বেটিং সিন্ডিকেট। গোটা তদন্ত এরপর শুধু গোটানোর পালা। হ্যানসি ক্রোনিয়েকে আজীবনের মতো ব্যান করা হল ক্রিকেট জীবন থেকে। কিন্তু এম কে জানিয়ে দিলেন এক অজানা জগতের কথা। জানা গেল নিছক প্লেয়ার নয়। ফিক্সিং আর বেটিং সিন্ডিকেটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সবাই। সবাই মানে কারা? সবাই মানে আম্পায়ার, গ্রাউন্ডসম্যান, টিমের ফিজিও এবং হ্যাঁ মিডিয়ার একাংশ। দেশবিদেশের বিভিন্ন ম্যাচ কভার করতে যাওয়া সাংবাদিকদের জন্য মিডিয়া রুম দেওয়া হয়। সংবাদ পাঠানোর জন্য। মেল অথবা ফ্যাক্স করার ব্যবস্থা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফ্যাক্সে ম্যাচ শুরুর পর থেকেই কিছু বিশেষ নম্বরে রিপোর্ট পাঠানো শুরু হয় দুবাই আর জেড্ডার ফ্যাক্স নম্বরে। সাদা এ ফোর সাইজের পেপারে পাঠানো হয়। কোনো নাম লেখা হয় না। থাকে শুধুই কিছু পরিসংখ্যান। কারা পাঠায়? কার কাছে?

যাই হোক সেই আজীবনের ব্যান হওয়ার পর হঠাৎ উধাও ক্রোনিয়ে। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু জানা গেল ক্রোনিয়ে নিজের মতো করে একটি ব্যাবসায়িক ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন আড়ালে। ২০০২ সালে যখন আবার হঠাৎ করে ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে ক্রোনিয়েকে নিয়ে আলোচনা শুরু হল এবং তাঁকে সামগ্রিকভাবেই ভিলেন তকমা দেওয়া হল, তখনই ক্রোনিয়ে আচমকা জানালেন, আমার অনেক কিছু বলার আছে। আমি একা কেন এভাবে ভিলেন হয়ে যাব? যাঁরা যুক্ত বলে আমি জানি, আমার

কাছে প্রমাণ আছে এরকম নাম এবার বলব। সেই তালিকায় নাকি রাজনীতিক থেকে সেলেব্রিটি সকলের নাম আছে। হ্যাঁ, ভারত, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া সকলে...। কিং কমিশনের সাক্ষ্যে ঠিক এরকমই আভাস দিয়েছিলেন তিনি।

৩১ মে ২০০২। প্রচণ্ড গুমোট জোহানেসবার্গে। শুক্রবারের ট্রাফিক মারাত্মক জ্যাম। সকলেই উইক এন্ডে বাড়ি ফিরবে তাড়াতাড়ি। বিজনেস মিটিং সেরে ফিরছেন হ্যান্সি ক্রোনিয়ে। তাঁর নিজের বাড়ি ওয়েস্টার্ন কেপ প্রদেশের জর্জ নামক শহরে। বাড়ি নয়। একটি গলফ রিসর্ট। বিএমডবু ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি অন্য কোনো রুটে যেতে বলছেন ক্রোনিয়ে। কারণ এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে তাঁকে একবার বেল ইকুইপমেন্ট কোম্পানিতে একটা ছোট মিটিং সারতে হবে। এদিকে জ্যামে রাস্তা প্রায় স্তব্ধ। ইচ্ছা করলেই মিটিং ক্যান্সেল করা যায়। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় একটাই কারণে। যখন তাঁকে ক্রিকেট দুনিয়া থেকে ব্যান করা হয় তখন এই সংস্থা তাঁকে একটা অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারের চাকরি দিয়েছিল। তাই এদের না বলা উচিত নয়। হ্যান্সি ক্রোনিয়ে ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত নীতিতে অটল। অথচ কেন তিনি নীতিহীন হয়েছিলেন? এই প্রশ্ন আজও তাড়িয়ে বেড়ায় গোটা ক্রিকেট সমাজে।

হ্যান্সি ক্রোনিয়ে সেদিনের ফ্লাইট মিস করলেন শেষ পর্যন্ত। সন্ধ্যা নামার পর আচমকা ঠান্ডা বেড়ে গেল। তীব্র বাতাসও দিচ্ছে। যখন মিটিং শেষ হল ততক্ষণে বেল ইকুইপমেন্টের প্রায় সব কর্মীই চলে গিয়েছেন। অল্প কয়েকজন শুধু অফিসে। ক্রোনিয়ে নিজের প্রাক্তন সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, কেউ কফি খাবে? কিন্তু এবার কী? ক্রোনিয়ে ফিরবেন আজই? নাকি থেকে গিয়ে আগামীকালের ফ্লাইট নেবেন? এখন আর ফ্লাইটের টিকিট পাওয়াও যাবে বলে মনে হয় না। উইকএন্ড রাশ। তাহলে? ক্রোনিয়ে বললেন আজই ফিরব। একটাই উপায় আছে। এয়ার কোরিয়াস। বেসরকারি এক চার্টার্ড এয়ারলাইনস কোম্পানির মালিকের সঙ্গে ক্রোনিয়ের বন্ধুত্ব। খুব বেশি সমস্যায় পড়লে মাঝে মধ্যে ক্রোনিয়ে এদের কার্গো ফ্লাইটে ককপিটে বসেই চলে যান। এদিনও সেরকম বন্দোবস্ত হল। ঠিক হল ক্রোনিয়ে ককপিটের জাম্প সিটে বসবেন। পাইলটের ঠিক পাশেই।

পাইলট চেনা। তবে ঠিক সময়মতো টেক অফ হল না। একটু ডিলেড। সে তো হতেই পারে। হকার সিডলে এইচ এস সেভেন ফোর এইট কার্গো এয়ারক্র্যাফট জো বার্গ থেকে টেক অফ করল। কেপ টাউন থেকে মাত্র ৪৩০ কিলোমিটার পূর্বের শহর জর্জে যেতে বেশি দেরি হবে না। এবার ল্যান্ডিং। একটু তন্দ্রা এসেছিল হ্যান্সির। তবে ঝাঁকুনিতে চোখ খুলে গেল। একটু কি বেশি দুলছে প্লেনটা? ভাবতে ভাবতেই আচমকা একটা পাহাড়ের দিকে বোঁ বোঁ করে নামতে শুরু করল এয়ারক্র্যাফট। এটা হল ক্র্যাডক পিক। আউটেনকিয়া পর্বতশ্রেণি। পাইলটের দিকে আতঙ্কের সঙ্গে তাকিয়েছিলেন সম্ভবত হ্যালি। সোজা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল সেই প্লেন। হ্যান্সি ক্রোনিয়ে মারা গেলেন। সঙ্গে দুই পাইলট। কী হয়েছিল? গ্যাভিন ব্র্যানসন এয়ার কোয়ারিসের মালিক। পরে বলেছিলেন, ওই রুটে এই কার্গো ফ্লাইট অবিরত ফ্লাই করে। এটা কীভাবে ক্র্যাশ করল আমরা আজও জানি না। কোনো খারাপ ওয়েদারও ছিল না। সবথেকে বড় যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না সেটি হল এয়ারক্র্যাফটে বোর্ডিংয়ের পর হ্যান্সি কেন একবারও স্ত্রী বার্থাকে ফোন করে বললেন না যে আমি আসছি? তিনি ফ্লাইট মিস করেছেন এটা বার্থা জানতেন। কিন্তু আবার আসছেন এটা জানতেন না। একটা ছোট কার্গো এয়ারলাইনসের এয়ারক্র্যাফটে কেন যান্ত্রিক গোলযোগ হল? কেন সামান্য ডিলেড ছিল? এসব প্রশ্নের থেকেও যে আরও বড় প্রশ্নগুলি হ্যান্সি ক্রোনিয়ের সঙ্গেই হারিয়ে গেল তা হল কাদের নাম তিনি জানতেন যারা জড়িয়ে বেটিং সিন্ডিকেটে? বিশেষ করে ভারতের রাঘববোয়ালরা আছে বলে তিনি বলেছিলেন! কারা তারা? যাতে ফাঁস না হয় সেই কারণেই মরতে হল না তো হ্যান্সিকে? ২০০০ সালে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়, কিং কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর আজীবনের মতো তাঁকে ব্যান করা হয়েছিল। অথচ চরম বিস্ময়কর হল ২০১৩ সাল পর্যন্তও হ্যান্সি ক্রোনিয়ের বিরুদ্ধে বা ওই ক্রিকেট বেটিং কেসের কোনো চার্জশিট দেওয়া হয়নি আদালতে। চার্জশিট দেওয়া হল ২০১৩ সালে। কেন? কারণ ছিল প্রবল উপরমহলের চাপ। রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের বাধা। এই মামলায় চার্জশিট হলে শুনানি শুরু হলে প্রচুর প্রভাবশালী রাজনীতিকদের নামও ফাঁস হয়ে যাবে। তাই চুপচাপ ১৩ বছর ধরে চার্জশিট না দিয়ে বসে থাকা হয়েছে। এসবের পরই ইন্টারপোল থেকে বলা হয়েছিল

ক্রিকেটের থেকে কালো টাকা সরাতে একটি বিশেষ উইং স্থাপন করা হবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর ইন্টারপোল থাকবে সেই উইংয়ে। কিন্তু রাজি হয়নি ক্রিকেট কর্তারা। কারা তাঁরা? প্রায় সকলেই রাজনীতির বিখ্যাত মুখ! কে ছিলেন সেই প্রস্তাব পেয়ে প্রত্যাখ্যানের সময় বি.সিআইআইয়ের সর্বোচ্চ পদে? শরদ পাওয়ার!

এবং ২০১৩ সালের ৫ মে। সেই ঈশ্বর সিংয়ের মতোই এবার আবার দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের এক ইনস্পেক্টর বদ্রিশ দত্ত আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়াদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের কতটা যোগাযোগ আছে তা জানার জন্য মোবাইল ফোন সার্ভেল্যান্সের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক তৈরি করছেন। বিকেলে ৫ টা ৫৪ মিনিট। রাজস্থান রয়্যাল টিমের এক সদস্যের কাছে ফোন এল। তাঁর ফোন ততক্ষণে দিল্লি পুলিশ ট্যাপ করে রেখেছে। সুতরাং সে সন্দেহের আওতায়। কিন্তু উলটোদিকে যে ফোন করছে তার পরিচয় জেনে দিল্লি পুলিশ স্তব্ধ। কারণ তিনি হলেন এক প্রাক্তন ক্রিকেটার। যাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। রাজস্থান রয়্যালসের প্লেয়ারকে ফোনে বলা হচ্ছে, আজকের ম্যাচে সেকেন্ড ওভারে ১৪ রানের বেশি দিতে হবে। এমনভাবে বল করবে! ঠিক আড়াই ঘণ্টা পর খেলা শুরু। জয়পুর সওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে। রাজস্থান রয়্যালস বনাম পুণে ওয়ারিয়ার্স। ঠিক কখন সেই ওভারটি শুরু হবে? ওই প্লেয়ারটি জানিয়ে দিলেন আমি ট্রাউজার থেকে ইন করা জার্সি বের করে আবার ইন করে নেব। ওটাই হবে সিগন্যাল। খুব ভালো। এই কথোপকথন শুনে দিল্লি পুলিশ গোটা ম্যাচ বল বাই বল দেখা শুরু করল। এবং সেই বোলার নিজের সেকেন্ড ওভারে সত্যিই ১৪ রানের বেশি দিয়ে দিল লুজ আর ওয়াইড বল করে। কিন্তু বিরাট ভুল করল। কারণ সম্ভবত টেনশন আর উত্তেজনায় সে ওই নির্দিষ্ট সিগন্যালটি দিতে ভুলে গিয়েছে। সেই জার্সি ট্রাউজার থেকে বের করা। চন্দ্রেশ প্যাটেল ওরফে জুপিটার রাগে আতঙ্কে কাঁপছিল। এই ম্যাচের একটি বিশেষ সিন্ডিকেটের হয়ে প্রধান পাণ্ডা চন্দ্রেশ। তার রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে! কারণ এই বিরাট ভুলের জন্য কোটি কোটি টাকার লোকসান হল। আর আতঙ্ক, কারণ এই ভুলের মাশুল তাকে দিতে হবে। আজ রাতেই ফোন আসবে পাকিস্তান থেকে। সত্যিই এসেছিল। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে রাত আড়াইটেয় বলা হয়েছিল জুপিটারকে, এরকম কেন হল? এই লস কিন্তু আমাদের পূরণ

করতেই হবে। যদি না পারে এসব ফালতু ছোকরাকে কাজে লাগিও না। আর এই ছেলেটা ডাবল ক্রস করছে না তো আমাদের? (ডাবল ক্রসের অর্থ অন্য কোনো সিন্ডিকেটের হয়েও কাজ করছে)। যদি সেরকম করে তাহলে কিন্তু....। ঠান্ডা গলায় বলেছিল ওপারের কণ্ঠটি। ভয়ে কাঠ হয়ে শুনছিল জুপিটার। কারণ ওপারের লোকটির নাম শাকিল বাবুমিয়াঁ শেখ। অর্থাৎ ছোটা শাকিল...দাউদের ডান হাত। দিল্লি পুলিশ বুঝে গেল আইপিএলে হচ্ছে স্পট ফিক্সিং। আর সিন্ডিকেটের দখলের হাতবদল হয়েছে। এখন আইপিএল নামের নতুন ক্রিকেটের বেটিং সিন্ডিকেটের গডফাদার হয়েছে তিনটি শিবির। কর্পোরেট, রাজনীতি এবং ডি কোম্পানি! অর্থাৎ দাউদ ইব্রাহিম! আর আমরা?

চিয়ারলিডার!

২৮

সিবিআই ইনস্পেক্টর রামন ত্যাগী ফাইল তৈরি করছেন। আগামীকাল ট্রায়াল কোর্টে শুনানি। বম্বে ব্লাস্টের। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুযায়ী এভিডেন্সসহ এই ফাইল সাবমিট করতে হবে। রাত প্রায় ৯ টা। এর মধ্যেই বাড়ি থেকে দুবার ফোন এসেছে। স্ত্রী। জানতে চাইছেন আর কত দেরি হবে। রামন ত্যাগী বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন অনেক সকালে। যদিও এই চাকরিতে এটা কোনো নজিরবিহীন ব্যাপারই নয় যে রাত দশটা এগারোটা হয়ে যাচ্ছে ফিরতে। এমনও হয়েছে অফিস থেকে সারারাত আর ত্যাগী বাড়ি ফেরেননি। পরদিন সকালে জানা গেল তিনি চেন্নাই। আসলে আজ একটা বিশেষ পারিবারিক গেট টুগেদারও আছে। যেতে হবে। এখনই রাত ৯ টা। রামন ত্যাগী ভাবলেন একবার বাড়িতে বলে দেবেন তিনি অফিস থেকেই সোজা সেই আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। আর পরিবার যেন সেখানে আগেই পৌঁছে যায়। তবে কাজটা প্রায় হয়ে এসেছে। আর দুটি পৃষ্ঠা। তারপর না হয় ফোন করা যাবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার ফোন বাজছে। এবার একটু বিরক্ত হলেন ত্যাগী। এরকম আচরণ তো স্ত্রী করেন না। তিনি জানেন বম্বে ব্লাস্টের কেস নিয়ে কতটা টেনশন আছে। অ্যাকিউজডদের কনভিকশন না হলে সিবিআই এর মানইজ্জত নষ্ট হবে তাই শুধু নয়, গোটা দেশের এবং বহিরাগত অপরাধী আর জঙ্গিদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স চলে আসবে যে এই দেশে ইনভেস্টিগেশন করার মতো তদন্তকারী সংস্থা নেই। সিবিআই এরকম একটা হাই প্রোফাইল কেসও ঠিকমতো হ্যান্ডল করতে পারছে না! সুতরাং কোনো ফাঁক যেন না থাকে ফাইলে। ত্যাগী অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ফোন তুলে সবেমাত্র বলতে শুরু করেছেন, আমি তো বলছি একটু বিজি আছি...একটু পরই বেরোব..। ওপ্রান্তে কে আছে ফোনে সেটা না জেনেই ত্যাগী ফোন কানে নিয়েই ওসব বলা শুরু করছিলেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর থেমে গেলেন। একটা চেনা কণ্ঠস্বর। তবে স্ত্রী নয়। এক পুরুষকণ্ঠ।

আদাব ইনস্পেক্টর সাব।

ত্যাগীর নার্ভ টানটান হয়ে গেল। তাঁর এক ইনফর্মার ফোন করেছে। আর এই ইনফর্মার তথা গুপ্তচরের মূল্য অপরিসীম। কারণ যে সে দলে যুক্ত নয় সে। এই লোকটি ডি কোম্পানির গ্যাংয়ের সদস্য। আর গোপনে সে সিবিআইয়ের ইনফর্মার। সুতরাং ত্যাগী ফাইল থেকে চোখ সরিয়ে চাপা স্বরে বললেন, হাঁ বোলো, কেয়া খবর হ্যায়।

সাব আপকে কামকা খবর হ্যায়। সেলিম কুরলা কা ফোন নম্বর মিল গয়া হ্যায়। উত্ত আভি হায়দরাবাদমে হ্যায়।

ত্যাগীর শিরদাঁড়া শক্ত হচ্ছে। সেলিম কুরলা! বম্বে ব্লাস্টের এক অন্যতম অভিযুক্ত। যাকে খোঁজা হচ্ছে অনেকদিন ধরে। পাওয়া যাচ্ছে না। ত্যাগী জানতে চাইছেন আর কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন আছে কিনা। সেই ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হল আপাতত আর কিছু খবর নেই। তবে আপনি হায়দরাবাদ চলে যান। ওখানে গিয়ে লোকাল কোনো নম্বর দিন আমাকে। আমি সেলিমের সঙ্গে কথা বলে কনফার্ম করব সে ওখানে থাকছে কিনা। অথবা কতদিন আছে। আমি পাক্কা খবর আপনাকে জানিয়ে দেব। উসকে বাদ আপ রেইড মার দেনা সাব!

ত্যাগী তৎক্ষণাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না। কারণ এই ইনফর্মার আগে যেমন অনেক সঠিক খবর দিয়েছে তেমনই আবার প্রচুর ভুল খবরও দিয়েছে। তাই আজকের খবর যে সঠিক হবে তার নিশ্চয়তা নেই। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি। ঠিক দু বছর আগে হয়েছে মুম্বই বিস্ফোরণ।

দাউদ ইব্রাহিমের গ্রুপে সেলিম আর শাকিল একাধিক। গ্যাং মেম্বারদের কাছে তাদের পরিচিতি ডাকনামে। ছোটা শাকিল। লম্বু শাকিল। সেলিম কুত্তা। সেলিম টেম্পো। সেলিম কুরলা। সেলিম কুরলার প্যাশন হল সিনেমা। হিন্দি সিনেমা। বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দাউদ ইব্রাহিমের যোগাযোগ বহুদিনের। আর সেই যোগাযোগকে মসৃণ করেছে সেলিম কুরলা। ব্লাস্টের পর দাউদ দুবাই ছেড়ে চলে গিয়েছে করাচি। দুবাই, শারজায় যত বেশি ভারতীয় চিত্রতারকাদের আগমন ঘটে ততটা ঘটে না পাকিস্তানে। তাই ক্রমেই সেলিম কুরলাই হয়ে উঠেছিল দাউদের অন্যতম লিংকম্যান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে। সেলিম কুরলা কীভাবে

জড়িত ছিল বিস্ফোরণে? উসমান খান, সঈদ ইশাক, শেখ ইব্রাহিম আর মহম্মদ হানিফ। এই চার যুবককে চিহ্নিত করে পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল এই সেলিম। ট্রেনিংয়ের জন্য। অস্ত্র আর আরডিএক্স হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্ব ছিল। ইসলামাবাদের কাছে এক জঙ্গলে চারদিনের ট্রেনিং হয়। এবং তারা ফিরে আসে বম্বে। ঘটনাচক্রে ১২ মার্চ ১৯৯৩ সালে বম্বের বিস্ফোরণের ঠিক চারদিন আগেই স্বয়ং সেলিম কুরলা আর যাকে পাঠানো হয়েছিল পাকিস্তানে তার সঙ্গী, সেই সঈদ ইশাক গ্রেপ্তার হয়ে গেল। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেপ্তার করেছে তাদের এক গুজরাটি ব্যবসায়ীকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগে। সুতরাং বম্বেতে যখন একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে তখন আইএসআই এর অন্যতম হ্যান্ডলার সেলিম কুরলা ক্রাইম ব্রাঞ্চের লক আপে। সুতরাং তাকে জেরা করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। জানাও হয়ে গেল যে কীভাবে পাকিস্তান থেকে গোটা প্ল্যান করা হল। সেইমতো নতুন কেসেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু তারপরই খবর এল সেলিম পালিয়েছে। তাকে ধরার জন্য ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। কিন্তু সেলিমকে আর ধরা গেল না। সেলিম উধাও।

ইনস্পেক্টর রামন ত্যাগী তাঁর সিনিয়রদের জানালেন এই বিশেষ ইনপুটের কথা। সকলেই শুনে প্রাথমিকভাবে উত্তেজিত। কিন্তু আসল প্রশ্নটাই সবথেকে মূল্যবান। সেটা হল সত্যিই কি এই খবর সঠিক? কারণ সরকারি তদন্তকারী সংস্থার একটা প্রক্রিয়া আছে। সরকারের উচ্চতম মহলে জানাতে হবে। একটা গোটা টিম এতবড় একটা অপারেশনে হায়দরাবাদে যাবে। এবং তার গিয়ে যদি দেখা যায় ইনফরমেশন ভুল? তাহলে চরম হেনস্তা। এই অবস্থায় কী করা উচিত? স্থির হল দিল্লি থেকে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ডিআইজি নীরজকুমার যাবেন। আর মুম্বই থেকে যাবেন ইনস্পেক্টর রামন ত্যাগী আর ওই শাখার এসপি সতীশ ঝা। তবে সতীশ ঝা চাইছেন আর একজন অফিসারকে নিতে। ইনস্পেক্টর ডি কে পরদেশি। এই পরদেশি যে কোনো আচমকা রেইড আর ট্র্যাকিং এ সাংঘাতিক অ্যাক্টিভ এক পুলিশ অফিসার। এই অবস্থায় টিম তৈরি হল। দিল্লির ডিআইজি জানিয়ে দিলেন যত দ্রুত সম্ভব রওনা হও। ফ্লাইটে । আমি আসছি। বিকেলের মধ্যে গোটা টিম হায়দরাবাদে হাজির। অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ অফিসার্স মেসটি হল বানজারা হিলসে। মাসাব ট্যাংকের

কাছে। বানজারা হিলস হায়দরাবাদের সবথেকে পশ এলাকা। চিরঞ্জীবী থেকে নাগার্জুনা। চন্দ্রবাবু নাইডু থেকে চন্দ্রশেখর রাও। প্রথম সারির সমস্ত সেলেব্রিটি থাকেন এই বানজারা হিলসে। রামন ত্যাগী আর ডি কে পরদেশি কিন্তু মুম্বই থেকে এসে সেই পুলিশ মেসে উঠলেন না। তাঁরা সোজা এয়ারপোর্ট থেকে চলে গেলেন সেই ল্যান্ডলাইন ফোন নম্বরের ঠিকানায়। যে ঠিকানার বাসিন্দার নাম কে আর ত্যাগী। ইনস্পেক্টর রামন ত্যাগীর ইনফর্মার সেলিম কুরলার যে ফোন নম্বর দিয়েছিল তার ঠিকানায় একবার নিজেই রামন ত্যাগী পরদেশিকে নিয়ে ঘুরে এলেন। তবে দূর থেকে। বেশি কাছে গেলে অচেনা মানুষকে দেখে সন্দেহ হতেই পারে। আর সামান্য সন্দেহ হলেই কুরলা পালাবে। যদি সে সত্যিই থাকে। সামনে থেকে ঘুরে এসে এবার হায়দরাবাদের এসিপি অফিসে এলেন রামন ত্যাগী এবং ডি কে পরদেশি। সেখানে আগে থেকেই বসে আছেন জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ কে ভি রামাড়ু। তাঁর সামনেই একটা ফোন রাখা। রামন ত্যাগী বললেন স্যার, একটা লোকাল ফোন নম্বর লাগবে। ফোন আসার কথা আছে। (তখন মোবাইল ফোন ছিল না)। সেই সামনে রাখা ফোন নম্বরটি দেওয়া হল। অন্যদিকে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ডিআইজি নীরজকুমার ততক্ষণে এয়ারপোর্টে নেমে সর্বাগ্রে পৌঁছেছেন সেকেন্দ্রাবাদের এসিপি অফিসে। এসেছেন সতীশ ঝা। আগে থেকেই বলা আছে। এখানেই এসে রিপোর্ট করবেন রামন ত্যাগী ও ডি কে পরদেশি। তাঁরা এলেই ঠিক কখন রেইড করা হবে সেটা ফাইনাল হবে। একদম সময় নষ্ট করা যাবে না। সবথেকে ভালো হয় এখন যদি সেলিম তার ওই গোপন আস্তানায় থাকে, তাহলে দেরি করা যাবে না। এখনই রেইড করতে হবে। নাহলে যদি পাখি উড়ে যায় আবার! এর আগেও একবার সেলিম পালিয়েছে। সুতরাং আবার সেই সিবিআইয়ের হেফাজত থেকেই যদি সেলিম পালায় তাহলে চরম লজ্জা। এখনও আসছে না কেন রামন ত্যাগীরা? আরও ২৫ মিনিট কেটে গেল। ওই যে আসছে রামন ত্যাগী আর ডি কে পরদেশি। ত্যাগীর মুখচোখ কেমন যেন শুকনো। বেচারা। কাল রাত থেকে ওর এক বিন্দুও বিশ্রাম নেই। লাগাতার ডিউটি। আর এই গোটা অপারেশনের ইনপুট দিয়েছে ত্যাগীরই ইনফর্মার। তাই ওঁর দায়িত্ব বেশি। ত্যাগী এসে দাঁড়িয়েছেন। সেকেন্দ্রাবাদের লোকাল পুলিশকে ইতিমধ্যেই রেডি থাকতে বলা হয়েছে। হায়দরাবাদ সিবিআই ব্রাঞ্চের দুই

অফিসারও হাজির। সব প্ল্যান রেডি। ত্যাগী কথা বলছেন না। কী ব্যাপার? কেয়া হুয়া পরদেশি? নীরজকুমার জানতে চান। কিন্তু পরদেশি নীরব। ইশারা করছেন ত্যাগীর দিকে। কী ব্যাপার ত্যাগী? টেল আস দ্য স্ট্যাটাস! এভাবে চুপ করে আছো কেন? ত্যাগী এবার কথা বললেন। মৃদু স্বরে। স্যার! সেলিম নেই। আজ সকালেই পালিয়েছে! ঘরে নেমে এল এক স্তব্ধতা!

সবটাই দাউদ ইব্রাহিমের সিদ্ধান্ত বদলের কাহিনি। সেই প্রথমবার লক আপ থেকে পালানোর পর থেকেই সেলিম কুরলা কোনো জায়গায় কিছুদিনের বেশি থাকতে পারছিল না। সর্বোপরি মুম্বই থেকে পালাতে হয়েছে। তাহলে তার রোজগার কীভাবে হবে? নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন-কাজ কে দেবে? তাই স্ত্রী, পরিবার নিয়ে সেলিম কুরলার বেঁচে থাকাই হয়ে দাঁড়াল এক সংকট। স্বাভাকিভাবেই যার জন্য এই জীবনকে সে বেছে নিয়েছে এবং যার নির্দেশে তার ওই অবস্থা তার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি কী। অতএব দাউদ ইব্রাহিমই হয়ে দাঁড়াল তার একমাত্র সহায়। দাউদের দক্ষিণ হস্ত ছোটা শাকিল মাঝে মধ্যেই ভাইয়ের নির্দেশে হাওলা মারফত সেলিমকে টাকা পাঠায়। সেই টাকায় কোনোমতে চালাচ্ছে। কিন্তু বুড়ো অথবা পঙ্গু ঘোড়াকে মালিক কতদিন টানে? একথা দাউদকে একদিন বলল আনিস ইব্রাহিম। দাউদের ছোট ভাই। সে বলল, ভাই, সেলিম আব কুছ কাম নেহি কর রাহা। আমরা অযথা ওকে টানছি কেন? দাউদ জানতে চাইল কী করা উচিত তাহলে? আনিস একটা প্ল্যান দিল। সহজ প্ল্যান। পুলিশে অ্যারেস্ট করিয়ে দাও। দাউদের মনে ধরেছে কথাটা। কিন্তু কীভাবে? এই পথও সহজ। মুম্বইয়ে থাকা দলের এক সদস্যকে দিয়ে পুলিশে ফোন করানো হবে। সে পুলিশকে বলবে সেলিম কোথায় আছে। সেই সোর্স মারফৎ খবর পেয়ে পুলিশ বা সিবিআই নির্ঘাৎ রেইড করবে। আর সেলিম কুরলা ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়লে তারপর আর তাকে বা তার পরিবারকে আর্থিকভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। সোজা কথায় যতক্ষণ তুমি কার্যকরী আছো তোমাকে সবরকম সুযোগ সুবিধা টাকা পাওয়ার সব দেওয়া হবে। একবার তুমি অকেজো হয়ে গেলে মানেই আর তোমাকে দরকার নেই। এটাই মাফিয়া জগতের নিষ্ঠুর ও অতিবাস্তব নিয়ম। সুতরাং সেলিমকে যাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করে সেই ব্যবস্থা মতোই যে দাউদ তাকে হায়দরাবাদে

থাকার গোপন আস্তানার ভাড়া মেটাচ্ছিল, সেই নিজের এক গ্যাংস্টারকে নিয়ে পুলিশকে ফোন করিয়ে দিল। সেই ফোনটাই এসেছিল বম্বেতে সিবিআই ব্রাঞ্চে সেই রামন ত্যাগীর কাছে রাত ৯ টার পর। তার মানে কী দাঁড়াল? তার মানে হল ইনস্পেক্টর রামন ত্যাগী ভেবেছিলেন তাঁর সোর্স তিনি গোপনে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন দাউদের গ্রুপে। গোপন যাবতীয় খবর যে তিনি পেয়ে যাচ্ছেন দাউদেরই এক গ্যাং মেম্বারের থেকে তা দাউদ কল্পনাই করতে পারছে না। আসলে তিনি ভুল ছিলেন। সবটাই দাউদ জানে। আর জেনেশুনেই সেই গ্যাং মেম্বারকে দাউদ নিজে পুলিশের সোর্স হিসাবেই কাজ করে যেতে গোপনে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। সেইমতোই সেই লোকটি রামন ত্যাগীকে সেদিন ফোন করে বলেছিল সেলিম কুরলা হায়দরাবাদে একটি ফ্ল্যাটে লুকিয়ে আছে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেলিম কুরলা আর তার পরিবারকে আর টাকা দিতে চাইছে না দাউদ। তাই কৌশলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। যাতে পুলিশ মনে করে তারা নিখুঁত ইনফরমেশন পেয়েছে। আর কুরলারও কোনো সন্দেহ না হয় যে খোদ দাউদ ভাই এভাবে তাকে ধরিয়ে দিল। কারণ একবার এই গোপন কৌশল প্রকাশ হয়ে পড়লে দাউদের গ্যাং মেম্বারদের মধ্যেও একটা চোরা আশঙ্কার স্রোত ছড়িয়ে পড়বে। সকলেই যে কোনো অপারেশন অথবা মিশনে নামার আগে ভাববে আমি নিছক যন্ত্র। একবার যন্ত্রটি অচল হয়ে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। সুতরাং সদস্যদের থেকে যে সম্ভ্রম, সমীহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি পাওয়া যায় সেটা আর থাকবে না। বেঁচে থাকবে কেবলমাত্র ভয়। রাজনৈতিক নেতা আর মাফিয়া ডনদের মধ্যে একটা জিনিসে মিল আছে। সেটি হল তাদের অনুগতরা যেন শুধু ভয় না পায়, ভক্তিও করে। সেটা দেখতে হয়। অর্জন করতে হয়। না হলে দল ধরে রাখা যায় না। এখানেই প্রশ্নটি উদিত হচ্ছে। তাহলে কেন সেলিম কুরলা পালিয়ে গেল? সব প্ল্যানই তো নিখুঁতভাবে এগোচ্ছিল। আনিস ইব্রাহিমের ফোন। সেই সোর্স পুলিশকে যথারীতি জানাল কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সেলিমকে। সেইমতো পুলিশ ও সিবিআই টিম হাজির হায়দরাবাদে। যেখানে সে গোপন জীবন যাপন করছে তার সন্ধানও পাওয়া গেল। পুলিশ খুব কাছে। অথচ আসল লোকটাই শেষ মুহূর্তে উধাও? কেন? এই কেনর উত্তর আরও বিস্ময়কর। শেষ মুহূর্তে নাকি দাউদ ইব্রাহিমের মন বদল হয়েছে। সে ভাইকে বলেছে,

সেলিম আমাদের জন্য আগে অনেক সার্ভিস দিয়েছে। ওকে এভাবে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আনিস কোনো কথা বলেনি। সে জানতে চাইল কবে আসছে পুলিশ? উত্তর পাওয়া গেল, আগামীকাল। তাই সেদিনই রাতেই আনিসের ফোন গিয়েছিল সেলিম কুরলার কাছে। ফোনে বলা হয়েছিল একটিই বাক্য। 'সাব আ রহে হ্যায়...নিকাল লো..।' সেলিম পালিয়েছে সেকথা শুনেই। 'সাব' অর্থাৎ পুলিশ। অপরাধ জগতের কোড নেম। কিন্তু এসব খবর কোথা থেকে জানা গেল? ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে? না। রামন ত্যাগী বললেন, হায়দরাবাদের যে নম্বরটি তাঁর সোর্সকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ফোন করে সেই ইনফর্মারই গোটা ব্যাপারটা জানিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সে দাউদের কথামতো কাজটা করেছে। আবার দাউদ যে এভাবে নিজেই সরাসরি সেলিমকে সতর্ক করে পালিয়ে যেতে বলবে সেটা সে জানতেই পারেনি। জেনেছে আজ বিকালে। এখন উপায়?

গোটা ঘরে সকলে চুপ। কেউ কোনো কথা বলছে না। এবার? মুখ দেখাবেন কি করে এতগুলো অফিসার? মিডিয়া জানবেই। সরকারকে জানাতে হবে। হোম মিনিস্টার নির্ঘাত লিখিত কৈফিয়ত চাইবেন। শোকজও হতে পারে। অতএব ভগ্নমনোরথ গোটা টিম আবার ফেরার পথে। একটি টিম যাবে দিল্লি। আর একটি টিম যাবে মুম্বই। কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে? হঠাৎ সিবিআই এসপি সতীশ ঝা গাড়ি থামাতে বললেন। এখন গাড়ি থামানো কেন? ফ্লাইটের টিকিট কাটা হয়নি এখনও। এয়ারপোর্টে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে। আদৌ পাওয়া যাবে কিনা জানা নেই। তাই বাকিরা বিরক্ত। তবে ডিআইজি নীরজকুমারের সবুজ সংকেত ছাড়া এটা সম্ভব নয়। পিছনের গাড়িও থেমে গেল। সকলে মাঝরাস্তায় নেমে পড়লেন। সতীশ ঝা বললেন, আমরা নিজেরা একবার ওই ফ্ল্যাটে কেন যাচ্ছি না? শুধুই ইনফর্মারের কথা শুনে হায়দরাবাদে এত বড় একটা টিম এসেও ফিরে যাবে? একবার যাওয়া যাক। তাই ঠিক হল। যে ফ্ল্যাট দূর থেকে দেখে আসা হয়েছিল। সেখানে দুটি গাড়ি ঢুকল। অনেক দূরে রাখা হল গাড়ি। এই সেই বাড়ি। যেখানে এতদিন ধরে লুকিয়ে আছে সেলিম। একটু আগে খবরটা পেলে...! আফশোস করছেন সিবিআই অফিসাররা। এগোচ্ছেন তাঁরা। গ্রাউন্ড ফ্লোরের দরজা হাট করে খোলা। প্রচণ্ড জোরে হিন্দি

সিনেমার গান ভেসে আসছে শুধু। একটা খোলা হলঘরে একটা স্টিরিও সিস্টেম। আর কিছু নেই। কেউ আছে? চিৎকার করলেন সতীশ ঝা। একটা বছরে দশেকের বাচ্চা বেরিয়ে এল। এবং তার পিছনে এক দম্পতি। তাদের পরিচয় কি? ইনিই কে আর ত্যাগী। ফ্ল্যাটের মালিক। আর তাঁর নামেই সেই ল্যান্ডলাইন ফোন। সিবিআইয়ের পরিচয় পেয়ে স্বাভাবিকভাবে তাঁরা ভীত। কী ব্যাপার? ফোন নম্বরটি বলে জানতে চাওয়া হল এই নম্বরটি আপনার? হ্যাঁ। আর কেউ এই নম্বর থেকে ফোন করে?

হ্যাঁ। আমাদের ভাড়াটে। আহমেদ।

আহমেদ? একটি ছবি দেখানো হল। এটাই কি আহমেদ?

হ্যাঁ। এটাই তো আহমেদ! কী ব্যাপার?

এই লোকটার নাম আহমেদ নয়। এ হল সেলিম কুরলা। মাফিয়া।

দম্পতি আতঙ্কে কাঁপছেন। তাঁরা জানালেন বিশ্বাস করুন। আমরা কিছুই জানি না। আমাদের এক চেনা লোক এই ভাড়াটেকে বসিয়েছে। আজ সকালেই তো আহমেদ তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে একটা ফিয়াটে চেপে চলে গিয়েছে। আমাদের কিছু বলেনি কোথায়। মাঝেমধ্যেই ওরা বাইরে চলে যায়।

চলুন তো দোতলায় ।

যাওয়া হল। দেখা গেল একটা বিরাট তালা ঝোলানো। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সিবিআই অফিসাররা। নীচে নেমে আসার পর সকলে এগোচ্ছেন নিজেদের গাড়ির দিকে। হঠাৎ সেই দম্পতির বাচ্চা ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল, এই তো, এটাও আংকলের গাড়ি। এই বলে হাত দেখালো সিঁড়ির নীচে। সেখানে দেখা গেল একটা স্কুটার। ডি কে পরদেশি বললেন, এটা আংকল চালায়? বাচ্চাটি বলল, হ্যাঁ। আংকল সবসময় এই স্কুটার চালায়। একটা স্কুটার আর একটা গাড়ি। সব শেষ। আবার খোঁজা শুরু হবে। নিয়মমাফিক যে গাড়িতে চেপে সেলিম পালিয়েছে সেটার রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়ে হায়দরাবাদ পুলিশকে বলা হল

ট্র্যাক করতে। এবার ফিরছে গোটা টিম। তবে কাল সকালের আগে আর ফ্লাইট পাওয়া যাবে না। সুতরাং আজ রাত কাটাতে হবে এখানে।

হঠাৎ কী মনে হল ইনস্পেক্টর ডি কে পরদেশি বললেন, স্যার একটা কাজ করি। আমরা দুজন এই ফ্ল্যাটের কাছেই গাড়িতে রয়ে যাই। যদি আবার সেলিম আসে। বাকিরা প্রশ্নবোধক চোখে তাকালেন। আবার আসবে? কেন আসবে? একবার পালিয়েছে যে সে আবার আসবে কেন? স্যার, যদি এই স্কুটার নিতে আসে? আশ্চর্য! এরকম ভুল কেউ করবে? সামান্য স্কুটারের জন্য সেলিম এত বড় রিস্ক নেবে? এটা আবার কী কথা? কিন্তু তাও কেউই উড়িয়ে দিল না কথাটা। কারণ পরদেশি বললেন, দাউদের পাঠানো টাকার উপর ভরসা করে যার দিন নেই সে একটা আস্ত স্কুটার ফেলে চলে যাবে? আগের সেলিম হলে তবু কথা ছিল। আজ যখন আর ফেরাই হচ্ছে না, তখন এটাও না হয় করে দেখা যাক। ভাবলেন বাকিরা। সেইমতো রামন ত্যাগী আর ডি কে পরদেশি রয়ে গেলেন। দূরে। অ্যামবাসাডর গাড়িতে। রাত বাড়ছে। কেউ নেই। গোটা এলাকা শুনশান হয়ে গেল। আলো নিভে গেল প্রায় সব বাড়ির। নিঝুম আঁধারে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে একটা সাদা অ্যামবাসাডর। কাঁচও তোলা । যাতে মনে হয় কেউ পার্ক করে চলে গিয়েছে। কেউ ভিতরে নেই। আসলে ভিতরে রয়েছেন রামন ত্যাগী আর ডি কে পরদেশি। কেউ এল না। রাত আড়াইটে। একটু ঝিমুনি এসেছে। দুজনেরই। সামান্য একটা শব্দ। অনতিদূরে। একটা অটো এসে দাঁড়াল। হেডলাইট জ্বলছে অটোর। তাই কেউ নড়লেন না ত্যাগী ও পরদেশি। কয়েক মিনিট কাটছে। হেডলাইট নিভল। স্টার্ট বন্ধ হয়েছে। একটা লম্বা লোক বেরিয়ে এল অটো থেকে। এগোচ্ছে সে ওই ফ্ল্যাটের দিকে। হাতে চাবি। সিঁড়ির দিকে। না সে উপরে গেল না। সিঁড়ির নীচে দাঁড়াল। স্কুটারের কাছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে স্কুটার হাত দিয়ে বের করে আনছে। অটোচালককে হাত দিয়ে ইশারা করল। অটোচালক স্টার্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে। এবার হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে অনেকটা দুর স্কুটার আনছে সেই লোকটি। অবশেষে চাবি ঢুকিয়ে বসে পড়ল সিটে। এবং স্টার্ট দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পিঠে টোকা। চকিতে মুখ ফিরিয়ে লোকটি দেখতে পেল দুদিকে দুটি মানুষ দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে রজার্স কোম্পানির

একটি পিস্তল। মুখ শুকিয়ে গেল লোকটির। তার নাম সেলিম কুরলা। রামন ত্যাগী বললেন, গাড়িতে ওঠো সেলিম!

পরদিন সকালে হায়দরাবাদ আদালতে প্রোডিউস করা হল সেলিমকে। ট্র্যানজিট রিমান্ডে নিতে হবে। যাতে বম্বে বিস্ফোরণের স্পেশাল কোর্টে তাকে পেশ করা হয়। কারণ ওই কেসেরই সে মূল অভিযুক্ত। এবং ফেরার। দ্রুত সব হয়ে গেল। বিকেল সাড়ে চারটের ফ্লাইট। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। বিমানে রামন ত্যাগী আর ডি কে পরদেশির ঠিক মাঝখানে বসেছে সেলিম কুরলা। আর ফ্লাইট টেক অফের ২০ মিনিট আগে গোটা ফ্লাইট জুড়ে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল। কারণ এক পরিচিত খ্যাতনামা চিত্রতারকা উঠেছেন। সকলে তাকাচ্ছেন তাঁর দিকে। বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক হিরো। তিনি গম্ভীর। কোনোদিকেই তাকাচ্ছেন না। এগিয়ে চলেছেন। একটা সিটের পাশ থেকে যাওয়ার সময় শুধু মাঝখানের আসনে বসা সেলিম কুরলার চোখে চোখ পড়তেই সেই নায়ক হাত তুলে সামান্য হাসলেন। সেলিম কুরলাও পালটা হাসল। তার দুদিকে যে সিবিআই অফিসার বসে আছেন সেকথা ওই চিত্রতারকা বোঝেননি। ওই একটি দৃশ্যেই বোঝা গেল সেলিম কুরলা তথা দাউদ কোম্পানির সঙ্গে বম্বের ফিল্মস্টারদের কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সিবিআই অফিসাররা সবটা দেখেও কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

বিশেষ আদালতে পেশ হওয়ার পর ২ বছর কেটে গেল। এই ২ বছর জেল হেফাজতে থাকার পরও বিচার সমাপ্ত হয়নি। কিন্তু প্রচণ্ড অসুস্থ সেলিম কুরলাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হল। কারণ তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। হাইপারটেনশন আর ডায়াবেটিস। জেল থেকে সোজা হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছে সে। মাঝেমধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। আবার ভর্তি হয়। এভাবেই কাটছে। আদালতেও হাজিরা দিতে হয়। কিন্তু শরীর ভাঙছে।

১৯৯৮। ২১ এপ্রিল। আন্ধেরি ওয়েস্টের ভিরার দেশাই রোড। বেলভিউ নার্সিং হোম। ওয়ার্ড নম্বর ওয়ানে ভর্তি সেলিম কুরলা। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুমিয়েছে সে। তবে এখন ঘুম ভেঙেছে। একটা ঘোর ঘোর আছে। তার বেডের পাশে ড্রাইভার আরিফ কেবলওয়ালা

বসে। সে রোজই আসে। হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দ। ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ করে সিঁড়ি ভেঙে কারা যেন ছুটছে। কী হল? আরিফ একবার বাইরে উঁকি মারতে গেল। আবার ফিরে এল। শুয়ে আছে সেলিম। সেও উৎসুক। কীসের শব্দ? একটু পর রিজওয়ানা আসবে। স্ত্রী। বাড়ির খাবার নিয়ে। ১২ টা নাগাদ। তাই স্নান করে নিতে হবে। উঠছে সেলিম। আচমকা একদল যুবক সেই ঘরে। বাইরে দুজন। ভেতরে ৯ জন। সবার হাতেই রিভলবার। একজনের হাত ফাঁকা। সে ছেলেটি হাত বাড়িয়ে সেলিমকে দেখাল। তৎক্ষণাৎ গুলিবৃষ্টি। মোট ১২ টি বুলেট লাগল সেলিমের বুকে পেটে মুখে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ঘরে থাকা ড্রাইভার আরিফের গায়ে লেগেছে চারটি বুলেট। সেও মারা গেল। যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল সেই যুবকের দল, সেভাবেই উধাও। গোটা হাসপাতালে হইচইয়ের বদলে শ্মশানের নীরবতা। ভয়ে আতঙ্কে সকলে লুকিয়েছে যে যেখানে পেরেছে। কে এর পিছনে? জানা গেল কয়েকদিন পর। ছোটা রাজন। কারণ? কারণ হল সে ঘোষণা করেছে বম্বে বিস্ফোরণের সঙ্গে যারাই যুক্ত আর জেলের বাইরে সেই সব দাউদ মেম্বারদের একে একে সে নাকি হত্যা করবে। আজ নম্বর ছিল সেলিম কুরলার। সত্যিই শুরু হল হত্যালীলা। একে একে এভাবেই দিনে দুপুরে রাজন টিমের হাতে খতম হয়ে যেতে লাগল দাউদ গ্যাংয়ের রফিক মাদি, মহম্মদ জিনদ্রাম, মহম্মদ শাকিল, আকবর আবু সামা খান, মাজিদ খান....। এভাবে একের পর এক গ্যাং মেম্বারকে মেরে ফেলছে রাজন। আমরা কিছু করব না? করাচিতে বসে রাগে ফুঁসছে ছোটা শাকিল আর আনিস ইব্রাহিম। বদলা চাই।

দাউদ ইব্রাহিম গ্রিন সিগন্যাল দিল। ঠিক ৮ মাসের মধ্যেই ছোটা শাকিল ফোন করল এক দুর্ধর্ষ হিটম্যানকে। দুবাইয়ের। তার নাম মালাবারি। টার্গেট কে? শাকিল বলল রাজন! মালাবারিকে বলা হল আরও পাঁচজন শুটার চাই। পাওয়া গেল। মুন্না, ভুল্লার, ঝিংগাদা। পাকিস্তানের। ব্যাংককে সুখমভেট এলাকা। একটি হোটেল নেওয়া হল। ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে। ২০০০ এপ্রিল। সেই হোটেলে বসে প্ল্যান চলছে কীভাবে হবে অপারেশন ছোটা রাজন। তাকে জ্যান্ত ধরতে বলেছে দাউদ। একবার...অন্তত একবার মুখোমুখি বসতে চায় দাউদ রাজনের সঙ্গে। তারপর কী হল? সেটা আমরা আগেই শুনেছি। দাউদ পারেনি রাজনকে ধরতে। রাজনও সাসপেন্স থ্রিলারের মতোই পালিয়েছিল হাসপাতাল থেকে।

রাজনকে অ্যাটাকের সেই নাটকীয় কাহিনি তো এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী এক এপিসোডেই বলা হয়ে গিয়েছে..। সে কাহিনির শুরু হয়েছিল আসলে এই সেলিম হত্যা থেকে।

২৯

দুবার ডোরবেল বাজার পর মরিয়ম রশিদা নাইটগাউন পরে নিলেন। দরজার আইহোলে চোখ রেখে দেখলেন একটি বেশ লম্বা লোক দাঁড়িয়ে। গোঁফ আছে। মুখটা চ্যাপ্টা টাইপের। পুলিশের ইউনিফর্ম। মরিয়ম একটু ভাবলেন। বুঝলেন নিশ্চয়ই তাঁর অ্যাপ্লিকেশনের কোনো ফিডব্যাক আছে। দরজা খুলে ভিতরে আসার পর জানা গেল সামনের লোকটি ইনস্পেক্টর বিজয়ন। লোকটি জানতে চাইছে ম্যাডাম আপনি ওভারস্টেইং করছেন কেন? ভিসা শেষ হয়ে গিয়েছে। তাও আপনি এদেশে থাকছেন। এটা তো বেআইনি। কারণটা কী? মরিয়ম অবাক হলেন। কারণটা তিনি একাধিকবার ত্রিবান্দ্রম পুলিশ কমিশনারের অফিসে গিয়ে জানিয়েছেন। অ্যাপ্লাই করেছেন ভিসা এক্সটেনশনের। কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশন হচ্ছে না। দেরি হচ্ছে। তাই তাঁকে এই হোটেলে থাকতে হচ্ছে। এমনকী ব্যাঙ্গালোরে তাঁর মেয়ে পড়াশোনা করে। সেখানেও যেতে পারছেন না এই ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে আটকে যাওয়ায়। মরিয়ম ভেবেছিলেন তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতেই পুলিশ এসেছে ভেরিফিকেশনে। কিন্তু লোকটি এমনভাবে প্রশ্ন করছে যেন কিছুই জানে না। মরিয়ম বললেন, আমার ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট পরপর ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। গুজরাটে নাকি প্লেগ দেখা দিয়েছে। আর সেই কারণেই মালদ্বীপের রুট ক্লোজড। দুবার টিকিট ক্যান্সেল করেছি। এখন কনফার্মেশনও পাচ্ছি না যে কবে নাগাদ যেতে পারব। আমি তো এসবই আমার অ্যাপ্লিকেশনে বলেছি আপনাদের। এখনও পুলিশ ভেরিফিকেশন নাকি ক্লিয়ারড হয়নি। তাই ভিসা এক্সটেনশন হচ্ছে না। বিজয়ন হাসলেন। মরিয়ম প্রায় ৬ ফুটের কাছাকাছি। গায়ের রং ফরসা না হলেও বেশ উজ্জ্বলতা আছে। চোখে একটা নীল আভা। পুরো নাম মরিয়ম রশিদা। মালদ্বীপের বাসিন্দা। নাইটগাউন পরে অস্বস্তি হচ্ছে। লোকটি যে অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন করবে তা আন্দাজ ছিল না। তাহলে অন্তত ফর্মাল একটা পোশাক পরে নেওয়া যেত। মরিয়ম লেন, আপনি কিছু নেবেন? চা কফি? আমি একটু আসছি। দ্রুত ওয়াশ রুমে গিয়ে মরিয়ম একটা জিনস আর টপ পরে নিলেন। ফিরে এসে দেখলেন ইনস্পেক্টর বিজয়নের মুখ থেকে হাসিটা যাচ্ছে না। চাপা হাসি ঠোঁটের

কোণে। তিনি বললেন, আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি কোনো একটা সেগমেন্ট থেকে হ্যারাস করা হচ্ছে। আশা করছি আগামীকাল কমপ্লিট হয়ে যাবে। মরিয়ম বেশ খুশি। যাক! এবার নিশ্চিন্ত। একটা অনিশ্চয়তা তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, কফি? ইনস্পেক্টর হাসছেন। বলছেন, আপনার কাজটা আমি করে দিচ্ছি। বাট হোয়াট উইল বি দ্য রেসিপ্রোকেশন? ডিল কী হবে? মরিয়ম জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন।

বিজয়ন বললেন, মানে আপনি সম্পূর্ণ ইললিগ্যালি ইন্ডিয়ায় রয়ে যাচ্ছেন। কোনো এভিডেন্সও নেই আপনার কাছে। আপনি তো অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন। এই যে হেল্প করছি, তার কোনো দাম নেই? কিছু একটা তো.....। মরিয়ম রেগে গেলে সর্বাগ্রে তাঁর ঘাড় শক্ত হতে শুরু করে। সেটা হচ্ছে। কারণ আগাগোড়া লোকটা তাঁর গোটা শরীরে চোখ বোলাচ্ছে। আসার পর থেকেই। প্রথমে তিনি ব্যাপারটা গায়েই মাখেননি। কারণ পুলিশ অফিসার। তার উপর বিদেশ। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট ইঙ্গিত। মরিয়ম বললেন, আপনার হেল্প করার প্রয়োজন নেই স্যার। আমার পক্ষে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। আমি অন্য ব্যবস্থা করে নেব। প্লিজ..। ইনস্পেক্টর বিজয়ন চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। আর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, এই কেসটা আমাকে হ্যান্ডল করতে বলা হয়েছে। তাই অন্য কার কাছে বলবেন? কারও ক্ষমতাই নেই। আমার হেল্প ছাড়া ইউ উইল বি ইন আ ডিপ ট্রাবল ম্যাম। মরিয়ম ঠোঁট কামড়ে ভাবলেন দু সেকেন্ডে। উঠে দাঁড়ালেন। এবং বললেন, কিন্তু আপনি যে অ্যাপ্রোচ করছেন সেটা কোনো সিভিল গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট করতেই পারে না। এটা আপনার জানা উচিত। ইভন, আমি কমপ্লেন করতে পারি। অ্যান্ড আপনার জানা নেই আপনি আসার এক ঘণ্টা আগে আমি কার সঙ্গে কথা বলেছি। বিজয়ন থমকালেন। জানতে চাইলেন, কার সঙ্গে? মরিয়ম এবার একটু হাসছেন। বললেন, আপনার আইজির সঙ্গে। সো ডোন্ট ক্রস ইওর লিমিট। বিজয়ন উঠে দাঁড়ালেন। পিছনে ঘুরলেন। মরিয়ম ভাবলেন, এবার ভয় পেয়ে ইনস্পেক্টর চলে যাচ্ছেন। আসলে নয়। দরজাটা বন্ধ কিনা একবার দেখে নিয়ে বিজয়ন সোজা এগিয়ে আসছেন। মরিয়মের কাঁধে হাত রেখে বললেন, লুক ম্যাম..আপনি বুঝতে ভুল করছেন। ওসব আই জি ফাই জি দেখিয়ে কী হবে? এটা তো সহজ ডিল। আপনি একটা ট্রাবলে আছেন। আমি সেই ট্রাবল থেকে আপনাকে রক্ষা

করছি। আর এটা ডিল হিসাবে ভাবছেন কেন? জাস্ট ফ্রেন্ডলি ফান! বলে কাঁধে রাখা হাতটা শক্ত করলেন।

শান্ত ভঙ্গিতে কাঁধে রাখা হাতটা সরিয়ে দিলেন মরিয়ম। কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। বিজয়ন ভাবলেন পুওর লেডি! এভাবে বাঁচা যায় নাকি! নিশ্চয়ই মরিয়ম এবার পালানোর চেষ্টা করবে। তিনি রিল্যাক্সড। কিন্তু মরিয়ম সেরকম কিছুই করলেন না। তাঁর ডান পাটা সমকোণে আচমকা উঠে এল। সোজা বিজয়নের চিবুকে হিট করল। এতটাই আকস্মিক যে বিজয়নের গোটা মাথা ঝনঝন করে উঠল এবং তাঁর চোখে তীব্র বিস্ময়। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে যেতে বিজয়ন ফের এক ঝটকায় সোজা হলেন এবং ডানহাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে একটা প্রবল ঘুসি ছুড়লেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝলেন মেয়েটি শুধু যে ক্যারাটে জানে তাই নয়, বক্সিংও জানে। কারণ বিজয়নের ওই চোখের পলকের ঘুসিটা অবশ্যই ওর কানের ডানদিকে লাগার কথা। কিন্তু চোখের নিমেষে মরিয়ম একটা স্টেপ পিছিয়ে গিয়েছে। আর সামনে জায়গা তৈরি করে নিয়ে এবার মাথা নীচু করে এগিয়ে এসে একটা নিখুঁত বক্সিং জ্যাব! সেই ধাক্কা ইনস্পেক্টর সামলাতে পারলেন না। ফ্লোরে পড়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠেও পড়লেন। উঠেই একটা ধাক্কা মারার চেষ্টা। কিন্তু সেই সময় দেওয়া হল না। মরিয়ম অকল্পনীয় একটা কাজ করলেন। প্রথমেই দরজাটা খুলে দিলেন। আর পিছিয়ে এসেই বিজয়নের কোমরের নীচে একটা হাত দিয়ে অন্য হাতে হাঁটুর জয়েন্ট ধরলেন। আর তুলে ধরলেন বিজয়নকে শূন্যে। স্রেফ ছুড়ে ফেললেন দরজার বাইরে। বিজয়ন ওঠার চেষ্টা করছেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করছেন না এসব যে সত্যিই ঘটছে! এটা অবশ্যই কোনো দুঃস্বপ্ন।

তাঁর রাগ হওয়ার কথা। কিন্তু একটা প্রবল অপমানবোধ আর বিস্ময় স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ত্রিবান্দ্রম পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিকিউরিটি ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ইনস্পেক্টর বিজয়নকে যে কোনো মহিলা এভাবে দু হাতে তুলে ছুড়ে দিতে পারে এটা গোটা ডিপার্টমেন্ট বিশ্বাস করবে না। বিজয়নের দিকে তাকিয়ে এবার হাঁফাতে হাঁফাতে মরিয়ম বললেন, আই থিংক ইউ বেটার আন্ডারস্টুড! বিজয়ন ধীরেসুস্থে উঠলেন। ইউনিফর্ম কুঁচকে গিয়েছে। একটু

ধুলোও লেগেছে। সেসব ঠিক করলেন। আর সোজা মরিয়মের দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বললেন, ইউ উইল বি রুইনড! জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। আপনার ভিসা তো অনেক দূরের কথা। দেশে ফিরতে পারবেন তো? আপনার জানাই নেই কার সঙ্গে আর কোথায় শত্রুতা করলেন। সি ইউ ম্যাম! ভেরি সুন!

মরিয়ম তখনও হাঁফাচ্ছেন। শুধু বললেন, গেট লস্ট!

তিনদিন পর ত্রিবান্দ্রমের সমস্ত সংবাদপত্রে জানা গেল মরিয়ম রশিদা নামক এক মালদ্বীপের মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর রিক্রুট। তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছে একটা কালো রঙের ডায়েরি। যে ডায়েরিতে এমন কিছু তথ্য আর নাম পাওয়া যাচ্ছে যা বিস্ফোরক! ভারতের স্পেস রিসার্চ প্রোগ্রামের গোপন নথিপত্র সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে বিদেশের হাতে! কে করছে? কারা এর পিছনে? সত্যিই কি মরিয়ম স্পাই? মালদ্বীপের স্পাই একজন ভারতীয় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এরকম আগ্রাসী আচরণ করবেন কেন? সেই স্পাই তো বরং এমন কিছু ব্যবহার করবেন যাতে তাঁর উপর কেউ রাগ না করে। স্পাই তো সকলকে তুষ্ট করে চলে? তাহলে?

এটা একটি পরিত্যক্ত চার্চ। সেন্ট মেরি ম্যাগডালেন। ত্রিবান্দ্রমের অনতিদূরে। জায়গার নাম থুম্বা। একদিকে রেললাইন। একদিকে সমুদ্র উপকূল। দরকার প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা কোনো প্লট। একসঙ্গে। পাওয়া গেল। তবে চার্চের জমির পাশাপাশি বাকি জমির সিংহভাগই স্থানীয় মৎস্যজীবীদের। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। ষাটের দশকের শুরু। বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই ভাবছেন জায়গাটা আইডিয়াল। কারণ আর্থ ইকুয়েটর আছে কাছেই। এরকম স্থানেই তো একটা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র করে তোলা উচিত। বিক্রম সারাভাই দেখা করলেন বিশপের সঙ্গে। রেভারেন্ড পিটার বার্নার্ড পেরেইরা। তাঁকে অনুরোধ করা হল, আমাদের জন্য আপনাদের এই জমিটা চাই। এখানে একটা স্পেস রিসার্চ সেন্টার হবে। বিশপ রাজি নন। তিনি বললেন, আপনাদের দেব কেন? এটা কত পুরোনো একটা চার্চ আপনাদের কোনো আইডিয়া আছে? বিক্রম সারাভাই শুরুতেই ধাক্কা খেলেন। এতদূর এসে শেষ পর্যন্ত কি তীরে এসে তরী ডুববে? জমিটা পাওয়া না গেলে আবার খুঁজতে হবে।

কিন্তু এরকম আদর্শ স্থান আর কোথায় পাব? বিশপ এবার বিক্রম সারাভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। বললেন, ওই যে বললেন, আপনাদের জন্য দিতে হবে। তাই ঠাট্টা করলাম। এই জমি আমরা ভারতের জন্য দেব সানন্দে। ভারতের জন্য মানে শুধু আপনারা নয়, গোটা দেশবাসীর জন্য। কারণ আপনারা যে কাজটা করছেন, করবেন তা গোটা দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল করবে। শুনে হেসে ফেললেন বিক্রম সারাভাই। তাঁর বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। তবে একটা শর্ত আছে। বললেন, রেভারেন্ড। তিনি বললেন, একটা চার্চ তো আমাদের সম্পত্তি নয়। সকলের। তাই সকলের মতামত নেওয়া দরকার। আপনারা বরং সানডে মাসে আসুন।

রবিবারের ওই প্রার্থনাসভায় আমরা সিদ্ধান্ত নেব সম্মিলিতভাবে। তাই হল। রবিবার গোটা স্পেস সায়েন্স টিম এলেন চার্চে। উপস্থিত খ্রিস্টান ভক্তদের বুঝিয়ে বললেন রেভারেন্ড পেরেইরা। সকলেই রাজি। এলাকার জেলেদের সঙ্গেও কথা বলা হল। তাঁদের বলা হল স্পেস সেন্টারে তাঁরা কাজ পাবেন। সুতরাং জমি দিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। সেই সেন্ট মেরি ম্যাগডেলান চার্চেই প্রথম গঠিত হল থুম্বা ইক্যুয়াটোরিয়াল রকেট লঞ্চ স্টেশন। পরবর্তীকালে তার নাম হয় বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার। পরবর্তী সময়ে অন্য জমিতে দুটি চার্চ তৈরি করে দেওয়া হয় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। চার্চের অভ্যন্তর ভারতের প্রথম স্পেস সেন্টারের অফিস। ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর। এই স্পেস স্টেশন থেকেই প্রথম রকেট লঞ্চিং হল। নাম নিক অ্যাপাচে। আমেরিকার নাসায় তৈরি। পাঠানো হয়েছিল মার্স অরবিটে। চার্চ বিল্ডিং থেকে লঞ্চ প্যাডে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই রকেট? ট্রাকে। আর প্রেয়ার রুম ছিল ল্যাবরেটরি। সারাদিন সারারাত মাঝেমধ্যেই ওই প্রেয়ার রুমের ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করতেন এক মনোযোগী তরুণ। বিশপস রুম ছিল সেই তরুণের ডিজাইন আর ড্রইং রুম। তাঁর নাম এ পি জে আবদুল কালাম। পরবর্তীকালে সবথেকে ছোট মডেলের স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল এখানে বসে নির্মাণ করেন কালাম। এসএলভি থ্রি। সেটি ছিল ১৭ টন। আর ৪০ কেজির রোহিণী স্যাটেলাইট স্থাপন করেছিল সাফল্যের সঙ্গে কক্ষপথে। সেটি কীভাবে আনা হয়েছিল লঞ্চ প্যাডে? সাইকেলে! সেটি ছিল ১৯৮০।

এ পর্যন্ত হল। কিন্তু এরপর? আরও এগোতে হবে তো? এবার লক্ষ্য পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি)। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও ১৪ বছর। ১৯৯৪ সালের ১৫ অক্টোবর। সেদিন কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছিল রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট। কিন্তু মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষ করে আমেরিকা আর রাশিয়া যেখানে পৌঁছে গিয়েছে সেখানে তখনও অনেক পথ চলা বাকি। একটি স্বপ্নই আপাতত সামনে রাখা হল। জিএসএলভি। জিওসিনক্রোনাস লঞ্চ ভেহিকল। যা আরও ভারী পে লোড বহন করতে সক্ষম আরও উচ্চতম কক্ষপথে। জিএসএলভির জন্য সর্বাগ্রে দরকার ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন। যা ভারতের কাছে নেই তখন। কিন্তু ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন ছাড়া কি এতবড় একটা গবেষণা বন্ধ হয়ে যাবে? বিদেশের উপরই নির্ভর করে ভারতের মহাকাশ গবেষণা চালাতে হবে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ? ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মনেপ্রাণে চাইছেন সরকার আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে একটা কিছু করুক। তাই হল। এগিয়ে এল ভারতের বন্ধু রাশিয়া। তারা জানাল ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তো দেবেই এবং তারই সঙ্গে প্রযুক্তি হস্তান্তরেও রাজি তারা। অর্থাৎ ক্রায়োজেনিক টেকনোলজি ট্র্যান্সফার। এই প্রযুক্তি পারবে হেভি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটকে স্থাপন করতে ৩৬ হাজার কিলোমিটার কক্ষপথে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতকে নির্ভর করতে হয় ইওরোপীয়ান স্পেস এজেন্সির উপর। ফ্রেঞ্চ গায়ানা লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করতে হয়। আর তার জন্য ইওরোপীয়ান স্পেস এজেন্সিকে দিতে হয় বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলার। ভারত যদি নিজেরাই ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি পেয়ে যায় তাহলে তো নিজেদের মতোই লঞ্চ প্যাড আর সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তির স্যাটেলাইট কমিউনিকশেন ব্যবস্থা অর্জন করে ফেলবে। বিপুল ক্ষতি মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিমের। এই কন্ট্রোল রেজিমের নেতৃত্বে বিগ ব্রাদার! আমেরিকা। সুতরাং যেই গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেল ভারত নিজস্ব টেকনোলজির দিকে এগোচ্ছে, তখনই সতর্ক হয়ে গেল মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম। যেভাবেই হোক ভারতকে এই প্রযুক্তি পাওয়া থেকে রুখতেই হবে। অপারেশন শুরু। প্রথমেই রাশিয়াকে কঠোর বার্তা দিল আমেরিকা। ওই রেজিমের পক্ষ থেকে রাশিয়াকে বলা হল, ভারতকে তোমরা ক্রায়োজেনিক দিতে পারবে

না। যদি দাও তাহলে তোমাদের মহাকাশ গবেষণায় নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার জন্য তৈরি হও। সোজা থ্রেট!

পৃথিবী থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় কক্ষপথে জিওস্টেশনারি অরবিটে প্রতি কেজি পে লোড স্থাপনের জন্য ইওরোপীয়ন স্পেস এজেন্সি মূল্য নির্ধারণ করেছে ২০ হাজার ডলার। প্রতি কেজিতে ২০ হাজার ডলার। বিপুল মুনাফা। আর ভারত যে প্রযুক্তি হাতে নিয়ে এগোতে পারে সেটা অনায়াসে এর থেকে অনেক সস্তায় হয়ে যাবে স্যাটেলাইট লঞ্চ। যা ভারতীয় দুর্ধর্ষ মেধার বিজ্ঞানীরা পারবে বলেই ধারণা আন্তর্জাতিক মহলের। সুতরাং মহাকাশকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইওরোপের বিপুল বাণিজ্য বিরাট ধাক্কা খাবে। কারণ একবার ভারত যদি ওই প্রযুক্তি অর্জন করে তাহলে অন্যান্য দেশও আগামীদিনে ভারতের দ্বারস্থ হবে সস্তায় মহাকাশ গবেষণার জন্য। কোনো দেশই রাজকোষের ঘটিবাটি বিক্রি করেও পশ্চিমী দেশগুলির শরণাপন্ন হবে না। সুতরাং ভারতকে আটকাও। ভারত তার অনেক আগেই রাশিয়ার সঙ্গে ২৩৫ কোটি টাকা দিয়ে একটি সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করেছে। রাশিয়াই দেবে প্রযুক্তি। কিন্তু আমেরিকা সেই একই প্রযুক্তির জন্য চাইছে ৯৫০ কোটি টাকা। আর ফ্রান্স দর দিয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। সেই অতিরিক্ত দামের প্রযুক্তি ভারত নেবে কেন? সুতরাং রাশিয়ার থেকেই নেওয়া হবে সব স্থির হয়ে গেল। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সরাসরি রাশিয়াকে হুমকি দিলেন। ভারতকে ওই প্রযুক্তি ট্র্যান্সফার করা হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষময় হয়ে যাবে। আর রাশিয়াকে তার ফল ভুগতে হবে। সবেমাত্র সমাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ার ফলাফল তখনও জানা নেই। রাশিয়ায় উদারীকরণের হাওয়া শুরু হয়েছে। আর ঠিক এই মুহূর্তে আমেরিকাকে চটানোর ক্ষমতাও নেই ওই নতুন রাশিয়ার। অতএব রাশিয়া পিছু হটল। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দমলেন না। তাঁরা সরকারকে বললেন, ঠিক আছে প্রযুক্তি চাই না। শুধুমাত্র ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন কেনা হোক। টেকনোলজি ট্র্যান্সফার করতে হবে না। তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো? রাশিয়া এতে রাজি। তারা চারটি ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন পাঠাল ভারতকে। সেগুলি পাঠানো হল রাশিয়ান উড়াল এভিয়েশনে। ঠিক দেড় বছরের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন মরিয়ম রাশিদা। কারণ তাঁর কালো ডায়েরিতে দেখা যাচ্ছে দুটি নাম।

নাম্বি নারায়ণ এবং শশী কুমারণ। যাঁরা দুজনেই ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের দুই মহাকাশ বিজ্ঞানী। তাঁরাই এই বিশেষ গবেষণার প্রধান হোতা। ভারতের নিজস্ব ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি। তাঁরা কাজ করেন তামিলনাড়ুর গবেষণাগারে। লিকুইড প্রোপালসন সিস্টেমস সেন্টারে। ক্রায়োজেনিক ফুয়েল প্রযুক্তি গবেষণার ভরকেন্দ্র। জানা গিয়েছিল তাঁরা দুজনে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি নির্মাণের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। যা জেনে ফেলেছিল আমেরিকান স্পাই এজেন্সি সিআইএ।

পুলিশ জেরার পর মিডিয়াকে জানাল, এই দুই বিজ্ঞানীকে অনেকবার ফোন করেছেন মরিয়ম রশিদা। জানা গেল তাঁর একজন সঙ্গীও আছে। নাম ফজিয়া হাসান। মালদ্বীপের বাসিন্দা এই দুই নারী আদতে হানি ট্র্যাপ। তাঁরা আসলে আইএসআই এর গুপ্তচর। ভারতের মহাকাশ গবেষণার গোপন তথ্য চুরি করতে এসেছে। আর টার্গেট করেছে দুই বিজ্ঞানীকে। নারায়ণ এবং শশী। তাঁরা দুজনেই সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন। অর্থাৎ ভারতের সবথেকে মূল্যবান মহাকাশ গবেষণা যাঁদের হাতে তাঁরাই দেশের সঙ্গে শত্রুতা করে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন যাবতীয় গোপন নথিপত্র! গোটা কেরলে আগুন জ্বলে গেল। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টারের কোনো কর্মী বিজ্ঞানীকে রিকশচালক নেবেন না। দোকানি মালপত্র বিক্রি করবেন না। সাধারণ মানুষ সাহায্য করবেন না। কারণ এঁরা সকলেই দেশদ্রোহী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিখ্যাত বিজ্ঞানী নাম্বি নারায়ণ আর তাঁর সহকর্মী সহকারী শশী কুমারণকে। স্তম্ভিত বিজ্ঞানীমহল। শশী আর নারায়ণ এরকম করবে? বিশ্বাস করা শক্ত! এবং গোটা চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত চারজন পুলিশ অফিসারও। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ওই মরিয়ম রশিদার। সুতরাং খোদ সরকারের পুলিশই এই কাজে যুক্ত? কেরলের মুখ্যমন্ত্রী করুণাকরণকে ইস্তফা দিতে হল। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম এ কে অ্যান্টনি। তিনি এসেই গোটা ঘটনার তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলেন। যাকে বলা হল এসআইটি। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। ইনচার্জের নাম শিবি ম্যাথিউ। রাজ্য পুলিশের ডিআইজি। গ্রেপ্তার নারায়ণ আর শশীকে জেরা করার জন্য দিল্লি থেকে এসেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।

শুরু থেকেই নাম্বি নারায়ণ আর শশী কুমারণ নির্বাক। স্তব্ধ। তাঁরা ভালো করে কথাও বলতে পারছেন না। তাঁদের একটাই কথা আমরা নির্দোষ। সব অপরাধীই এরকম বলে। তাই বোঝা গেল এভাবে এঁরা মুখ খুলবেন না। জেরার জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি রিট্রিটে নিয়ে যাওয়া হল। নাম্বি নারায়ণকে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে লেদারের তৈরি অদ্ভুত একটা চাবুক দিয়ে পিঠে মারা হচ্ছে। শপ..শপ...শপ...শব্দ। পিঠের জায়গাগুলো ফুটে যাচ্ছে নিমেষে। কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধছে না। শশী কুমারণকে সোজাসুজি রড দিয়ে পেটানো হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলেও কিছুতেই স্বীকার করছেন না আসল মাথা কারা? কী কী প্রযুক্তি তাঁরা সাপ্লাই করেছেন? তাঁদের মাঝেমধ্যেই একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে। যেটা বেশ বিস্ময়কর! বলা হচ্ছে আর এই রিসার্চের আউটকাম কে কে জানে? আর কাউকে বলেননি তো? জামিন পেলে ওই একই রিসার্চে আবার যাবেন? নাকি অন্য কোথাও ট্র্যান্সফার নিতে চাইবেন? এইসব প্রশ্নের মানে কি? কিন্তু দুই বিজ্ঞানী ওই অমানুষিক অত্যাচারে বারংবার জ্ঞান হারাচ্ছেন। তাই এসব সম্যকভাবে বোঝার অবস্থায় নেই।

মাসের পর মাস। বছরও ঘুরে যায়। মহাকাশ গবেষণা স্পাইং মামলার তদন্ত আর এগোচ্ছে না। এবার পালটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে জনমমে। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে যেখানে গ্রেপ্তার করা হল, এত অভিযোগের ফিরিস্তি দেওয়া হল, সেখানে কেন কোনো চার্জশিট নেই? কেন কোনো মামলার শুনানিতে সামান্য নতুন কোনো তথ্য দেওয়া যাচ্ছে না? অবশেষে প্রবল রাজনৈতিক চাপে মুখ্যমন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি বাধ্য হলেন তদন্ত সিবিআইকে দিতে। ঠিক এক বছরের মধ্যেই সিবিআই জানিয়ে দিল গোটা মামলায় কোনো মেরিট নেই। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই এস্ট্যাবলিশ করতে পারেনি কেরল পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। যে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের একজন নিছক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা করতে ইন্ডিয়াতে এসেছেন। সেটা মালদ্বীপে ভারতীয় দূতাবাস আর বিদেশমন্ত্রকের তথ্য থেকেই কনফার্ম করা যাচ্ছে। আর মরিয়ম রশিদার মেয়ে ব্যাঙ্গালোরের স্কুলে পড়ে। তিনি এর আগেও এসেছেন। বিজ্ঞানী নাম্বি নারায়ণ আর শশী কুমারণ মহিলাকে চেনেনই না। কালো ডায়েরির গল্পটাই সাজানো।

সুতরাং গ্রেপ্তার হওয়া সকলেই আদালত থেকে সিবিআই রিপোর্টের ভিত্তিতে মুক্তি পেলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী নাম্বি নারায়ণ আর শশী কুমারণকে পুরোনো পদে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। কার্যত তাঁদের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেল। তার থেকে বেশি ক্ষতি হয়ে গেল ভারতের মহাকাশ গবেষণার। বহুদূর পিছিয়ে গেল ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি নির্মাণের কাজ। স্রেফ একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে। পালটা মামলা করলেন নাম্বি নারায়ণ। আজও তাঁরা সুবিচার পাননি।

কেন? নিছক মরিয়ম রশিদা কেরল পুলিশের এক ইনস্পেক্টরকে হোটেলের রুম থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বলেই এত বড় একটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিস্ফোরক ঘটনার চক্রান্ত হতে পারে? না। হতে পারে না। গোটা ঘটনার পিছনে আমেরিকার সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির প্ল্যান। কারণ নাম্বি নারায়ণ আর শশী কুমারণকে এভাবে স্পাই সাজিয়ে বদনাম করে ভারতের ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি গবেষণা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার কৌশল। আর সেই কাজে আমেরিকার এই গুপ্তচর সংস্থাকে কে সাহায্য করেছেন? ভারতের কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা আইবির এক স্পেশাল ডিরেক্টর। আইবির মধ্যে সিআইএর চর!

ভারতের গুপ্তচর সংস্থা আইবির অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর রতন সেহগল একা বসে আছেন তাজ মান সিং হোটেলের কফি শপে। একটা আমেরিকানো ব্ল্যাক কফি অর্ডার করা হয়েছে। বারংবার রতন সেহগল দেখছেন সামনের কাচের জানালার বাইরেটা। সেটা প্রকৃতি দেখার জন্য নয়। দিল্লির প্রকৃতি অবশ্যই দেখার মতো। বিশেষ করে এরকম সব বড় হোটেলগুলি এমন লোকেশনে করা হয়েছে যে চারদিক. সবুজে সবুজে ছয়লাপ। প্রচুর পাখিও আসে। তাই এরকম এক মনোরম বিকেলে বেশ লাগছে দেখতে ধীরে ধীরে অস্ত যাওয়া সূর্যের দিল্লিকে। রতন সেহগল এসব কিছুই দেখছিলেন না। তিনি বারবার জানালার বাইরে তাকাচ্ছেন, কারণ একজন আসবে। সামনেই হোটেলের এন্ট্রি পয়েন্ট। গাড়িটা তিনি চেনেন। ওই যে আসছে। মেয়েটির নাম আগস্ট। হাতে দুটো প্যাকেট। সেহগলের আছে এসে বসলেন তিনি। সেহগল জানতে চাইছেন গস্ট কী খাবেন? আগস্ট হেসে বললেন,

আমি কাপুচিনো। সেহগলকে দুটো প্যাকেট দিলেন আগস্ট। এতক্ষণ বোঝা যায়নি। সেহগলের পাশেই টেবলের কাছের টবের আড়ালে একটা ব্রিফকেন রাখা আছে। সেটা থেকে একটা এনভেলাপ বের করলেন সেহগল। বেশ মোটা। সেটি ছিলেন আগস্টকে। খুব বেশি হলে ১০ মিনিট। তারপর দুজনেই উঠে পড়লেন। এবং দুটি আলাদা সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। খুব স্বাভাবিক একটি দৃশ্য। সন্দেহের অবকাশই নেই। তবে কিছু দূরে আর একটি চেয়ারে বসে থাকা এক কালো শার্ট পরা সারাক্ষণ ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দিয়ে মুখ ঢাকা ব্যক্তি গোটা ঘটনাটি যে নিছক পর্যবেক্ষণ করলেন তাই নয়। ওই ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে একটা ফুটো করা আছে। সেখান থেকেই একটি মাইক্রো মুভি ক্যামেরায় সেহগল আর আগস্টের গোটা ১০ মিনিটের পর্বটি তুলে রাখছিলেন এই লোকটি।

লোদি রোড। এই বাংলো আর আধুনিক ফ্ল্যাটগুলিতে সাধারণত থাকেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এমপি আর সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসাররা। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর রতন সেহগলের বাসভবন এখানে। প্রথমে একটা বড় রাস্তা। তারপর বাইলেন। বাংলোর সামনেটা লন আর বাগান। গেটের বাইরে বোগেনভিলিয়া। একটি সাদা কন্টেসা ক্লাসিক অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে। দুই মহিলা আর এক ব্যক্তি ভিতরে গিয়েছেন। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর তাঁরা বেরিয়ে এলেন। দুজন বিদেশি। একজনকে দেখে মনে হল ভারতীয়। অনেক রাত। প্রায় ১১টা। গাড়িতে ওঠার আগে তাঁরা তিনজনেই সন্দিগ্ধ চিত্তে এদিক ওদিক তাকালেন। অত রাতে ওই অভিজাত পাড়ায় আর কাউকে দেখার কথাও নয়। কেউ ছিল না। তাই নিশ্চিন্তে তিনজনই বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসলেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পর বোগেনভিলিয়ার পাশের ঝোপ থেকে একটি যুবক গায়ে মাথায় পাতা আর পোকা ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এলেন। আর নোট করলেন গাড়ির নম্বর। টাইম। হাঁটতে হাঁটতে পকেটে ঢোকালেন একটা ছোট ইলেকট্রনিক ডিভাইস।

দিল্লি গলফ ক্লাবে এক বিদেশির সঙ্গে একটা বিয়ার নিয়ে হাসতে হাসতে রতন সেহগল বলছিলেন, স্যার আমার সারাদিন খুব সহজ সরলভাবে কাটে। সকালে আমি গলফ খেলি। দুপুরে সন্ধ্যায় আমি জ্যাজ শুনি। আর মাঝখানে একটু স্কচ খাই। জীবনের কাছে

আমার ডিমান্ড খুব অল্প স্যার। সেই বিদেশি ভদ্রলোক হেসেছিলেন। একটু পর জানা গেল তাঁর সঙ্গে এক মহিলাও ছিলেন। একটু দূরে। যিনি একটু পর নিজের গাড়ির পরিবর্তে রতন সেহগলের গাড়িতে উঠে কোথাও একটা চলে যাবেন। ওই গাড়িতে ওঠার দৃশ্য তাঁদের অজান্তেই ভিডিওতে উঠে গেল।

১৯৯৭ সালের ৩০ নভেম্বর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর অরুণ ভগত ডেকে পাঠালেন তাঁর দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টরকে। রতন সেহগল। রতন সেহগল যে সে অফিসার নয়। তিনি কাউন্টার ইনটেলিজেন্স ইউনিটের ইনচার্জ। অরুণ ভগতের ঘরে ঢুকে সেহগল স্বাভাবিক স্বরে বললেন, কী ব্যাপার স্যার! এনিথিং সিরিয়াস?

অরুণ ভগত বললেন, বসুন! আপনাকে সিআইএ কত টাকা দেয়? সিআইএ, অর্থাৎ আমেরিকার গুপ্তচর এজেন্সি।

সেহগল থমকে গেলেন। মুখ থেকে বাক্য সরছে না। শুধু বললেন, স্যার..হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট?

অরুণ ভগত, ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, হাউ মাচ সেহগল সাব? কত দেয়? কীভাবে দেয়? ডলারে নাকি টাকায়?

সেহগল বললেন, আমি এসব কথা কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। আপনি কী বলছেন? আমি কিন্তু কমপ্লেন করব উপরে।

অরুণ ভগত জানালেন, কমপ্লেন অলরেডি করা আছে। পি এম (প্রাইম মিনিস্টার) জানেন। এইচ এম (হোম মিনিস্টার) জানেন। আপনাকে বরং একটা ভিডিও দেখানো যাক। বলে তিনি বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর্দালির পরিবর্তে আরও দুজন আইবি অফিসার এলেন। তাঁদের কাছে একটা ভিডিও ক্যাসেট। সেটা চালানো হল। দেখা গেল মোট ৯টি ভিডিও। সেখানে দেখা গেল আমেরিকার দূতাবাসের অফিসারদের সঙ্গে এবং অচেনা দুই বিদেশির সঙ্গে দিল্লি, আগ্রা আর মুম্বইয়ে যেখানে যেখানে সেহগল মিট করেছেন, তার সব ভিডিও করা আছে। অরুণ ভগত জানালেন, আমরা জানি এরা কারা। আপনি বলুন। দুটো রাস্তা আছে। একটা হল আজই রিজাইন করুন। অথবা তদন্ত শুরু করা হবে।

সেহগল সেদিন ইস্তফা দিলেন। সেহগল ছিলেন সিআইএ এজেন্ট। পরবর্তীকালে যা নিয়ে প্রবল ঝড় ওঠে। কারণ যেভাবেই হোক ভারতের ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি গবেষণাকে আটকানোর জন্য সিআইএ যে প্ল্যান করেছিল তার প্রধান অপারেটর হিসাবেই বাছাই করা হয়েছিল রতন সেহগলকে। এই অভিযোগটি পরবর্তীকালে করেছেন স্বয়ং সেই বিজ্ঞানী নাম্বি নারায়ণ। তাঁর অভিযোগ তাঁকে জেরা করা হয় যখন তখন গোটা জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব পিছন থেকে পরিচালনা করেন এই রতন সেহগল। সুতরাং তিনি যে আদতে সিআইয়ের হয়ে কাজ করছিলেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এবং সেই সঙ্গেই তিনি যুক্ত করেছিলেন কেরল পুলিশের কিছু পুলিশ অফিসারকেও। ইনস্পেক্টর বিজয়ন তাঁর এক পুলিশকর্তাকে বলেন, মরিয়ম রশিদাকে গ্রেপ্তার করা হলে এক বিশেষ পুলিশ অফিসারের ডিরেক্টর জেনারেল হওয়া আটকে দেওয়া যাবে। কারণ মরিয়ম সেই আইজিকে ফোন করেছে এরকম প্রমাণ আছে। কেরল পুলিশ আর কেরল রাজনীতির লবির কারণেই এরপর চক্রান্ত তৈরি হয় গভীর। আর কেরল পুলিশের এক কর্তাই রতন সেহগলকে যখন জানান মালদ্বীপের এক মহিলার কাছে বৈধ ভিসা নেই, তখনই প্ল্যান করা হল ওই মহিলাকে পাকিস্তানের চর সাজাতে হবে। আর দুই বিজ্ঞানীকে হানি ট্র্যাপ আর স্পাইংয়ের ফাঁসে জড়িয়ে দেওয়া হোক। রতন সেহগলের বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রথম তৈরি হয় ১৯৯৪ সালেই। একটি গোপন ও রহস্যময় ফোন এসেছিল আইবি দপ্তরের এক আধিকারিকের কাছে। সেই প্রথম শুরু সন্দেহ। কিন্তু কেন রতন সেহগলের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? তিনি নির্বিঘ্নে আমেরিকা চলে গিয়েছেন। কীভাবে? কারা সাহায্য করলেন তাঁকে? এই প্রশ্ন আজও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের। ওই প্ল্যান সম্পূর্ণ সফল। কারণ এই স্পাই স্ক্যান্ডালের ফলে ভারতের ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি গবেষণা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল বহু বছরের জন্য। বিপুল আর্থিক লাভ হয়েছিল আমেরিকা আর ইওরোপের।

১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি ফ্রান্সের উপরে মঁ ব্লাঁ পর্বতশিখরের কাছে এয়ার ইন্ডিয়ার বম্বে থেকে নিউইয়র্ক ফ্লাইটের রহস্যময় দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন ভারতের প্রথম পরমাণু প্রযুক্তি বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। কখন হয়েছিল ওই এয়ারক্র্যাশ? ঠিক যখন ভারত

একটি পরমাণু বিস্ফোরণ পরীক্ষা করবে। সেটা চিনের পরমাণু বিস্ফোরণের পালটা জবাব। সব স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ই রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ওই পরীক্ষার প্রধান পুরোহিত ডক্টর হোমি জাহাঙ্গির ভাবার।

১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর। কোভালামের এক হোটেলের রুমে মাত্র ৫২ বছর বয়সি এক মহাকাশ বিজ্ঞানীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। তাঁর কোনোরকম হার্টের রোগ ছিল না। ছিল না কোনো দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা। সেই বিজ্ঞানীর নাম বিক্রম সারাভাই। ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ।

এরকম আরও কত রহস্য লুকিয়ে আছে গোপন চক্রান্তের অজানা ফাইলে? এসব রহস্য মৃত্যুর গোপন ফাইলগুলো খুলবে কবে?

৩০

আমরা এভাবে আর কতদিন থাকব?

মানে?

মানে তুমি বুঝতে পারছ না? কাশ্মীরের ওইদিকের সঙ্গে এই কাশ্মীরের কোনোরকম মিল আছে?

না নেই! অনেক অমিল। কিন্তু তুমি কী বলতে চাইছ?

আমি বলতে চাইছি এতদিনেও কি তুমি বুঝতে পারছ না যে আমাদের জীবন, আমাদের কেরিয়ার নিয়ে স্রেফ আইএসআই ছিনিমিনি খেলছে। আমাদের ফিউচার কী? শামিমা, তুমি কি জেহাদের সাপোর্টার নয়? আজাদি চাও না?

না। এখন আর নই। এখন আর চাই না। আমি বুঝে গিয়েছি আমরা নিছক পুতুল। আমাদের দিয়ে এই পাকিস্তান নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। আমাদের আজ পর্যন্ত কী লাভ হয়েছে? কারা মরছে? কাদের ফ্যামিলি ধ্বংস হচ্ছে? ভালো করে ভেবে দেখ, আম কাশ্মীরিদের। তোমার মতো ব্রাইট ইয়ং ছেলেদের শুধু অবাস্তব গল্প বলে টেনে আনা হচ্ছে ঘর থেকে। আর তারপর? নিজের ঘরবাড়ি, পরিবার, সমাজ সব ছেড়ে শুধু পালিয়ে বেড়াও। একদিন এভাবেই বুড়ো হয়ে যাওয়া। আর একবার অকাজের লোক হয়ে গেলে এরাও তাড়িয়ে দেবে। আর নয়তো ইন্ডিয়ার সিকিউরিটির হাতে গুলি খাওয়া। এই জন্য আমরা পড়াশোনা করলাম? এই দুয়ের মধ্যে পড়ে আমাদের লাইফ তো সম্পূর্ণ চলে যাচ্ছে। আবদুল একবার ভেবে দেখ। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো তো?

এটা কী বলছ? আমি এ দুনিয়ায় একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করি। সেটা নিজের মুখে বলতে হবে? ঠিক আছে তুমি বল, কী করা উচিত।

এখান থেকে পালাও। চলো ওদিকে ফিরে যাই। আমাদের কাশ্মীরে। এখানে আমার মন টিকছে না। এটা এক অচেনা দেশ। কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি না। কারও সঙ্গে সামান্য মনের মিল হয় না। শুধু কাজ কাজ কাজ আর কাজ! এভাবে কি জীবন কাটানো যায়?

আর তোমার কাজ? যে কাজের কোনো শেষ নেই। একটা অপারেশনের পর আর একটা অপারেশন। একটা মিশনের পর আর একটা মিশন। এন্ডলেস। আর বদলে? শুধু পিঠ চাপড়ানো।

তুমি কী বলতে চাও এরা চায় না কাশ্মীরের ভালো হোক? এরা চায় না আমরা আজাদ হই? এরা আমাদের তাহলে হেল্প করছে কেন? আমরা যা চাইছি তাই দিচ্ছে। এত টাকা খরচ করছে।

আবদুল তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম কেন জানো? তুমি একজন ইনটেলিজেন্ট লোক বলে। তোমার শার্প মাইন্ড আর কাশ্মীরের জন্য এই ভালোবাসা দেখেই আমার মনে হল এরকম মানুষই পারে কাশ্মীরের দুঃখ কষ্ট সত্যিকারের বুঝতে। শুধু ইমোশন নয়। কাশ্মীরকে যদি জাস্টিস দিতেই হয় তাহলে বাস্তবটা বুঝে নিয়ে সেইমতোই ভাবনাচিন্তা করা দরকার। শুধুই ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ান ফোর্সকে অন্ধের মতো ভিলেন বানিয়ে আর পাকিস্তানকে গডফাদার করে কিন্তু আমরা ভুল করছি। তাই সঠিক পথ দেখানোর জন্য দরকার তোমার মতো মাইন্ডসেট। যারা অ্যানালাইজ করতে পারবে আসলে কাদের লাভ হচ্ছে। তুমি এখনও ভাবো পাকিস্তান আমাদের ভালো চাইছে?

চায় না? তুমি কী মনে করো?

নেভার আবদুল নেভার। পাকিস্তান আমাদের ইউজ করছে। ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড! ওরা একমাত্র চায় কাশ্মীরে সারাক্ষণ শুধু বারুদের গন্ধ ভাসুক। কাশ্মীর যেন প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় খবর হয়। কাশ্মীরের অশান্তি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ম করে যেন আলোচনা হতেই থাকে। এটাই টার্গেট পাকিস্তানের।

আসল টার্গেট কিন্তু ইন্ডিয়ার খপ্পর থেকে বের করে আনা। কারণ পাকিস্তানকে সবথেকে বড় ধাক্কা দিয়েছে ইন্ডিয়া ইস্ট পাকিস্তানকে আলাদা করে দিয়ে। বাংলাদেশ নামের একটা নতুন দেশ পাকিস্তানের শরীর কেটে তৈরি হল। এটা মেনে নিতে পারবে না কোনোদিন পাকিস্তান। তাই কাশ্মীর চাই ওদের।

তুমি আবার ভুল করছ আবদুল। ইস্ট পাকিস্তানের মানুষগুলি নিজেরাই তো বেরিয়ে যেতে চেয়েছে। প্রায় সবাই। কিছু রাজাকার বাদ দিয়ে। কিন্তু আমাদের কাশ্মীরে মিক্সড রেসপন্স। নর্থ, সাউথ গোটা কাশ্মীর, জম্মু সর্বত্র তো সবাই চায় না যে ইন্ডিয়া থেকে আমরা আজাদি পাই। অনেকে ভারতেই থাকতে চায়। তা না হলে এখনও যখনই নির্বিঘ্নে ইকেলশন হচ্ছে তখন সকলেই কেন ফারুখ সাব, মুফতি সাবদের ভোট দিচ্ছে? কেন ওরাই জিতছে লাগাতার? তার মানে একটা অংশের পাবলিক শান্তি চায়। আর অবশ্যই চায় অন্য পাঁচটা রাজ্যের মতোই কাশ্মীরও যেন স্বাভাবিক স্টেট হয়। আবার তোমাদের মতো মানুষও হাজার হাজার আছে। যাদের একমাত্র স্বপ্ন আজাদি। আমারও তাই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি এভাবে হবে না। আমরা আসলে পাকিস্তানের হাতে পরিচালিত হচ্ছি। তাই অন্যভাবে ভাবতে হবে। অন্যভাবে কাশ্মীরিয়তকে আমাদের এস্ট্যাবলিশ করতে হবে। আমি আমাদের কাশ্মীরে ফিরতে চাই আবদুল। আমি আর তুমি। একটু ভাবো। নয়তো দেরি হয়ে যাবে।

আবদুল মজিদ দার থমকে গেল। শামিমা কি ঠিক বলছে? হতেও পারে। অন্তত শুনে তো মনে হচ্ছে। এই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফফরাবাদের সঙ্গে সত্যিই সেই ফেলে আসা কাশ্মীরের কোনো মিল নেই। সেই একই পাহাড়, একই ভ্যালি, একই নদী। কিন্তু একবার ওই পারে গেলেই মনে হয় একটা অন্যরকম উন্নত কান্ট্রিতে এলাম। আর এই পাক অধিকৃত কাশ্মীর কেমন যেন ধূসর প্রাচীন আর ঘিঞ্জি একটা গরিব এলাকার মতো। পাকিস্তান নিজেরা বলে ভারতের সিকিউরিটি ফোর্স গোটা কাশ্মীরকে দখল করে রেখেছে। কাশ্মীর একটা পুলিশ স্টেটে পরিণত হয়েছে। মানুষের হাঁটাচলার পথে সাধারণ বাসিন্দার থেকে উর্দিধারী স্টেনগানধারী পুলিশ বেশি। কিন্তু এখানেও তো তাই। এই পাক অধিকৃত কাশ্মীরেও একই দৃশ্য। গোটা ভ্যালিই তো পাকিস্তান আর্মি দখল করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে পাকিস্তান কাশ্মীরকে ভালোবাসে না, কাশ্মীরের আজাদির জন্য জানপ্রাণ দিয়ে হেল্প করছে তা নয়, এটা কি ঠিক? শামিমা এসব কী বলছে? কিন্তু আবদুল মজিদ দারের মনোজগতে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। সে এক নিমেষে গত ১০ বছরের ঘটনাপঞ্জি, নানারকম ইনসিডেন্ট মনে করতে শুরু করল। সত্যিই তাই। ১০ বছর আগে কাশ্মীর যতটা

শান্ত ছিল, যত দিন এগিয়েছে ততই অশান্তি বেড়েছে। আবদুল মজিদ দারকে তার স্ত্রী শামিমা একটা মারাত্মক সত্যি কথা বলল। বলল, আবদুল কাশ্মীরের এই আজাদির লড়াইতে কী হচ্ছে জানো তো? মজিদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শামিমা বলল, কাশ্মীরিদের হাতে কাশ্মীরিদের মৃত্যু হচ্ছে। যে কোনো ব্লাস্ট, যে কোনো গানব্যাটল, যে কোনো আক্রমণে হয় সাধারণ মানুষ মারা যায় আর নয়তো কাশ্মীর পুলিশ ফোর্সের কেউ। আর্মি কিংবা সেন্ট্রাল ফোর্সের বাইরে কাশ্মীর পুলিশে তো সবাই আমাদের কাশ্মীরেরই লোক। পাকিস্তান কী করছে? এই কাশ্মীর থেকে অর্থাৎ পাক অকুপাইড কাশ্মীর থেকে ইন্ডিয়া অকুপাইড কাশ্মীরে টেররিস্ট পাঠাচ্ছে। যদি ওখানে সফলভাবে আক্রমণ করা হয় তাহলে ওই পারের কাশ্মীরবাসীর মৃত্যু হচ্ছে। আর যদি ওখানে সিকিউরিটি এজেন্সি অপারেশন চালায় তাহলে সেই অপারেশনে এই পাক অকুপাইড কাশ্মীরের ছেলেরা মারা যাচ্ছে। তার মানে? দুদিক থেকেই কাশ্মীরের মানুষ মরছে। পাকিস্তানের কী হচ্ছে? কিছুই না। মজিদ দার এসব শুনে সম্পূর্ণ মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। এভাবে সে ভাবেইনি কখনও।

শামিমা আজ চোখ খুলে দিল। না। আর নয়। এবার একটা এসপার ওসপার। সবার আগে এই মুজফফরাবাদ ছাড়তে হবে। কীভাবে? তাকে তো এরা যেতে দেবে না! হঠাৎ করে সে কেন চলে যেতে চাইছে? আর গেলেই যে ওই পারে তার জন্য ফুল নিয়ে কেউ ওয়েট করছে তা তো নয়। বরং তাকে পাগলের মতো খুঁজছে ইন্ডিয়ান ফোর্স। একবার টের পেলেই সারাজীবনের জন্য জেলে। তাহলে? তাও কি যাব? এসব ভাবছে দার। শামিমা আসলে ইন্ডিয়ায় ফিরে যেতে মরিয়া। এখানে তার আর ভালো লাগে না। কোথায় শ্রীনগর, সোপর, পহেলগাঁও, ফুলওয়ামা, আর কোথায় এই মুজফফরাবাদ! কোনো তুলনাই হয় না। কিন্তু ফেরার রাস্তা তো বের করতে হবে! কে এই আবদুল মজিদ দার? এতক্ষণে তো বোঝাই যাচ্ছে সে এক জঙ্গি। কিন্তু স্ত্রীর কথায় সে নিশ্চিন্ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ছেড়ে অনিশ্চিত জীবন নিয়ে ভারতের কাশ্মীরে আসতে চাইছে কেন?

মহম্মদ ইউসুফ শাহ জামাত ই ইসলামির এক বক্তা। কাশ্মীরে তার বক্তৃতা এতই জনপ্রিয় হয় যে ১৯৮৭ সালের বিধানসভা ভোটে ইউসুফ শাহ ঠিক করে ইলেকশনে লড়াই

করবে। একটি ছোট দলের হয়ে সে আমিরাকাদাল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে প্রার্থী হল। এবং হেরে গেল। ইউসুফ শাহ অভিযোগ আনল সম্পূর্ণ রিগিং হয়েছে নির্বাচনে। সে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও জেহাদে নামল। ফলে স্বাভাবিক পরিণাম জেল। জেলেই তার আলাপ হল এক ব্যক্তির সঙ্গে। সেই লোকটি বলল তোমার জেহাদকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে একটাই লোক। এহসান দার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করো। তুমি যে কাশ্মীরকে দেখতে চাইছ, সেই লোকটি তাই চায়। জেল থেকে বেরিয়ে এহসান দারের সঙ্গে যতদিনে দেখা হল ততদিনে কাশ্মীরে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। আচমকা বেড়ে গেল অবিরত বিস্ফোরণ, গুলির লড়াই। এহসান দার একটি সংগঠনের প্রধান ছিল। সেই সংগঠনের নাম হিজবুল মুজাহিদিন। ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে সেই সংগঠনের প্রধান কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করা হল ইউসুফ শাহকে। মহম্মদ ইউসুফ শাহের নতুন নামকরণ হল। সালাউদ্দিন!! পরবর্তী দশকগুলিতে যে নামটি কাশ্মীরের সন্ত্রাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যাবে। হিজবুলের প্রধান কাজ হল কাশ্মীরের ছড়িয়ে থাকা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের ছাতার তলায় নিয়ে আসা। এরকমই একটি গ্রুপ উত্তর কাশ্মীরে দাপিয়ে বেড়ায়। সোপোর থেকে কুপওয়ারা। সেই গ্রুপের পিছনে আছে একটি ব্যক্তি। লন্ড্রি চালায়। আবদুল মজিদ দার। কিন্তু লন্ড্রি চালানোর মধ্যে সে নিজেকে মোটেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। তার আসল লক্ষ্য আজাদ কাশ্মীর। তাকে একঝলক দেখেই পিপলস লিগ নামের এক বৃহৎ সংগঠন তাকে দলে টেনে নিল। কিন্তু নিজের একক সংগঠন চায় সে। কারও অঙ্গুলিহেলনে চলার পাত্র নয়। কারণ সে দেখতে পাচ্ছে এসব আধা পলিটিক্যাল গ্রুপগুলো আসলে সুবিধাবাদী। এরা জেহাদের নাম করে ইয়ং ছেলেদের বাইরে বের করে আনছে। আর অন্যদিকে গোপনে ইন্ডিয়ান মেইনস্ট্রিম পার্টি আর গভর্নমেন্টের সঙ্গেও গোপন কন্ট্যাক্ট রাখে। ফলে এদের কোনো ক্ষতি হয় না। এরা সবদিক থেকেই নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছে। কাশ্মীর যে অন্ধকারে সেখানেই পড়ে আছে। এরকমই ভাবে আবদুল মজিদ দার। তার এক স্বাভাবিক নেতৃত্বক্ষমতা আছে। সুতরাং অনুগামী পেতে অসুবিধাই হল না। সমর্থকও। অতএব নিজের সংগঠন হল। নাম তেহরিক ই জিহাদ ই ইসলামি। আর চরম সক্রিয়তায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রত্যাশিতভাবেই

দ্রুত খ্যাতি আর কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। আর সবার আগে আগ্রহী হল দুটি সংগঠন। একটি হল ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। আর অন্যটি পাকিস্তানের আইএসআই। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ নতুন ফাইল খুলল আবদুল মজিদ দারের নামে। আর আইএসআই ফাইল খুলল এই লোকটিকে এবার রিক্রুট করতে হবে এই লক্ষ্যে। আইএসআই সফল। হিজবুল মুজাহিদিনের প্রধান সেই এহসান দারকে আইএসআই জানিয়ে দিল এই লোকটিকে আমাদের চাই। তোমার দলে নাও। যা টাকা লাগে দেব। ঠিক দেড় মাসের মধ্যে হিজবুল মুজাহিদিনের ডেপুটি চিফ কমান্ডার হল একটি নতুন লোক। আবদুল মজিদ দার। পরবর্তী সময়ে কাশ্মীর জুড়ে সন্ত্রাস তাণ্ডবের জেরে একের পর এক ইনটেলিজেন্স ইনপুটে জানা যাচ্ছে সব অ্যাটাক প্ল্যানের পিছনে একটিই মাথা। আবদুল মজিদ দার। হিজবুলই পারবে কাশ্মীর আজাদি আনতে। অতএব ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোপরের নিজের ঘরবাড়ি, সমাজ, পরিবার ছেড়ে আবদুল মজিদ দার চলে গেল পাকিস্তানে। গোপনে। খুব অল্পবয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। ভালো করে প্রেম ভালোবাসা বোঝার আগেই। কিন্তু আসল প্রেম যেন অপেক্ষা করে ছিল। সোপোরের মেয়ে শামিমা বদরুকে একদিন দেখেছিল আবদুল। একটি ক্লিনিকে। শামিমা ডাক্তার। এবং বিবাহিতা। ছোটখাটো শহরের ক্লিনিকে সন্ত্রাসবাদী দলে নাম লেখানো লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করে দিতেই হয়। এটাই নিয়ম। সেই চিকিৎসা সূত্রেই দেখা। আবদুল তাকিয়েছিল। এবং শামিমাও। সেই দেখাই চিরস্থায়ী হয়ে গেল যেন। নিয়ম করে দেখা হল। প্রতিদিন কথা হতে পারত না। কারণ আজকাল আবদুল সময় পায় না। কোথায় যেন চলে যেত দিনের পর দিন। আর তারই মধ্যে একদিন শোনা গেল সে পাকিস্তান চলে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য! তাকে এভাবে কাশ্মীরে ফেলে রেখে আবদুল চলে যাবে। কেন? আবদুল ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, আমার কাছে আজাদি আগে। জান থাকলে, ভাগ্য থাকলে আবার দেখা হবে।

এদিকে আবদুলের প্রথম স্ত্রী? তার সঙ্গে ততদিনে দূরত্ব অনেক। সে নিজের বাপের বাড়িতেই থাকে। কিন্তু সন্তান? হ্যাঁ। এই ছেলেকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে আবদুল। কিন্তু তার কাছে ততদিনে কাশ্মীরকে স্বাধীন করার লক্ষ্য প্রোথিত হয়েছে মনের অন্দরে। তাই তাদেরও পিছনে ফেলে রেখেই আবদুল চলে গেল পাকিস্তান। কোথায়?

আপাতত লাহোর। তারপর মুজফফরাবাদ। মুজফফরাবাদে হিজবুল মুজাহিদিনের হেড কোয়ার্টার। আবার আইএসআই-এর ইউনিট। এটাই হল মিশন টেররিজমের এবং বলা যায় হেট ইন্ডিয়া প্রোজেক্টের ভরকেন্দ্র। তাই যত হামলার ট্রেনিং সব হয় এই মুজফফরাবাদে। পাকিস্তান নিজেদের মূল এলাকায় অর্থাৎ এই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বাইরে নিজেদের ভূখণ্ডে কোনো আঁচ আসতে দিতে চায় না। দুই কাশ্মীরবাসীই অশান্তি ভোগ করুক। এখানেই দিন কাটছে আবদুল মজিদের। মাঝেমধ্যেই মনে পড়ে শামিমাকে। ছেলেকেও। নিয়ম করা আছে সপ্তাহে একদিন করে ফোন করবে তারা। একটি হাসপাতালের নম্বর দেওয়া। সেখানেই। কিন্তু আর কি কখনও দেখা হবে?

একজন মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

মহিলা? কে?

তা তো জানি না।

এই মুজফফরাবাদে আবার মহিলা কে? আবদুল মজিদ দার অবাক। এবং বাইরে এসেই স্তব্ধ। সামনে দাঁড়িয়ে শামিমা। হাসছে।

একী? তুমি? কীভাবে?

শামিমা বলল, চলে এলাম।

মানে?

মানে এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করব। ভিসা নিয়ে এসেছি। স্টুডেন্ট ভিসা। মজিদ বিস্মিত। তোমাকে ভিসা দিল? ইন্ডিয়া ছেড়ে কেউ পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে পাকিস্তানে আসছে এটা কেউ বিশ্বাস করবে?

শামিমা বলল সেই কারণেই তো আরও বেশি করে দিল। কারণ এটা তো ইন্ডিয়ার কাছেই একটা মেসেজ পাকিস্তানের যে, কাশ্মীরের ছেলেমেয়েরা পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে ইন্ডিয়ায় যায় না। পাকিস্তানে যায়। এসব যে আসলে অজুহাত তা তো দুজনেই জানে। অতএব দুজনেই যেন পরস্পরকে পেয়ে শ্বাস ফেলল। এতদিন পর তাহলে দেখা হল। কিন্তু

শামিমার স্বামী রাজি? তার সঙ্গে কোনোদিনই মনের মিল হয়নি। সেও শামিমাকে মন থেকে চায়নি। তাহলে? তাহলে একটাই রাস্তা। কিছুদিন পরই শামিমা ডিভোর্স করবে স্বামীকে। এবং মুজফফরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে সে চাকরিও পেয়ে যাবে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে। কারণ ভারতের কাশ্মীর থেকে আসা কাশ্মীরিদের পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীরে চাকরিবাকরি ব্যবসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় বেশি করে। কারণ ওখানে তো ভারতের কাশ্মীরকে ভারতের বলে মনে করা হয় না। অতএব হিজবুল মুজাহিদিনের কমান্ডার আবদুল মজিদ দার এবং মুজফফরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালের ডাক্তার শামিমা বদরুর হয়ে গেল বিবাহ। দুজনেরই দ্বিতীয়বারের বিয়ে।

ঠিক চার বছর কাটল। 'এবং হিজবুল মুজাহিদিন কাশ্মীরের শেষ কথা । কিন্তু একটু যেন হাওয়া বদলাচ্ছে! আইএসআই দপ্তরে কিছু নতুন লোকের আমদানি বাড়ছে। এরা কারা? একটি সাদা কুর্তা পরা দাড়িওয়ালা আর মোটা ফ্রেমের চশমা পরা লোককে বেশি আনাগোনা করতে দেখা যাছে। সবথেকে বড় কথা হল আইএসআই ইউনিটে যেসব কাজের জন্য আজকাল আবদুল মজিদ কিংবা সালাউদ্দিনকে ডাকা হচ্ছে তা খুবই জোলো, সাধারণ। সেসব করে কাশ্মীরের আজাদি পাওয়া যাবে না। ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়া, কিছু বোমা মারা, বনধের সময় ভাঙচুর। এসব রুটিন কাজে কোনো সাড়া ফেলা যায় না। শুধু রিক্রুটমেন্ট ছাড়া আর কোনো কাজই নেই বলা যায়। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবদুল মজিদ দার বুঝতে পারছে আইএসআইয়ের কাছে নতুন কিছু গোষ্ঠীর আনাগোনা বেড়েছে। এমনকী এটাও জানা গিয়েছে কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্পও চলছে। যা মুজাহিদিনকে জানানো হয়নি। এটা কেন করছে আই এসআই? আবদুল চিন্তিত এবং ক্ষুব্ধ। কিছু একটা লুকানো হচ্ছে তাদের কাছে। ব্যাপারটা কী?

ঠিক একমাস পর মুজাহিদিনের রিক্রুট করা ৬ জন যুবকের একটি টিমকে আইএসআই ইউনিটে পৌঁছে দিতে বলা হল। বলা হল ওদের আপাতত কিছুদিন প্রশিক্ষণ দিতে হবে। একটা প্ল্যান আছে। কিন্তু যে কোনো ট্রেনিং এ মজিদ দার কিংবা সালাউদ্দিন থাকবে তো! এবার বলা হচ্ছে কেউ থাকবে না। কেন? ১৫ দিনের ট্রেনিং শেষ। ওই ৬ যুবক ফিরে যাবে

ইন্ডিয়ায়। কাশ্মীরে। কী প্ল্যা হল? যে যুবকদের মজিদ নিজের নেটওয়ার্কে এই ১৫ দিন আগেই নিয়ে এসেছে কাশ্মীর থেকে তাদের চোখমুখ বদলে গিয়েছে। ঠান্ডা কণ্ঠে তাদের একজন বলল, সেটা তো বলা বারণ! বারণ? আমাকেও বলা বারণ? আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে মজিদ। কারা ট্রেনিং দিল? এবার ছেলেগুলো উচ্ছ্বসিত। বলল, উফফ, মারাত্মক ভালো ট্রেনার। যা কথা বলেন। রক্ত গরম হয়ে যাবে। মজিদ আরও অবাক। ভালো কথা বলে? এরকম আবার কে এসেছে? ছেলেগুলি পালটা বিস্মিত। সেকী মজিদভাই! আপনি জানেন না। আর আমাদের এখন থেকে ওঁকেই রিপোর্ট করতে হবে। আমাদের প্ল্যানের পর ওদের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবে বলেছে। কোথায়? লাহোর। ওই গ্রুপের হেডকোয়ার্টার? মজিদ কিছুই জানে না। তার লজ্জা করছে। এরা তারই রিক্রুট। এরা কাশ্মীরে গিয়ে এরপর বলবে মজিদভাই আসলে অনেক কিছু জানে না। আইএসআই এরকম করছে কেন? কে লোকটা? যে এখন আইএসআইয়ের কাছে এত আপন হয়ে উঠছে? লোকটির নাম হাফিজ সঈদ! নতুন সংগঠনের নাম লস্কর ই তৈবা!

অর্থাৎ পাকিস্তান ফোকাস চেঞ্জ করেছে। তারা আর কাশ্মীর থেকে উঠে আসা কাশ্মীরিদের সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনকে পুরোদমে বিশ্বাস করছে না। এখন নতুন স্ট্র্যাটেজি হল পাকিস্তানের মধ্যেই জন্ম হওয়া, পাকিস্তানের লিডার দিয়েই পরিচালিত এবং আলকায়েদার মতো ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করা নতুন গ্রুপকে দিয়ে ইন্ডিয়াকে অ্যাটাক করা। অর্থাৎ তাহলে কি আবদুল মজিদ দারের গুরুত্ব কমছে? আর এর দেড় বছরের মধ্যেই আবদুলকে শামিমা এক রাতে ডিনারের পর বলল, আমরা এভাবে আর কতদিন থাকব এখানে? ১০ দিন পর। হিজবুল মুজাহিদিনের দুটি যুবক ভারতের কাশ্মীরে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। তাদের নিয়ে যাওয়া হল সোজা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কাছে। আই বি অফিসারের সঙ্গে রয়েছেন বিএসএফ কমান্ডারও। সেই কমান্ডার বললেন এক আশ্চর্য কথা। বললেন, ধুলত সাব এই ছেলেদুটোর সাথে একটু কথা বলুন তো? ইন্টারেস্টিং কথা বলছে। সত্যি মিথ্যা জানি না। আইবি অফিসার ধুলত চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন। একটি ছেলে কোনো ভণিতা করল না। সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার মজিদ দারকে চেনেন? আইবি অফিসার ধূলত চমকে উঠলেন।

চেনেন মানে? হিজবুল মুজাহিদিনের অপারেশন কমান্ডার যতই সালাউদ্দিন হোক, আসল ব্রেন হল এই মজিদ দার। গোটা ইন্টেলিজেন্স সেটা জানে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। চিনি। কেন কী হয়েছে? এবার যেন ঘরে বাজ পড়ল। সকলেই স্তব্ধ। কারণ ছেলেটি বলছে, আবদুল মজিদ দার ইন্ডিয়ায় ফিরতে চাইছে স্যার। আপনারা কি হেল্প করবেন? একটা প্ল্যান আছে! প্ল্যান? কী প্ল্যান। দার ইন্ডিয়ায় নিজে থেকেই ফিরতে চায়? এটা তো খুব অদ্ভুত কথা। আইবি অফিসার শুনলেন গোটা প্ল্যান। তিনি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন প্রথমে ২৩ বছরের ওই বাচ্চা ছেলেটির দিকে। ছেলেটির চোখে ভয় আর শঙ্কা। কারণ প্ল্যান শুনে এই অফিসার কী সিদ্ধান্ত নেবেন তার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে। ধুলত চোখ কুঁচকে ভাবছেন। এবং তারপর বললেন, ডান! ইটস আ ডিল! বোঝা গেল এই ছেলেদুটি ইচ্ছা করেই ধরা দিয়েছে। এই প্ল্যান জানানোর জন্য। সেদিন রাতেই রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস চিফ ফোন করলেন ভারতের হোম মিনিস্টারকে। বললেন প্ল্যানের কথা। সেই হোম মিনিস্টার বললেন, গো অ্যাহেড! বাট ডোন্ট ফরগেট টু কিপ ওয়াচ অন হিম! হোম মিনিস্টারের নাম লালকৃষ্ণ আদবানি!

স্যার আমি ইন্ডিয়া ফিরতে চাই। পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীরের মুজফফরবাদের এক দোতলা বিল্ডিং। সেখানে যে ঘরে বসে কথা বলছে আবদুল মজিদ দার, সেটা এক বিরাট হলঘর। দুদিকে সার দেওয়া চেয়ার। পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ লাগানো ক্যাবিনেট টেবল। কায়েদ এ আজমের পোর্ট্রেট দেওয়ালে একটু বেঁকে গিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আছে দার। কথাটা বলে সে অপেক্ষা করছে প্রতিক্রিয়ার। সামনে যিনি বসে আছেন তার নাম ব্রিগেডিয়ার রিয়াজ! পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর হ্যান্ডলার। তিনি বললেন, ইন্ডিয়া ফিরে যাবে? কেন? আবদুল বলল, স্যার আমার একটা প্ল্যান আছে। কী প্ল্যান? রিয়াজ জানতে আগ্রহী। এতটা রিস্ক নিয়ে লোকটা ফিরতে চায় কেন? মজিদ বলল, আমি আমার নেটওয়ার্ক দিয়ে প্রো ডায়লগ গ্রুপে ঢুকে যাব। ইন্ডিয়াকে আলোচনার টেবিলে আনার জন্য রাজি করাব। আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু আমরা আড়ালে আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। মানে? রিয়াজ একটু সামনে ঝুঁকে এলেন উত্তেজনায়। তিনি জানতে চান প্ল্যানটা। আবদুল বলছে, একদিকে আমরা আলোচনায় রাজি পাকিস্তান—এরকম

মেসেজ দেব। আবার সেই আলোচনার টেবিলে ইন্ডিয়াকে টেনে এনে কাশ্মীর আর কাশ্মীরের বাইরেও হামলা চালাব। তাহলে ইন্ডিয়া আরও দিশাহারা হয়ে যাবে। রিয়াজ চমৎকৃত। এটা দারুণ প্ল্যান। তবে তিনি বেশি উচ্ছ্বাস দেখালেন না। বললেন, আচ্ছা আমি একটু ওপর তলায় কথা বলি। তোমায় কাল জানাব। কাল আবার এসো। রিয়াজ এই সময়টা চেয়ে নিলেন আসলে আড়ালে সালাউদ্দিনের মতামত নেওয়ার জন্য। কারণ সালাউদ্দিনের সঙ্গে আদতে মজিদের সম্পর্ক খুব ভালো নয়। সালাউদ্দিন এক নম্বর হলেও, মজিদকেই এই গ্রুপের সবাই মান্য করে বেশি। আর আইএসআই জানে মজিদের বুদ্ধি, প্ল্যানিং, রিক্রুটমেন্ট ক্ষমতা অনেক শার্প। সুতরাং তা নিয়ে চাপা ঈর্ষা আছে সালাউদ্দিনের। তাই মজিদ দারের কোনো অন্য মতলব আছে কিনা তা জেনে নেওয়া দরকার।

কারণ সালাউদ্দিন আইএসআইয়ের ঘরের ছেলে। তার ক্ষমতাই নেই নিজের মতো করে ভাবার। মজিদের আছে। যারা নিজের মতো করে ভাবতে পারে, তারা যেমন কার্যকর হয়, তেমন আবার বিপজ্জনকও। ব্রিগেডিয়ার রিয়াজ সালাউদ্দিনকে প্ল্যানের কথা জানানোয় সালাউদ্দিন জানাল তাকে আগেই বলেছে মজিদ। সে নিজের গ্রুপেও গোপনে কথা বলেছে। কোনো আশঙ্কা নেই। এই প্ল্যান ভালোই হবে। সুতরাং রাজি ব্রিগেডিয়ার। কারণ আবদুল মজিদ দার ভারতে ফিরছে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনার অ্যাজেন্ডায় ভারতকে রাজি করাতে। কাশ্মীরে দুটি অংশ আছে। একটি অংশ চায় কোনো মধ্যপন্থা নয়। সোজাসুজি জিহাদ। ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আর একটি অংশ চায় ভারত পাকিস্তানকে আলোচনার টেবিলে বসাতে। আবার একটি অংশ চায় ভারতে থেকেই কাশ্মীরের নিজস্ব আরও অধিকার প্রাপ্তি। সুতরাং ওই আলোচনায় যে গোষ্ঠীগুলো রাজি তাদের মধ্যে ঢুকবে আবদুল মজিদ দার। সে পরিচিত নাম। যে সে নয়। হিজবুল মুজাহিদিনের ডেপুটি কমান্ডার। সুতরাং সে যদি অস্ত্র ছেড়ে আলোচনায় বসতে চায় তাহলে ইন্ডিয়া অবশ্যই রাজি হবে। কিন্তু আসলে সে হয়ে থাকবে পাকিস্তানের চর। আইএসআই এজেন্ট। যে সমস্ত আলোচনার প্রাক-প্রস্তুতি আর ইন্ডিয়ার প্ল্যান গোপনে পাকিস্তানকে জানাতে থাকবে। একইসঙ্গে চলবে জঙ্গি হামলা।

২৪ জুলাই ২০০০। মজিদ দার শ্রীনগরে প্রবেশ করল। এবং তার আগেই সে ঘোষণা করেছে একতরফা সিজফায়ার। অর্থাৎ যুদ্ধবিরতি। ভারত সরকার তৎক্ষণাৎ স্বাগত জানাল। স্থির হল ভারত সরকারের সঙ্গে প্রথম বৈঠক হবে এই সন্ত্রাস ছেড়ে আসা গোষ্ঠীদের সঙ্গে। তারা কী চায়? জানতে চাওয়া হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব কমল পাণ্ডে একঝাঁক অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ৩ আগস্ট শ্রীনগর এলেন। নেহরু গেস্ট হাউসে প্রথম মিটিং। সঙ্গে হামিদ তান্ত্রে আর ফারুখ মির্জা। সন্ত্রাস ছেড়ে আসা মজিদ দারের হয়ে মধ্যস্থতাকারী হলেন ফজল হক কুরেশি। আলোচনা শুরু হল। পরের মিটিং ৮ আগস্ট। কী কী কথা হচ্ছে? জানতে চায় পাকিস্তান। আইএসআই মেসেজ পাঠাচ্ছে নানাভাবে আবদুলের কাছে। আবদুল জানাচ্ছে, আর একটু কথা এগোক। জানাচ্ছি। এরপর সেপ্টেম্বর। আইএসআইকে এবার নিজেই জানাল মজিদ দার। আলোচনার গতিপথ কোনদিকে এগোচ্ছে। এরপর আশা করা যায় একটা সম্মেলন ডাকা হবে। কারা থাকবে সেখানে? তাও জানাল মজিদ। হয়তো সেই সম্মেলনে আফগানিস্তান অংশ নেবে। আজ মার্কিন বিদেশসচিব আসতে পারেন। আইএসআইয়ের কাছে জানতে চাইলো এবার মজিদ। আমাদের নেক্সট মিশন কী? আইএসআই বলল, আমরা কুপওয়ারা আর অনন্তনাগে একসঙ্গে একটা অ্যাটাক করব। টিম পাঠাচ্ছি। ওদের কোথায় রাখা যায়? তুমি একটু দেখে নিও। ঠিক পাঁচদিন পর সেই টিম ধরা পড়ে গেল। মধ্যরাতের এক অপারেশন ভারতের সেনাবাহিনীর একটি কাউন্টার ইনটেলিজেন্স টিম হানা দিয়ে সকলকে ধরে ফেলল। তারা জানাল আইএসআই পাঠিয়েছে তাদের। সালাউদ্দিনের টিম। কীভাবে লিক হয়ে গেল খবর? আইএসআই হেডকোয়ার্টারে রাগের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। একটি নয়, পরপর তিন বার তিনটি মিশন ফেল করল। অথচ আলোচনার টেবিলে সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে এসে ইন্ডিয়া দেখাতে সক্ষম হচ্ছে তারা জঙ্গিদের আলোচনায় নিয়ে এসে কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে সফল। কেউ একজন বেইমানি করছে? কে? আইএসআইয়ের জানতে জানতে প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেল যে আদতে এই গোটা খেলায় একজন ডাবল এজেন্ট রয়েছে।

তার নাম আবদুল মজিদ দার। তার গ্রুপের ছেলেরা যখন ভারতের আইবি অফিসারকে বলেছিল মজিদ দার ফিরবে বলছে। আপনারা হেল্প করুন। আইবি এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস (RAW) গুপ্তচররা স্পষ্ট বলেছিলেন, একটাই পথ খোলা। আমরা সবরকমভাবে ওকে হেল্প করব। আলোচনার টেবিলে আনব। শুধু আমাদের হয়ে ওকে কাজ করতে হবে। আইএসআইয়ের প্ল্যান আমাদের জানাতে হবে। তুমি পাকিস্তানের এজেন্ট হয়ে থাকো। কিন্তু আসলে তুমি ইন্ডিয়ার স্পাই এজেন্ট। আমাদের মিটিংয়ের খবর ওদের দেবে। তার পর ওরা কী প্ল্যান করছে তা আমাদের জানিয়ে দেবে। রাজি? আবদুল রাজি! আর এই গোটা প্ল্যানের কারিগর কে? ডক্টর শামিমা বদরু! সবটা সে একা ছক কষেছে। ভারতের গুপ্তচরবাহিনীর হয়ে কাজ করতে করতেই আবদুল মজিদ দার কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনার রাস্তা খুলে দেওয়ার অন্যতম ভূমিকা নিলে তার মূলস্রোতে ঢুকে যাওয়া সহজ হবে। গ্রেপ্তার হতে হবে না। আবার আইএসআইয়ের কাছে যদি সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন কিছু মিটিংয়ের খবর পৌঁছে দিয়ে তাদের গুডবুকে থাকা যায় তাহলে তাদের আস্থাভাজনও থাকা সম্ভব হবে। এই ছিল প্ল্যান। যা সম্পূর্ণ সফল! কিন্তু খবর পেতে দেরি হয়নি আইএসআইয়ের। তারা জেনে গেল ডাবল এজেন্ট কে? তারপর?

ডক্টর শামিমা বদরু রোগী দেখছিলেন। আজ খুব লম্বা লাইন। ২৩ মার্চ। ২০০৩। আবদুল আজ মা আর বোনকে দেখতে গিয়েছে। সোপরে। নিজেদের বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। তাই তাড়া নেই। একটা পেশেন্টের অবস্থা ভালো নয়। হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে শামিমা। সন্ধ্যা হয়েছে। মনোরম হাওয়া। ঠিক তখন অনেক দূরের সোপর শহরেও সন্ধ্যা নেমেছে। আবদুল মজিদ মায়ের সঙ্গে দেখা করে খেয়েও নিল। রাত হবে ফিরতে। মা আর বোন বেরিয়ে এসেছে। মাকে তাহলে আগামী রবিবার নিয়ে আসিস। একবার চেকআপ করাতে হবে। এখানে ওসব হবে না। বোনকে বলল, মজিদ দার। ঠিক তখনই সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে একটা মোটরবাইক। দুটি যুবক। দাঁড়িয়েছে। তবে স্টার্ট বন্ধ হচ্ছে না। ছেলেদুটি নামছেও না। সালাম আলাইকুম মজিদ ভাই...চিৎকার করে উঠল তারা। মজিদকে সবাই চেনে। সে অবশ্য সবাইকে চেনে না। তাই হেসে হাতটা তুলে বলল আলাইকুম আসসলাম। কে? আবার শব্দ শোনা গেল, আমরা ভাই... আমরা কারা?

মজিদ এগিয়ে যাচ্ছে। দু'কদম এগোতেই উপর্যুপরি গুলি। থামছে না। মজিদ দার মাটিতে পড়ে গিয়েছে। বাইকে বসে গুলি চালাচ্ছে ছেলেদুটি। তারপর স্পিড তুলল। চলে গেল। আবদুলের মা মাটিতে পড়ে। বোন বসে পড়েছে। সকলের পেটে বুকে, মুখে গুলি লেগেছে। আবদুল মজিদ দারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায়নি। মারা গিয়েছে সে। ওখানেই।

২০০৬ সালের নভেম্বর। ডক্টর শামিমা বদরু অত্যন্ত ক্লান্ত। আজ সারাদিন তাঁর কেটেছে তিনটে স্কুলে। মৃত স্বামীর নামে তাঁর একটি এনজিও আছে। গরিব বাচ্চাদের বইখাতা দেওয়া, পড়ানোর খরচ, জামাকাপড় ইত্যাদি বিতরণ করে ওই এনজিও। তারই কাজ ছিল। বেশি লোকজন তো নেই। একাই প্রায় সব কাজ করতে হয়। বয়সও তো হচ্ছে। আর স্বামী চলে যাওয়ার পর কেমন যেন একটা নির্লিপ্তি এসেছে তাঁর। কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা হয় না। শামিমা বদরু আজ কিছু খাবেন না। ভালোই লাগছে না। রাত পৌনে আটটা। ডোরবেল বাজছে। এখন আবার কে? কাজের একটি মেয়ে আছে সর্বক্ষণের। তাকে বললেন, দরজাটা খুলে দ্যাখ তো কে ? দুমিনিট পর একটা আর্ত চিৎকার পাওয়া গেল। কী হল! ডক্টর শামিমা বেরিয়ে এসে দেখলেন বাচ্চা মেয়েটি মেঝের এক প্রান্তে বসে আছে। মুখে হাত দিয়ে। চারজন ছেলে দাঁড়িয়ে। তারা কোনো কথা বলল না অবশ্য। শুধু গুলি চালাল। ডক্টর শামিমা বদরু একা একা শ্রীনগরের চানপোরায় লালনগরের বাগ এ ইসলাম অঞ্চলে নিজের বাড়িতে রক্তাপ্লুত হয়ে ধীরে ধীরে গেলেন মৃত্যুর দিকে।

সেখান থেকে অনেক অনেক দূরে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে মুজফফরাবাদের এক দোতলা বিল্ডিংয়ে সেই বিরাট বড় হলঘরে ক্যাবিনেট টেবলে বসে থাকা ব্রিগেডিয়ার রিয়াজের ফোন বাজল। ফোন কানে নিয়ে তিনি শুনলেন হ্যাঁ, শামিমা খতম। তিন বছর আগে খতম হয়েছিল আবদুল মজিদ দার। হাসলেন ব্রিগেডিয়ার রিয়াজ। কুটিল হাসি। ভাবলেন ইন্ডিয়ান কাশ্মীরি মিলিট্যান্টদের শিক্ষা হওয়া দরকার। বুঝুক বেইমানি করলে কী সাজা হয়। এটাই হল আইএসআইয়ের বদলা! আজও কাশ্মীরে যারা পাকিস্তানের হাতে

পুতুল হয়ে সন্ত্রাসে নাম লেখাচ্ছে তাদের কি এই শিক্ষাটির কথা মনে আছে? সামান্য বেচাল দেখলেই তাদেরও যে হাল এরকম হতে পারে সেটা তারা জানে তো?

৩১

দাউদ গিলানি হাসল। আশ্চর্য এই ইন্ডিয়ান অথরিটি। এত বড় একটা ভুল কেউ সন্দেহই করল না? তাও আবার একটা নয়। অন্তত তিনটে স্টেপে যেটা ক্রস এক্সামিনেশন করার কথা ছিল, সেসব না করে অনায়াসে স্বাগত জানানো হল দাউদ গিলানিকে। তার পাসপোর্টে বাবার নাম লেখা ছিল না। অথচ ভিসায় বাবার নাম লেখা সেলিম গিলানি। এখন দাউদ গিলানি যে নাম নিয়েছে, তার সঙ্গে এই গিলানি পদবির সম্পর্কই নেই। দাউদ গিলানির এখন নতুন নাম। পাসপোর্টে ভিসায় সেই নতুন নামই জ্বলজ্বল করছে। অথচ আমেরিকায় দাউদ গিলানির সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর যা, এই নতুন পাসপোর্টেও সেই একই সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর। সেটাও একবার চেক করা দরকার ছিল। ভারতীয় ভিসা মঞ্জুর করা দপ্তর সেটাও করল না। মারাত্মক ভুল! সুতরাং স্রেফ নাম পালটে চলে আসা দাউদ গিলানি খুব সহজে ভারতে আসার ভিসা পেয়ে গেল। তাহলে দাউদ গিলানির নতুন নাম কী? কেন তাকে কেউ সন্দেহ করল না? সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। এখনই দাউদ গিলানির নতুন নামটি বলা যাবে না। একটু পরই আমরা জানতে পারব। এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন ক্রস করার পর মনে মনে সে আবার হেসে একটা বিশুদ্ধ হিন্দি গালাগালি দিয়ে করুণার চোখে তাকাল এয়ারপোর্টে কাউন্টারে কঠোর চোখে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্ডিয়ান কাস্টমস অফিসারদের দিকে। করুণার কারণ কী? কারণ এরা ঝকঝকে পোশাকে স্মার্ট কথাবার্তা নিয়ে কড়া কড়া চোখ করে এখানে বসে নিজেদের রাজা উজির ভাবে। আর আমাদের মতো বাইরের লোক এদের বুদ্ধু বানিয়ে অবিরত যখন তখন ঢুকে যাচ্ছে। এটাই ভাবল দাউদ। দাউদ গিলানি ২০০৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পদার্পণ করল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বসির নামে এক যুবক। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে বেরোতেই বসির হাত তুলল। একবারেই চিনে ফেলেছে। একটা মারুতি এস্টিম এনেছে বসির। সেটায় লাগেজ রেখে দাউদ গিলানি উঠে বসল ড্রাইভিং সিটের পাশে। সেটাই তার পছন্দ। নতুন শহরকে ভালোভাবে চেনা দরকার। এই শহরকে তার আগামী বহুদিন ধরে একেবারে হাতের তালুর মতো চিনতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকে

বেশিক্ষণ লাগল না। জায়গাটা নাকি সাউথ মুম্বই। চার্চগেট। মারুতি এস্টিম এসে দাঁড়াল হোটেল আউট্রামের সামনে। এটাকে বলা যায় সেমি লাক্সারিয়াস একটা বাজেট হোটেল। প্রধানত পর্যটক আর বিদেশিরা এসে থাকে। হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজারের নাম মিস্টার কৃপালনী। মিস্টার আর মিসেস কৃপালনী খুব ভালো মানুষ। বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকদের কাছে তাঁরা প্রায় লোকাল গার্জেন। প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল এই মাঝবয়সি দম্পতিকে। দাউদ গিলানি বুঝল ইন্ডিয়া জায়গাটা খুব একটা খারাপ নয়। দাউদকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনো ইলেকট্রনিকস গ্যাজেটস সে ব্যবহার করতে পারবে না। কোনোভাবেই তাকে যেন ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি এজেন্সি মনিটর কিংবা ট্র্যাক করতে পারে। বিশেষ করে ইন্টারসেপশন। সুতরাং প্রথমেই যেটা দরকার তা হল একটা ইন্টারনেট কাফে। চার্চগেটের ঠিক উলটোদিকে অনেক কাফেই আছে। তবে দাউদ গিলানির পছন্দ হল একটি বিশেষ কাফে। তার নাম রিলায়েন্স সাইবার কাফে। হোটেলের কাছেই। যখন তখন যাতায়াত করা যাবে। একটা ইমেল করে পৌঁছসংবাদ পাঠাতে হবে। যেখানে পাঠানো হবে সেই ইমেল আইডি হল rare.layman@gmail.com। এই ইমেল কাদের? বলা যায় জয়েন্ট। দুজন মানুষ এই মেল আইডি হ্যান্ডল করেন। একজনের নাম সাজিদ মীর। আর অন্যজন মহম্মদ ইকবাল। এরপর হেঁটে হেঁটে দাউদ গিলানি একটু ঘুরতে চাইল। কিন্তু মেঘলা। আর গুমোট। সমুদ্রের দিক থেকে একটা বাতাস আসছে বটে। তবে সেটা সম্ভবত গুমোটের থেকে একটু দুর্বল। কারণ ঘাম হচ্ছে। দাউদের অভ্যাস নেই এত গুমোট আর ঘামের। সে বহুদিন ধরেই আমেরিকায় থেকে অভ্যস্ত। শিকাগোয়। কখন যেন সমুদ্রের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে দাউদ। এটাই তাহলে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া! চমৎকার তো! মেঘলা হাওয়ায় জলের বিন্দু মিশে আছে। মাঝেমধ্যেই সেই হাওয়া এসে যেন শরীরকে আর্দ্র করছে সামান্য। অদূরেই বিল্ডিং। দারুণ সুন্দর আর অভিজাত দেখতে। দাউদ মুগ্ধভাবে দেখছে। আজ হবে না। আর কয়েকদিন পর আসতে হবে এই বিল্ডিং দুটোতে। এত দূর থেকে আসা। আর এদুটোর মধ্যে ঢোকা হবে না তাই হয় নাকি? ঠিক চারদিন পর আবার সেখানে এসে প্রথমে বড় আইকনিক বিল্ডিংটায় এসে ঢুকল দাউদ গিলানি। এককাপ কফি আর একটা গ্রিলড হানি স্যান্ডউইচ খেতে। এটা একটা হোটেল।

ভারতের সবথেকে সুন্দর হোটেল। তাজমহল। কফিটা খেতে খেতে ক্রাউডের দিকে ভালো করে নজর করল দাউদ। প্রচুর বিদেশি। চামড়ার রং দেখে মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ান গেস্টও অনেক। সামনে খোলা ব্যালকনি। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এরকম একটা হোটেলের কফিশপ যে কোনো শহরের কাছে অলংকারস্বরূপ। পরদিন দাউদ গেল পাশের হোটেলটায়। সেটাও এরকমই। তবে আর্কিটেকচার আলাদা। অন্যরকম একটা লুক। হোটেল ট্রাইডান্ট। দাউদ গিলানির এখনও কোনো বন্ধু হয়নি। মেয়েবন্ধুও হল না। গার্লফ্রেন্ড ছাড়া বেশিদিন থাকা সম্ভব নয় গিলানির পক্ষে। কিন্তু অচেনা শহরে আচমকা গার্লফ্রেন্ড পাওয়া যায় কীভাবে? তাই একটু ডিপ্রেশন আছে। এই কয়েকদিনের মধ্যে বন্ধু তৈরি হওয়াও সম্ভব নয়। বিশেষ করে এখনও তো সে একজন পর্যটক। একাই এসেছে। কিন্তু এভাবে পর্যটক হয়ে থাকা সম্ভব নয়। একটা কিছু কাজ করতে হবে। কতদিন আর সঙ্গে নিয়ে আসা টাকায় চালানো যায়। তবে তার আগে একবার আমেরিকায় ফিরতে হবে। আসলে প্রাথমিক কাজটি ছিল শহরটাকে চেনা। চেনা বলতে নিছক কয়েকটি রাস্তা চিনলাম, লোকালিটি জেনে গেলাম, কোন ট্যাক্সির ভাড়া কত, কটার সময় কোন ট্রেন যায় এসব নয়। শহরটির চরিত্র জানতে হবে। মানুষের আচরণ বুঝতে হবে। আর কোন এলাকায় ঠিক কোন ধরনের লোকজন আসে সেটার একটা সম্পূর্ণ ধারণা করে ফেলতে হবে। সেইমতো বসকে খবর দিতে হবে। দাউদ গিলানির দুজন বস। সাজিদ মীর আর মহম্মদ ইকবাল। আর একজন বন্ধু।

তাওহর রানা। প্রথম পর্বে তিন মাস কেটে গেল। ঠিক তিনমাস পর ১৪ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে দুবাই হয়ে আমেরিকা ফিরে গেল দাউদ গিলানি। তবে বেশিদিনের জন্য নয়। মাত্র দুমাসের মধ্যে আবার ভারতে ফিরে এল সে। এটা হল সেকেন্ড ট্রিপ টু ইন্ডিয়া। আবার সেই একই হোটেল। কৃপালনী দম্পতি একটু বিস্মিত। একই লোক তিনমাস হোটেলে থাকছে এরকম তো হয় না। নেহাত ট্যুরিস্ট? হাবভাব দেখে ট্যুরিস্ট মনে হয় না। একটাই জিনিস ছাড়া। ক্যামেরা। লোকটা ক্যামেরা ছাড়া বাইরে বেরোয় না। সত্যিই দাউদ গিলানি শুধু স্টিল নয়, ভিডিও ক্যামেরাও খুব ভালোবাসে। যখনই সে মুম্বইয়ের কিছু স্পটে বেড়াতে যায়, সময় কাটায় তখনই স্টিল ছবি তোলে, ভিডিও করে জায়গাটার।

এটা তার শখ। দাউদ গিলানি শিকাগো ফিরে গিয়েছিল ভিসা সমাপ্ত হওয়া ছাড়া আর একটা জরুরি আলোচনার জন্য। মুম্বইয়ে পাকাপাকি বেশ কিছুদিন থাকার জন্য কিছু একটা বিজনেস করা দরকার। কী ধরনের বিজনেস করা যেতে পারে? তাওহুর রানার পরামর্শ চাই। রানা দাউদের সেই ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গেই স্কুলে পড়াশোনা। সেই থেকে বন্ধুত্ব রয়েই গিয়েছে। শিকাগোর ডেভন অ্যাভিনিউতে রানা তার এক পরিচিত বন্ধু রেমন্ড স্যান্ডার্সের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটা বিজনেস শুরু করেছিল প্রায় অনেকদিন আগেই। ছোট কোম্পানি। নাম ওয়ার্ল্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস। এই সংস্থার কাজ হল অন্য দেশ থেকে যারা আমেরিকায় আসতে চায় এবং কাজের সন্ধান করে থেকে যেতে ইচ্ছুক এরকম মানুষদের বিভিন্নভাবে আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া। পেপার, ডকুমেন্ট তৈরি, কীভাবে ভিসার আবেদন করতে হয়, কোন কোন কাজের জন্য ওয়ার্ক পারমিট কেমন হয় এসব বিষয়ে এক ধরনের কনসাল্টেশন। এদের সিংহভাগ ক্লায়েন্ট হল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। এই রানা নিজে আমেরিকার নাগরিক নয়। সে আসলে কানাডার বাসিন্দা। তবে জন্মসূত্রে অন্য দেশের। সেই দেশের নাম পাকিস্তান। রানার ওয়ার্ল্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস সংস্থাই দাউদ গিলানির সমস্ত ভিসার কাগজপত্র ঠিক করে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে ওরা এক্সপার্ট। কোনোরকম ভুলভ্রান্তি থাকলেই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ক্যান্সেল হয়ে যায় সবাই জানে। আর আজকাল তো সেই নাইন ইলেভেনের পর আরও কড়াকড়ি। কিন্তু ওই যে শুরুতেই বলেছিলাম দাউদ গিলানি যখন নিজের নতুন নামের পাসপোর্ট তৈরি করে প্রথমবার ভারতে আসতে চেয়ে ভিসার আবেদন করেছিল, তখন তার ভিসা আর পাসপোর্টে বেশ কয়েকটি অসামঞ্জস্য ছিল। দাউদ গিলানি আসলে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অনেকবার বছরের পর বছর ধরে আমেরিকা থেকে লাহোর, করাচি থেকে আবার আমেরিকা করেছে। বারংবার সে পাকিস্তান গিয়েছে একই বছরে। দাউদ গিলানি নামের একটি লোক অসংখ্যবার পাকিস্তান গিয়েছে এটা পাসপোর্টে দেখেই ভারতীয় ভিসা দপ্তরের ভুরু কুঁচকে যেতেই পারে। তাই ভারতকে সন্দেহমুক্ত করার জন্য দাউদের নতুন পরিচয় হওয়া দরকার। তাই ২০০৫ সালের এক সেপ্টেম্বর মাসে দাউদ নিজের এতদিনের চেনা আইনজীবীর অফিসে গেল। আইনজীবীর নাম ডোনাল্ড ট্রাম্ফ।

হাই ডোনাল্ড, আমি নাম চেঞ্জ করতে চাই।

মাই গড! কেন?

আমি এই দাউদ গিলানি নাম নিয়ে টায়ার্ড। আর পারছি না এটাকে ক্যারি করতে।

সব জায়গায় সন্দেহ। আর এই নিয়ে তিনবার জেলে গেলাম। এখন আমাদের কেউ আর বিশ্বাস করে না ইউ নো ভেরি ওয়েল।

দ্যাটস আ পয়েন্ট গিলানি। সো হোয়াট উড বি দ্য নিউ ওয়ান?

আমি চাই এমন একটা নাম নিতে যাতে আমাকে আর কেউ প্যাকি (পাকিস্তানী) মুসলিম বলে মনে না করে।

তাহলে বল কী নামে পেপার করব?

দাউদ গিলানি একটু হেসে মাথা নীচু করে সামনে ঝুঁকে, কেটে কেটে উচ্চারণ করল তিনটি শব্দ। তার নতুন নাম।

ডেভিড কোলম্যান হেডলি!

সৈয়দ সেলিম গিলানি পাকিস্তানের এক উচ্চপদস্থ ডিপ্লোম্যাট। বহু জায়গায় পোস্টিং হয়েছে এর আগে। তবে তাঁর পছন্দের পোস্টিং হল অবশেষে ওয়াশিংটনে। ভদ্রলোক অত্যন্ত মরালিস্ট আর ডিসিপ্লিনড। এতটা উচ্চপদে চাকরি করেও কখনও কোনোরকম অন্যায় সুযোগ সুবিধা নেননি কারও কাছে। সরকারের উপরতলার কর্তাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব যথেষ্ট বেশি। অথচ তাঁর আচার আচরণ দেখে তা বোঝা যায় না। পাকিস্তান এমব্যাসিতে এক আমেরিকান মেয়ে কাজ করেন। মেয়েটি মেরিল্যান্ডের। নাম সিরিল হেডলি। সেলিম তাঁর বস। আর বসের প্রেমে পড়া আবহমানের এক প্রবণতা। অতএব সিরিল হেডলি আর সেলিম গিলানি পরস্পরকে ভালোবাসলেন। বিয়েও হল। সুখী সংসার। তাদের সন্তান দাউদ গিলানি। আমেরিকান মা। পাকিস্তানি বাবা। দাউদ জন্মসূত্রে পাকিস্তানি পিতার সন্তান হলেও তাকে দেখে কেউ বলবেই না সেকথা। কারণ তাকে দেখতে অবিকল আমেরিকান। অর্থাৎ মায়ের মতো হোয়াইট। তাই দেখে সর্বদাই

সকলে ধরেই নেয় বিদেশি। ছোট থেকেই। ততদিনে ওয়াশিংটন ছেড়ে এই পরিবার চলে এসেছে পাকিস্তান। সেলিম গিলানি পাকিস্তানে হাই স্ট্যাটাসের মানুষ। তাই ছেলেকে তিনি ভর্তি করলেন এলিট স্কুলে। হাসান আবদাল ক্যাডেট কলেজ। রাওয়ালপিন্ডি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক মিলিটারি স্কুল। সেই স্কুলের ক্লাস সেভেনে এক প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে প্রথম দেখা। তার নাম তাওহার রানা। এরকম হাই স্ট্যাটাসের স্কুলের সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর। নিজেদের স্কুলকে প্রতিটি ছাত্র ভালোবাসে। ক্লাস নাইন। ১৯৭২ ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। মাঝেমধ্যেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। কেন এই যুদ্ধ? পাকিস্তানের থেকে ভারত চাইছে ইস্টার্ন পাকিস্তানকে ছিনিয়ে নিতে। অর্থাৎ পাকিস্তানকে ভেঙে দিতে ভারত সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। আর যুদ্ধের যা হালচাল, সত্যিই হয়তো তাই হবে। ঠিক এরকমই একদিন শোনা গেল তাদের স্কুলে ইন্ডিয়ান ফাইটার জেট বিমান বোমা ফেলেছে। দুটো। স্কুলে বোমা? দুজনের মৃত্যু হয়েছে। স্কুলের একাংশ উড়ে গেল। আর তার ঠিক পরদিন জরুরি এক মিটিং ডাকা হল সেখানে। এতদিন পর্যন্ত এই স্কুলে কখনওই অ্যান্টি ইন্ডিয়া কোনো ভাষণ দেওয়া হয়নি। নিছক উচ্চমানের পড়াশোনাই হত। অন্য ছোটখাটো স্কুলের মতো কখনওই এখানে ভারতকে শত্রু বানিয়ে অযথা ঘৃণা ছড়ানো হয়নি। দুই ছাত্র দাউদ গিলানি আর তাওহর রানা সেদিন স্কুলের ওই জরুরি মিটিংয়ে গিয়ে জীবনে প্রথমবার শুনতে পেল কীভাবে ভারত পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। আর পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করতে প্ল্যান নিয়েছে। সেই টিচার অবশ্যই এটা বললেন না যে পাকিস্তান কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে চরম অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে। আর ভারত নয়, ওই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষই চায় পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যেতে। অর্ধেক সত্য শুনল ছাত্ররা। আর তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠল ভারতের বিরুদ্ধে। সেই প্রথম দাউদ গিলানির মনে জন্ম নিল একটি বিশেষ বোধ। ইন্ডিয়া আমাদের শত্রু। ইন্ডিয়াকে যেভাবে হোক ধ্বংস করতে হবে একদিন।

দাউদ মোটেই ভালো ছাত্র নয়। মিডিওকার। তবে পড়াশোনা নয়। সবথেকে বড় ধাক্কা এল তার বাবা মায়ের দিক থেকে। কারণ সুখ টিকল না। সিরিল হেডলি ডিভোর্স ফাইল করলেন। হয়েও গেল। এই দম্পতির সন্তান দাউদ গিলানি রয়ে গেল বাবার কাছে। এবং

বাবা আবার বিয়ে করলেন। এবার তাঁর স্ত্রী আর বিদেশিনী নয়। এক পাকিস্তানি মহিলা। কিন্তু এই নতুন মায়ের সঙ্গে মোটেই সম্পর্ক ভালো নয় দাউদের। ক্রমেই ওই দম্পতির আরও সন্তানের জন্ম হল। আর দাউদকে সম্পূর্ণ অবহেলা করতে শুরু করলেন বাবা সেলিম গিলানি। বাড়িতে সে অবহেলিত। আর পাড়া প্রতিবেশী তাকে সম্বোধন করে গোরা বলে। কারণ তার গায়ের রং। তাকে পাকিস্তানি নয়, আমেরিকানই মনে হয়। এক চরম আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের মধ্যে দাউদকে আচমকা নিজের কাছে ডেকে নিলেন মা সিরিল হেডলি। এবং সেই মুহূর্ত থেকে দাউদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যখাতে ঘুরে গেল। শিকাগোর সেকেন্ড স্ট্রিটে একটি পাব চালান মহিলা। জায়গাটার নাম চেস্টনাট। মিক্সড কালচারের কাস্টমার আসে। সেখানে ছেলেকে বসতে বলেন মা। দাউদের ওসব ভালো লাগে না। বরং তার নতুন একঝাঁক বন্ধু হয়ে গেল যাদের সঙ্গে তার নতুন জীবন। সেই জীবনের নাম ড্রাগ পেডলিং। সিরিল শেষ চেষ্টা করেছিলেন আর্মি কলেজে চান্স পাইয়ে দিতে। দাউদ গিলানি ততদিনে নিজের রাস্তা করে নিয়েছিল। ১৯৮৫ সালেই সে জীবনের প্রথম বিবাহটি করে ফেলল। একটি কানাডিয়ান মেয়েকে। পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা সেই মেয়েটি বেশিদিন থাকতে পারল না। কারণ ১৯৮৮ সালে শিকাগোর হোটেলে ড্রাগ পাচারের ঠিক মুহূর্তে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির গোয়েন্দারা হাতেনাতে ধরে ফেলল দাউদকে। আমেরিকায় ড্রাগ পেডলিং। সাংঘাতিক সাজা হবে। তবে ডিইএ গোয়েন্দারা একটা শর্ত দিল। যদি দাউদ ওই ড্রাগ বিজনেসের মাথাদের চিনিয়ে দেয় কিংবা ধরিয়ে দেয় তাহলে তার সাজা কমিয়ে দেওয়া হবে। দাউদ রাজি।

ঠিক দুদিন পর শিকাগোর নিউ স্ট্রিট অ্যাপার্টমেন্টে দাউদ বসে আছে। সে ডেকেছে তার পরিচিত ড্রাগ মাফিয়া দুজনকে। একটা বড় কনসাইনমেন্ট পেয়েছে সে। সেটাই হ্যান্ডওভার করা হবে। রিচার্ড রাউন্ডট্রি আর ডেরিল ট্যাংক। শিকাগোর সবথেকে গোপন কুখ্যাত ড্রাগ মাফিয়া টিম। তারা সঙ্গে করে এনেছিল একটা লাল সুটকেস। কফি এল লিভিং রুমে। দাউদ বলল, ১৫ কেজি আপাতত আছে। বাকি ১৫ কেজি আগামীকাল ডেলিভারি। উঠে ক্যাবিনেট থেকে বের করে আনল ব্যাগ। একটা ফয়েল পেপারে মোড়া

প্যাকেট। রিচার্ড সেটি হাতে নিয়ে বলল এটা সব আমাদের? দাউদ হেসে বলল ইয়েস বস! তৎক্ষণাৎ ডলারের প্যাকেট বের করে দাউদের হাতে দিল রিচার্ড হাসতে হাসতে।

তাহলে নেক্সট ডিল কবে? দাউদ বলল, ভেরি সুন। এবার পরস্পরকে হ্যান্ডশেক করে উঠে পড়ল তারা। আর পাশের ঘর থেকে আচমকা বেরিয়ে এল চারজন শক্তসমর্থ লোক। ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির গোয়েন্দা। এই ঘরে তারা আগেই গোপন ক্যামেরা আর অডিও সিস্টেম লাগিয়ে রেখেছিল। কারণ প্রমাণ চাই। দাউদ নিখুঁত অপারেশনে শিকাগোর দুই কুখ্যাত মাফিয়াকে ধরিয়ে দেওয়ায় তার ৮ বছরের জেল অর্ধেক করে দেওয়া হল। চার বছর জেলে। বিচারক বলেছিলেন, মিস্টার গিলানি ইউ আর আ ইয়ং গাই। আপনি এরপর নিজের মতো করে আবার নর্মাল লাইফ কাটান। দাউদ গিলানি হেসেছিল। কারণ সে শোধরায়নি। চার বছর জেলে কাটানোর পর আবার সে ফিরে গিয়েছিল সেই পুরোনো বিজনেসে। তবে অন্য শহরে। শিকাগো আর নয়। এবার নিউ ইয়র্ক। ১৯৯৭ সালে কিন্তু সে আবার লাহোর থেকে নিউইয়র্ক আসার পথে ড্রাগ নিয়েই ধরা পড়ে গেল। আশ্চর্য বিষয় হল আবার সেই একই কাহিনি। এবারও ডিইএ গোয়েন্দাদের সে বলল, আমি আপনাদের আসল ড্রাগ বিজনেসম্যানদের ধরিয়ে দিতে হেল্প করছি। আমার সাজা কমাতে হবে। রাজি গোয়েন্দারা। এবং এবার যে সে নয় আমেরিকার সবথেকে ওয়ান্টেড ড্রাগ মাফিয়া জেমস লুইসকে ধরিয়ে দিল দাউদ। জেমসের ১০ বছর জেল। অথচ দাউদের মাত্র ১৫ মাসের জেল হয়েছিল। একই জেলে থাকাকালীন জেমস বলেছিল ১৫ মাস পর তুমি জেল থেকে রিলিজ হবে। তারপর এই পৃথিবী থেকেই রিলিজ করে দেওয় হবে। আমার সঙ্গে বেইমানি! কেউ বাঁচেনি দাউদ! তুমিও না।

দাউদ মরতে চায় না। অতএব ১৫ মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে সবার আগে লাহোরের বিমান ধরল। ১০ দিন পর লাহোরের কাদিশিয়া জামা মসজিদে নমাজ পড়তে ঢুকেছিল দাউদ গিলানি। কী ব্যাপার? এরকম কঠোর নিরাপত্তা কেন? গোটা মসজিদ ঘিরে রেখেছে কার্বাইন আর এ কে ফর্টি সেভেন হাতে একঝাঁক সুরক্ষাবাহিনী। দাউদ ভাবল নিশ্চয়ই টেররিস্ট থ্রেট আছে। তাই এই নিরাপত্তা। কিন্তু তারপরই তার চোখ পড়ল মসজিদের

বাইরের রাস্তায় একটি বিরাট বড় বিলবোর্ডে। সেখানে লেখা আছে অদ্ভুত একটা বার্তা। এরকম প্রকাশ্য বার্তা কোনো দেশে থাকতে পারে তা কল্পনাই করেনি দাউদ গিলানি। বিলবোর্ডে লেখা 'জিহাদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন। জিহাদে অংশ হওয়ার জন্য এখানে যোগাযোগ করুন।' সঙ্গে একটা মাত্র ফোন নম্বর। প্রকাশ্যে এরকম জিহাদের ঘোষণা? আর জয়েন করতে বলা হচ্ছে টেররিজমে? আশ্চর্য দেশ তো! দাউদ গিলানি নিজের লক্ষ্য স্থির করে ফেলল। ওই পোস্টারে লেখা নম্বরে ফোন করে সে বলল, আমি টাকা ডোনেট করতে চাই! ওপ্রান্তে যে ছিল সে বলল আপনি ফোন রাখুন। আমি কল ব্যাক করছি। এক মিনিটের মধ্যে কলব্যাক।

হ্যাঁ জনাব বলুন।

আমি জিহাদের ডোনেশন করতে চাই। কীভাবে করব?

আপনি কোথায় আছেন বলুন? আমরা লোক পাঠাচ্ছি।

লাহোরের ফ্ল্যাটের ঠিকানা বলল দাউদ। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আবিদ আলি সেখানে ডোরবেল বাজাল। ৫০ হাজার টাকা দিল দাউদ। আর বলল আজ খুব ভালো দিন। আপনি বিকেলে আমাদের ওখানে আসতে পারেন। সমাবেশ আছে। আমাদের বড়া সাহেব বলবেন। আসবেন জনাব! দাউদ গিলানি জানাল অবশ্যই যাবে। সে গেল। এবং সেই প্রথম সেই বড়া সাহিবকে দেখে দাউদ মুগ্ধ হয়ে গেল। লোকটা দুর্দান্ত কথা বলতে পারে। কাশ্মীরে ইন্ডিয়া যে এভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে তা লোকটা এমনভাবে বলছিল যে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আমাকে কাশ্মীর যেতে হবে। ভাবল দাউদ গিলানি। এগিয়ে গেল সেই লোকটির দিকে। সাদা লং ঝুলের কুর্তা। লোকটার নাম হাফিজ সঈদ। লস্কর ই তৈবার কমান্ডার ইন চিফ! ২০০১। দাউদ গিলানির জীবনের সেকেন্ড ইনিংস শুরু হল ওই লোকটার হাত ধরে।

প্রায় পাঁচ বছরে দাউদ গিলানি লস্কর ই তৈবার বিশ্বাসযোগ্য আন্ডারকভার এজেন্ট। তাকে ততদিনে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফফরাবাদে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। এবং একের পর এক ক্যাম্পে বক্তৃতাও দিতে হয়েছে। তার বক্তৃতা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ

তাকে দেখতে বিদেশির মতো। আর তার পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে আমেরিকা থেকে আসা আমাদের এজেন্ট! অতএব বাচ্চা বাচ্চা টেররিস্টরা মুগ্ধ। কিন্তু ওসব বক্তৃতা দিয়ে কোনো মজা নেই। দাউদ চায় অ্যাকশন। সে চাইছে ইন্ডিয়ায় ঢুকে ইন্ডিয়াকে কীভাবে অ্যাটাক করা যায় আর সেই অপারেশনের সে হবে অন্যতম কমান্ডার! সে একদিন হাফিজ সঈদকে বলল আমি কাশ্মীর যেতে চাই। সঈদ হেসে বলল, তুমি এখন লাখভির আন্ডারে। যা বলার ওকে বল। ওর সাথে কথা বলে ঠিক করবে। ও যা বলবে তাই হবে। লাখভি মানে হল জাকিউর রহমান লাখভি। লস্করের সেকেন্ড ইন কমান্ড। তাকে একই কথা বলল দাউদ গিলানি। কাশ্মীর যাব। লাখভি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, কাশ্মীরে আমরা শুধু ইয়ং ছেলেদের পাঠাই। ওখানে অপারেশন অনেক কঠিন। আর ফিদায়ে (আত্মঘাতী) ফোর্স। তোমার বয়স অনেক বেশি। তোমাকে কাশ্মীরে পাঠানো সম্ভব নয়। তোমার জন্য অন্য কাজ আছে। কী কাজ? মুম্বই যেতে পারবে? ওখানে থাকতে হবে। গোটা শহরের সবথেকে ফেমাস যে জায়গাগুলোতে সবথেকে বেশি ভিড় থাকবে আর প্রচুর ফরেনার থাকবে সেই জায়গাগুলোর গোটা ছবি, ভিডিও, রিপোর্ট সব চাই আমাদের। বিশেষ করে ইজরায়েল আর আমেরিকান থাকবে এরকম জায়গা। মনে রেখো। ইহুদি আর আমেরিকান ক্রাউড চাই। ইন্ডিয়ান তো আছেই। এক আধদিন নয়। তোমাকে থাকতে হবে বহু দিন। মাসের পর মাস। ওখানে তোমাকে বন্ধু তৈরি করতে হবে। তুমি আস্তে আস্তে হয়ে যাও মুম্বইয়ের লোক। যত টাকা লাগবে আমরা দিচ্ছি। ওসব নিয়ে ভেবো না। যখন জানবে তোমার ওই শহর সম্পর্কে আর কিছুই জানার নেই তখন আমাদের জানাবে। তবে প্রতিদিন তোমাকে জানাতে হবে সারাদিন কী কী করলে। পারবে? তার আগে তুমি ৬ মাসের একটা ট্রেনিং নাও। তোমার ট্রেনার হবেন দুজন। সাজিদ মীর। আমাদের অপারেশন কমান্ডার। আর মেজর ইকবাল। এ লোকটি আইএসআইয়ের। তবে নিখুঁত অপারেশনের প্রশিক্ষণ একজনই নেবে। তার নাম ব্রিগেডিয়ার রিয়াজ। আইএসআই গুপ্তচর ফোর্সের ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংক। দাউদ চমকে গেল! লস্কর তার মানে নিছক কোনো টেররিস্ট গোষ্ঠী নয়! পাকিস্তান আর্মি, পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনী সকলে মিলেই এই গোটা সন্ত্রাস সাম্রাজ্যটি চালাচ্ছে? প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে দাউদ গিলানি জাকিউর লাখভির কাছে

জানতে চাইল এবার কী? জাকিউর বলল, এবার তুমি আমেরিকা হয়ে সেখানকার সিটিজেন হিসাবে মুম্বইয়ে যাবে। একবার ইন্ডিয়ায় নামার পর পাকিস্তানের কোনো ফোন নম্বরে একটাও কল করবে না। একমাত্র ইমেল করবে। যা কমিউনিকেশন সব আমেরিকার নম্বরে। আমেরিকায়? আমি তো কাউকেই চিনি না ওখানে তোমাদের গ্রুপের? জাকিউর রহমান লাখভি হাসল। তুমি শিকাগো নিউইয়র্কে ড্রাগ ব্যবসা করলেও এখনও চোখ-কান খোলা রাখতে শেখোনি দাউদ। শিকাগোয় তোমার সবথেকে প্রিয় বন্ধু সেই ছেলেবেলার বন্ধু রানা আমাদের লোক! তার কাছে তোমার সব ডিটেল না নিয়ে কি আমরা তোমাকে গ্রুপে জায়গা দিলাম? যে কেউ এসে ডোনেশন দিতে চাইল আর তাকে আমরা নিয়ে নেব এটা হয়? তুমি জানো এখনও আমরা জানি না আমাদের গ্রুপে কিংবা জৈশের মধ্যে কোনো ইন্ডিয়ান স্পাই আন্ডারকভার এজেন্ট আছে কিনা? হয়তো আছে। তাই আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না। দাউদ গিলানি অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে রইল! রানা লস্কর এজেন্ট? জাকিউর তার কাঁধে হাত রেখে বলল, মুম্বইয়ে যা যা করতে বললাম শুধু মনে রেখো। কেন, কী জন্য, কবে, কোথায় এসব প্রশ্ন করবে না। সঠিক সময়ে সময়ে ইনফরমেশন তোমাকে দেওয়া হবে। সবার আগে শিকাগো যাও। নাম পালটাও। তুমি এবার থেকে আমেরিকান! মুম্বইয়ে একটাও হিন্দি আর উর্দু বলবে না। ইয়াদ রাখনা দাউদ, ইসবার ইন্ডিয়া কো ইতনা বড়া ঝটকা দেনা হ্যায় কে উও মুলক হিল যায়ে গা! কভি সোচভি নেহি সকতা অ্যায়সা কুছ হোনেবালা হ্যায়। খালি ইন্ডিয়া নেহি, পুরি দুনিয়া আমাদের পায়ে পড়বে দেখো..! জাকিউর রহমান লাখভি দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে উঠল! সেই প্রথম জীবনে সামান্য ভয় পেয়ে গেল দাউদ। সে ভাবল কী করতে চাইছে এরা? আমেরিকা ফিরে গিয়ে একমাসের মধ্যে নাম পালটে ফেলল সে। এবং নতুন পাসপোর্ট নিয়ে ইন্ডিয়ায় এসে নামল ডেভিড কোলম্যান হেডলি।

একটা জিমে জয়েন করতে হবে। জিম ছাড়া ডেভিডের চলে না। তার কাছে সবার আগে শরীর। সাউথ মুম্বইয়ে পেয়ে গেল মোটামুটি একটা ভালো জিম। মোক্ষ ওয়েলনেস। একজন বিদেশি তাদের জিমে ওয়ার্ক আউট করতে এসেছে এটা তো বেশ

ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের ব্যাপার। তাই স্বাভাবিকভাবেই ডেভিডকে যথেষ্ট উষ্ণতার সঙ্গে আপ্যায়ন করা হল। এই ফর্মটা ফিল করতে হবে স্যার

হ্যাঁ দিন।

এখানে নাম, লোকাল অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট নম্বর লিখে দিন। ঠিক আছে? ফর্ম ফিল আপের পর বলল হেডলি।

আপনার দুটো ফোটোগ্রাফ লাগবে স্যার।

কিন্তু আমার তো ফোটোগ্রাফ নেই। কী করা যায়? পরে একসময় দেওয়া যায়? রিসেপশনের লোকটি সামান্য কয়েক সেকেন্ড ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা কোনো প্রবলেম নেই স্যার।

হেডলি আবার হাসল। আবার মনে মনে ইন্ডিয়ানদের একটা বিশুদ্ধ হিন্দিতে গালাগালি দিল। কারণ আমেরিকায় হলে এরকম জীবনে হতেই পারে না যে উইদাউট ফোটো একজন বিদেশিকে একটা ক্লাবে জয়েন করতে দেওয়া হচ্ছে। ভাবাই যায় না। আমাকে কেমন দেখতে আগামীদিনে এদের কাছে কোনো প্রমাণই থাকবে না? কী বোকা এরা! ভাবল ডেভিড! কারণ ওই পরে দেব আসলে কথার কথা। কোনোদিনই দেবে না হেডলি নিজের ছবি। জিমে অনায়াসে ভর্তি হওয়া গেল। জিম ইনস্ট্রাকটর বিলাস ওয়ারাক খুব পছন্দ করে ফেলেছে এই নতুন ভর্তি হওয়া আমেরিকানকে। কারণ লোকটাকে সে নিজে কী বডি ওয়ার্ক আউট শেখাবে? লোকটি আগে থেকেই অনেক বেশি জানে। বরং এই হেডলির থেকেই কত কিছু শেখার আছে। দারুণ কথা বলতে পারে। আর সবথেকে বড় কথা খুব সামান্য হিন্দি চট করে শিখে যাচ্ছে। আজকাল কয়েকটি কথা সে বেশ বুঝতে পারে। অল্পদিনের মধ্যেই ডেভিড আর বিলাসের সম্পর্ক নিছক জিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। তারা বিকেলেও দেখা করতে লাগল পরস্পরের সঙ্গে। কেন এত আগ্রহ ডেভিডের? কারণ ততদিনে জানা হয়ে গিয়েছে যে বিলাস একজন শিবসেনার কর্মী। সে নিয়মিত যায় শিবসেনার সদর দপ্তরে। আর ডেভিডকে যেসব জায়গার ভিডিও করতে হবে, ভিতরের খুঁটিনাটি জানতে হবে সেই তালিকায় রয়েছে শিবসেনার হেডকোয়ার্টারও। সেনাভবন!

অতএব বিলাসকে আরও বেশি করে বন্ধুত্বের জালে আটকে ফেলছে ডেভিড। সকালে জিম। দুপুরে লাঞ্চের পরই ডেভিড বেরিয়ে যায় মুম্বই সফরে। হাতে ক্যামেরা। সে ভিডিও তুলছে তাজমহল হোটেলের। ভিডিও তুলছে চার্চগেট রেল স্টেশনের বাইরে। সিএসটি স্টেশনের বাইরে। টাকা আসছে কোথা থেকে? এভাবে মাসের পর মাস থাকা? নিয়ম করে তাহাওয়ার রানা ব্যাংকে টাকা ট্র্যান্সফার করে দিত। ব্যাংকটি ছিল ট্রাইডান্ট হোটেলের কাছে। তবে একটা নিজের কিছু করা দরকার। সবথেকে সোজা কাজ হল ইমিগ্রেশন সংস্থা করা। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের একটাই কমন ইস্যু। প্রায় সিংহভাগ ইয়ং ছেলে বিদেশে যেতে চায়। তাই ওই ব্যবসার চাহিদা সাংঘাতিক। ডেভিড নতুন একটি অফিস খুলল নিজের। তারদেও এ সি মার্কেটে। অফিসের নাম ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ইমিগ্রেশন! সেই অফিসে একজন সেক্রেটারি রাখা হয়েছে। যাতে কোনো সন্দেহ না হয়। তার নাম মাহরুখ ভারুচা।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। জিম বন্ধ। বিলাসের ছুটি। ডেভিড তার আগেই জেনে নিয়েছে একটা বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন আছে। শিবাজি মন্দিরের কাছে। সে কি যাবে? বিলাস বলল, আমিও তো যাচ্ছি ওখানে। আমার এক বন্ধু আসবে। চলো। বডি বিল্ডিং ডেভিড কোলম্যান হেডলির এক সাংঘাতিক প্যাশন। ওখানেই কেটে গেল দিনের প্রথম ভাগ। আর দ্বিতীয়ার্ধে একটি ঝকঝকে দারুণ ফিগারের টোনড বডির যুবক এল বিলাসের সঙ্গে দেখা করতে। বিলাস তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ডেভিডের।

ডেভিড এই আমার বন্ধু রাহুল।

হাই রাহুল, দিজ ইজ ডেভিড।

রাহুলেরও খুব পছন্দ হয়ে গেল ডেভিডকে। রাহুলের পরিচয় শুনে ডেভিডের মুখটি কি সামান্য চকচক করে উঠল?

সেদিন রাতে রিলায়েন্স সাইবার কাফেতে ঢুকে লস্কর ই তৈবা আর আইএসআইয়ের হ্যান্ডলার সাজিদ মীর আর মেজর ইকবালকে ইমেলে জানাল ডেভিড তার নতুন বন্ধুর কথা। বলল, কাজ ভালোই এগোচ্ছে। অনেক ভিডিও হয়ে গিয়েছে। আর এই নতুন বন্ধু

দুটি ইয়ং ছেলে বেশ কাজে আসবে মনে হচ্ছে? কারা তারা? বিলাসের কথা তো আগেই বলেছ? সাজিদ মীর জানতে চাইল। এবার ডেভিড লিখল, ছেলেটির নাম রাহুল। রাহুল ভাট। ফিল্ম ডিরেক্টর মহেশ ভাটের ছেলে!

ওপ্রান্ত থেকে সাজিদ মীর শুধু লিখল, মাই গড! কীভাবে করলে এরকম একটা কাজ? ইউ আর ডেঞ্জারাস!

ডেভিড সাইবার কাফেতে বসে হাসল! এবার শুরু হবে আসল অপারেশন!

পাকিস্তানের ফরিদকোটের এই গলিতে কোনো বিদ্যুৎ নেই। জলের পাইপলাইন নেই। প্রতিটি বাড়ি টিনের ছাদ। আর মহল্লার পিছনে কমিউনিটি বাথরুম। যেটা এককথায় জাহান্নামের সমতুল। পুতিগন্ধময় মলমূত্র রাস্তায় নেমে আসছে। সেসবের উপর দিয়েই রোজ গোটা মহল্লার নারীপুরুষ অবর্ণনীয় নরকে গিয়ে প্রাকৃতিক কর্ম থেকে স্নান সবই করছে। ৪৫ বছরের নুর ইলাহি ঠিক ওই আবর্জনাপূর্ণ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বড় ছেলেকে একটা চড় মারলেন! শুধু খাওয়ার সময় আসিস। খাওয়াটা কোথা থেকে আসছে জানিস? একবেলার নিজের খাওয়া জোগাড় করতে পারবি? পারবি না! জায়গাটার নাম ওকারা। পশ্চিম পাঞ্জাবের পূর্বপ্রান্তে। এমন একটা লোকেশন যেটা হাজার হাজার বছর আগে ছিল আদতে সিন্ধুসভ্যতার অংশ। এখনও এসব জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করলে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু এখন একদা পৃথিবীর সেই সেরা সভ্যতার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শয়ে শয়ে বস্তি। এটাই হল লস্কর ই তৈবার বিশ্বস্ত রিক্রুটমেন্ট সিটি। ওই যে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টারে যেসব যুবকের ছবি টাঙানো, তারা সেই কিন্তু ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল নয়। তারা হিরো। ইন্ডিয়ার কাশ্মীরে জিহাদে গিয়ে ইন্ডিয়ান সেনাদের হাতে নিহত হয়েছে। তাই তাদের পরিচয় শহিদ। প্রতিটি মহল্লায় সবথেকে বেশি দেওয়াল লিখন- ‘চলো.. জন্নত চলো...’। শুধু যুবকদের নয়। শিশু কিশোরকেও চাই। ছোট থেকেই ট্রেনিং দিলে সেইসব বাচ্চা একটু বড় হয়ে অনেক পাকাপোক্ত জঙ্গি হয়ে যায়। তাই লস্করের মিডিয়া সেল এই শহরে একটি পত্রিকা চালায়। সেই পত্রিকার কার্টুন স্ট্রিপের নাম ‘জো’। ‘জো’ হল একটি কিশোর চরিত্র, যে বারংবার কার্টুনের নিত্যনতুন গল্পে ইন্ডিয়ায়

হামলা করে আর প্রতিবারই জয়ী হয়ে ফিরে আসে। তাই কার্টুন ক্যারেকটর জো প্রবল জনপ্রিয় এই ফরিদকোটে। বাচ্চারা সকলে চায় 'জো' হতে। লস্করের কাজটা সহজ হয়ে যায়। কারণ এই শহরের সেই পরিবারই সবথেকে বেশি সম্মান পায়, যাদের ছেলে জিহাদে যোগ দিয়েছে। মাঝেমধ্যে তারা আসে বাড়িতে। পিঠের রুকস্যাকে কার্বাইন। সেই সময় বীরের মতো সম্মান সংবর্ধনা লাভ করে। প্রতিদিন মহল্লায় তাকে ঘুরে ঘুরে বীরত্বের কাহিনি বলতে হয়। আর প্রতিবারই তার সঙ্গে একজন অন্তত নতুন ছেলে যায়। নুর ইলাহির স্বামীর নাম আমির। এই পরিবারের আগে ছিল পশু বিক্রির ব্যবসা। সেটি চলল না। এরপর পশু জবাই করে বিক্রি করার জীবিকায় প্রবেশ করল। সেও প্রায় দুই প্রজন্ম হয়ে গেল। আর তাই তাদের পদবিও হয়ে গেল ওই জীবিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। পদবির নাম কাসব। 'আমির কাসবের চার ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। তবে এভাবে চলছে না। তাই আমির লাহোরের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সাইটে কাজ নিয়েছে। সপ্তাহে আয় ৪০০ টাকা। ২০০০ সালে যখন গোটা মহল্লা আনন্দ করছে, কারণ দিল্লিতে জেলবন্দি দুর্দান্ত জঙ্গি নেতা মৌলানা মাসুদ আজহারকে ইন্ডিয়া জেল থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। না ছেড়ে উপায় ছিল না। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডু দিল্লি ফ্লাইট হাইজ্যাক করে কান্দাহারে নিয়ে আসা হয়েছে। আর ওই চাপ সামলাতে পারেনি ইন্ডিয়ার সরকার। তাই মাসুদকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মহল্লায় মহল্লায় মিঠাই বিলি হচ্ছে। আর ঠিক তখনই আমির কাসবের ধরা পড়ল এক অসুখ। টিবি। লাহোরে গিয়ে আর কাজ করা সম্ভব নয়। তাই ফরিদকোটেই যা কাজ পাচ্ছে করছে। কিন্তু টিবি নিয়ে কি এসব পরিশ্রমের কাজ সম্ভব? সপ্তাহে ৪০০ থেকে কমে তাদের পারিবারিক আয় দাঁড়াল সপ্তাহে ১৭৫ টাকা। আর পরিবারের বড় ছেলে এসবের ভ্রূক্ষেপ না করে পানমশলা চিবাতে চিবাতে সারাদিন ধরে শুধু ফরিদকোটে বাসস্ট্যান্ডে আড্ডা মারে কিছু লোফার ছেলের সঙ্গে। হাইট শর্ট। লম্বা চুল। আমির কাসবের এই অবাধ্য ছেলেটির নাম আজমল কাসব। ১৯৮৭ সালে জন্ম। মা নুর ইলাহির সেই চড়টি খেয়ে আজমল পরদিনই আব্বার থেকে এক পরিচিত লোকের ঠিকানা নিয়ে চলে গেল লাহোর। সেই কাজেই যোগ দিল, যে কাজ তার বাবা এতদিন করে এসেছে। অর্থাৎ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের লেবার। ভোর চারটেয় প্রতিদিন ওঠা। আর সারাদিন ওই

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সপ্তাহে ৩৫০ টাকা! ১৪ বছরের আজমলের আর ভালো লাগেনি। বন্ধু মুজফফরকে একটা বন্দোবস্ত করতে বলল। পড়াশোনা না করা ছেলে আর কীই বা কাজ পাবে? তাই কোনো কাজই নেই। ৬ বছর কেটে গেল ঠিক এইভাবেই। ২০ বছর বয়স আজমলের। মুজফফর একটা ভালো কাজ পেয়েছে। ওয়েলকাম টেন্ট সার্ভিস। ঝিলম শহরে যেতে হবে। ইসলামাবাদ রোডের উপরই জায়গাটা। আজমলকেও একদিন নিয়ে গেল। কাজ হল ক্যাটারিং সার্ভিসের। তাও ওই কনস্ট্রাকশনের লেবারের থেকে ভালো। কিন্তু একমাসের মধ্যে মুজফফর বুঝিয়ে দিল সাদা কাজে তার আটকে থাকার কোনো ইচ্ছাই নেই। একই কাজ করে দুজনে। অথচ মুজফফরের জামা কাপড় ঝকঝক করছে। শুক্রবারে নমাজ থেকে ফিরে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে। কোরমা, বিরিয়ানি, চিকেন রেজালা। কীভাবে হচ্ছে? আজমলের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষায় ছিল সে। শিখিয়ে দিল কীভাবে পয়সা রোজগার বাড়াতে হয়। খুব সিম্পল। যদি দেখা যায় কোনো একটি বাড়ি বা অফিস তালাবন্ধ পরপর কয়েকদিন, তাহলে বাথরুমের জানালা থেকে ঢুকতে হয় সেইসব বাড়ি আর অফিসে। আর তারপর কাজটা সহজ। তবে একতলা বিল্ডিং হওয়া দরকার। কাজের সুবিধা হয়। সোজা কথায় চুরি। পরপর সাতটি ঘটনা ঘটাল দুজনে মিলে। একবারও ধরা পড়ল না। কারও সন্দেহই হল না ওয়েলকাম টেন্টে কাজ করা দুটো ছোকরা এলাকায় এলাকায় চুরি করে বেড়াচ্ছে। পকেটে পয়সা আসছে। আজমল আর মুজফফর একটি শুক্রবার ছুটির দিন সিনেমা দেখতে যাবে স্থির হয়েছে। বম্বের সিনেমা। নাম শোলে। একজন পুলিশ অফিসার দুজন চোরকে রিক্রুট করেছে এক ডাকাতকে ধরার জন্য। আর তার জন্য মোটা টাকা দেওয়া হচ্ছে। গোটা সিনেমাটা একবার দেখেও আশ মিটল না। পরপর তিনদিন তিনটে শো দেখার পর তারা করল এটাই পথ। ইন্ডিয়াকে এরা কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ইন্ডিয়ার একটাই জিনিস বেস্ট। মুভি। তাহলে 'শোলে' তাদের শিখিয়ে দিল কীভাবে কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করা যায়। আর এসব পাবলিককে ক্যাটারিংয়ের খাবার খেতে দেওয়ার মতো ফালতু কাজ পোষায় না। নাম কিনতে হবে। আর তার জন্য দরকার আর্মস। ২০০৭ সালের নভেম্বরের দুপুরে ঝিলম শহর থেকে দুটি যুবক রাওয়ালপিন্ডিগামী বাসে উঠে পড়ল বন্দুক কেনার জন্য। কিন্তু সেখানে তো কিছুই চেনে

না এরা। চিন্তার কিছুই নেই। একটা মোবাইল নম্বর দিয়েছে মুজফফরের বস। যার হয়ে সে কাজ করে। আইডিয়া সেই বসের। রাওয়ালপিন্ডি চলে যা। সেখানেই আছে আর্মসের ডিলার। আর সঙ্গে আরও বড় কাজের সুযোগ।

গোটা শহর যেন সেজে উঠেছে। একদিকে ইলেকশন আসছে। আর অন্যদিকে ঈদ। তাই রাওয়ালপিন্ডি শহরের সর্বত্র রংবেরঙের টেন্ট, শামিয়ানা আর মেকশিফট দোকান। যে ঠিকানা পকেটে ছিল সেই ঠিকানা একটি জামাকাপড়ের গোডাউন। সঙ্গে মোবাইল নম্বর। চিঠিটা দেখাতেই দোকানে থাকা মধ্যপঞ্চাশের ব্যক্তি এক ঝলক তাকিয়ে গদি থেকে উঠে পড়লেন। আর হাতের ইশারায় বললেন পিছন পিছন আসতে। অবাক হল আজমল। কী ব্যাপার! এত গোপনীয়তা কেন? তবু পিছনে গেল। প্রায় মিনিট পাঁচেক হাঁটা। একটা বড় প্রাঙ্গণকে ঘিরে নানারকম টেন্ট। তারই একটিতে ঢুকে এক বৃদ্ধের কানে কানে ওই লোকটি কিছু একটা বলছে। আজমল আর মুজফফর সামনে দাঁড়িয়ে। ৩০ সেকেন্ডের ওই ফিসফিসের পর বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন দুজনকে। সব হয়ে যাবে। একবার এসেছ যখন। এখন রেস্ট নাও। তারপর খেয়ে বেরিও। মাটন আর ভাত। আশ্চর্য তো! একটামাত্র আর্মস কেনার কাস্টমারকে এত খাতিরদারি! আজমল কাসবের মনে হচ্ছে এই প্রথম তার বেশ দাম আছে। খাওয়া দাওয়ার পর টেন্টের পিছনদিকে নিয়ে যাওয়া হল। আরে! টেন্টের পিছনে এরকম একটা আস্ত অফিস! বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না। এক গম্ভীর যুবক বসে। সে শুধু একটা চিরকুট এগিয়ে দিল। কাসব পড়াশোনা না জানলেও এটুকু পড়তে পারল কী লেখা আছে। সেটায় লেখা-দউরা ই সুফা! তাদের বলা হল এই চিরকুট নিয়ে যেতে হবে লাহোর শহরের কাছেই একটা জায়গায়। মুরিদকে।

ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর আজমল কাসব আর মুজফফর এসে নামল লাহোর থেকে ৩০ মিনিট বাসদূরত্বের জায়গা মুরিদকে স্টপেজে। বাসস্টপে নেমে যেতে হবে বিশেষ একটি এলাকায়। যার নাম মারকাজ ই তৈবা। এটা কী? আসলে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। গেট থেকে ভিতরে ঢুকলেই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় রাস্তা। সেই রাস্তার দুদিকে ফুল

আর সবুজ উদ্ভিদে ঢাকা পাথওয়ে। অন্তত চারটে খেলার মাঠ। কিছুক্ষণ পর পর একটি করে গার্ডেন। ব্যাক গেটের সামনে বিরাট এক সুইমিং পুল। চারদিকে বড় বড় বিল্ডিং। সবথেকে বৃহৎ ভবনটির নাম আবু হারেরা মসজিদ। সেই বিল্ডিংয়ে একসঙ্গে ৫ হাজার মানুষ বসতে পারে। অফিসে বসিয়ে রাখা হল অনেকক্ষণ। প্রায় ৪০ মিনিট পর একটি লম্বা মানুষ ঢুকল। অফিসে উপস্থিত সকলেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। এই হল চাচা জাকি! লস্কর ই তৈবার নম্বর টু কমান্ডার! আর লাহোর থেকে ৩০ মিনিট দূরত্বের এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হল লস্কর ই তৈবার জঙ্গি তৈরির কলেজ। আজমল কাসব আর তার বন্ধুকে বলা হল তোমাদের আপাতত পাঁচদিনের একটা কোর্স করানো হবে। পাঁচদিন পর বলবে তোমরা এখানে থাকবে কিনা! ঠিক পাঁচদিন ধরে ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে নমাজের পর সারাদিন ধরে বক্তৃতা শোনা। আর সবথেকে মজার টাইম বিকেলে। ক্রিকেট খেলা। সেই খেলার নিয়ম হল সবথেকে খারাপ প্লেয়ারদের নিয়ে যে টিম তৈরি হবে তার নাম দেওয়া হয় ইন্ডিয়া। আর ভালো পোক্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি টিমের নাম পাকিস্তান। তাই মুরিদকে প্লে গ্রাউন্ডে দিনের পর দিন প্রতিদিন প্রতি ম্যাচেই একটি টিম জিতে যায়। পাকিস্তান। পাঁচদিন পর সকালের নমাজের পর সকলকে ডাকা হল অডিটোরিয়ামে। একটি বিশেষ মানুষ আসবে আজ। ৪০ জন যুবকের দল বসে আছে। অপেক্ষায়। মুখে দাড়ি, রোগাটে চেহারা। একটা কালো চশমা পরা। সানগ্লাস কিনা বোঝা যায় না। মঞ্চের সামনে রাখা পোডিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটির নাম আল কামা! লস্করের অপারেশন কমান্ডার কাশ্মীর সেক্টর। সে বলল, ইন্ডিয়ার বড় বড় সিটিতে অ্যাটাক করা হবে। আমরা এবার ইন্ডিয়ার মধ্যে ঢুকে সেখান থেকেই যুদ্ধ শুরু করব। আর এই যুদ্ধে ইন্ডিয়া হারবেই। ১৫ জনের টিম তৈরি হবে। তোমাদের থেকেই। কে কে রাজি আছো? মনে রেখো এটা হবে ফিঁদায়ে ফোর্স। আত্মঘাতী বাহিনী। পারবে? মনের জোর আছে? যদি বেঁচে ফিরতে পারো তোমরাই হবে পাকিস্তানের নতুন হিরো! চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে তোমাদের মুখ! সোজা জন্নতে যাবে। তোমাদের শরীর এসে নিয়ে যাবে স্বয়ং ফেরেস্তা। আর সেই শরীর থেকে বেরোবে অপূর্ব এক গোলাপের খুশবু! এবার বলো? সবার

আগে একটি শর্ট হাইটের ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জনাব, আমি যাব! ছেলেটির নাম আজমল কাসব!

রাহুল তুমি এত হ্যান্ডসাম! ফিল্মে নামছ না কেন? প্রশ্ন করল ডেভিড কোলম্যান হেডলি।

রাহুলের সবথেকে গোপন স্পর্শকাতর জায়গা। তাঁর বাবার নাম মহেশ ভাট। বোনের নাম পূজা ভাট। কাকার নাম বিক্রম ভাট। অথচ তাঁকেই কেউ সেভাবে চান্স করে দিচ্ছে না। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ডেভিড এই দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছে। ২০০৭ সালের নভেম্বরে রাহুলের বাড়ির ব্যালকনিতে বসে ডেভিড জানতে চাইলেন, ওই কথাটা, রাহুল তুমি ফিল্মে নামছ না কেন? রাহুল চুপ।

ডেভিড জানতে চাইছে, একটা ফিল্ম তৈরি করতে কত টাকা দরকার হয়? একটা ছোট বাজেটের সিনেমা করতে প্রায় ৫ থেকে ৬ কোটি টাকা তো লাগবেই। ইউ মিন টু মিলিয়ন?

ইয়েস, অ্যাক্সিমেটলি।

ওকে! ইটস ভেরি ইজি! আই উইল ট্রাই ফর ইউ বয়! চিয়ার আপ!

রাহুল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ডেভিড তাঁকে লঞ্চ করাবে? তাঁর কতদিনের স্বপ্ন এই ফিল্ম জগতে ঢোকা।

বাট রাহুল তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। একটা ছোট্ট হেল্প। বিলাস তোমার খুব বন্ধু। ও শিবসেনার ক্যাডার। ওকে বলে আমার সঙ্গে একবার শিবসেনা সুপ্রিমোর রাতে হবে। আই ওয়ান্ট টু মিট হিম! মিস্টার বাল ঠাকরে! আলা

পাঁচদিনের মাথায় বিলাস একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড করে ফেলল। তারা তিনজন গেল মাতশ্রী। বান্দ্রা ইস্ট। বাল ঠাকরের বাড়ি। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ডেভিড বলল, তোমরা জানো মুম্বইয়ে শিবসেনার কটা শাখা আছে? রাহুল আর বিলাস কেউই জানে না। ডেভিড হেসে বলল, ২৪১ টি। আশ্চর্য! এই দুজন সারাজীবন মুম্বই থেকেও এত কিছু জানে না। আর এই আমেরিকান লোকটি এত কথা জানছে কীভাবে? কিন্তু সেদিন বাল

ঠাকরের সঙ্গে দেখা হল না। কারণ তিনি ব্যস্ত। আর এভাবে যাঁর তাঁর সঙ্গে তিনি দেখাও করেন এমন নয়। বিলাস অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেও এতটা খুঁটিনাটি জানেই না। তাই আপাতত আর হচ্ছে না। কারণ ডেভিড চলে যাবে আবার। কয়েকমাস থেকেই ডেভিড চলে যায় আমেরিকা। এটাই নিয়ম। কেন যায়? কোথায় যায়? এখানে ওর নিজের অফিস আছে। লম্বা একটা ভিসা নিচ্ছে না কেন? রাহুল ভাট কিছুই আঁচ করতে পারছে না সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। ততদিনে ডেভিড টার্গেট ঠিক করে ফেলেছে। লিস্ট হয়ে গিয়েছে। সিএসটি স্টেশন, তাজ হোটেল, লিওপোল্ড কাফে, ট্রাইডেন্ট হোটেল। এছাড়া একটা হাসপাতালকে বাছাই করতে হবে। কিন্তু আসল কাজ বাকি। এগুলোর ভিডিওগ্রাফি করা। মেজর ইকবাল লাস্ট ভিজিটে একটা ভিডিও ক্যামেরা দিয়েছে। একজন বিদেশি লোক স্টিল আর ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলছে এটা মোটেই কোনো আশ্চর্য কিংবা সন্দেহজনক দৃশ্যই নয়। হামেশাই দেখা যায় দেশের সমস্ত শহরের দর্শনীয় স্থানে। আর সন্দেহ করলেও চিন্তা নেই। ডেভিড বলতেই পারে সে একটা মুম্বইয়ে ট্র্যাভেল প্লাস ইমিগ্রেশন কোম্পানি চালায়। তাই ক্লায়েন্ট আর ট্যুরিস্টদের দেখাতেই হয় বিখ্যাত জায়গাগুলির ভিডিও সিডি। শুধু কেউ নজর করল না যে এই লোকটি সাধারণ পর্যটকদের মতো বাইরে থেকে ছবি বা ভিডিও করে চলে যাচ্ছে না। ডেভিড কোলম্যান হেডলি বিনা বাধায় ভিডিও করে যাচ্ছে ওই টার্গেটগুলোর এন্ট্রি পয়েন্ট, এক্সিট পয়েন্ট, ফায়ার সার্ভিস, কতজন সিকিউরিটি, সিকিউরিটি ডিউটি চেঞ্জ হয় কখন....। সব। ঠিক এভাবেই কোলাবা থেকে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা একটা আবিষ্কার করা গেল নতুন টার্গেট। একটা পাঁচতলা বিল্ডিং। নাম নরিম্যান হাউস। কী আছে ভিতরে? এবং জেনে চমৎকৃত। হেডলি ইহুদিদের কেন্দ্র। চাবাড সেন্টার। ইজরায়েলের পর্যটক আর স্থানীয় ইহুদিদের থাকার জায়গা। প্রার্থনাস্থলও। সেদিনই রাতে ইমেলে মেজর ইকবালকে হেডলি জানাল নতুন টার্গেটের কথা। ইকবাল উত্তেজিত। সে বলল, এটা দারুণ কাজ করেছ। আমেরিকান, ইজরায়েল, আর ইন্ডিয়া। সবাইকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যাবে। ওয়েল ডান দাউদ! কিন্তু খুব সাবধান। ওই চাবাড হাউসে স্থানীয় ইহুদিরাও থাকে আর ইজরায়েলি ট্যুরিস্টদের

যাতায়াত। তার মানেই ওটা মোসাদের ঘাঁটি। ইজরায়েলের দুর্ধর্ষ স্পাই এজেন্সি! ওদের চোখ মারাত্মক! তাই সতর্ক হয়ে কাজ করবে।

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮। মুম্বইয়ের বিখ্যাত রেস্তোরাঁ হানিবাল রাইসিংয়ের দিকে যাচ্ছে একটা মারুতি এস এক্স ফোর। রাহুল, বিলাস আর ডেভিড হেডলি। জ্যাম আছে। গাড়ি এগোচ্ছে না। কেম্পস কর্নার ক্রসিংয়ে। কার রেডিও ঘোরাচ্ছে রাহুল। ভালো একটা গান শুনতে হবে। আচমকা নিউজ হেডলাইনস চলে আসায় ডেভিড বলল, হোল্ড, এক সেকেন্ড! চলন্ত গাড়িতে নিউজে বলছে কিছুক্ষণ আগেই পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ম্যারিয়ট হোটেলের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫৪ জনের মৃত্যু। ২৫০ জন আহত। ডেভিড স্তব্ধ। সে ভাবল এটা নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান এজেন্সির করা। দাঁতে দাঁত চেপে রইল। খবরটা শুনে প্রাথমিক অভিঘাতে রাহুল আর বিলাসও চুপ। তারপর আচমকা ডেভিড বলল, এরকম অ্যাটাক মুম্বইতেও হতে পারে শীঘ্রই। তোমরা দুজনে কিন্তু সাবধানে থেকো! রাহুল আর বিলাস চমকে উঠল! মানে কী? এসব কী বলছে ডেভিড?

ডেভিডের কাজ শেষ। একটাই ডিউটি বাকি। সেটাই সবথেকে ভাইটাল। একটা সেফ ল্যান্ডিংয়ের সন্ধান করতে হবে। সাজিদ মীর তাকে ইমেলে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে এমন কয়েকটা কোস্ট এলাকা আইডেন্টিফাই করো যেগুলি কোনোভাবেই কোস্টাল পুলিশের পেট্রলিংয়ের নজরদারির মধ্যে নেই। পরদিন হেডলি তাজ হোটেলের সামনে থেকে আরবসাগরে একটি ট্যুরিস্ট বোটে চেপে বসল। প্রথমে এলিফ্যান্টা কেভ। পকেট থেকে বের করল একটা গোপন মূল্যবান জিপিএস রিডিং গ্যাজেটস। আর সকলের অলক্ষ্যে সেই জিপিএস অন করে করে ফোটোগ্রাফি আর ভিডিও করতে লাগল গোটা যাত্রাপথ। বিশেষ করে ফেরা। একদিনে তো হবে না। কারণ সেদিন রাতে তাকে ইমেলে বলা হল দিনের বেলা নয়। তুমি রাতের জিপিএস আর ক্রাউড পাঠাও। এই ধরো সাড়ে ৮ টা থেকে ৯ টা! কেন? আইএসআই এর অফিসার হাসলেন। এখনও আসল অপারেশনের টাইমটা কাউকে বলা হয়নি। তিনজন জানে। হাফিজ সঈদ, সাজিদ মীর, মেজর ইকবাল।

তিনজনের মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে রাত সাড়ে ৮টাই প্রশস্ত সময়। হেডলি পরদিন সন্ধ্যার পর মেরিন ড্রাইভ থেকে প্রথমে গেল কাফে প্যারেড। একটা ট্যাক্সি নেওয়া হল। সমুদ্রতীর ধরে হেডলি সোজা যাচ্ছে। যতক্ষণ না বাধওয়ার পার্ক এল। এটা সবথেকে আদর্শ ল্যান্ডিং হতে পারে। ভাবছিল হেডলি। একটিমাত্র বোট নিয়ে এক মাঝি বসে আছে। তাকে হেডলি বলল, আজ রাত তিনটের সময় আমি সাগরে যাব। নিয়ে যাবে? এই নাও অ্যাডভান্স! ৫০০ টাকা! ওই মাঝি একটি ট্রিপে এত টাকা পায়নি কোনোদিন। এই প্রথম। তাই সানন্দে রাজি। সেদিন নিশুতি রাতে বোটে চেপে সেই নির্জন সমুদ্রতীর থেকে বোট নিয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার সাগরের ভিতরে চলে গেল হেডলি। আর তারপর ফেরার সময় জিপিএস অন করে দিল। সঙ্গে ভিডিও। গোটা রুট। এটাই ফাইনাল। মাঝির হাতে আরও ৫০০ টাকা দিয়ে হেডলি বলল, তোমার নাম কী? কয়েকজন কলেজ স্টুডেন্ট আসছে শীঘ্রই। তোমার বোটে চাপবে। মনে থাকবে তো! মাঝি ঘাড় নাড়ল। আটদিন পর ডেভিড কোলম্যান হেডলি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় একটি বিল্ডিংয়ে ঢুকল। তার ব্যাগে জিপিএস রিডিংস আর যাবতীয় ভিডিও। আজ এগুলো দেখানো হবে। সাজিদ মীরের থাকার কথা। কই তাকে তো দেখা যাচ্ছে না! কোথায় গেল? এখনও আসেনি? ডেভিডকে দেখে একটি লোক এগিয়ে এল। গোটা মুখ ক্লিন শেভড! হাঁটার ধরনটা চেনা। মুখের আদলটাও? কিন্তু পুরোপুরি চেনা যাচ্ছে না। লোকটি কাছে টেনে নিল ডেভিডকে। বলল, সালাম আলাইকুম দাউদ! সব খ্যায়রিয়াৎ? 'আপনি?' বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল ডেভিড। লোকটি বলল, আমি মীর! চমকে গেল ডেভিড! মীর? সাজিদ মীর? এরকম দেখতে হয়ে গেল কীভাবে? মুম্বই অ্যাটাক এগিয়ে আসছে। তাই সাজিদ মীর প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে নিয়েছে নিজের মুখ! ইন্ডিয়া যদি আগামীদিনে তাকে চক্রান্তকারী হিসাবে ছবিও দেয়, পাকিস্তান সরকার বলতেই পারবে এরকম দেখতে কোনো টেররিস্ট পাকিস্তানে নেই! আগাম প্ল্যান রেডি! মীর বলল, দাউদ তোমার কাজ শেষ। বহোৎ শুক্রিয়া। এবার আসল কাজ করবে অন্য টিম! স্ত্রী সাজিয়া আর চার ছেলেমেয়েকে পাকিস্তান থেকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিল ডেভিড কোলম্যান হেডলি। তার বড় ছেলে বিশেষ প্রিয় হেডলির। তাকে বলল, ড্যাডি তোমার সঙ্গে ওয়ান উইক পর মিট

করবে। এখন যাও তোমরা। প্রিয় পুত্রের নাম কী রেখেছিল ডেভিড কোলম্যান হেডলি? ওসামা!!

২৪ জনের গ্রুপ। মুরিদকের ট্রেনিং শেষ। এবার যেতে হবে অন্য কোথাও। আরও কঠোর প্রশিক্ষণ। আট ঘণ্টার জার্নি। নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের জায়গাটার নাম মানশেরা! দক্ষিণদিকে কী আছে? একটা ছোট জনপদ। সেই সিটির নাম অ্যাবটাবাদ। ওসামা বিন লাদেন থাকে সেখানে তখন। ২১ দিনের ট্রেনিং হল এখানে। যার পোশাকি নাম দওরা ই আমা। ঝিলমের একটা সামান্য ছোট সংস্থা ওয়েলকাম টেন্ট সার্ভিসে কাজ করা আজমল কাসব রাওয়ালপিন্ডি গিয়েছিল একটামাত্র যে কোনো আর্মস কিনতে। কান্ট্রিমেড। কারণ ওটা দিয়ে সে আর তার বন্ধু মুজফফর ভেবেছিল ছিনতাই শুরু করবে। তার হাতে এই প্রথম দেওয়া হল সম্পূর্ণ স্বপ্নের মতো একটি আর্মস। একে ফর্টিসেভেন। এই ক্যাম্পে প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হল একটি করে এই কালাশনিকভ। দেড় মাস কঠোর পরিশ্রমের পর তাদের বলা হল এবার রেস্ট। ছুটি। যে কেউ ইচ্ছে করলে বাড়ি যেতে পারে। তবে ১৫ দিনের জন্য। আবার যোগ দিতে হবে ক্যাম্পে। সবথেকে বিস্ময়কর হল এত কঠোর প্রশিক্ষণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ কেউই জানে না কেন এই ট্রেনিং! কোথায় অ্যাটাক করা হবে? সকলে ধরেই নিয়েছে কাশ্মীরে যেতে হবে। মুজফফরকে বাড়ি থেকে দাদা নিতে এসেছিল। সেই দাদার হাতে টাকা তুলে দিল লস্কর। বলা হল তোমার ভাই আমাদের নয়, তোমাদেরও পরিবারের গর্ব। যাও। আবার ফের দিয়ে যেও। আজমলকে কেউ নিতে আসেনি। সে বাড়িতে দুবার ফোন করল মোবাইলে মাকে। লাইন ঢুকছে না। আর কথাই হল না। ক্যাম্পেই থেকে যেতে বাধ্য হল সে। ট্রেনিং সমাপ্ত। কাদের বাছাই করা হল?

হাফিজ আরশাদ। ৬ ফুট লম্বা। বাড়ি মুলতানে। তার ৬ ভাই আখের খেতে কাজ করে। আর আরশাদ রেলের লেবার ছিল। সেখানেই রেলকলোনির মাঠে হাফিজ সঈদের সভা দেখল একদিন বিকালে। সেখানেই তাকে হাফিজের জ্বালাময়ী অ্যান্টি ইন্ডিয়া ভাষণ শুনে হাততালি দিতে দেখে দুজন লস্কর রিক্রুটার বলেছিল তাদের হয়ে কাজ করলে মাসে

১২০০ টাকা করে দেওয়া হবে। সে রাজি। আর সেই নতুন কাজের রুট তাকে আজ এই ক্যাম্পে এনেছে।

শোয়েব। সবথেকে কম বয়সি। ১৮ বছর। শিয়ালকোট জেলার বড়াপিন্ড গ্রামের কোরান শিক্ষকের ছেলে। মুরিদকায় তাকে ভর্তি করা হয়েছিল ধর্মীয় টিচার হওয়ার জন্য। তার বাবা জানতেন না ওই কেন্দ্রটি আসলে জঙ্গি গড়ার কারিগর।

নাসির আহমেদ। ফয়জালাবাদের একটি রোগা যুবক। নাসির দীর্ঘদিন ধরে গরিব গ্রামের ছেলেদের লস্কর ক্যাম্পে পাঠানোর কাজ করে। মাসে বেতন ১৩০০ টাকা। আবদুল রহমান ছোটো। ইটভাটায় কাজ করেছে। পাঞ্জাবের বেহরা জেলার এমন এক প্রত্যন্ত গ্রামে তার বাড়ি যে সেই গ্রামের সরকারি কোনো নামই নেই। শুধু কাগজে কলমে যার নাম ৫১১। গ্রামের নাম।

ফাহাদুল্লা। আজমল কাসবের নিজের এলাকার ছেলে। ২৪ বছর বয়স। বাঁ হাতের দুটো আঙুল নেই। কীভাবে হল? জিজ্ঞাসা করা হলে সে শুধু রহস্যময় হাসে। উত্তর দেয় না। জাভেদ। ওকারার উত্তরদিকে গুগেরা গ্রামের ছেলেটি ১৬ বছর বয়সেই বাবা মাকে বলেছিল সে লস্করে যোগ দিতে চায়। গ্রামের চাষি তার বাবা শুনেই এতটা ক্ষিপ্ত আর ভীত হয়ে যান যে, তিনি পাশের বাড়ির ১৪ বছরের এক কিশোরীর সঙ্গে ১৬ বছরের ছেলের বিয়ে দিয়ে দেন। যাতে ছেলের মাথা থেকে লস্করের ভূত চলে যায়। তা হয়নি। সে কয়েকমাস পরই বাড়ি থেকে পালায়। আর আশ্রয় নেয় ওকারায় লস্কর হেডকোয়ার্টারে।

ইসমাইল খান। নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের একমাত্র অপাঞ্জাবি সদস্য। আর এদের সঙ্গে করাচিতে গিয়ে দেখা হবে আরও দুই সদস্যের। উমের আর অক্ষ। যদিও আর কয়েকদিনের মধ্যেই ফাইনাল অপারেশনের আগে সব নাম চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। প্রত্যেককে নতুন নামে দেওয়া হবে আই কার্ড। কপালে থাকে গেরুয়া তিলক। মুম্বইয়ের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির থেকে ওই গেরুয়া তিলকের কৌটো কিনে এনেছে ডেভিড।

ডেভিড কোলম্যান হেডলি আরও কিছু শপিং করে এনেছে আগেই। ১০টা চাইনিজ ব্যাকপ্যাক। প্রত্যেকটির উপরে একটি লোগো। যাতে লেখা আছে 'দ্য টাইড। 'পাঁচটা

নোকিয়া ১২০০ হ্যান্ডসেট। দুজন করে টিম হবে। প্রত্যেক টিমের কাছে একটি ফোন। ভোদাফোনের সিম কার্ড। অমৃতসরের কাছে একটা সীমান্তবর্তী গ্রামে গিয়ে ডেভিড চেক করে এসেছে সেই সিম কাজ করে কিনা পাকিস্তান বর্ডারে।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮। আজমল কাসব আর বাকি ৯ জন ট্রেনে করে করাচি এসেছে। একটি নির্জন লোকালিটি। নাম আজিজাবাদ। আসলে এরকম নামের কোনো জায়গাই নেই ওখানে। সবটাই কোডনেম। সেখানেই উঠেছে এই গোটা টিম। এখানে ব্যাগ গোছানো হবে। ব্যাগে থাকছে জিংক চেস্ট, পিংক ফোম। তুলো দিয়ে ঢাকা ডিটোনেটর। টিনের বাক্সে আরডিএক্স। চারটে পৃথক ব্যাগে গ্রেনেড আর কার্তুজ। পরে এগুলো ভাগ বাটোয়ারা করা হবে। ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হল ১৬টা লাইফ জ্যাকেট। একটা ডিঙি। আর একটি ইম্প্রোভাইজড বোট কেনা হয়েছে। যার নাম আল হুসেনি। বেআইনি নয়। পাকিস্তান কাস্টমসের অনুমাদিত পোর্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট আছে। যার নম্বর বিএফডি ৫৮৪৬। একটা বোট যদি ইঞ্জিন ফেল করে? তাই ব্যাক আপ রাখা হবে। আরও দুটো। আল আট্টা। আর আল ফাউজ! এই বোট চালাবে কে? কারাই বা হবে নেভিগেটর? তাই ১৬ জন মাঝিকে রিক্রুট করা হল। একজনকে কন্ট্রাক্ট দিয়ে। যার কোডনেম হাকিম সাব।

তোমরা সবাই রেডি? এখনও তোমাদের বলা হয়নি কোথায় আমরা অ্যাটাক করব। তোমরা জেনে খুশি হবে। জায়গাটার নাম মুম্বই। ইন্ডিয়ার সবথেকে বড়লোক সিটি। বলল আমির সাব। সে এসেছে আজই সকালে। ১৩ সেপ্টেম্বর। ২০০৮। আজিজাবাদের মধ্যেই একটা ছোট কনফারেন্স রুম। চাচা জাকি, আবু হামজা, মেজর ইকবাল হাজির।

সাজিদ মীরের কাজ শেষ। সে ব্যাকঅফিসের লোক। অপারেশনের জন্য এবার অন্য কমান্ডারের দায়িত্ব। চাচা জাকি ১০ জনের ফিঁদায়ে টিমকে বলল আমাকে ফলো করে এসো। সকলেই ওই অডিটোরিয়াম ছেড়ে একটা প্রাঙ্গণ পেরোল। বিল্ডিংয়ের একেবারে পিছনদিকে একটা সম্পূর্ণ আলাদা ঘর। এটা হল লস্কর ই তৈবার ডেটা সেন্টার। এই সেন্টারের ইনচার্জ আবু জারার শাহ। গত কয়েকমাস ধরে সে পোর্টেবল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। আর এই গোটা নেটওয়ার্ক গড়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে

একটি ইনফরফেশন টেকনোলজি টিম। যে টিমের কোডনেম ‘আউলস’। তাদের রিক্রুট করা হয়েছে দুবাই, করাচি, জেড্ডা থেকে। এই ১০ জন জঙ্গি যখন মুম্বই ল্যান্ড করবে তখন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সারাক্ষণ যাতে থেকে যায় এবং এই করাচি কিংবা লাহোরে বসেই যাতে মিনিট বাই মিনিট নির্দেশ দেওয়া যায় অথবা আপডেট পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে প্রথমেই নেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট ফোন লাইন ভাড়া। যাকে বলা হয় ইন্টারনেট টেলিফোনি। কোথা থেকে নম্বর এবং নেটওয়ার্ক ভাড়া করা হয়েছে? আমেরিকার নিউ জার্সির কোম্পানি কলফোনেক্স । এই সংস্থার নেটওয়ার্ক ইউজ করে জঙ্গিবাহিনী মুম্বই থেকে ইন্ডিয়ান সিমকার্ড থেকে যে ইন্টারন্যাশনাল কল করবে, সেটি প্রথমে যাবে অস্ট্রিয়ায়। সেখান থেকে কল ডাইভার্ট করা হবে পাকিস্তান ভায়া কলফোনেক্স! ভারতীয় গোয়েন্দাদের পক্ষে যা ট্র্যাক করা অসম্ভব!

ফাইনাল প্ল্যান। ১৪ সেপ্টেম্বর। সেদিনই প্রথম আজমল আর তার টিম জানতে পারল তাদের কোথায় অ্যাটাক করতে হবে। ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাসে যাবে আজমল আর ইসমাইল। শোয়েব আর উমের যাবে লিওপোল্ড কাফে। আবদুল রহমান আর জাভেদ ঢুকবে তাজ হোটেলে। উমের আর অক্ষ টার্গেট করবে চাবাড় হাউসে। ডেভিড হেডলির তোলা ভিডিও আর জিপিএস রিডিংস টানা ৭ দিন ধরে দেখানো হল। আর যারা তাজে ঢুকবে তাদের বোঝার সুবিধার জন্য থ্রি ডি অ্যানিমেশন প্রদর্শিত হল বড় স্ক্রিনে। ১০ দিন পর তোমাদের দেওয়া হবে একটি করে আই কার্ড। তোমরা স্টুডেন্ট। হিন্দু। হায়দরাবাদের অরুণোদয় ডিগ্রি কলেজের। মনে রাখবে সবাই। কন্ট্রোল রুম খোলা হবে করাচির মালির টাউনে। মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। সবথেকে পশ এলাকা। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে। এখান থেকে চারদিকে পাকিস্তানি সেনার সিকিউরিটি বলয়ের মধ্যে থেকে কন্ট্রোল করা হবে ভয়াবহ একটি অপারেশন!

২৭ সেপ্টেম্বর। ২০০৮। প্রত্যেকটি ব্যাকপ্যাকে একটি করে কালাশনিকভ, ২৪০ রাউন্ড গুলি, ৮টা হ্যান্ডগ্রেনেড, একটা বেয়নেট, একটি করে পিস্তল যার তিনটি ম্যাগাজিন। এক কেজি করে কাঠবাদাম, কিশমিশ। হেডফোন। ব্যাটারি চার্জার। ৮ কেজি আরডিএক্স।

সাপ্লাই বস্তার মধ্যে চাল ডাল তেল, জল, টিস্যু পেপার, মাউন্টেন ডিউ, রেজার, টুথপেস্ট, ব্রাশ টাওয়েল, মিল্ক পাউডার। সন্ধ্যা ৬ টা। দুটি ডিঙিতে ১০ জন। আবু হামজা, হাফিজ সঈদ, চাচা জাকি সকলকে জড়িয়ে ধরে বলল, জিতকে আনা! ঠিক সাড়ে ৭ টায় অ্যাটাক করবে। নতুন ঘড়ির কাঁটা আধঘণ্টা এগিয়ে রাখো। ইন্ডিয়া আমাদের থেকে টাইমে এগিয়ে। সঙ্গে দুজন করে মাঝি। অনেক দূরে সাগরে দাঁড়িয়ে আছে আল হুসেনি।। কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি। সামান্য ১৯ মিনিটের মধ্যেই আরব সাগর এত উত্তাল হয়ে উঠল যে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ডিঙি সামলানো যাচ্ছে না। ফিরে এল ১০ জন।

পাঁচদিন পর। আবার রওনা হওয়া। এবার কোনো সমস্যা হল না। অনায়াসে সমুদ্রের অভ্যন্তরে দাঁড়ানো আল হুসেনি বোটে ওঠা গেল। সকলেই উত্তেজিত। এগোনো হচ্ছে দ্রুত। কেউ কথা বলছে না। অজানা সফর। অজানা টার্গেট। অজানা দেশ। কী হবে? আচমকা শান্ত আকাশ আবার অশান্ত। প্রবল ঝড় উঠল। টলমল করছে বোট। কিন্তু হাকিমসাব স্টিয়ারিংয়ে। কোনো চিন্তা নেই। ইন্ডিয়া বর্ডারের কাছেই? নাকি ক্রস করা হয়েছে? হঠাৎ ওই ঝড়ের শব্দ ভেদ করে একটা বিদ্যুচ্চমক।

গুলি চালাচ্ছে কেউ? চিৎকার করে উঠল হাকিমসাব। কে এই মাঝসমুদ্রে গুলি করছে? সকলেই বাইরে আসতে ভয় পাচ্ছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উপর্যুপরি গুলি আসছে অন্ধকার থেকে। হাকিম সাহেবের হাত কেঁপে গেল বোঝা গিয়েছে। সামনেই কোনো ইন্ডিয়ান ট্রলার। সেখানে যারা আছে তারা ভেবেছে এটা জলদস্যুদের বোট। তাই আগুপিছু না ভেবেই গুলি চালাচ্ছে ইন্ডিয়ান ট্রলার। উপায় নেই? এদের সঙ্গে লড়াই করে গুলি নষ্ট করা কিংবা ধরা পড়লে সব প্ল্যান নষ্ট! তাই আবার ব্যর্থ হল মিশন। ফিরে গেল আল হুসেনি। করাচিতে। কয়েকশ গ্যালন ডিজেল নষ্ট হল। কাজ হল না। মিশন কি ব্যর্থ হবে? ঠিক দু সপ্তাহ পর। রাত সাড়ে তিনটের ইয়ে ফোন এল রাহুল ভাটের কাছে। এত রাতে কে? অনেক বড় নম্বর। ডেভিড।

হাই রাহুল।

হ্যালো ডেভিড, কী খবর!

একটা কথা বলার ছিল।

কী?

আগামী একমাস সাউথ মুম্বইয়ে যেও না তুমি আর বিলাস!

মানে? কেন?

আমি বলছি যেও না।

স্যাটেলাইট ফোন কেটে গেল!

২২ নভেম্বর। রাত ৯টা। ফের দুটি নতুন ডিঙি কেনা হয়েছে। কারণ আগেরগুলো অপয়া। সেই পুরোনো টিম। ডিঙিতে চেপে যাচ্ছে আরব সাগরে। করাচির এক নির্জন উপকূল ছেড়ে। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে আল হুসেনি। অপেক্ষা করছে হাকিম সাব। ১০ টিম মেম্বার আর সাতজন বোটকর্মী নিয়ে আল হুসেনি নিজেকে ভাসিয়ে নিল মুম্বইয়ের দিকে। সমুদ্রে রাত কাটানো এই প্রথম। পরদিন সকাল। ২৩ নভেম্বর। খুব ভোরেই ক্রস করা হয়ে গিয়েছে ইন্ডিয়ান বর্ডার। সমুদ্র শান্ত। এই টিমের লিডার করা হয়েছে ইসমাইলকে। সে মাঝেমধ্যেই গান গাইছে। আসলে টেনশন কাটাতে। কারণ ইচ্ছা করলেই আর পিছু হটা যাবে না। ইন্ডিয়ান নেভির হাতে ধরা পড়লে সারাজীবন জেল। আর এতসব অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়া মানে সাংঘাতিক শাস্তি। ১০ জনের কানে একটা কথাই বাজছে। আসার আগে তাদের হ্যান্ডলাররা বলে দিয়েছে যত বেশি সংখ্যক লোক মারতে হবে। গোটা দুনিয়া যেন ভয় পেয়ে যায়। ১০ জন যুবক সেটাই করতে চলেছে। ঠিক দুপুরে দূরে একটা বিন্দু। হাকিম সাব ডেকে পাঠাল বাকিদের। ডেক থেকে দূরবিনে চোখ। দেখা যাচ্ছে একটা ট্রলার। আবার ইন্ডিয়ান ট্রলার? হ্যাঁ। এই কালো, সাদা হলুদ রঙের ট্রলারটির নাম এম ভি কুবের! দ্রুত এগিয়ে আসছে আল হুসেনির দিকে। একটু কাছে আসতেই উমের হাতে একটা ভাঙা ফ্যানের বেল্ট তুলে নাড়াতে লাগল। যাতে মনে হয় তারা বিপদে পড়েছে। সেই ভারতীয় ট্রলার নিয়ম অনুযায়ী কাছে এল। সমুদ্রে বিপদে পড়লে সকলেই পরস্পরকে

সহায়তা করে। এটাই নিয়ম, অঘোষিত। দুটি বোট পাশাপাশি। আচমকা আড়াল থেকে চারজ ছিটকে বেরিয়ে এসে জাম্প করে এমভি কুবেরের ডেকে উঠে গেল। ভারতের নিরীহ লোকগুলো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। আর উঠেই গুলি চালাল দুজন। ছিটকে পড়ল ভারতীয় ট্রলারের দুজন সওয়ারি। এরা জেলে। মাছ ধরতে এসেছে। মোট চারজন। নাবিক বাদে বাকিদের ধরে জোর করে আল হুসেনিতে তুলে দেওয়া হল। আর আরও ৬ জন লস্কর জঙ্গি উঠে এল এম ভি কুবেরে। এবার এই ভারতীয় ট্রলার এই ১০ লস্কর জঙ্গিদের দখলে। একমাত্র এই ট্রলারের ভারতীয় যে সে চালক। অমরচাঁদ সোলাঙ্কি। তার হাত পা বেঁধে ফেলা হল। আর অন্যদিকে যে তিনজন জেলেকে পাকিস্তানের হাকিমসাবের বোটে তোলা হয়েছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নই নেই। পরপর গলার নলি কেটে ফেলা হয়েছে। গোটা শরীর ছটফট করতে করতে শান্ত হওয়ার আগেই সব কটা বডি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল। এবার বিদায়ের পালা। হাকিমসাব এই টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বোট ঘুরিয়ে নিল। সে ফিরে যাবে করাচি। চিৎকার করে বলল, চুন চুন কে মার না ভাইলোগ! আজমলরা হেসে হাত নাড়াল।

ভারতীয় ট্রলারে উঠে কিছুক্ষণ ধাতস্থ হতে সময় লাগল এই ১০ জনের। টেনশনও আছে। বোটের ডেকে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় ইসমাইল মোবাইল ফোনে নম্বর ঘুরিয়ে বলল, সালাম আলাইকুম! কোনো শব্দ নেই ওপ্রান্তে। কয়েক সেকেন্ড চলে গেল। কী ব্যাপার? কানেকশন হচ্ছে না? ঠিক ১৫ সেকেন্ড পর ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল ভাঙা কণ্ঠ। আলাইকুম আসসালাম! আবু হামজা। করাচির কন্ট্রোল রুম থেকে। একটা উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। মাঝসমুদ্রে আর কন্ট্রোলরুমে সর্বত্র আনন্দ। বিকেল চারটের পর দূর থেকে একটা দিগন্তরেখায় দেখা যাচ্ছে বড় বড় বিল্ডিংয়ের ছায়া। চিৎকার করে উঠল আবদুল রহমান ছোটা। সবাই চলে এসো! ওই দ্যাখো মুম্বই! জিপিএস অন আছে। দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ। ওটাই মুম্বই কোস্টলাইন! ভারতীয়দের কাছে স্বপ্ননগরী। ইসমাইল আজমলকে জিজ্ঞাসা করল এই লোকটাকে নিয়ে করব? আজমল বলল মেরে ফেলব! আবার কী? তবু ইতস্তত করছে ইসমাইল। কন্ট্রোল রুমে ফোন। এবার আবু হামজা লাইনে। হ্যাঁ বল! এই ট্রলারের ইন্ডিয়ানকে নিয়ে কী করা হবে? আবু বলল, তোমাদের যা ইচ্ছে! ওকে দিয়েই শুরু করো

তোমরা! বলে হেসে উঠল। হাসল আজমলও। অমরচাঁদ সোলাঙ্কিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল।

সন্ধ্যা ৬টা। জিপিএস দেখাচ্ছে ওই যে বাধওয়ার পার্কের মাছিয়ারা কলোনি। ওটাই ল্যান্ডিং লোকেশন। আজমল কাসব আর ৯ জন লস্কর ফোর্স মুম্বই নামল। ২৬ নভেম্বর ২০০৮। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ঠিক এক ঘণ্টা পর শুরু হবে এক কালান্তক পর্ব! টুয়েন্টি সিক্স ইলেভেন! মুম্বই অ্যাটাক! ১৬৪ জনের মৃত্যু। ৩১০ জন আহত। কয়েকশো পরিবারের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। মুম্বই পুলিশ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের কমান্ডোদের অসীম বীরত্বের কৃতিত্ব ভোলার নয়। প্রাণ দিয়েছেন একঝাঁক পুলিশ অফিসার আর সিকিউরিটি অফিসার। আক্রমণকারীদের ভারতীয় সুরক্ষাবাহিনী অসীম সাহসী লড়াইয়ে হত্যা করেছে। ধরা পড়েছে আজমল কাসব।

পাঁচদিন পর মুম্বই পুলিশের অ্যান্টি টেররিজিম স্কোয়াডের দুই অফিসারকে ধরা পড়া আজমল কাসব জানতে চাইল আমার সঙ্গীরা কোথায়? অফিসার বললেন, তারা অন্য কোথাও আছে। দেখা করবে? আজমল ব্যগ্র হয়ে বলল, দেখা করা যাবে? অফিসার বললেন হ্যাঁ, চলো। আজমলকে নিয়ে আসা হল বাইকুল্লায় জে জে হাসপাতালে। একটি ঘরে ঢোকানো হয়েছে তাকে। পরপর স্ট্রেচার। চাদর দিয়ে ঢাকা। কোথায় ওরা? আজমল জানতে চায়। স্থির চোখে জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ রাকেশ মারিয়া সামনে আঙুল দিয়ে বললেন, ওই তো! সার দিয়ে ৯ জনের ডেডবডি। পাকিস্তানের পাঠানো ফোর্স খতম। আজমল হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। চার বছর পর তার ফাঁসি হয়।

কীভাবে হয়েছিল সেদিনের সেই যুদ্ধটা? চারদিন ধরে ভারতীয় সিকিউরিটি বাহিনীর ওই অভিযানের নাম ছিল "অপারেশন টর্নেডো"। এক সাধারণ কনস্টেবল থেকে ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডো, প্রত্যেকের ছিল একটি করে ব্যক্তিগত জীবন বাজি রাখা অসমসাহসী লড়াইয়ের কাহিনি। সে কাহিনির প্রতিটি মুহূর্তের হাড় হিম করা রোমহর্ষক বিবরণ। সে এক সত্যি থ্রিলার। আবার পরে হয়তো কোনো এক সময় শুনব আমরা!

আপাতত করিডর ক্লোজড!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

তথ্য ঋণ :

এই সত্যি কাহিনিগুলো লেখার জন্য সবথেকে কঠিন ছিল সোর্স রেফারেন্স সংগ্রহ করা। কারণ প্রতিটি ঘটনার মিনিট বাই মিনিট বিবরণে কোনো কল্পনার জায়গা থাকতে পারে না। প্রায় কমবেশি সকলেরই এসব কাহিনি চেনা, জানা এবং পরিচিত। সুতরাং তথ্যবিকৃতি সবথেকে বড় অপরাধ হিসাবেই গণ্য হবে। তাই যেসব বই, ফাইল, তদন্তকারী সংস্থার চার্জশিট, মামলার রায়ের কপি এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার বিবরণের কাছে অকুণ্ঠ ঋণী সেগুলি হল নিম্নরূপ :

NEWS REPORT AND INVESTIGATIVE FEATURES FROM VARIOUS MEDIA:

1. THE GUARDIAN
2. THE TRIBUNE
3. INDIAN EXPRESS
4. REDIFF
5. HINDUSTAN TIMES
6. DAWN

REPORTS:

1. “CENTRE FOR LAND WARFARE STUDIES" UNDERSTANDING THE INDIAN MUJAHIDIN-MANEKSHIT SINGH
2. INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES

GOVERNMENT DOCUMENTS AND REPORT:

1. NATIONAL INVESTIGATION AGENCY CASE STUDY REPORT AND PRESS RELEASE
2. CBI REPORT AND PRESS RELEASE
3. ANNUAL REPORT: MINISTRY OF HOME AFFAIRS

4. MUMBAI ATS CRIMINAL BAIL APPLICATION AND CHARGESHEET TO HIGH COURT
5. SPECIAL CELL DELHI POLICE PRESS RELEASE
6. HIGH COURT AND SUPREME COURT FINAL JUDGEMENT

BOOKS:

1. MISSION RAW - RK YADAV
2. FEAST OF VULTURES – JOSY JOSEPH
3. KASHMIR-THE VAJPAYEE YEARS-A S DULAT
4. SIX MINUTES OF TERROR-NAZIA SYED AND SHARMIN HAKIM
5. DIAL D FOR DON - NEERAJ KUMAR
6. DANGEROUS MINDS-BRIJESH SINGH ANS S HUSSAIN ZAIDI
7. FOUND DEAD-SHANTANU GUHA RAY
8. FIXED-SHANTANU GUHA RAY
9. DONGRI To DUBAI - S HUSSAIN ZAIDI - A S DULAT
10. SPY CRONICLES

নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের
প্রাকপর্ব, স্বাধীনতার দুই দশক পার হওয়া এবং
দ্রুত পালটে যেতে থাকা বাঙালি মূল্যবোধের
সেই সন্ধিক্ষণের অস্থির সময়ে জন্ম কলকাতায়।
পিতামাতার কর্মসূত্রে শৈশব, কৈশোর
যাযাবরের জীবন। সেভাবেই বড় হওয়া শহর
কলকাতা সংলগ্ন জনপদে। বারাসত সরকারি
স্কুল এবং কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল
মিশন কলেজে পড়াশোনা। অধুনালুপ্ত
'ওভারল্যান্ড' পত্রিকায় প্রথম চাকরি। এরপর
বর্তমান পত্রিকায় যোগদান। নব্বইয়ের দশকে
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সাংবাদিকতার
সূত্রে গ্রামীণ ও মফস্সলের সমাজজীবন প্রত্যক্ষ
করা। তারপর একদিন দিল্লিতে পোস্টিং। সেই
সুবাদে ভারতের প্রায় সিংহভাগ রাজ্যে, শহরে,
গ্রামে, কুম্ভমেলায়, নির্বাচন অথবা ঘটনা-দুর্ঘটনা
কভার করতে গিয়ে বহমান ভারতের খণ্ডদৃশ্য
দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তারই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর
সফরসঙ্গী হিসাবে একাধিকবার বিদেশ সফর।
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'গুপ্তচর-ভারত পাকিস্তান'।
এখন 'বর্তমান' পত্রিকার দিল্লি অফিসের
নিউজ ব্যুরো চিফ।

বিয়েবাড়ির অ্যাম্বাসাডর থেকে চারজন লাফ দিয়ে নেমে এল। লম্বা যুবকটি প্রথমেই ড্রাইভিং সিটের পাশে এসে এক ঝটকায় দরজা খুলে চিত্রাকে বলল, নেমে যাও যদি বাঁচতে চাও. . .। চিত্রার মুখে কথা নেই। কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? সাবির স্তব্ধ। তার হাতে পিস্তল, কিন্তু চোখের সামনে চিত্রাকেও তো পিস্তলের সামনে ধরে আছে আর একটি ছেলে। যুবককে চেনে সাবির। মনোহর সুরভে। সবাই ডাকে মান্যা। ঠান্ডা চোখ। অন্যরা আরও বেশি চেনা। আমিরজাদা, আলমজেব। সাবিরদের গ্যাং-এর নতুন বিজনেস পার্টনার। দুই পাঠান ভাই। নিজের মৃত্যু নয়, সম্ভবত সাবিরের চোখের সামনে প্রথম ভেসে উঠল ভাইয়ের মুখটা। ভাই দাউদ এই সময় পাশে থাকলে...সে যখন জানবে তখন...। রেডি? চোখ বুজল সাবির...শুধু সেফটি ক্যাচের শব্দটা কানে এল...।
9 789388 351287